সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৮, ১৯, ২১

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,
দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,
দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮২০—১৮৯১

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

হুগলী (বর্ত্তমানে মেদিনীপুর) জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে ১২ আশ্বিন ১২২৭, মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম। তিনি স্বরচিত চরিত-কথায় স্বীয় জন্ম ও বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শকাব্দাঃ ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনক জননীর প্রথম সন্তান।···

বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু, এই গ্রাম আমার পিতৃপক্ষীয় অথবা মাতৃপক্ষীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান নহে। জাহানাবাদের ঈশান কোণে, তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে বনমালিপুর নামে যে গ্রাম আছে, উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান।···

প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান; জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত কথান্তর

উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ও ম
সহোদরের অবমাননাব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগে, তদীয় অন্তঃ
নিরতিশয় ব্যথিত হইল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি কি
দিবস অতিবাহিত করিলেন; অবশেষে, আর এ স্থানে অবি
করা, কোনও ক্রমে, বিধেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, কাহাে
কিছু না বলিয়া, এককালে, দেশত্যাগী হইলেন।

বীরসিংহ গ্রামে, উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে অতি প্র
পণ্ডিত ছিলেন।......রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধা
তৃতীয় কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গ
তর্কভূষণ মহাশয়ের, দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে।...জ্যেষ্ঠ ঠাকুর
বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।

রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন; দুর্গাদেবী, পুত্র ক
লইয়া, বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।
দিনের মধ্যেই দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনা ভোগ, ও তদীয় পুত্র কন্যা
উপর কর্ত্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর, এতদূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল,
দুর্গাদেবীকে, পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া, পিত্রালয় যাইতে হইল
কিছু দিনের মধ্যেই, পুত্র ও কন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন ক
দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্ব
বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্য্যা তাঁহার উপর অতি
বিরূপ; অনিয়ত কালের জন্যে, সাত জনের ভরণপোষণের ভারবহ
তাঁহারা, কোনও মতে, সম্মত নহেন।...দুর্গাদেবীকে, পুত্র কন্যা লই
পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতি
ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন, এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে এক কু
নির্ম্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গাদেবী, পুত্র কন্যা লইয়া, সেই কুটি

অবস্থিতি ও অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিয়া, সেই সুত বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন।...এই সময়ে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি, মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জ্জনের চেষ্টায়, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।...

কিছু দিন পরে ঠাকুরদাস আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম পাইয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ব্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও, বেতনের দুইটি টাকা, যথানিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন।...দুই তিন বৎসরের পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাই ভগিনীগুলির অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে, কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন; তথায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দেখিতে না পাইয়া বীরসিংহে আসিয়া, পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগমলাভে, সকলেই, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। শ্বশুরালয়ে, বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন, এজন্য, কিছুদিন পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু, দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া, সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এইরূপে বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল।

বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে, তদীয় কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া, তিনি যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ ও সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বড়বাজারের দয়েহাঁটায়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল।...ঠাকুরদাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া, বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন। এই অবধি, ঠাকুরদাসের আহারক্লেশের অবসান হইল। যথাসময়ে আবশ্যকমত, দুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি পুনর্জ্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভ ঘটনা দ্বারা, তাঁহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল, এরূপ নহে; সিংহ মহাশয়ের সহায়তায়, মাসিক আট টাকা বেতনে এক স্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

এই সময়ে, ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত, তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতী দেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

ছাত্র-জীবন

ঈশ্বরচন্দ্র স্বলিখিত জীবন-চরিতে তাঁহার বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন:—

"আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম। বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। গ্রামস্থ বালকগণ ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আমি তাহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম।...আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তথায় শিক্ষা করিলাম। আমি গুরুমহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলাম।

পিতামহদেবের দেহাত্যয়ের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন। তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বড়বাজারনিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সময়ে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্ব্বে সিংহ মহাশয়ের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্ত্তা।...জগদ্দুর্লভবাবুর বাটীর অতি সন্নিকটে, শিবচরণ মল্লিক নামে এক সম্পন্ন স্থবর্ণবণিক্ ছিলেন। তাঁহার বাটীতে একটি পাঠশালা ছিল। ঐ পাঠশালায় তাঁহার পুত্র, ভাগিনেয়, জগদ্দুর্লভবাবুর ভাগিনেয়েরা, ও আর তিন চারিটি বালক শিক্ষা করিতেন। কলিকাতায় উপস্থিতির পাঁচ সাত দিন পরেই, আমি ঐ পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাস তথায় শিক্ষা করিলাম। পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।

ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে আমি রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলাম।...সংবাদ পাইবামাত্র, পিতামহীদেবী অস্থির হইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, এবং দুই তিন দিন অবস্থিতি করিয়া, আমায় লইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনা

চিকিৎসায়, সাত আট দিনেই, আমি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আমি পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম।...

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যত দূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন।...আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্যবশতঃ, ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব।...তিনি বলিলেন, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃতসাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া, তিনি আমায় ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে, আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক; আর যদি চাকরী করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে; সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া, যাহারা ল কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা

আদালতে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেওয়াই উচিত। চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কালেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণরূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর, বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।"

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণী: নয় বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন:

"১৮২৯ খ্রীষ্টীয় শাকে, জুন মাসের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হই। তৎকালে আমার বয়স নয় বৎসর। ইহার পূর্ব্বে আমার সংস্কৃত-শিক্ষার আরম্ভ হয় নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, ঐ শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করি।...কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান্ ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।" ('শ্লোকমঞ্জরী,' বিজ্ঞাপন)

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার দেড় বৎসর পরে (অর্থাৎ, ১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার পর) ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৫৲ করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। কৃতী ছাত্রদিগকে

কলিকাতায় বাসা-খরচের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইত। যাহারা বৃত্তি পাইত, তাহাদিগকে "Pay Student," এবং যাহারা বৃত্তি পাইত না, তাহাদিগকে "Out Student" বলা হইত। এই সময় ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন—মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি। ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে সাড়ে তিন বৎসর—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন:

> "প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধপাঠ সমাপন করিয়া, শেষ ছয় মাসে অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম।" ('শ্লোকমঞ্জরী,' বিজ্ঞাপন)

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র উপর্য্যুপরি তিনটি বার্ষিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় তিন বারই পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। পারিতোষিকের পরিমাণ এইরূপ:—

> "১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় "আউট ষ্টুডেণ্ট"রূপে ব্যাকরণ ও নগদ ৮৲। ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায়—অমরকোষ, উত্তররামচরিত ও মুদ্রারাক্ষস। ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় "পে ষ্টুডেণ্ট"রূপে নগদ ২৲।"

ইংরেজী-শ্রেণী: সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে ওলাস্টন (M. W. Wollaston) নামে একজন সাহেবকে মাসিক ২০০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ইহা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। ব্যাকরণ-শ্রেণী হইতেই প্রথমে ইংরেজী-শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে হইত। ঈশ্বরচন্দ্রও মুগ্ধবোধ পড়িতে পড়িতে ইংরেজী-শ্রেণীতে যোগ দিয়াছিলেন (ইং ১৮৩০)। ১৮৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র ৫৷৹

মূল্যের পুস্তক—*History of Greece* (Rs. 4), Reader etc (Rs. 1-8-0) এবং ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররূপে Poeltical Reader No. 3 ও English Reader No.2 পারিতোষিক-স্বরূপ পাইয়াছিলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী-শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাহিত্য-শ্রেণী : ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত দুই বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসরও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় মাসিক ৫৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সাহিত্য-শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত ও কাদম্বরী পড়িতে হইয়াছিল।

১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় (অর্থাৎ সাহিত্য-শ্রেণীর দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায়) প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'সাহিত্যদর্পণ,' 'কাব্যপ্রকাশ' ও দুই খণ্ড *History of British India*, এবং দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্য হিতোপদেশ ও রবিন্সনের *Grammar of History* পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন।

অলঙ্কার-শ্রেণী : ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তখন অলঙ্কারের অধ্যাপক। ঈশ্বরচন্দ্র এক বৎসর অলঙ্কার-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে 'সাহিত্যদর্পণ,' 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'রসগঙ্গাধর' পড়িতে হইয়াছিল। ১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায়

তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্য-প্রকাশ, রত্নাবলী, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্ব্বশী ও মৃচ্ছকটিক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।

বেদান্ত-শ্রেণী : ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাস হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত-শ্রেণীতে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এত দিন তিনি মাসিক ৫৲ বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ৮৲ নির্দ্ধারিত হয়। বেদান্ত-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর, ১৮৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দশ টাকা মূল্যের পুস্তক—মনু (২৲), প্রবোধচন্দ্রোদয় (২৲), অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব (৫৲) এবং দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসা (১৲) পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।

স্মৃতি-শ্রেণী : ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই শ্রেণীতে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। হরনাথ তর্কভূষণ তখন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীতে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববৎ মাসিক ৮৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে তাঁহাকে মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও ব্যবহারতত্ত্ব পড়িতে হইয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন, হরচন্দ্র "তর্কভূষণ মহাশয়, দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বটে; কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার তৎপর বিশেষ দৃষ্টি ছিল না; সুতরাং স্মৃতির ব্যবহারাধ্যায়ে ভালরূপ ব্যবস্থা স্থির করিতে অক্ষম ছিলেন। যদিও অগ্রজ স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মনের তৃপ্তি জন্মাইত না; একারণ,

অদ্বিতীয় ধীশক্তি-সম্পন্ন হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট যাইয়া স্মৃতি অধ্যয়ন করিতেন।”

১৮৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র নগদ ৮০৲ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন; তাঁহার সহাধ্যায়ী মুক্তারাম পাইয়াছিলেন ১০০৲। কিন্তু সংস্কৃত গদ্য-রচনার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীর আর একটি পারিতোষিক ১০০৲ পাইয়াছিলেন। পুরস্কার-প্রাপ্ত গদ্য রচনাটি ঈশ্বরচন্দ্রের ‘সংস্কৃত রচনা’ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু সেটির সহিত আসল রচনাটির বিশেষ মিল নাই। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন দপ্তর হইতে আসল রচনাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

লৌকিককার্য্যে সত্যকথনস্যোপকারাঃ ॥

“সত্যং হি নাম মানবস্য সাধারণজনবিশ্বসনীয়তাপ্রতিপাদকং বিশ্বসনীয়তায়াশ্চ ফলমিহ বহুতরমুপলভ্যতে তথাহি যদি কস্যচিত্ কথঞ্চন সত্যকথনদর্শনেন সাধারণসমীপে বিশ্বসনীয়তা ভবতি ভবতি কি তস্য ক্রমশো নরপতিবিশ্বাসভাজনতা সমুদ্ভূতায়াঞ্চ তস্যাং কিং নাম নরস্য দুরবাপমবশিষ্যতে অর্থিপ্রত্যর্থিনোশ্চ বিবদমানয়োঃ সন্দিগ্ধবিষয়ে সন্দেহাপারপারাবারবারিণি নিমগ্নস্য নরপতের্ন তন্নিস্তরণবিষয়ে সাক্ষিণাং সত্যবচনতরণিরূপাবলম্বনমন্তরেণ কশ্চন সদুপায়ঃ সাক্ষিণামপি সত্যকথনেন বহুতরপ্রতিষ্ঠা দৃশ্যতে যস্য পুনর্বচসি ন সত্যতাপ্রতিভাসঃ কো নাম তমিহ বিশ্বসিতি তথাপি যদি কথঞ্চন সাক্ষিণাং বচনস্যাসত্যতাবিজ্ঞানং ভবতি তে খলু ভবন্তি চিরমেব সাক্ষিধর্ম্মবহিস্কৃতাঃ সততাবিশ্বসনীয়া অনেকশো দণ্ডনীয়াশ্চ অপিচ কিমত্র বহুতরং বক্তব্যং শিশবোঽপি বাললীলাবিষয়ে যদি কশ্চিন্মিথ্যাবাদিতয়া নিশ্চিতো ভবতি শৃণুত ভোঃ সখায়ো নানেনাধমেনাস্মাভিঃ পুনর্ব্যবহর্ত্তব্যময়ং খলু মৃষাভাষীত্যেবমাদি গিরমুদ্গিরন্তীতি লৌকিককার্য্যে বহুধা

সত্যকথনস্থোপকার ইত্যস্তু কিং বিস্তরেণেতি। ধর্মশাস্ত্রাধ্যায়ি শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ ॥"

হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা: সংস্কৃত কলেজে রীতিমত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করেন। সেকালে যাঁহারা আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে এই পরীক্ষা পাস করিতে হইত। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ এপ্রিল তারিখে এই পরীক্ষা হয়। কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী মে মাসে ঈশ্বরচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

HINDOO LAW COMMITTEE FO EXAMINATION.

We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd twenty-second April 1839 by the Committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chunder Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law Officer in any of the Established Courts of Judicature.

H. T. PRINSEP — President
J. W. J. OUSELY — Members of the Committee of Examination.

This Certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the Seal of the Committee this 16th Sixteenth day of May in the year 1839 corresponding with the 3rd Third Joistha 1761 Shukavda.

J. C. C. Sutherland
Secy. to the Committee,

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের নামের শেষে "বিদ্যাসাগর" উপাধিটি লক্ষণীয়। অনেকে লিখিয়াছেন, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলেজে পাঠ সমাপন করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-বর্গ মিলিত হইয়া তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দিয়াছিলেন। এরূপ উক্তি যে ভিত্তিহীন, তাহা জানা যাইতেছে।

ন্যায়-শ্রেণী : ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এই শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন।

এই বৎসর (১৮৩৯) ২১ মে তারিখে সকল বিভাগের বহু ছাত্র সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেক্রেটরী জি. টি. মার্শেলের নিকট আবেদন করেন। এই আবেদনপত্রে ন্যায়-শ্রেণীর ছাত্রবর্গের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রেরও স্বাক্ষর আছে। আবেদনকারীরা লিখিয়াছিলেন :—

ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়িনাং ছাত্রাণাং

"...আমারদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই ইংরাজিভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে উক্ত-ভাষাধ্যয়ন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক নতুবা যে রাজা এতদ্দেশে ইংরাজি বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থে যত্নপূর্ব্বক বহুতর ধন ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাঁহার যে কেবল এতন্মহানগরস্থ প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উক্ত-ভাষাভ্যাসবিষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে ইহা কোনরূপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক রীত্যনুসারে আমারদিগের ইংরাজিভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারি—লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্যাষ্টদিবসীয়া—"

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র একটি রচনা-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন :

"পশ্চিম অঞ্চলে, [সাহারানপুরে] জন মিয়র নামে, এক অতি মহানুভাব সিবিলিয়ান্ ছিলেন। ঐ মাননীয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয়ের

প্রস্তাব অনুসারে, পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ও য়ুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে, কতকগুলি শ্লোক লিখিয়া, একশত টাকা পারিতোষিক পাইয়াছিলাম।" ('সংস্কৃত রচনা,' পৃ. ১৬)*

শম্ভুচন্দ্রের মতে, ঈশ্বরচন্দ্র "দর্শনের প্রাইজ ১০০৲ টাকা পান, এবং সংস্কৃত কবিতা-রচনায় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কবিতা লিখিয়া ১০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।" "বিদ্যার প্রশংসা" নামে সংস্কৃতে একটি পদ্য রচনা করিয়া তিনি যে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় এক শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকেও আছে।

১২ ফেব্রুয়ারী ১৮৪০ তারিখে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হইলে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ কিছু দিন অস্থায়ী ভাবে ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ১১ই আগস্ট জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে স্থায়ী ভাবে ন্যায়-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর (ইং ১৮৪০-৪১) প্রধানতঃ জয়নারায়ণেরই ছাত্র ছিলেন। ন্যায়-শ্রেণীতে তাঁহাকে ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ন্যায়সূত্র ও কুসুমাঞ্জলি পড়িতে হইয়াছিল।

১৮৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়-শ্রেণীর দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র একাধিক বিষয়ে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন; ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১০০৲, পদ্যরচনার জন্য ১০০৲, দেবনাগর-হস্তাক্ষরের জন্য ৮৲, এবং বাংলায় কোম্পানীর রেগুলেশন বিষয়ে পরীক্ষায় ২৫৲—সর্ব্বসাকল্যে নগদ ২৩৩৲। তাঁহার পদ্যরচনার বিষয়

* এই সকল শ্লোক বিদ্যাসাগর-রচিত 'ভূগোলখগোলবর্ণনম্' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ৫০৲—এক শত টাকা নহে।

ছিল—অগ্নীধ্র রাজার তপস্যা; ইহা তাঁহার 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দেও ঈশ্বরচন্দ্র কয়েক মাস জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অধীনে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক বৃত্তি ঐ বৎসরের জুন মাসে বন্ধ হইয়া যায়। তিনি অনধিক তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন।

জ্যোতিষ-শ্রেণী : ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্থির হয়, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার-শ্রেণীর ছাত্রগণকে অন্ততঃ এক বৎসর ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজগণিত পড়িতে হইবে। এই বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য পরবর্ত্তী মে মাসে, উইলসন সাহেবের সুপারিশে, যোগধ্যান মিশ্র নামে একজন পণ্ডিত মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে জ্যোতিষ-শ্রেণীর পাঠও লইয়া থাকিবেন। তিনি যে এক সময়ে এই শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তাহার প্রমাণ, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দেন, তাহাতে জ্যোতিষের অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্রেরও স্বাক্ষর আছে।

প্রশংসাপত্র : বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রশংসা-পত্র লাভ করেন। ইহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই; কৌতূহলী পাঠক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' পুস্তকে ইহার প্রতিলিপি দেখিতে পাইবেন।

৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ মিলিত হইয়া বিদ্যাসাগরকে দেবনাগর অক্ষরে লেখা একখানি স্বতন্ত্র প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান্

ব্যাকরণম্	...	শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্	...	শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্	...	শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্	...	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্	...	শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্	...	শ্রীযোগধ্যানশর্ম্মভিঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ	...	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতৈস্তৈস্তৈঃ তত্ শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট।

১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।

Rassomoy Dutt, Secretary.

10 Decr. 1841.

ইহাই সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র-জীবনের ইতিহাস,—নীরস ইতিহাস সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি বাংলা ভাষাকে সর্ব্বপ্রথমে সরস করিয়া সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের উদ্যোগপর্ব্বের ইতিহাস ঐতিহাসিকের নিকট কম মূল্যবান্ হইবার কথা নয়।

উপনয়ন ও বিবাহ

১১ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের উপনয়ন সংস্কার হয়। তিনি ছাত্রাবস্থায় আনুমানিক চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ক্ষীরপাই-নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যের কন্যা দিনময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

সরকারী চাকুরী

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ: কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইয়া সৌভাগ্যক্রমে অল্প দিনের মধ্যেই এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের চাকুরী জুটিল। ৯ নবেম্বর ১৮৪১ তারিখে মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ শূন্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী হইলেন। বিলাত হইতে যে-সকল সিবিলিয়ান এদেশে চাকুরী করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে কলিকাতায় থাকিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইত; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন জেলার শাসনকার্য্যের ভার পাইতেন। তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী ছিলেন ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শেল। গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বৃত্তি-পরীক্ষায় পরীক্ষক থাকিতেন, কিছু দিন (২৭ মার্চ ১৮৩৯—এপ্রিল ১৮৪০) ঐ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটরীও ছিলেন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্র-জীবনের কৃতিত্বের সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিচয় ছিল। মার্শেল ঈশ্বরচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের নিকট এক সুপারিশ পত্র পাঠাইলেন (২৭ ডিসেম্বর)। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখ হইতে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। বর্ত্তমান বাংলার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাগুরুর ইহাই কর্ম্মজীবনের আরম্ভ।

ক্যাপ্টেন মার্শেল সেরেস্তাদারের কাজে খুশী হইয়া উঠিলেন।

পণ্ডিতের সংস্রবে আসিয়া তিনি ক্রমেই তাঁহার বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, জ্ঞানের গভীরতা, কর্ম্মের ক্ষমতা এবং স্থৈর্য্য, তেজস্বিতা ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই চাকুরী গ্রহণের ফলে, মার্শেল সাহেবের পরামর্শে তাঁহাকে ভাল করিয়া ইংরেজী ও হিন্দী শিখিতে হইত; বিদ্যাসাগরকে সিবিলিয়ান ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজ দেখিতে হইত; এই কার্য্যের জন্য ইংরেজী ও হিন্দীর জ্ঞান একান্ত আবশ্যক ছিল। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি অল্পস্বল্প ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, এখন প্রতি দিন বৈকালে শিক্ষকের সাহায্যে ইংরেজী পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু তালতলা-নিবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথের পিতা) তাঁহাকে প্রথমে কিছু দিন ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। প্রাতে একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহাকে হিন্দী শিখাইতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে বিদ্যাসাগর রীতিমত সংস্কৃতের চর্চ্চাও করিয়াছিলেন; এই সময় তিনি সাংখ্য ও পুরাণ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্রবে আসিয়া অনেক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ ও গণ্যমান্য দেশীয় বড়লোকের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ-পরিচয় হয়। ক্যাপ্টেন মার্শেল কাউন্সিল-অব-এডুকেশন বা শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটের (Mouat-এর) সহিত বিদ্যাসাগরকে পরিচিত করাইয়া দেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরী বিদ্যাসাগরের গতি নির্দ্দেশ করিল।

প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্য করিবার পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইলেন। যে-প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিতেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ

মার্চ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের পরলোক গমনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য ইংরেজীতে আবেদনপত্র পাঠাইলেন (২৮ মার্চ); উহার সহিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী মার্শেল সাহেবের একখানি প্রশংসাপত্রও ছিল। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

Certified that Ishwar Chunder Vidyasagar has been Serishtadar of the Bengallee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanscrit College and studied all the branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since, by private study, acquired a very considerbale degree of knowledge of the English Language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office—and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarahips in the Sanscrit College for the last four years, in which I have been strongly impressed with his tact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposifion, and high respectability of character.

College of Fort William — G. T. MARSHALL
28th March 1846. — Secretary College

বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলোচনার পর, তাঁহার আবেদন-পত্র সুপারিশ করিয়া সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত ৩১ মার্চ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে পত্র লিখিলেন। ২ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখের পত্রে শিক্ষা-পরিষদ্ বিদ্যাসাগরের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগরের স্থানে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন (৪ এপ্রিল),—সংস্কৃত কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র।

সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটরী : ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর হইতে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ এপ্রিল পর্য্যন্ত চার বৎসর চার মাস ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদারের কর্ম্ম করিয়া, ৬ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০, বেতনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন; এই সময় তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর।

ইহার কয়েক দিন পরেই—১৩ই এপ্রিল সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত এই শূন্য পদে বিদ্যাসাগরকেই বসাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। এই পদ গ্রহণ করিলে তাঁহার মাসিক আয় আরও ৪০, বাড়িত। কিন্তু এ কাজ তিনি তাঁহার সতীর্থ মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ছাড়িয়া দিলেন। তর্কালঙ্কার তখন ৫০, বেতনে কৃষ্ণনগর কলেজের হেড পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর উৎসাহের সহিত সংস্কৃত কলেজের কাজ করিতে লাগিলেন। সম্পাদকের সাহায্যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ তারিখে এক উন্নত প্রণালীর পঠন-ব্যবস্থার রিপোর্ট সম্পাদকের হস্তে দিলেন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের যে বৃত্তিপরীক্ষা হয়, মেজর মার্শেল তাহার পরীক্ষক ছিলেন; তিনি পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের এক স্থলে বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন :—

> The Assistant Secretary consulted me some time ago on a plan of study which he had prepared at a great sacrifice of time and labour. The suggestions therein contained appeared to me well adapted to produce order to save time, and to secure to each subject of study the degree of attention which it deserves; as such I would beg strongly to recommend the Council to give it a

trial. If I am not much mistaken, the result would prove highly satisfactory."

বিদ্যাসাগর মেজর মার্শেলের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন—এ কথা সম্পাদক রসময় দত্ত জানিতেন। বিদ্যাসাগর তদীয় রিপোর্টটি মার্শেলের গোচর না করিলে, মার্শেলের পক্ষে এই প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থার কথা জানা বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা কখনই সম্ভবপর হইত না। এই কারণে সম্পাদক রসময় দত্ত সহকারীর প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইলেন। তিনি ছিলেন ঠিকা কর্ম্মচারী, সরকারী কর্ম্ম বজায় করিয়া কয়েক ঘণ্টা মাত্র সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে সহকারী কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়িলে তাঁহার বিরক্ত হইবারই কথা। বোধ হয় এই কারণেই তিনি বিদ্যাসাগর-প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থা শিক্ষা-পরিষদের গোচর করেন নাই। দু-একটি ছোটখাট প্রস্তাব, যেমন,—সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়নকাল ১২ হইতে ১৫ বৎসরে পরিণত করা ছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত কোন সংস্কারই তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। কলেজের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর যখনই যাহা প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, সম্পাদক রসময় দত্ত তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এই বাধায় বিদ্যাসাগরের জলন্ত উৎসাহ নিমেষে শীতল হইয়া গেল। স্বাধীনচেতা পণ্ডিত চটিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিলেন; বন্ধুদের সহস্র অনুরোধ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের ইহা এক বিশেষত্ব।

১৬ জুলাই ১৮৪৭ তারিখে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইল।

---

* General Report on the Public Instruction, in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1846-47 (May 1846—April 1841), pp. 39, 41.

তখনকার দিনে এক কথায় ৫০৲ টাকা বেতনের চাকুরী একজন পণ্ডিত কি করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন, বিজয়ী রসময় দত্ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি নাকি একজনকে বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর খাবে কি?" এই কথা শুনিয়া তিনি দত্ত-মহাশয়কে জানাইতে বলিয়াছিলেন,—"বলো বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।"

পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে: মার্শেল সাহেব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ও হিতৈষী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে তিনি সেই পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। এই পদ শূন্য হওয়ার ইতিহাসটুকু চিত্তাকর্ষক। দেশবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথের পিতা, তালতলার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী বজায় রাখিয়াও অতিরিক্ত ছাত্র হিসাবে মেডিক্যাল কলেজে লেকচার শুনিতে যাইতেন। তিনি ডাক্তারি করিবেন স্থির করিয়া ১৬ জানুয়ারি ১৮৪৯ তারিখে মেজর মার্শেলের হস্তে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। পরবর্ত্তী ১ মার্চ তারিখে পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়া মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।*

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ: ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেলেন। শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটরী ডাঃ ময়েট তাঁহার স্থানে বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু নানা কারণে বিদ্যাসাগর এই পদ

* Proceedings of the College of Fort William.—*Home Miscellaneous* No. 575, pp, 598, 650.

গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে ডাঃ ময়েট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর জানাইলেন, শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন। ডাঃ ময়েট বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন।

৪ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছাড়িয়া পর-দিন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে—এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের উপর ভার পড়িল। ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর "দীর্ঘচিন্তা ও যথেষ্ট বিবেচনা-প্রসূত" এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদে দাখিল করিলেন।* কলেজ-পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা ও পাঠ্যপ্রণালীর বহুবিধ পরিবর্ত্তন সমর্থন করিয়া এই রিপোর্ট লিখিত পুনর্গঠিত সংস্কৃত কলেজ যে সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনের কেন্দ্র ও মাতৃভাষা-রচিত সাহিত্যের জন্মক্ষেত্র হইবে, এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই যে শিক্ষকরূপে এক দিন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সাহিত্য-রস বিতরণ করিবে,—পরিবর্ত্তনের ফল যে একান্ত শুভ ও আশাপ্রদ, রিপোর্টে তিনি এ কথা দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন।

শিক্ষা-পরিষদ্ এমনই একজন কার্য্যপটু, দৃঢ়চিত্ত লোককে চাহিতেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করা যায় কি না—এই কথাই কিছু দিন হইতে তাঁহারা ভাবিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে

* *General Report on Public Instruction*, etc. 1850--51 গ্রন্থের ৩৪-৪৩ পৃষ্ঠায় এই দীর্ঘ রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়াছে। সুবলচন্দ্র মিত্রের বিদ্যাসাগর-জীবনীতেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলে (ডিসেম্বর ১৮৫০) পুরাতনের বাধা সরিয়া গেল। শিক্ষা-পরিষদ্ বঙ্গীয় গবর্মেণ্টকে লিখিলেন—

"দশ বছর ধরিয়া বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। তাহার উপর সারাদিন তিনি অন্যত্র দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন। কলেজের যখন কাজ চলে, তখন তিনি কলেজে উপস্থিত থাকিতে পারেন না। ফলে কলেজের শৃঙ্খলা শিথিল হইয়াছে। হাজিরা-খাতার উপর মোটেই নির্ভর করা চলে না, এবং নানারূপ গোলমাল ও অব্যবস্থায় কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—কার্য্যকারিতা একান্তভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অথচ এই বিদ্যালয় এক বিপুল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান, কারণ কলেজের ছেলেদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হয় না।

বাংলায় সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানের যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে, কর্ম্মিষ্ঠ লোকের হাতে পড়িলে সংস্কৃত কলেজ সেই আন্দোলনের সহায়করূপে অনেক কাজ করিতে পারে।

বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগে এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের একমাত্র অন্তরায় দূর হইল। কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডাঃ স্প্রেঙ্গার আরবী ভাষায় যেরূপ সুপণ্ডিত, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত পাওয়া যাইতেছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষা-পরিষদের মতে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। এক দিকে তিনি ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্য দিকে সংস্কৃত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মত উদ্যমশীল, কর্ম্মনিপুণ, দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালীর মধ্যে দুর্লভ। তাঁহার রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও

'চেম্বার্সের বায়োগ্রাফি'র বঙ্গানুবাদ সমস্ত গবর্মেণ্ট স্কুলকলেজেই বাংলার পাঠ্য পুস্তক হিসাবে পড়ান হয়। তিনি অধ্যক্ষ হইলে বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ উঠিয়া যাইবে। এই দুই পদের বেতন মোট ১৫০৲ টাকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০৲ টাকা দিলেই চলিবে। সুতরাং এই পরিবর্ত্তনে ব্যয়বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা নাই।

গবর্মেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় সম্প্রতি অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল।" (৪ জানুয়ারি ১৮৫১, অনূদিত)।

সরকার শিক্ষা-পরিষদের প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। বিদ্যাসাগর মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন (২২ জানুয়ারি ১৮৫১)। এক কথায় কলেজের সংস্কার, পুনর্গঠন ও পরিবর্ত্তনের পূর্ণ অধিকার তাঁহার হাতে দেওয়া হইল।

সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন

১৮৫১ হইতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ইহার পুনর্গঠনের ইতিহাস। বিদ্যালয়ের শাসনশৃঙ্খলার দিকে বিদ্যাসাগর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। নিয়মিত উপস্থিতির দিকে নজর রাখা হইল; সামান্য কারণে শ্রেণীত্যাগ এবং অকারণ গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি নিবারণ করার দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইল। প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজের ছুটি বন্ধ করিয়া সপ্তাহান্তে রবিবারে ছুটির দিন ধার্য্য হইল। পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রই সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকারী ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন দেশে শিক্ষাবিস্তার

ও লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির পরম বন্ধু। তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথমে কায়স্থ, পরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে-কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দুকে সংস্কৃত কলেজে অবাধ অনুমতি দিলেন।

বিদ্যাসাগর নিজের কলেজের জন্য আর একটি কাজ করিলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্মান ও ছাত্রদের ভবিষ্যতের উপরও যে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুকলেজ ও মাদ্রাসার পাস-করা কৃতবিদ্য ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়া হইত। বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদের মধ্য দিয়া গবর্মেণ্টের কাছে সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য ছাত্রদিগকে এই বিষয়ে সমান সুযোগ ও সুবিধা দিবার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জানাইলেন (১৩ জানুয়ারি ১৮৫২)। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে পরে ডেপুটিগিরি দেওয়া হইত।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রতিষ্ঠা হইতে সংস্কৃত কলেজ অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। ফলে দাঁড়াইয়াছিল এই, ছাত্রেরা বিনা প্রতিবন্ধে কলেজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত এবং পরে সুবিধা পাইলেই অন্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে চলিয়া যাইত। এমনও হইত, ভর্ত্তি হইয়া নাম লিখাইয়া ছেলের আর দেখা নাই, তার পর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে যখন হাজিরাখাতা হইতে নাম কাটা গেল, তখন ছাত্র অথবা ছাত্রের অভি-ভাবক এমন করিয়া আসিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে ধরিয়া পড়িল যে, নিবেদন অগ্রাহ্য করা দুরূহ। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের প্রথমে দুই টাকা প্রবেশ-দক্ষিণার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। পুনঃপ্রবেশের জন্যও ঐ ব্যবস্থা বাহাল হইল। তার পর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝিতে মাসিক এক টাকা বেতনের বন্দোবস্ত হইল। ইহাতে অব্যবস্থিতচিত্ত ছাত্রদের কিঞ্চিৎ

চৈতন্যোদয় হইল, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির হারও যথেষ্ট বাড়িয়া গেল।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজে এক উন্নত প্রণালীর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। ব্যাকরণ-বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হইল। পূর্ব্বে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ' ছিল ব্যাকরণের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। সংস্কৃত শিক্ষার গোড়াতেই সংস্কৃতে লেখা এই দুরূহ ব্যাকরণখানি ছেলেদের পড়িতে হইত। এখানি আয়ত্ত করিতে লাগিত চার-পাঁচ বৎসর; তাও ছেলেরা অর্থ না বুঝিয়াই মুখস্থ করিত। কাজেই সংস্কৃত-সাহিত্য পড়িবার সময় এই মুখস্থ বিদ্যা বিশেষ কাজে লাগিত না; দেখা যাইত, ভাষায় তাহারা আশানুরূপ অধিকার লাভ করে নাই। বিদ্যাসাগর ছেলেদের বাধাটুকু বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, বাঙালী ছাত্রকে সংস্কৃত শিখাইতে হইলে বাংলায় ব্যাকরণ পড়াইতে হইবে। তিনি 'মুগ্ধবোধ' পড়ান বন্ধ করিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে বাংলায় লেখা স্বরচিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ধরাইলেন। এই সঙ্গে 'ঋজুপাঠ'ও পড়ান হইতে লাগিল সংস্কৃত গদ্য ও কাব্য হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচিত অংশ 'ঋজুপাঠে' সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই নব ব্যবস্থার ফল ভালই হইল। সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে এই ব্যবস্থায় সংস্কৃতে মোটামুটিরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে তিন বৎসরের বেশী সময় লাগে না।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার বাধাবিপত্তি এমনি করিয়া দূর করিলেন। অতঃপর তিনি সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগ পুনর্গঠনের কাজে হস্তক্ষেপ করিলেন।

দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; প্রথম, হিন্দু সাহিত্যের অনুশীলন; দ্বিতীয়, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞনের ক্রম-প্রচলন।

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের আমদানি এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজী-শ্রেণী খোলা হয়, কিন্তু ইহা আট বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শিক্ষা-পরিষদের চেষ্টায় এই শ্রেণী পুনঃস্থাপিত হয় বটে; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাসাগর এই ইংরেজী-বিভাগের শিক্ষা-প্রণালীর ভিতরে গলদ বেশ বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি ইহাকে ফলপ্রসূ করিতে সচেষ্ট হইলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংরেজী-বিভাগে একটি অধিকতর বিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বিত হইল। পাঁচ জন শিক্ষকের মধ্যে মাসিক এক শত টাকা বেতনে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী হইলেন ইংরেজীর অধ্যাপক ও শ্রীনাথ দাস হইলেন গণিতের অধ্যাপক। পূর্ব্বে সংস্কৃতে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা চলিত—ভাস্করাচার্য্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' ছাত্রদিগকে পড়িতে হইত। বিদ্যাসাগর ইহা উঠাইয়া দিয়া অতঃপর ইংরেজীতেই গণিতের শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলেন। এখন হইতে ইংরেজী অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়-সমূহের অন্তর্গত করা হইল।

বিদ্যাসাগর যখন এই সব সংস্কারে ব্রতী, সেই সময় শিক্ষা-পরিষদ্ কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ—বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ জে. আর. ব্যালাণ্টাইনকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আহ্বান করিলেন। শিক্ষা-পরিষদের নিমন্ত্রণে ডাঃ ব্যালেণ্টাইন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন (জুলাই-আগস্ট ১৮৫৩)। পরিদর্শনান্তে একটি রিপোর্ট পরিষদে পেশ করিলেন:—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথা শুনিয়া এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ-সম্পর্কে তৎপ্রদত্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে

ধারণা জন্মিয়াছিল, এই সুধী অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে আমার যে ধারণা দৃঢ়তর হইল, এই আলাপে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিলাম।" (অনূদিত)

কলেজের পঠন-ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয়ে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিবার পর তিনি কাশী ও কলিকাতা—এই উভয় সংস্কৃত কলেজের অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বারাণসীতে আবশ্যিক ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত করা যে সম্প্রতি অসমীচীন, এই মত প্রকাশ করেন। তার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নূতন কতকগুলি পুস্তক প্রবর্ত্তন ও ছাত্রদের ভাবগ্রহণ করিবার শক্তি সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেন, তাহা বিদ্যাসাগরের পরবর্ত্তী রিপোর্ট হইতে জানা যাইবে। নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ডাঃ ব্যালাণ্টাইন তাঁহার রিপোর্ট শেষ করিয়াছেন:—

"ভারতীয় পাণ্ডিত্য ও ইংরেজী বিজ্ঞানের মধ্যে যে প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা ঘুচাইবার জন্যই আমি এই সকল কথার অবতারণা করিয়াছি।…কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী এই উভয়বিধ পাঠ্যই পড়িতে হয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উভয় ভাষার শাস্ত্রের কোথায় মিল, কোথায় অমিল—তাহা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ছাত্রদের অবধারণ যে সন্তোষজনক নয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং সেই জন্যই কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া অতিরিক্ত আরও যে যে গ্রন্থের প্রচলন প্রয়োজন, তাহার প্রস্তাব করিয়াছি…।" (অনূদিত)

শিক্ষা-পরিষদ্ ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন (২৯ আগস্ট ১৮৫৩)। বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের বর্ণিত প্রণালীর সমর্থন করিতে না পারিয়া পরিষদের নিকট যে উত্তর প্রেরণ করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল:—

মত পাঠ করিয়াছে—বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যে যথার্থরূপে ধারণা করিয়াছে, তাহার কাছে সত্য—সত্যই। "সত্য দুই রকমের" এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে-শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হইবে। যেখানে দুইটি সত্যের মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেখানে সেই ঐক্য যদি কোন বুদ্ধিমান্ ছাত্র বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সেরূপ ঘটনা সত্যই অদ্ভুত বলিতে হইবে। ধরা যাক, ইংরেজী ও সংস্কৃত—উভয় ভাষাতেই ছাত্রেরা লজিক, অথবা দর্শন বিজ্ঞানের যে-কোন বিভাগ অধ্যয়ন করিল। এখন যদি তাহারা বলে, "লজিকের পাশ্চাত্ত্য থিয়োরিও সত্য, হিন্দু থিয়োরিও সত্য," অথচ যদি তাহারা উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান না পায়, এবং না পাইয়া এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় তাহারা বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, না-হয় যে-ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই ভাষায় তাহাদের জ্ঞান অল্প। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু-দর্শনে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা ইংরেজীতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা যায় না; তাহার কারণ, সে-সব অংশের মধ্যে পদার্থ কিছু নাই।

ডাঃ ব্যালাণ্টাইন আরও বলেন,—"বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজের গঠন-পদ্ধতি এবং ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষায় শিক্ষার রীতি হইতেই বুঝা যায়, এমন এক দল লোক গড়িয়া তোলা দরকার, যাহারা পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় উভয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে, এবং উভয় দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিভাষী ব্যাখ্যাতার কার্য্য করিয়া উভয়ের মধ্যে যেখানে দৃশ্যতঃ অনৈক্য, সেইখানে সত্যকার মিল দেখাইয়া দিয়া অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করিবে;—হিন্দুর দার্শনিক

আলোচনা যে-সকল প্রাথমিক সত্যে পৌঁছিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিবে।" দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত অন্যমত। আমার মনে হয় না, আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাইতে পারিব। যদি-বা ধরিয়া লওয়া যায় ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয়, উন্নতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানে তথ্য-সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব। কোন নূতন তত্ত্ব, এমন কি, তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে, তাহারই পরিবর্দ্ধিত স্বরূপ—যদি তাহাদের গোচরে আনা যায়, তবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। আরব-সেনাপতি আমরু আলেকজেন্দ্রিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্থা কি করা যাইতে পারে, তখন খালিফ উত্তর দিলেন, "গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরাণের মতের অনুযায়ী, না-হয় বিরুদ্ধ; যদি অনুরূপ হয় ত এক কোরাণ থাকিলেই যথেষ্ট; আর যদি বিরুদ্ধ মত হয় ত গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর। অতএব ওগুলি ধ্বংস কর।" আমার বলিতে লজ্জা হয়—ভারতীয় পণ্ডিতগণের গোঁড়ামি ঐ আরব-খালিফের গোঁড়ামির চেয়ে কিছু কম নয়। তাহাদের বিশ্বাস, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব শাস্ত্র-সমূহ অভ্রান্ত। আলাপ অথবা আলোচনার সময় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের নূতন সত্যের কথা অবতারণা করিলে, তাহারা হাসি ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেয়। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে—বিশেষতঃ কলিকাতা ও তাহার আশে পাশে—পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে;

শাস্ত্রে যাহার অঙ্কুর আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনিলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখান দূরে থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয় এবং 'আমাদেরই জয়' এই ভাব ফুটিয়া উঠে। এই সব বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করাইবার কোন আশা আছে, এমন আমার বোধ হয় না। যে প্রদেশের পণ্ডিতদের দেখিয়া ডাঃ ব্যালাণ্টাইন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এই সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার মত খাটাইলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

বাংলার কথা স্বতন্ত্র। 'দুই স্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত' এবং 'জোর করিয়া সামঞ্জস্য-বিধান বিজ্ঞের কার্য্য নহে'—তাঁহার এই মন্তব্যগুলি খুবই সমীচীন। ভারতবর্ষের এই অংশের স্থানীয় অবস্থার দরুন শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে আমাদের ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আমি সযত্নে এখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাহাতে আমার মনে হইয়াছে, দেশীয় পণ্ডিতদের কোন-কিছুতে হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত নয়। তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের প্রয়োজন নাই; কেন-না, আমরা তাঁহাদের কোনরূপ সাহায্য চাই না। আজ ইঁহাদের সম্মানও লুপ্তপ্রায়, কাজেই এই দলকে ভয় করিবার কারণ দেখি না। ইঁহাদের কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। এ দলের পূর্ব্ব-আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার আর বড় সম্ভাবনা নাই। বাংলা দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টি না করিয়াও আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে

সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন

স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি,—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরণের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সঙ্কল্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা কলেজের পাঠ শেষ করিয়া এই ধরণের লোক হইয়া উঠিবে—এমন আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ আশা অলীক নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যে বাংলা ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইংরেজী বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও যে তাহারা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ ও তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে জ্ঞানলাভ করিবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুখের বিষয়, সম্প্রতি তাহাদের চিন্তাধারায় এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, মনে হয়, অতঃপর প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্রই দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে। এখানকার সংস্কৃত কলেজের কাছে কি আশা করা যাইতে পারে, তাহার নমুনাস্বরূপ রিপোর্টের সঙ্গে গত বর্ষের একটি বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ পাঠাইলাম। প্রবন্ধটির লেখক—দর্শন-বিভাগের ছাত্র রামকমল শর্ম্মা। রামকমল এই বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র,

কলেজের পাঠ শেষ করিতে তাহার এখনও তিন বৎসর বাকি এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সে এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।”*

শিক্ষা-পরিষদ্ সব দিক্ বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন :—

“ডাঃ ব্যালাণ্টাইন সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও উন্নতির সম্বন্ধে এমন অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া শিক্ষা-পরিষদ্ আনন্দিত।...পরিষদ্ চান যে, অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্ত-সার ও অন্যান্য গ্রন্থ অবাধে ব্যবহার করেন। তাঁহার নিজের ও তাঁহার অধীন শিক্ষকদের পাঠনার অন্তর্গত বিষয়-সমূহের অর্থ বুঝাইবার ও উদাহরণ দিবার জন্য [illegible]গুলি অত্যন্ত কাজে লাগিবে। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের গ্রন্থের সহিত পরিচয়ে এই সব বিষয়ের শিক্ষার্থিগণ যথেষ্ট উপকৃত হইবে। তাঁহার বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্বন্ধে অধ্যক্ষ যেন ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত সর্ব্বদা পত্র-ব্যবহার করেন। কাশী ও কলিকাতা—এই দুইটি প্রধান বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রমিক উন্নতি সম্বন্ধে অবাধে মতের বিনিময় করেন, ইহাই শিক্ষা-পরিষদের ইচ্ছা।” (১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩, অনূদিত)

সংস্কৃত কলেজ নূতন করিয়া গড়িবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় শিক্ষা-পরিষদের এই আদেশ তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। তিনি নিজ কার্য্যে অন্যের হস্তক্ষেপ সহিতে পারিতেন না এবং যাহা ঠিক বলিয়া মনে করিতেন, [illegible] হইতে এক চুলও নড়িতেন না। ৫ অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে শিক্ষা-পরিষদের

* ইংরেজীতে লিখিত বিদ্যাসাগরের মূল পত্রখানি আমার *Ishwarchandra Vidyasagar as an Educationist* প্রবন্ধে ('মডার্ণ রিভিয়ু', অক্টোবর ১৯২৭) মুদ্রিত হইয়াছে।

সম্পাদক ডাঃ ময়েটকে লিখিত এই আধা-সরকারী চিঠিখানি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

"ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট-সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের আদেশ স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম; সেই আদেশগুলি হুবহু প্রতিপালন করিতে গেলে, পরিষদের অনুমতিক্রমে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজে প্রবর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইবে। ফলে কলেজে আমার অবস্থা কতকটা অপ্রীতিকর, এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার দিক্ দিয়াও ক্ষতিকর হইবে।

কলেজ বন্ধ এবং বাড়ী যাইবার উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যস্ততার দরুন আমি এ-বিষয়ে সরকারী চিঠি লিখিতে পারিলাম না। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি আমার মনে আসিয়াছে; কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে তাহা আমি জানাইয়া যাইতে চাই।

যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমি অনুমোদন করিতে পারি না, তাহাই গ্রহণ করিতে, অথবা আমার সমপদস্থ একজন অধ্যক্ষের সহিত বিদ্যালয়ের উন্নতির সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মর্য্যাদাহানির যে কথা আছে, এমন একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই ব্যক্তিগত কথা সম্প্রতি আমি মিশাইতে চাহি না; এই সব সর্ত্তে কাজ করিতে কোন শিক্ষিত ইংরেজই রাজী হইতেন না। ব্যক্তিগত আপত্তি ছাড়িয়া, প্রকৃত বিষয়ে অবতীর্ণ হইতেছি।

মনে হয়, ডাঃ ব্যালাণ্টাইন এই ভাবিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য না হইলে ইংরেজী সংস্কৃতের ছাত্রেরা 'দুইরূপ সত্যের' অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িবে। তাঁহার কাশীর পণ্ডিত-বন্ধুগণের মনোবৃত্তির সম্বন্ধে আমি কোন প্রশ্ন তুলিব না। কিন্তু এ

কথা আমি জানি এবং জোর করিয়া বলিতে পারি, বঙ্গদেশে এমন একজনও বুদ্ধিমান্ লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যিনি সংস্কৃত ও ইংরেজীতে শিক্ষিত হইয়া মনে করেন, 'সত্য দুই প্রকার।'

বাংলায় যথার্থ অধিকারী করিবার জন্য যদি আমি সংস্কৃত শিখাইতে পাই, তার পর যদি ইংরেজীর সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারি এবং আমার কার্য্যে শিক্ষা-পরিষদের সাহায্য ও উৎসাহ পাই, তাহা হইলে এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন এক দল যুবক তৈয়ারী করিয়া দিব, যাহারা নিজ রচনা ও পড়াইবার গুণে আপনাদের ইংরেজী অথবা দেশীয় যে-কোন কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অপেক্ষা ভালরূপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিবে। আমার এই একান্ত অভিলাষ—এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যকর করিবার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে। ডাঃ ব্যালাণ্টাইন-কৃত সংক্ষিপ্ত-সার ও গ্রন্থের যেগুলি আমি অনুমোদন করিতে পারি—যেমন *Novum Organum*-এর সুন্দর ইংরেজী সংস্করণ—তাহা আনন্দসহকারে সত্বর বিদ্যালয়ে চালাইব। কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন, মূল্য অথবা আমি যেখানকার অধ্যক্ষ, সেই বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ও অবস্থার সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়াই যদি আমাকে তাঁহার গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—'আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।' এইরূপ ব্যবস্থা আমার প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির বাধা জন্মাইবে এবং শিক্ষা-পরিষদের কর্ম্মচারী হিসাবে আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান সত্ত্বেও যে দায়িত্ব আমি তীক্ষ্ণভাবে বোধ করি, তাহা একেবারে নষ্ট না হউক—ক্ষীণ হইয়া আসিবে।

আশা করি, ব্যস্তভাবে লিখিত আমার বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিতগুলি

শিক্ষা-পরিষদ্ সদয়ভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাব কতকটা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবেন,—যাহাতে সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্দেশিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক না হইয়া পড়ে।

যদি দরকার হয়, কলেজের অবকাশের পর আমি এ বিষয়ে সরকারী—সুতরাং অধিকতর কেতাদুরস্ত—পত্র লিখিব।" (অনূদিত)

এই পত্রখানিতে সুফল ফলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবস্থিত শিক্ষা-প্রণালী অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী যে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। এই সাফল্যের একটি প্রধান কারণ,—নিজের তাঁবে ঠিক ধরণের লোক বাছিয়া লইবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার ছিল। সংস্কারের ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদ্ সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে বিদ্যাসাগরের বেতন বাড়াইয়া তিন শত টাকা করিয়া দেন।

রাজকর্ম্মচারীরা বিদ্যাসাগরকে সম্মান করিয়া চলিতেন। শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যে তাঁহারা পণ্ডিতের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সিবিলিয়ান-দিগকে প্রাচ্যভাষা শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভাঙিয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বোর্ড-অব-একজামিনার্স গঠিত হইলে বিদ্যাসাগরকে বোর্ডের এক জন কর্ম্মী-সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সদস্য ও বাংলার প্রথম ছোট লাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে পরিষদ্ বারাসতের নিকটবর্ত্তী বামুনমুড়া বঙ্গবিদ্যালয় প্রদর্শন করিতে বিদ্যাসাগরকে পাঠাইয়াছিলেন (জুলাই, ১৮৫৪)।

শুধু পণ্ডিত নয়, বিদ্যাসাগর সাহিত্য-রসিক ছিলেন। বাংলার বহু

সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি কোন-না-কোনরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতার ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি নানাবিধ উত্তম পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিতেন। এই সভার উপর বিদ্যাসাগরের কর্তৃত্ব ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের জন্য, এশিয়াটিক সোসাইটির আদর্শে, একটি পেপার কমিটি গঠন করিয়াছিলেন; বিদ্যাসাগর এই কমিটির ও একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

কিন্তু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারই শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের শেষ ও প্রধান কার্য্য নহে।

বাংলা-শিক্ষা প্রচলন

তখনকার কালে দেশবাসীর শিক্ষার দিকে ভারত-সরকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। সংস্কৃত ও আরবীর জন্য সরকার কিছু টাকা ব্যয় করিতেন মাত্র। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গবর্নর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক মিনিটে লিখিলেন,—"ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচারই ব্রিটিশ-রাজের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষা-বাবদ সকল মঞ্জুরী অর্থ শুধু ইংরেজী-শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেই ভাল হয়।" এই গুরুতর সিদ্ধান্তের দিন হইতে গবর্মেণ্ট ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থায় উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। বেণ্টিঙ্কের নব ব্যবস্থায় উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা-সম্পর্কিত অভাবই দূর হইতে পারে। সেই হেতু শিক্ষা-বিষয়ে সাধারণের দাবি বিশেষভাবে উপস্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরেজী কিম্বা সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়া ত আর দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারা যায় না;—মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই জনসাধারণ জ্ঞানলাভ করে। এই দিক্ দিয়া প্রথম প্রচেষ্টার সম্মান সার্ হেনরী হার্ডিঞ্জের প্রাপ্য।

দেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, আর্থিক অস্বচ্ছলতার অসুবিধাসত্ত্বেও, তিনি মাসিক ১৮৬৫৲ টাকা ব্যয়ে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নানা স্থানে ১০১টি পল্লী-পাঠশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন (অক্টোবর, ১৮৪৪)। এই সকল পাঠশালার জন্য শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী মার্শেল ও বিদ্যাসাগরের উপর ছিল।

কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতির অভাবে হার্ডিঞ্জের প্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। চারি বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধায়ক—বোর্ড অফ রেভিনিউ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—"সফলতা অসম্ভব, বাংলা পাঠশালা-গুলির আর কোন আশা নাই।" তাহার পর হইতে সাধারণের শিক্ষার জন্য সরকার আর বিশেষ কিছু করেন নাই। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার যে এক অসম্ভব কাজ নয়, ভারতবর্ষের অপর এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সে-কথা প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি নির্ব্বাচিত জেলায়, ছোট লাট টমাসন্ কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত দেশীয় ভাষায় শিক্ষা-প্রণালী যে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তৎসম্বন্ধীয় রিপোর্ট বড় লাটের হস্তগত হইল। বঙ্গ ও বিহারে এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, সে কথা কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের তিনি বিশেষ করিয়া জানাইলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বাংলা-সরকারকে ঐ বিষয়ে মতামত জানাইতে অনুরোধ করিলেন (৪ নবেম্বর ১৮৫৩)। একটি সুসম্বদ্ধ বাংলা শিক্ষা-প্রণালী কি উপায়ে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে এক খসড়া তৈয়ারী করিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিলেন (১৯ নবেম্বর)। মাতৃভাষায় শিক্ষা-সম্বন্ধে অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্ট এবং টমাসনের

ব্যবস্থাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া সেই খসড়া তৈয়ারী করিতে হইবে। ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪ তারিখে পরিষদ্ ঐ বিষয়ে সদস্যদিগের মিনিটগুলি বঙ্গীয় গবর্মেণ্টকে পাঠাইলেন।

বাংলায় ছোট লাটের পদ সৃষ্ট হইল (১ মে ১৮৫৪); প্রথম ছোট লাট হইলেন—ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে। এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই মাস পূর্ব্বে শিক্ষা-পরিষদের সদস্যরূপে হ্যালিডে বাংলায় শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার মত একটি মিনিটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন (২৪ মার্চ)। শিক্ষা-পরিষদ্-প্রদত্ত কাগজপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া হ্যালিডে স্থির করিলেন, তিনি নিজে যে-প্রণালী পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বড় লাটের গ্রহণার্থ ইহাই তিনি অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন (১৬ নবেম্বর)। হ্যালিডের মিনিটের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :—

"২। বঙ্গদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরণের পাঠশালা আছে। ইউরোপীয় এবং এদেশীয়—উভয় শ্রেণীর ভদ্রলোকের কাছে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় ; কারণ, শিক্ষকের কার্য্য অতি অযোগ্য লোকের হাতেই গিয়া পড়িয়াছে।

৩। এই পাঠশালাগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া তোলা আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। এ-বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্বতন ছোট লাটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই শ্রেয়। পাঠশালাগুলির আদর্শ-স্বরূপ কতকগুলি মডেল স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার। নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলে, গুরু মহাশয়েরা আদর্শের প্রেরণায় ক্রমশঃ পাঠশালাগুলিকে উন্নত ধরণে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে।

৫। এই বিষয় সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের সুদক্ষ অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা এক মন্তব্য সংযুক্ত হইল। এ কথা

সকলেই জানেন, ইনি বাংলা-শিক্ষা প্রচারকার্য্যে বহুদিন হইতেই অত্যন্ত উৎসাহী। সংস্কৃত কলেজে নব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য প্রাথমিক পুস্তক-সমূহ রচনা করিয়া এ-সম্বন্ধে ইনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন।

৬। অধ্যক্ষের মন্তব্যান্তর্গত শিক্ষা-প্রণালী আমি সাধারণভাবে অনুমোদন করি। ইহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাই আমার অভিপ্রেত।

১৩। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের, এবং এ-বিষয়ে যাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত এই—সরকারী মডেল স্কুলে প্রবেশ-দক্ষিণা প্রথম-প্রথম কিছু না থাকাই উচিত, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের মত এগুলিও নিশ্চয়ই নিজেদের খরচা নিজেরাই চালাইতে পারিবে।

২৮। শিক্ষক তৈয়ারী করিবার জন্য নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তার কথা কিছু বলি নাই। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষায় এখন বেশ ভাল শিক্ষক গড়িয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান অধ্যক্ষের হাতে পড়িয়া সংস্কৃত কলেজ বাংলা দেশে নর্মাল স্কুলের স্থান অধিকার করিয়াছে।"*

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, হ্যালিডের মিনিটের মূল উৎস ছিল—বিদ্যাসাগরের নিপুণ মন্তব্য। বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-সম্পর্কে এই মন্তব্যের অন্তর্গত নির্দ্দেশগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পরবর্ত্তী কালে গৃহীত হইয়াছিল। এই কারণে বিদ্যাসাগরের মন্তব্যটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া প্রয়োজন :—

---

* হ্যালিডের এবং শিক্ষা-পরিষদের সদস্যগণের মিনিটগুলি—*Selections from the Records of the Bengal Govt.*, No. xxii—Correspondence relating to Vernacular Education (Calcutta. 1855) গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

"১। সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা-শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেন-না, মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।

২। লেখা পড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না; শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবন-চরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতি-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরতত্ত্ব শেখান প্রয়োজন।

৩। নিম্নলিখিত প্রকাশিত প্রাথমিক পুস্তকগুলি পাঠ্যরূপে গ্রহণযোগ্য :—

(ক) শিশুশিক্ষা (পাঁচ ভাগ)। প্রথম তিন ভাগে আছে—বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠন শিক্ষা। চতুর্থ ভাগ—জ্ঞানোদয়-সম্পর্কিত একখানি ছোট বই। পঞ্চম ভাগ—'চেম্বার্স এডুকেশনাল্ কোর্স'-অন্তর্গত নৈতিক-পাঠ পুস্তকের ভাবানুবাদ।

পশ্বাবলী, অর্থাৎ জীবজন্তুর প্রাকৃতিক বিবরণী।

(গ) বাংলার ইতিহাস—মার্শম্যানের গ্রন্থের ভাবানুবাদ।

(ঘ) চারুপাঠ বা প্রয়োজনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পাঠমালা।

(ঙ) জীবন-চরিত—'চেম্বার্স এক্সেমপ্ল্যারি বায়োগ্রাফি'-অন্তর্গত কোপার্নিকস, গ্যালিলিও, নিউটন, সার্ উইলিয়ম হর্শেল, গ্রোশ্যস, লিনিয়স, ডুবাল, সার্ উইলিয়ম জোন্স ও টমাস জেঙ্কিন্সের জীবনবৃত্তের ভাবানুবাদ।

৪। পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা এবং নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী রচিত হইতেছে। ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, শারীরতত্ত্ব ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ এবং কতকগুলি ধারাবাহিক জীবনচরিত এখনও রচনা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস হইলেই চলিবে।

৫। এক জন শিক্ষক হইলে চলিবে না; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্ততঃ দুই জন করিয়া শিক্ষক চাই। স্কুলগুলিতে সম্ভবতঃ তিনটি হইতে পাঁচটি করিয়া শ্রেণী থাকিবে; কাজেই এক জন শিক্ষকের দ্বারা সুশৃঙ্খলায় কাজ চলিবে না।

৬। গুণ এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে পণ্ডিতদের মাহিনা ন্যূনপক্ষে ৩০৲, ২৫৲ অথবা ২০৲ টাকা হওয়া চাই। পূর্ব্বকথিত পুস্তকগুলি যখন রচিত হইয়া পাঠের জন্য গৃহীত হইবে, তখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে এক জন হেড-পণ্ডিত রাখার প্রয়োজন হইবে।

৭। শিক্ষকেরা কোথাও না গিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট স্থানেই যাহাতে যথানিয়মে বেতন পান, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। হুগলী, নদীয়া, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর—এই চারিটি জেলা বর্ত্তমানে কাজের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে হইবে। উপস্থিত পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রয়োজনানুসারে জেলা চারিটির মধ্যে এইগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। নগর এবং গ্রামের এমন স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যেন তাহার নিকটে কোন ইংরেজী কলেজ বা স্কুল না থাকে। ইংরেজী কলেজ ও স্কুলের আশে পাশে বাংলা-শিক্ষা ঠিক ভাবে আদৃত হয় না।

৯। কর্ম্মকুশল সুদক্ষ তত্ত্বাবধানের উপরও বটে, এবং কৃতবিদ্য ছাত্রদের উৎসাহদানের উপরও বটে, বাংলা-শিক্ষার সাফল্য বহু-পরিমাণে নির্ভর করে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানোপার্জ্জন সাধারণ দেশবাসীর এখনও উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই। এই কারণে, ছোট লাট হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব—যাহা এত দিন চাপা ছিল—দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হওয়া দরকার।

১০। তত্ত্বাবধানের নিম্নলিখিত উপায় বিশেষ কার্য্যকর এবং অল্পব্যয়সাধ্য হইবে।

১১। যাতায়াতের ব্যয়সুদ্ধ, মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে দুই জন বাঙালী তত্ত্বাবধায়ক রাখা প্রয়োজন ;—এক জন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য, আর এক জন নদীয়া ও বর্দ্ধমানের জন্য। তাঁহাদের কাজ হইবে—ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, শ্রেণীগুলির পরীক্ষা লওয়া, এবং শিক্ষা-প্রণালী সংশোধন করা।

১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক দিতে হইবে না; কেবলমাত্র যাতায়াতের খরচা দিলেই চলিবে। এই বাবদ বৎসরে ৩০০৲ টাকার বেশী ব্যয় হইবে না। তিনি বৎসরে একবার স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিবেন। কর্ত্তৃপক্ষের উপরই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকিবে।

১৩। গ্রন্থ-প্রণয়ন, এবং পুস্তক ও শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার প্রধান তত্ত্বাবধায়কের উপর থাকিবে।

১৪। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার এক কেন্দ্রভূমি হইয়াও বাংলা শিক্ষক গড়িবার জন্য নর্মাল স্কুলরূপে প[রিগণ]িত হইবে।

১৫। এমনি ভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, [পাঠ্য] পুস্তক রচনা ও গ্রহণ, শিক্ষক-নির্ব্বাচন, এবং সাধারণ তত্ত্বাবধানে[র ভা]র একই পদে যুক্ত হইলে, অনেক অসুবিধা হইতে অব্যাহতি প[াওয়া] যাইবে।

১৬। মাসিক এক শত টাকা বেতনে, প্রধান তত্ত্বাবধায়কের একজন সহকারী নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে শিক্ষক-তৈয়ারী ও পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নে সাহায্য করিবেন এবং প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বাংলা স্কুল-পরিদর্শনে বাহির হইলে তাঁহার স্থানে অস্থায়িভাবে কাজ চালাইবেন।

১৭। গুরুমহাশয়-চালিত এখনকার পাঠশালাগুলি কোন কাজেরই নয়। যে-কাজে তাহারা অযোগ্য, এই সকল শিক্ষক সেই কাজ হাতে লওয়াতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয়। তত্ত্বাবধায়কদের কাজ হইবে—এই সকল পাঠশালা পরিদর্শন করা এবং শিক্ষাদানের রীতি সম্বন্ধে গুরুমহাশয়দের যথাসাধ্য উপদেশ দেওয়া। পূর্ব্বোল্লিখিত পাঠ্যপুস্তকগুলি সুযোগ-মত যথাসাধ্য প্রবর্ত্তন করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে পাঠশালাগুলি যাহাতে প্রয়োজনসাধক বিদ্যালয়রূপে গড়িয়া উঠে, সে দিকে তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১৮। দেশীয় লোক অথবা মিশনরী কর্ত্তৃক স্থাপিত যে-সব স্কুল সুদক্ষ শিক্ষকের হাতে আছে, অবশ্য তাহাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়কেরা এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া কিরকম উৎসাহ ও সাহায্য তাহারা পাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

১৯। নিজের নিজের এলাকার অন্তর্গত, শহর ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগকে গবর্মেণ্ট স্কুলের আদর্শে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে প্ররোচিত করাও তত্ত্বাবধায়কের এক কর্ত্তব্য হইবে।" ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪।

হ্যালিডে ব্যয়বাহুল্য বর্জ্জন করিবার ইচ্ছায় ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানের সমর্থন করেন নাই। তিনি মিনিটে লিখিয়াছি[লেন],—

"জানি, মাথার উপর কোন ইউরোপীয় না থাকিলে দেশীয় তত্ত্বাবধায়কদের বেশী বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা একজন অসাধারণ লোক, তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরীক্ষার ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দেখিলে আমি আনন্দিত হইব। পরীক্ষার ফল কি হয়,

তাহা দেখিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক এবং আমি সত্যই মনে করি, ইহাতে তিনি সফল হইবেন।"

কিন্তু শিক্ষা-পরিষদের সদস্যদের অনেকেই—রামগোপাল ঘোষ, সার্ জেম্‌স কোল্‌ভিল প্রভৃতি—এ প্রস্তাবের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের এতটুকু সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদের গুরু ভারের কথা স্মরণ করিয়া বিদ্যাসাগরকে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক করিবার প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মতি দেন নাই। সংস্কৃত কলেজ হইতে তাঁহাকে ছাড়িতে না-চাহিলেও তাঁহারা স্থির করেন যে, "এই মহৎ আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের কোন-না-কোনরূপ যোগ থাকা উচিত। পুস্তক, শিক্ষক এবং স্থানের নির্ব্বাচন শিক্ষা-প্রণালী ও অপরাপর নানা বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ খুবই মূল্যবান্ হইবে।" কিন্তু হ্যালিডে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কোন বাধাই তাঁহাকে সে-কাজে বিচলিত করিতে পারিত না। ইহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

বিদ্যাসাগরের শক্তি সম্বন্ধে হ্যালিডের একটা শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধা হইতে বন্ধুত্বের উৎপত্তি হয়। অনেক সময় তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া শিক্ষা-সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতেন। বাংলার ছোট লাটের আসনে বসিবার পরই, হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের উপর প্রস্তাবিত মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলির স্থান-নির্ব্বাচনের ভার দিলেন। এই কাজের জন্য তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। ৩ জুলাই ১৮৫৪ তারিখে ছোট লাটকে তিনি যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি ২১এ মে হইতে ১১ই জুন পর্য্যন্ত, সংস্কৃত কলেজের ছুটির সময়, হুগলী জেলার শিয়াখালা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, মলয়পুর, কেশবপুর, পাঁতিহাল পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। এই

সকল গ্রামের অধিবাসী স্কুল-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল, এমন কি, তাহারা নিজ খরচায় স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরাইয়া আসায় বিদ্যাসাগর হুগলী জেলার অন্যান্য স্থান, অথবা নদীয়া, বর্দ্ধমান ও ২৪ পরগনায় যাইতে না পারিলেও, স্কুল-প্রতিষ্ঠার উপযোগী গ্রামগুলির সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদ আহরণ করিয়াছিলেন। পত্রের শেষে তিনি লিখিতেছেন,—"বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যেমনই অনুমতি পাওয়া যাইবে, স্কুল-ঘর তৈয়ারী করিবার জন্য দু-তিন মাস অপেক্ষা না করিয়া আমার নির্ব্বাচিত স্থানগুলিতে অমনিই যেন স্কুল খোলা হয়।"

বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা শেষে বুঝিতে পারিলেন, ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বটে। ১৯ জুলাই ১৮৫৪ তারিখে বোর্ড অফ কন্‌ট্রোলের সভাপতি, সার্‌ চার্লস্‌ উড, 'ভারতের শিক্ষা-বিষয়ক চার্টার' নামে পরিচিত বিখ্যাত পত্রখানি স্বাক্ষর করিলেন। পর-বৎসর জানুয়ারি মাসে বাংলায় কাজ আরম্ভ হইল; শিক্ষা-পরিষদের বদলে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন বাহাল হইলেন। কিছু দিন পরেই কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণার্থে এক ইউনিভার্সিটি-কমিটি গঠিত হইল। বিদ্যাসাগর এই কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বিদ্যাসাগর ইহার 'ফেলো' মনোনীত হন।†

হ্যালিডের মিনিটে প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের পত্রে তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যবস্থার নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার দিকে বড় লাটের ঝোঁক থাকায় তিনি

* Letter to Pandit Iswarchandra Sharma. dated 26 January, 1855. —*Public Con. 26 Jany. 1855*, No. 154, also No. 153.

† *Public Procdgs. 12 Decr, 1856*, p. 7.

প্রথমে কয়েকটি জেলা লইয়া কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। যদি সংস্কৃত কলেজের কাজের কোন ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য বাহির হইতে পারেন, এ সম্বন্ধে বড় লাটের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিলাতের পত্র অনুসারে তাঁহাকে বাংলা-শিক্ষা-ব্যবস্থার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করা যায় না; এ কার্য্য ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন এবং তদধীন ইন্‌স্পেক্টরের দ্বারা চালিত হইবে।*

ডিরেক্টর অব পাবলিক্ ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন নিযুক্ত হইলেন। তবু হ্যালিডে অনুভব করিতে লাগিলেন, যদি বঙ্গদেশে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা সফল করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগরের মত লোকের সাহায্য ব্যতীত সে কার্য্য অসম্ভব। ডিরেক্টরকে লিখিত বাংলা-গবর্মেণ্টের পত্রে প্রকাশ :—

> "শিক্ষা-বিভাগের নূতন ব্যবস্থাসত্ত্বেও, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত বিশিষ্টরূপ গুণবান্ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা শ্রেয়স্কর, ইহাই ছোট লাটের মত। অধ্যক্ষ-হিসাবে সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তব্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধ না হয়, অথচ এ কাজে তাঁহার প্রয়োজনীয় সাহায্য কি করিয়া পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ঠিক করিতে ছোট লাট অনুরোধ করিতেছেন।"
> (২৩ মার্চ ১৮৫৫)

উত্তরে ডিরেক্টর প্রস্তাব করিলেন, স্থায়ী কর্ম্মচারী মিঃ প্র্যাটকে না-পাওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরকে অস্থায়িভাবে ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলের কাজে লাগান যাইতে পারে। এ প্রস্তাব কিন্তু ছোট লাটের মনঃপূত হইল না। তিনি মিনিটে লিখিলেন—

* Letter from C. Beadon. Secy. to the Govt. of India, to W. Grey. Secy. to the Govt. of Bengal, dated 13 Eeb. 1855.

"অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়া কোনই লাভ নাই। ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ়চিত্ত লোক। বাংলা-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি জোরালো মতামত আছে। যদি তাঁহার মতলব অনুযায়ী কাজ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উৎসাহ ও বিচার-বুদ্ধি সহকারে মঞ্জুরী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তুলিবার কার্য্যে লাগিয়া যাইবেন। তিন মাসে হউক আর তিন সপ্তাহে হউক মিঃ প্র্যাট যেমনই আসিবেন, অমনিই সরিয়া যাইতে হইবে, এইরূপ অস্থায়িভাবে যদি তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তবে তিনি যে-কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন, এমন আমার বোধ হয় না।

আমার নির্দ্ধারিত যে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা ভারত গবর্মেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, তাহাতে তিন-চারিটি জেলার উল্লেখ আছে। সেই জেলাগুলিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা কাজে পরিণত করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতনে প্রতিনিধি-সাব-ইন্‌স্পেক্টররূপে ঈশ্বরচন্দ্রকে যদি নিযুক্ত করা যায়, তাহাতে আমি কোন আপত্তির কারণ দেখি না। ইহাতে মিঃ প্র্যাটের কাজে বাধা পড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। ঈশ্বরচন্দ্রের কার্য্যের পরিদর্শন ছাড়াও, যে সব জেলা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র, সেই সব স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী ও ইঙ্গ-বঙ্গ স্কুল ও কলেজসমূহের ইন্‌স্পেক্টর হিসাবে তাঁহার করিবার কাজ যথেষ্টই থাকিবে।

বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা অতি গুরুতর বিষয়। বহু কষ্ট স্বীকার এবং যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া যাহা ঠিক করিয়াছি, সেই ব্যবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের এক জন প্রধান উদ্যোগীকে যদি এমন কাজে নিযুক্ত করা হয়, যাহাতে নানাভাবে প্রতিহত হইবার আশঙ্কা আছে, এবং তাঁহাকে ভুল পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যদি সেই ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিবার

দিকে লইয়া যাওয়া হয়, তবে সত্যই তাহা দুঃখের কথা।” (১১ এপ্রিল (১৮৫৫)

২০ এপ্রিল ১৮৫৫ তারিখে বাংলা সরকার ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনকে এই সুরে পত্র লিখিলেন,—

“ছোট লাট পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোককে ঐরূপ একটা অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করিবার বিরোধী। অতি অল্প দিনের কাজে পণ্ডিত কোন কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এরূপ নিয়োগ তাঁহার চরিত্র ও [illegible] যোগ্য হইবে না। যে-কোন মুহূর্ত্তে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—এমন অস্থায়ী ব্যবস্থা করিলে পণ্ডিতের প্রতি সরকারের অবিচার হইবে।

ছোট লাটের মত এই, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মাকে এখনই অনুমোদিত ব্যবস্থা-অনুসারে কাজ করিতে নির্দ্দেশ করা হউক। পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী তিন-চারিটি জেলা কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লওয়া হউক। ইহাতে—অন্ততঃ এই সময়টায়—পণ্ডিতের কলেজের কাজে বিশেষ বাধা জন্মিবে না।… সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বেতন ছাড়া, পণ্ডিত এই কাজ করিবার কালে মাসিক দুই শত টাকা এবং যাতায়াতের পথ-খরচা পাইবেন।”

ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাক্‌শন তখনই বিদ্যাসাগরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের পরামর্শ করিলেন। তাঁহাকে দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়সমূহের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর-পদে নিযুক্ত করা হইল; ১ মে ১৮৫৫ হইতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার উপর এই কাজে মাসে দুই শত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। নিযুক্ত হইয়াই তিনি নিজের সাব-ইন্‌স্পেক্টর* বাছিয়া

* হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। ইঁহাদের বেতন ছিল—পথ-খরচা ছাড়া মাসিক এক শত টাকা।

লইলেন, এবং মডেল স্কুল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মফস্বলে পাঠাইলেন। প্রস্তাবিত নূতন বাংলা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-নির্ব্বাচনই হইল তাঁহার প্রথম কাজ। তিনি জানিতেন, এই সব শিক্ষকের উপযুক্তরূপ জ্ঞানের উপরই সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। সংস্কৃত কলেজে বাংলা শিক্ষক নির্ব্বাচনের একটি পরীক্ষা গৃহীত হইবে বলিয়া তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে দুই শতেরও অধিক পদপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়াছিল। দেখা গেল, আর কিছু শিক্ষা না পাইলে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই সরকারী মডেল স্কুলগুলির ভার লইতে সমর্থ হইবে। এমনই করিয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইল। 'পাঠশালা' নামে একটি বাংলা স্কুল পূর্ব্বে হিন্দু-কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে সেটি যাহাতে তাঁহার তত্ত্বাবধানে আসে, বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায় ছিল তাহাই। তিনি ডিরেক্টরকে বলিলেন, প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কাজে লাগিবে। যাহারা মফস্বল-বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক হইতে চায়, তাহারা 'পাঠশালা'য় শিখাইবার ও পরিচালন করিবার পদ্ধতি দেখিয়া, কখনও কখনও নিজেরাও পড়াইয়া, শিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ মডেল স্কুলে পরিণত করা যাইতে পারে। ডিরেক্টরকে লিখিত ২ জুলাই ১৮৫৫ তারিখের পত্রে বিদ্যাসাগর নর্মাল স্কুল-স্থাপনে তাঁহার উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য আছে :—

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্ব্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত নর্মাল ক্লাসগুলির প্রধান শিক্ষক হন—ইহাই আমার অভিমত ;

বর্ত্তমানে প্রথম শ্রেণীর বাংলা লেখক অতি অল্পই আছেন; অক্ষয়কুমার সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকদের অন্যতম। ইংরেজীতে তাঁহার বেশ জ্ঞান আছে, এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যসমূহ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ; শিক্ষকতা-কার্য্যেও তিনি পটু। [illegible] কথা, তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই।···দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে আমি পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নাম উল্লেখ করি।"

বাংলা-স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছিল। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এবং ডিরেক্টর, উভয়েই পণ্ডিতের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। ছয় মাস অন্তর ৬০ জন করিয়া গুণী শিক্ষক স্কুল হইতে বাহির হইবে; তুলনায় মাসিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় কিছুই নয়। ১৭ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইল।

স্বতন্ত্র বাড়ী না পাওয়ায় নর্মাল স্কুল সকালবেলা দুই ঘণ্টার জন্য সংস্কৃত কলেজেই বসিত। স্কুলটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; উচ্চ শ্রেণীর ভার—প্রধান শিক্ষক সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং নিম্ন শ্রেণীর ভার—দ্বিতীয় শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতির উপর ছিল। ৭১টি ছাত্র লইয়া প্রথম স্কুল খোলা হয়; তন্মধ্যে ৬০ জনকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত। ১৭ বছরের কম, অথবা ৪৫ বছরের বেশী বয়সী ছাত্রদের ভর্ত্তি করা হইত না। প্রথম প্রথম কেবল উচ্চবর্ণের লোককেই লওয়া হইত। 'বোধোদয়,' 'নীতিবোধ,' 'শকুন্তলা,' 'কাদম্বরী,' 'চারুপাঠ' ও 'বাহ্যবস্তু' পড়ান হইত। ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধেও পাঠ দেওয়া হইত। মাসে মাসে পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা ছিল। অমনোযোগী ছাত্রেরা বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত, এবং পাঠে অগ্রসর ছাত্রেরা শিক্ষকরূপে নির্ব্বাচিত হইত।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই বিদ্যাসাগর তাঁহার

এলাকার প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি করিয়া স্কুল স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়-পিছু মাসে ৫০৲ টাকা করিয়া খরচ পড়িত। বিদ্যালয়-গৃহ গ্রামবাসীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনের নির্দ্দেশ ছিল, ছয় মাস পর্য্যন্ত ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইবে না, তাহার পর কিন্তু সম্ভব হইলে মাহিনা আদায় করা হইবে।

অক্লান্তকর্ম্মা ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নর্ম্মাল স্কুল, চারি জেলার মডেল স্কুল ও বাংলা পাঠশালার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি যে-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ভারত-সরকারের নির্দ্দেশে, পূর্ব্বতন নাম বদলাইয়া সে পদের নাম হইল—দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়সমূহের স্পেশ্যাল ইন্‌স্পেক্টর।

সার্ হেন্‌রি হাডিঞ্জের স্থাপিত স্কুলগুলি সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়াও বিদ্যাসাগর দমিলেন না। তিনি মডেল স্কুল-গুলিকে সার্থক করিবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নেও তিনি লাগিয়া গেলেন। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সুফলপ্রসূ না হইয়া পারে না। কার্য্য-সূচনার তিন বৎসর পরে তিনি যে রিপোর্ট লিখিলেন, তাহাতে সফলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

> "প্রায় তিন বৎসর হইল মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্কুলগুলি সন্তোষজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে। ছাত্রগণ সকল বাংলা পাঠ্য পুস্তকই পাঠ করিয়াছে। ভাষার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়; প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়েও তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছে।
>
> গোড়ায় অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল, মফস্বলের লোকেরা মডেল স্কুলগুলির মর্ম্ম বুঝিবে না। প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ সার্থকতা এই সন্দেহ

দূর করিয়াছে। যে যে স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত, সেই সব গ্রামের এবং তাহাদের আশপাশের পল্লীবাসীরা এই বিদ্যালয়গুলি অতি উপকারী বলিয়া মনে করে; ইহার জন্য সরকারের কাছে তাহারা কৃতজ্ঞ। স্কুলগুলির যে যথেষ্ট আদর হইয়াছে, ছাত্র-সংখ্যাই তাহার প্রমাণ।”

বিদ্যাসাগর বিভিন্ন জেলায় যে-সকল মডেল স্কুল স্থাপন করিয়া ছিলেন, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

নদীয়া

বেল্‌ঘোরিয়া	মডেল স্কুল	প্রতিষ্ঠাকাল	...	২২	আগষ্ট	১৮৫৫
মহেশপুর	ঐ		...	১	সেপ্টেম্বর	,,
ভজনঘাট	ঐ		...	৪	ঐ	”
কুশদহ বা খাঁটুরা	ঐ		...	১১	ঐ	”
দেবগ্রাম	ঐ		...	১২	ঐ	”

বর্দ্ধমান

আমাদপুর	মডেল স্কুল	প্রতিষ্ঠাকাল	...	২৬	আগষ্ট	১৮৫৫
জোগ্রাম	ঐ		...	২৭	ঐ	”
খণ্ডঘোষ	ঐ		...	১	সেপ্টেম্বর	”
মানকর	ঐ		...	৩	ঐ	”
দাঁইহাট	ঐ		...	২৯	অক্টোবর	”

হুগলী

হারোপ	মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠাকাল	...	২৮ আগষ্ট	১৮৫৫
শিয়াখালা	ঐ	...	১৩ সেপ্টেম্বর	"
কৃষ্ণনগর	ঐ	...	২৮ ঐ	"
কামারপুকুর	ঐ	...	২৮ ঐ	"
ক্ষীরপাই	ঐ	...	১ নবেম্বর	"

মেদিনীপুর

গোপালনগর	মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠাকাল	...	১ অক্টোবর	১৮৫৫
বাসুদেবপুর	ঐ	...	১ ঐ	"
মালঞ্চ	ঐ	...	১ নবেম্বর	"
প্রতাপপুর	ঐ	...	১৭ ডিসেম্বর	"
জকপুর	ঐ	...	১৪ জানুয়ারি	১৮৫৬

বিদ্যাসাগরের যত্ন-চেষ্টায় অনেকগুলি বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পাইকপাড়া রাজাদের প্রতিষ্ঠিত (১ এপ্রিল ১৮৫৯) কাঁদির ইংরেজী-সংস্কৃত স্কুল তাহাদের অন্যতম। কিছু দিন তিনি ইহার অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। মেদিনীপুর ঘাটাল অঞ্চলে "এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার পাঠোপযোগী এক সংস্কৃত সহিত ইংরেজী স্কুল" প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে দুই জন স্থানীয় ভদ্রলোক আর্থিক সাহায্যের জন্য তাঁহাকে লিখিলে তিনি অবিলম্বে তাহাদের জানাইয়াছিলেন,—"আপনাদিগের উদ্যোগে ঘাটালে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে উহার গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনটন আছে আমি স্বতঃপরতঃ তাহা সমাধা করিয়া দিব সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তজ্জন্য অন্য চেষ্টা

দেখিবার আর প্রয়োজন নাই” (৬ জুলাই ১৮৬৮)। স্বগ্রামে তিনি বালকদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন (ইং ১৮৫৩)। দক্ষিণ-বাংলার স্কুল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টর লজ সাহেব বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

“বীরসিংহ বিদ্যালয়।—এই স্কুলটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে পরিচালিত। এ কথা না বলিলে এই সুবিখ্যাত জনহিতৈষীর প্রতি অবিচার করা হয়; স্কুলগৃহের জন্য তিনি বেশ উপযোগী স্থানে একখানি সুন্দর বাংলা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ছয়-সাত জন শিক্ষকের বেতন তিনি নিজেই দেন। ছাত্রদের নিকট মাহিনা লওয়া হয় না, বিনামূল্যে তাহাদের সকল রকম বই দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতের নিজের বাড়ীতে প্রায় ৩০ জন দরিদ্র ছেলের আহারের ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে; দরকার পড়িলে বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত যোগান হয়। অসুখে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়; সকলের সম্বন্ধেই এমন যত্ন লওয়া হয় যেন প্রত্যেকেই পরিবারের এক জন।

এখানে সংস্কৃতই প্রধান পাঠ্য। উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী এবং নিম্ন শ্রেণীতে বাংলাও পড়ান হয়। স্কুলে আটটি শ্রেণী আছে। ছাত্র-সংখ্যা ১৬০। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা ইংরেজীতে ভালই পরীক্ষা দিয়াছিল, তবে তাহাদের উচ্চারণ শুদ্ধ নয়।

বাংলা সম্বন্ধে ছেলেরা বিশেষ মনোযোগ দেয় না। বাংলায় লেখা বিজ্ঞানের বই চালাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছি। ছেলেরা সংস্কৃত ভালই জানে।” (২০ মে ১৮৫৯)

শেষ-জীবনে বিদ্যাসাগর শহরের কর্ম্মকোলাহল হইতে মাঝে মাঝে মধুপুরের নিকট কার্ম্মাটারের নির্জ্জন সাঁওতাল-পল্লীতে আসিয়া বাস করিতেন। কার্ম্মাটার স্টেশনের ধারেই বাগান সমেত তাঁহার

বাংলাখানির ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবেশী অসভ্য সাঁওতালদের তিনি এতই ভালবাসিতেন যে, তাহাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য নিজব্যয়ে এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার মাসিক কুড়ি টাকা ব্যয় হইত।

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার সরকার নিজের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। ইতিপূর্ব্বেই কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েক জন সম্ভ্রান্ত মহোদয় এবং খ্রীষ্টান মিশনরীগণ স্ত্রীশিক্ষার কিছু সূচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৭ মে ১৮৪৯ তারিখে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্ত্তৃক একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তখন হইতেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল। প্রথমে ইহার নাম ছিল—হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়; পরে 'বীটন নারী বিদ্যালয়'—এই নূতন নামকরণ হয়। গোড়া হইতেই বিদ্যাসাগরকে সহকর্ম্মী এবং উৎসাহী বন্ধুরূপে পাইবার সৌভাগ্য বীটন সাহেবের ঘটিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে বীটন তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হন। বিদ্যাসাগরকে এক জন অক্লান্তকর্ম্মী গুণী ব্যক্তি বলিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, তাই তিনি তাঁহাকেই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাজ করিবার জন্য ধরিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৫০)। বিদ্যাসাগর আচারবদ্ধ দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বিদ্যালয়ের বালিকাদের গাড়ীর দুই পাশে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—মনুসংহিতার এই শ্লোকাংশ খোদিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পরেই বীটন পরলোকগত হন (১২ আগস্ট ১৮৫১)। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড ড্যালহাউসি বিদ্যালয়-পরিচালনার সমস্ত খরচ বহন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেবের বিদায়গ্রহণের (মার্চ, ১৮৫৬) পর হইতে ইহা সরকারী-ব্যয়ে-পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হইল, এবং বঙ্গের ছোট লাট ইহাকে সিসিল বীডনের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত করিলেন। ১২ আগস্ট ১৮৫৬ তারিখের পত্রে বীডন বাংলা-সরকার সমীপে এক ব্যবস্থা পেশ করিলেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের নজরে বিশেষ করিয়া পড়ে, এবং তাঁহারা যাহাতে এই বালিকা-বিদ্যালয়ে কন্যাদের পড়াইতে প্ররোচিত হন, এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব সেই পত্রে ছিল। একটি কমিটি করিবার কথাও পত্রে ছিল। কমিটির সদস্যরূপে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়। বিদ্যাসাগরকে সম্পাদক করিয়া তাঁহার উপর স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার দিবার জন্য বীডন ব্যগ্র হইলেন। তিনি ছোট লাটকে লিখিলেন :—

"কমিটি সম্পাদক-নিয়োগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহার সামাজিক সম্মান ও স্কুলের সম্পাদক হিসাবে পূর্ব্বপরিশ্রম তাঁহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে।"

বাংলা-সরকার সম্মত হইলেন। বীডন সাহেব কমিটির সভাপতি ও বিদ্যাসাগর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের মত বিদ্যাসাগরও স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন ; তিনিও মনে করিতেন, স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও কর্ম্মিষ্ঠতা শুধু বীটন স্কুলের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত পত্রে ও অন্যত্র বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা

স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এক সমস্যা। সেই সমস্যা-সমাধানের উপায় বহুল পরিমাণে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বাংলা দেশে হ্যালিডে সাহেব সেই কাজে হাত দিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ডাকাইয়া, তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিলেন। কাজ যে কত কঠিন, সে কথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ে নিজেদের মেয়ে পাঠাইতে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মনে কতটা যে অনিচ্ছা আছে, তাহা তাঁহারা ভালরূপেই বুঝিতেন। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কাজে লাগিলে এরূপ সৎকার্য্যে জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা খুব কঠিন হইবে না।

বিদ্যাসাগর অল্প দিনের মধ্যেই জানাইলেন, বর্দ্ধমান জেলার জৌগ্রামে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলিতে পারিয়াছেন (৩০ মে ১৮৫৭)। ডিরেক্টর প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকারের কাছে ৩২৲ টাকা মাসিক সাহায্যের অনুমোদন করিয়া পত্র লিখিলেন।

দক্ষিণ-বঙ্গের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর প্র্যাট সাহেবের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য তিনখানি আবেদন-পত্র আসিয়াছিল। ডিরেক্টর সেগুলি পূর্ব্বেই সরকারের দপ্তরে পেশ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত দোয়ারহাটা ও বৈদ্যবাটী থানার অন্তর্গত গোপালনগর, এবং বর্দ্ধমানের নারোগ্রামে তিনটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সেই তিনখানি আবেদন-পত্রে ছিল। ছোট লাট সকল দরখাস্তই মঞ্জুর করিলেন; প্রত্যেক স্থলেই পল্লীবাসীরা বিদ্যালয়-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিবার ভার লইল। সাহায্য মঞ্জুর করিবার সময় ছোট লাট জানিতে চাহিলেন, বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টরদের নিকট হইতে ডিরেক্টর আর কোন

আবেদন পাইয়াছেন কি না, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রার্থনাও তিনি পূর্ণ করিবেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা-সরকারের ভাব বি[illegible]রের কাছে ভাল বলিয়াই মনে হইল। তিনি পূর্ব্বেই বালকদের জন্য মডেল বাংলা বিদ্যালয়গুলি কার্য্যকর ও সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইবার বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি ফিরাইলেন। মডেল বাংলা বিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই করিলেন। তিনি ধরিয়া লইলেন, সরকার তাঁহার মতলব সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। এই ধারণার বশে তিনি নিজ এলাকাভুক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সব বিদ্যালয় স্থাপনার সংবাদ তিনি যথাসময়ে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের কাছে পাঠাইয়া মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ডিরেক্টর পূর্ব্বেকার আদেশ অনুযায়ী অন্যান্য আবেদন-পত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পত্রগুলিও ছোট লাটের বিবেচনার্থ পাঠাইলেন।

নবেম্বর ১৮৫৭ হইতে মে ১৮৫৮—এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫৲ টাকা খরচ হইত; ছাত্রী-সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০। এই সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

হুগলী

গ্রাম	পোটবা	প্রতিষ্ঠাকাল	২৪ নবেম্বর ১৮৫৭	মাসিক খরচ	২৯৲
	দাসপুর		২৬ ঐ		২০৲
	বঁইচি		১ ডিসেম্বর		৩২৲
	দিগশুই		৭ ঐ		৩২৲

গ্রাম	তালাণ্ডু	প্রতিষ্ঠাকাল	৭ ডিসেম্বর	মাসিক খরচ	২০৲
	হাতিনা		১৫ ঐ		২০৲
	হয়েরা		১৫ ঐ		২০৲
	নপাড়া		৩০ জানুয়ারি ১৮৫৮		১৬৲
	উদয়রাজপুর		২ মার্চ		২৫৲
	রামজীবনপুর		১৬ ঐ		২৫৲
	আকাবপুর		২৮ ঐ		২৫৲
	শিয়াখালা		১ এপ্রিল		২০৲
	মাহেশ		১ ঐ		২৫৲
	বীরসিংহ		১ ঐ		২০৲
	গোয়ালসারা		৪ ঐ		২৫৲
	দণ্ডীপুর		৫ ঐ		২৫৲
	দেপুর		১ মে		২৫৲
	রাউজাপুর		১ ঐ		২৫৲
	মলয়পুর		১২ ঐ		২৫৲
	বিষ্ণুদাসপুর		১৫ ঐ		২০৲

বর্দ্ধমান

রানাপাড়া	১ ডিসেম্বর ১৮৫৭	২০৲
জামুই	২৫ জানুয়ারি ১৮৫৮	৩০৲
শ্রীকৃষ্ণপুর	২৬ ঐ	২৫৲
রাজারামপুর	২৬ ঐ	২৫৲
জ্যোৎ-শ্রীরামপুর	২৭ ঐ	২৫৲
দাঁইহাট	১ মার্চ	২০৲

গ্রাম	প্রতিষ্ঠাকাল	মাসিক খরচ
কাশীপুর	১ মার্চ	২১৲
সাহুই	১৫ এপ্রিল	২৫৲
রসুলপুর	২৬ ঐ	৩১৲
বস্তীর	২৭ ঐ	২০৲
বেলগাছি	১ মে	২০৲

মেদিনীপুর

ভাঙ্গাবন্ধ	১ জানুয়ারি ১৮৫৮	৩০৲
বদনগঞ্জ	১০ মে	৩১৲
শান্তিপুর	১৫ ঐ	২০৲

নদীয়া

নদীয়া	১ মে ১৮৫৮	২৮৲
		৮৪৫৲

১৩ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে বাংলার ছোটলাট ভারত-সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন,—পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬টি বিদ্যালয়ের সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত আসিয়াছে। সরকারী-সাহায্যদান-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী আর একটু ঢিল না হইলে তিনি দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন না। তিনি দেখাইলেন, ১ অক্টোবর ১৮৫৬ তারিখের পত্রে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ আশা দিয়া বলিয়াছেন যে, বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হইবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও

ছোট লাট মনে করেন, আরও কিছু করা দরকার। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন, যখনই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নি-খরচায় উপযুক্ত গৃহ এবং অন্ততঃ কুড়িটি ছাত্রী ভর্ত্তি হইবে, এমন একটা আশা পাওয়া যাইবে, তখনই স্কুল-পরিচালনার সমস্ত খরচ সরকার সরবরাহ করিবেন।

৭ মে ১৮৫৮ তারিখের পত্রে ভারত-সরকার বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম করিতে অস্বীকৃত হইলেন; বলিলেন, উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভাল।

ভারত-সরকারের এইরূপ আদেশ বিদ্যাসাগরের কাজে বাধা জন্মাইল। সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাইবেই, এই মনে করিয়া বিদ্যাসাগর অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য কথা ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরাই উপযুক্ত বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে, আর সরকার অন্য সব খরচ যোগাইবেন। পণ্ডিত এখন বুঝি ন, তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে. এত কষ্টের স্কুলগুলি অ ম্বে উঠাইয়া দিতে হইবে। আর এক সমস্যা—শিক্ষকদের তন। প্রতিষ্ঠাবধি স্কুল হইতে তাঁহারা মাহিনা পান নাই। ৩০ জ ১৮৫৮ তারিখ পর্য্যন্ত ধরিলে তাঁহাদের সকলের বেতন মোট প না হয়—৩৪৩৯৶৫।

এই সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনকে ে া ঈশ্বরচন্দ্রের ২৪ জুন তারিখের পত্রখানি পড়িলে ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। বাংলায় পত্রখানির মর্ম্ম দেওয়া গেল :—

> "হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকারহইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল-গৃহ

তৈয়ারী করাইয়া দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত-সরকার কিন্তু ঐ সর্ত্তে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবর্গ গো... হইতে মাহিনা পান নাই, তাঁহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি, সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন।

সরকারী আদেশ পাইবার পূর্ব্বেই, আমি অবশ্য স্কুলগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমে আপনি, অথবা বাংলা-সরকার এ বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে, এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। স্কুলের কর্ম্মচারিবর্গ মাহিনার জ... স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে,—বিশেষতঃ খরচ যখন সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য করা হইয়াছে।"

ডিরেক্টর বাংলা-সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের কথা জানাইয়া বলিলেন,—

"পণ্ডিতের পত্রের সহিত সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; কেন-না, স্ত্রী-শিক্ষা-সম্পর্কে এই কর্ম্মচারীর স্বেচ্ছাবৃত এবং অনাড়ম্বর পরিশ্রমের কথা সরকারের না জানাই সম্ভব। দূরবর্ত্তী স্থানের অন্যবিধ কর্ত্তব্যের গুরুভার যাঁহার উপর ন্যস্ত, কতৃত্বের বিশেষ উচ্চপদেও যিনি অবস্থিত নন এমন এক ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতী... গ্রামসমূহে যদি এতটা করিয়া থাকিতে পারেন, সরকারের অনুমোদন ও সাহায্য পাইলে সেই দিকে কতটাই না তিনি করিতে পারিতেন? আর যদি আন্তরিক প্রচেষ্টাসত্ত্বেও ইহাতে সেই কর্ম্মচারীর অপমান ও

আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে কি নিরুৎসাহের ভাবই না আসিয়া পড়িবে ?"

ছোট লাট ডিরেক্টরের অনুরোধ-পত্র সমর্থন করিয়া এবং "সংস্কৃত কলেজের অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও কৃতী অধ্যক্ষের আড়ম্বরহীন উৎসাহের" কথা উল্লেখ করিয়া ভারত-সরকারকে ব্যাপারটা পুনরায় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন (২২ জুলাই ১৮৫৮)।

সরকার পণ্ডিতের উপর সুবিচার করেন নাই এবং সরকারের কাজে যে আর্থিক দায়িত্ব তিনি নিজে লইয়াছিলেন, সে দায়িত্ব তাঁহার ঘাড়েই পড়িয়াছিল, সরকার তাহা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হন—এই গল্প বিদ্যাসাগরের জীবনী-লেখকগণই বানাইয়াছেন। ভারত-সরকারের ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের পত্রে এ-সম্বন্ধে শেষ আদেশ প্রদত্ত হয়। বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বিদ্যাসাগর যে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই টাকা যে সমস্তই পরিশোধ করা হইয়াছিল, এই পত্রই তাহার নিশ্চিত প্রমাণ। ভারত-সরকার লিখিতেছেন,—

"দেখা যাইতেছে, পণ্ডিত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই এ কাজ করিয়াছেন, এবং এ কাজ করিতে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের উৎসাহ এবং সম্মতিও তিনি পাইয়াছেন। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া, এই বিদ্যালয়গুলিতে যে ৩৪৩৯৶৫ প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে, সেই টাকার দায় হইতে সপারিষদ বড় লাট তাঁহাকে মুক্ত করিতে-ছেন। সরকার এ টাকা দিবেন, ইহাই তাঁহার আদেশ।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলির, অথবা সেগুলির পরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত সরকারী বিদ্যালয়গুলির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কোন স্থায়ী অর্থসাহায্য করিতে কাউন্সিলের সভাপতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সমস্ত চিঠিপত্র বিবেচনার্থ সেক্রেটরী অফ ষ্টেটের নিকট

প্রেরিত হইবে। হুগলী, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগণায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনার জন্য অনধিক এক হাজার টাকার সাহায্যের জন্যও ইহাতে অনুরোধ থকিবে। সেই টাকার কিয়দংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির সাহায্যার্থ এবং কিয়দংশ সরকার-সমর্থিত কতকগুলি মডেল স্কুলের জন্য ব্যয় করা হইবে।”

কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য আর্থিক অনটনবশতঃ বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে কোন স্থায়ী সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন ;—তবে আশা দিলেন, বিষয়টা ভবিষ্যতে বিবেচিত হইবে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কীয় ব্যাপারে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনের সহিত মতান্তরই না-কি তাঁহার পদত্যাগের অন্যতম কারণ। মাসিক ৫০০৲ টাকার আয় হ্রাস, সরকারের সাহায্যদানে অসম্মতি,—এ সব কিছুতেই তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে নিরাশ করিতে পারিল না। বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পরিচালনের জন্য তিনি এক নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুলিলেন ; ইহাতে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চতন সরকারী কর্ম্মচারীরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁহার প্রচেষ্টা যে দেশবাসীর আনুকূল্য লাভ করিয়াছে, তাহা সার্ বার্টল ফ্রিয়ারকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

“শুনিয়া সুখী হইবেন, মফস্বলের যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য আপনি চাঁদা দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জেলা-সমূহের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নূতন নূতন স্কুলও খোলা হইতেছে।”

ছোট লাট বীডন সাহেবও মাসিক ৫৫৲ টাকা সাহায্য করিয়া পণ্ডিতকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আগেই বলিয়াছি, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগর বীটন-স্কুল-কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি উক্ত কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাকে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, কাজেই সময় তাঁহার বেশী ছিল না, তবুও বীটন-বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখে বিদ্যাসাগর বাংলা-সরকারকে বীটন-বিদ্যালয় সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পাঠান। তাঁহার সম্পাদক থাকিবার কালে বিদ্যালয়ের অবস্থা কেমন ছিল, তাহার আভাস এই রিপোর্টে পাওয়া যায়:—

> "পঠন ও লিখন, পাটীগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ, এবং সূচীকার্য্য শিক্ষণীয় বিষয়। বাংলা-ভাষার মধ্য দিয়াই ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এক জন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, দুই জন সহকারিণী এবং দুই জন পণ্ডিত—এই পাঁচ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষক।...
>
> কমিটির মত এই, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে...বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া কমিটি বিশ্বাস করেন, যাহাদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ইহা ক্রমেই সমাদর লাভ করিতেছে। বড়লোকেরা এখনও সাক্ষাৎভাবে বীটন-বিদ্যালয়ের সুবিধা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন নাই; এই শ্রেণী হইতে অতি অল্প-সংখ্যক ছাত্রীই স্কুলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অনেক সম্পন্ন-ঘরেই কিন্তু মহিলাদের জন্য গৃহশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে,—ইহা দেখিয়া কমিটি আনন্দানুভব করিতেছেন। বিশেষ ভাবে বীটন-স্কুলের হিতকর প্রভাবই যে ইহার কারণ—ইহাই কমিটির বিশ্বাস।"

মিস্ মেরী কার্পেন্টারের নাম এদেশে মানব-হিতৈষী কর্ম্মী ও ভারত-বন্ধু বলিয়া সুপরিজ্ঞাত। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি তিনি কলিকাতায় আসেন। ভারতবর্ষে নারী-শিক্ষার প্রচার ছিল তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা। বিদ্যাসাগর যে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে একজন বড় কর্ম্মী, এ কথা সুবিদিত। মিস্ কার্পেন্টার কলিকাতা পৌছিয়াই পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন অ্যাটকিন্‌সন সাহেব বে-সরকারী পত্রে বিদ্যাসাগরকে জানাইলেন,—

> "প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়, মিস্ কার্পেন্টারের নাম শুনিয়া থাকিবেন। তিনি আপনার সহিত পরিচিত হইতে, এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইতে ইচ্ছুক···।" (২৭ নবেম্বর ১৮৬৬)

ডিরেক্টর বীটন-বিদ্যালয়ে মিস্ কার্পেন্টারের সহিত পণ্ডিতের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রথম আলাপেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তিনি বিদ্যাসাগরের সহিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালিকা-বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিলেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে ডিরেক্টর অ্যাটকিন্‌সন, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্রো এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত মিস্ কার্পেন্টার উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। ফিরিবার মুখে বিদ্যাসাগরের বগী-গাড়ী উল্টাইয়া যায়। তিনি পড়িয়া গিয়া যকৃতে গুরুতর আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া যায়। যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি শেষে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে তাঁহাকে মৃত্যুপথে লইয়া যায়, এই দারুণ আঘাতই তাহার মূল কারণ। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই স্বাস্থ্যহানির দিকে মোটেই নজর দিলেন না,— প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় দেশহিতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

এক দল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ বীটন-বিদ্যালয়েই একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত করিবার জন্য মিস্ কার্পেন্টার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এম. এম ঘোষ প্রমুখ এদেশীয় জনকয়েক গণ্যমান্য লোক এই আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন। মিস্ কার্পেন্টারের সহিত তাঁহার প্রস্তাবের ঔচিত্য বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার আয়োজন হয় (১ ডিসেম্বর ১৮৬৬)। বিদ্যাসাগরও ইহাতে আহূত হইয়াছিলেন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হয়, বিদ্যাসাগর তাহার এক জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। স্থির হয়, কমিটি প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুল স্থাপন বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন করিবেন। সভার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর কমিটিভুক্ত থাকিতে অস্বীকার করেন; তিনি লিখিয়া পাঠান :—

"আমার মতে, কোন-কিছু করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা-ব্যাপারে যাঁহারা অনুরাগী, সমাজের সেই সব মান্যগণ্য ব্যক্তির মতামত জানা উচিত ছিল। কিন্তু সভাতে তাঁহাদিগকে আহ্বানই করা হয় নাই, এবং তাঁহাদের সাহায্যও চাওয়া হয় নাই; এ অবস্থায় সরকারের নিকট প্রস্তাবিত আবেদনে আমার নাম সংযুক্ত রাখা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে, যখন আমাকে সভায় উপস্থিত হইতে বলা হয়, তখন সোজাসুজি ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে, মিস্ কার্পেন্টারের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করাই সভার উদ্দেশ্য; তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবি নাই যে, উহা যথারীতি সভা হইবে অথবা এরূপ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা এত সংক্ষেপ হইতে পারে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি এমনই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম যে, সভার আলোচনায় যোগদান অথবা আলোচ্য বিষয়ে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই।

বীটন-বিদ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই,—এ বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। যে মানব-হিতৈষী মহাত্মার নামের সহিত বিদ্যালয়টির নাম সংযুক্ত, তিনি ভারতে নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারকল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মারক-রূপেও সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ভার বহন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মফস্বলের বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পক্ষে আদর্শরূপে কাজ করিবে বলিয়াও এইরূপ শহরের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত এক সুব্যবস্থিত বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। হিন্দু-সমাজের উপর এই বিদ্যালয়টির নৈতিক প্রভাব যথেষ্ট। চারি পাশের জেলা-সমূহে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে ইহা পথ প্রস্তুত করিয়াছে; তাই আমার বিবেচনায় ইহার পিছনে বছরে বছরে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহা সার্থক বলিতে হইবে। কিন্তু এ কথাও সত্য, ব্যয়সঙ্কোচ ও উন্নতির যথেষ্ট অবসর আছে। কার্য্যকারিতার হানি না করিয়াও বিদ্যালয়ের খরচ অর্দ্ধেক কমাইতে পারা যায়।

স্বাস্থ্যলাভের আশায় দীর্ঘকালের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইতেছি। বীটন বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন-সম্বন্ধে যদি আমার মতামত জানিতে চান, তাহা হইলে কলিকাতায় আপনার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে ও সাক্ষাতে আলোচনা করিতে পারি।" (১ অক্টোবর ১৮৬৭)

কিন্তু বাংলা সরকার মিস্ কার্পেণ্টারের কল্পিত ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। শীঘ্র ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগও ঘটিল।

ছাত্রী-সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে এবং অন্যান্য নানা কারণে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বীটন-স্কুল কমিটির মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, বিদ্যালয়ের এ অবস্থায় এক বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এই কারণে জুলাই মাসে কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হইল। অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীকে লইয়া এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। অনুসন্ধানের ফল সাব কমিটি একটি রিপোর্ট দাখিল করিলেন (২৪ সেপ্টেম্বর)। রিপোর্ট-পাঠে বীটন-স্কুল-কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন, যত দিন মিস্ পিগট্ অধ্যক্ষ থাকিবেন, তত দিন বিদ্যালয়ের উন্নতির আশা নাই। কমিটি এ-বিষয়ে বাংলা-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইলেন।

বাংলা-সরকার মিস্ পিগট্‌কে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ হইতে সত্বর অপসারিত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বীটন-স্কুল-কমিটিকে লিখিলেন :—

"ছোট লাটের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কমিটি যেন অপর শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত না করেন। স্বর্গীয় বীটন তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ীখানি দান করিয়া গিয়াছেন। রাজস্ব হইতেও বছরে বছরে বেশ মোটা টাকা সাহায্যার্থ দেওয়া হয়। ছোট লাট মনে করেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বর্ত্তমান অবস্থায় যেরূপ করা হইতেছে, এই-সকল দানের এতদপেক্ষা অধিকতর সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্কুলটি একটু ছোট করিয়া, তাহার সহিত শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি নর্মাল স্কুল যোগ করিয়া দিলে, ছোট লাটের বিশ্বাস, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

এইরূপ করাই যদি শেষে সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে শিক্ষা-বিভাগের আরও ঘনিষ্ঠ সংস্রবে লইয়া যাওয়া

বাঞ্ছনীয় হইবে। একজন ইংরেজের সভাপতিত্বে কমিটির দেশীয় সদস্যেরা এতদিন পর্য্যন্ত বীটন-বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু এই ভদ্র মহোদয়েরা বিভাগীয় স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের সহযোগিতায় পরামর্শ-সভার সভ্যরূপে কাজ করিতে রাজী আছেন কি না, ছোট লাট জানিতে চান।" (৩ মার্চ ১৮৬৮)

বীটন-স্কুল কমিটি এই সর্ত্তে বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

ব্যয়সংক্ষেপ করা হইবে, কার্য্যকারিতাও বাড়িবে, এইরূপ প্রয়োজন-সাধনার্থ সরকার প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুল ও বীটন-স্কুল একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন বৎসরের জন্য মিসেস ব্রিট্‌শে নামে এক মহিলা বীটন ও নর্মাল স্কুলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। বীটন-স্কুল-কমিটি ভাঙিয়া গেল। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন কমিটির সদস্যদের—বিশেষভাবে কমিটির সুদক্ষ সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে—তাঁহাদের অতীত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

বিদ্যাসাগর এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন না সত্য, কিন্তু চাহিবামাত্র কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। ২ মার্চ ১৮৬৯ তারিখে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব ডিরেক্টরকে লিখিতেছেন,—

"বীটন-স্কুল-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৩এ [ফেব্রুয়ারি] আমার হাতে দিয়াছেন। তিনি বহু ক্ষণ ধরিয়া আমার সহিত বিদ্যালয়-গৃহে এবং সংলগ্ন জমিতে বেড়াইলেন এবং ইহা হিন্দু-মহিলাদের থাকিবার পক্ষে উপযোগী করিতে হইলে কি কি দরকার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

যত দিন কলিকাতায় থাকিবে, তত দিন নর্মাল স্কুলটি যে বিশেষ ফললাভ করিবে, এমন আশা তিনি করেন না। কিন্তু তবুও নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।"

বিদ্যাসাগরের কথাই ফলিল। তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই পরবর্ত্তী ছোট লাট সার্ জর্জ ক্যাম্পবেল বীটন-বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট নর্মাল স্কুলটি তুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠানকে সফল করিতে গেলে দেশের রীতি ও সংস্কার অনুসারে যে তাহা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে, এ-বিষয়ে তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল। ডিরেক্টরের নিকট নিম্নলিখিত আদেশ-পত্র প্রেরিত হইল :—

"সাধারণভাবে সমস্ত বিষয়টি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়, তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিবার পরও ফিমেল নর্মাল স্কুলটিকে সফল করিতে পারা যায় নাই। এ-সব বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ, সেই সব মহিলার সহিত ছোট লাট প্রায় একমত। তাঁহাদের মত এই, নারীদের ধর্ম্মসংস্রবহীন শিক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া বড়ই বিপদ্‌জনক। অতএব ৩১ জানুয়ারী ১৮৭৮ তারিখের পর ফিমেল নর্মাল স্কুলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক।" (২৪ জানুয়ারি ১৮৭২)

উপরে লেখা হইতে বুঝা যাইবে, বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের কি উৎসাহ ও আগ্রহই না ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে, এক হিন্দু মহিলা-সঙ্ঘ বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা করেন :—

"বীটন-বিদ্যালয়ের কমিটি জানাইতেছেন, কলিকাতাস্থ মহিলা-অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগর-স্মৃতিরক্ষা-কমিটির সম্পাদকের নিকট হইতে

১৬৭০৲ টাকা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কোন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইলে, পরবর্ত্তী দুই বৎসরের জন্য এই টাকার আয় হইতে তাহাকে একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে।"

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ

শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারিরূপে বিদ্যাসাগর অসাধারণ উৎসাহ এবং বিচক্ষণতার সহিত তাঁহার কাজ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে সংস্কৃত-শিক্ষার সংস্কার, বাংলা-শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষার বহুল বিস্তার তাঁহার কাজ। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা বিষয়ে উপরিওয়ালারা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন। সুতরাং সকলেই আশা করিয়াছিল, প্র্যাট সাহেব ছুটি লইয়া বিলাতযাত্রা করায় দক্ষিণ-বাংলার ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলের শূন্য পদে বিদ্যাসাগরই নিযুক্ত হইবেন। বস্তুতঃ ছোট লাট হ্যালিডের সহিত পণ্ডিতের এ-সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। নিম্নলিখিত পত্রাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে—

"গত শনিবার যখন আপনার সহিত দেখা ক   দক্ষিণ-বাংলার ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিবার   মতি প্রার্থনা করি, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে একখা   লিখিত পত্র দাখিল করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে অ   বিনীতভাবে প্রস্তাব করিতেছি,—যদি আপনি আমাকে ঐ প   হাল করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে সংস্কৃত কলেজে আমার পদে যাঁহাকে আনা হইবে, তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে আমার সহিত যেন পরামর্শ করা হয়; কেন-না, যে-সকল ব্যক্তির মধ্য হইতে নির্ব্বাচন হইবে, তাহাদের

সম্বন্ধে বিশেষরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই, আমার মনে কে ঐ পদের উপযুক্ত, সে সম্বন্ধে আমিই ঠিক কথা বলিতে পারিব। আর সরকারী ইংরেজী কলেজ ও স্কুল থাকার দরুন বিভাগটি আমার হাত দেওয়া যদি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, অন্ততঃ যে-জেলায় মডেল স্কুল আছে— যেমন মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, নদীয়া, সেই জেলাগুলি যেন আমার হাতে দেওয়া হয়; কলেজ ও স্কুলগুলি বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টরের অধীন থাকিলে আর কোন অসুবিধা হইবে না।" (মে, ১৮৫৭)

এই পত্র হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই হ্যালিডে এপ্রিল মাসে লজ সাহেবকে ঐ শূন্যপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহাতে একান্ত নিরাশ হইলেন। তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হয় নাই, তাঁহার পদোন্নতির ন্যায্য দাবী বার বার উপেক্ষিত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। শিক্ষা বিভাগে নূতন ডিরেক্টর—গর্ডন ইয়ং নামক অনভিজ্ঞ যুবক সিবিলিয়ান তাঁহার কাজে উৎসাহের পরিবর্ত্তে নানা বাধা দিয়া আসিতেছেন, এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য ছোট লাট হ্যালিডের মধ্যস্থতায় বিবাদের কতকগুলি কারণ দূরীকৃত হইয়াছিল। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কাজে তাঁহার যে পদোন্নতি হইয়াছে, এক জন কালা কর্ম্মচারীর পক্ষে তাহার অধিক আশা করা বিড়ম্বনা—বিদ্যাসাগরের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিল। তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবিলম্বে অবসর লইবেন স্থির করিলেন, এবং ডিরেক্টরকে জানাইলেন,—

"আপনি তিন মাসের জন্য শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন জানিয়া আমি মনে করিলাম, সরকারী কর্ম্ম হইতে শীঘ্র অবসর গ্রহণ করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা আপনাকে জ্ঞাত করাইবার ইহাই

প্রকৃত সুযোগ। এই সঙ্কল্পের মূলে যে-সকল কারণ আছে, তাহা ব্যক্তিগত—সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সেগুলি বিবৃত করিতে বিরত হইলাম।" (২৯ আগষ্ট ১৮৫৭)

হ্যালিডেও যাহাতে এই সংবাদ জানিতে পারেন, তজ্জন্য বিদ্যাসাগর তাঁহাকেও এই পত্রের এক প্রতিলিপি পাঠাইলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্কল্পের কথা পাঠ করিয়া হ্যালিডে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লিখিলেন,—

"প্রিয় পণ্ডিত, তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমি সত্যসত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। বৃহস্পতিবার আমার সহিত দেখা করিতে আসিবে এবং জানাইবে, কেন তুমি এ সঙ্কল্প করিয়াছ।" (৩১ আগষ্ট)

দক্ষ কর্ম্মচারীরা কাজ ছাড়িয়া দেয়, ইহা হ্যালিডের কাছে কখনই রুচিকর ছিল না। তিনি পণ্ডিতকে হঠাৎ কিছু না করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাসাগরও সম্মত হইলেন। যদিও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না তবুও তিনি আর এক বৎসর ঐ পদে কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাঙিতে সুরু হওয়ায় তিনি ৫ আগষ্ট ১৮৫৮ তারিখে ডিরেক্টরের কাছে কর্ম্মত্যাগ-পত্র পাঠাইলেন,—

"সরকারী কর্ত্তব্যপালনে অবিরত মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহাতে আমার এমন গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে যে, বাংলার ছোট লাট বাহাদুরের নিকট আমার পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিতে বাধ্য হইলাম।

আমি মনে করি, আমার কর্ত্তব্যপালনে যে অবিশ্রান্ত মনোযোগের প্রয়োজন, তাহা আমি আর দিতে পারিব না। আমার বিশ্রামের দরকার। সাধারণের স্বার্থের খাতিরে এবং নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে সেই বিশ্রাম পাইতে পারি।

যে-মুহূর্ত্তে স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইব, আমার ইচ্ছা, তন্মুহূর্ত্ত হইতে আমার সময় এবং চেষ্টা প্রয়োজনীয় বাংলা পুস্তক প্রণয়নে এবং সঙ্কলনে নিয়োগ করিব। স্বদেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার সম্পর্কে সরকারী কর্ম্মের সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে সত্য, তবুও আমার অবশিষ্ট জীবন এই মহৎ এবং পবিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ব্যয়িত হইবে। এ বিষয়ে আমার গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ কেবল আমার জীবনের সহিত অবসান লাভ করিতে পারে।

এরূপ গুরুতর পন্থা অবলম্বন করিবার গৌণ হেতুগুলির মধ্যে দুইটি এই,—ভবিষ্যৎ উন্নতির আর কোন আশা নাই; এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণ বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের পক্ষে যে-সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত আমার সেই ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাব।

প্রথম কারণটির সম্পর্কে কথা এই,—বর্ত্তমান পদের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ অল্প শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিব। অস্বীকার করিতে পারি না, যে-ব্যক্তি এত দিন পর্য্যন্ত আপন পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছাদনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে এরূপ ভাবা অন্যায় নহে। এই পরিশ্রমসাধ্য গুরু কর্ত্তব্যের সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিতে বিলম্ব করিলে ভগ্নস্বাস্থ্যবশে সেরূপ সংস্থান করাও আর চলিবে না।

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য,—আমি মনে করি, সরকারের স্কন্ধে আমার মতামত চাপাইবার অধিকার নাই। তবুও, কর্ম্মের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ নাই—যাঁহাদের চাকুরি করি, তাঁহাদের নিকট হইতে এ সত্য গোপন করিতে চাই না। এ কারণে আমার কর্ম্মকুশলতার অবশ্য হানি হইবে। বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ

সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষে সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কাজ করা এক প্রধান গুণ। এইরূপ সদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ইহা অপেক্ষা অল্পও বলিতে পারি না,—অধিক বলিতেও ইচ্ছুক নই।

আমার ক্ষুদ্রশক্তি অনুযায়ী যত দূর সম্ভব উৎসাহসহকারে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, এই তৃপ্তি হৃদয়ে লইয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতেছি। আশা করি, সরকার চিরদিন আমার প্রতি যে অবিচলিত অনুগ্রহ, বিবেচনা এবং স্নেহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।"

শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ-পত্র অনুমোদন করিয়া, মঞ্জুরীর জন্য সরকারের কাছে পাঠাইলেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন, বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ব্যাপারে ডিরেক্টরের সহিত বিরোধের ফলেই বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। কিন্তু হ্যালিডেকে লিখিত বিদ্যাসাগরের একখানি [illegible]-সরকারী পত্রে প্রকৃত কারণগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর লিখিতেছেন,—

"বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, আমার পদত্যাগ-পত্রের যে-অংশগুলি আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকিয়াছে, সঙ্গতি বা ঔচিত্যের দিক্ দিয়া সে-অংশগুলি আমি উঠাইয়া লইতে পারি না। শারীরিক অসুস্থতা আমার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবেক-ধর্ম্মানুসারে বলিতে গেলে ইহাকে একমাত্র কারণ বলিতে পারি না। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে দীর্ঘ অবসর গ্রহণ করিয়া আমি স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারী চাকুরী করা যে আমার পক্ষে অনেক সময় অপ্রীতিকর এবং অসুবিধা-জনক বোধ হইয়াছে, এবং যে-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া বাংলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, তাহাতে যে অর্থের অপব্যয় হইতেছে

মাত্র—এ সব কথা আপনাকে বহু বার বলিয়াছি। আপনি জানেন, আমি অনেক সময় কাজে বাধা পাইয়াছি। এ ছাড়া, দেখিয়াছি পদোন্নতির আর কোন আশা নাই; কারণ, আমার ন্যায্য দাবি একাধিক বার উপেক্ষিত হইয়াছে। অতএব আমি আশা করি, আপনি স্বীকার করিবেন, আমার অভিযোগের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।" (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮)

ডিরেক্টরের অনুমোদন গ্রাহ্য করিয়া বাংলা-সরকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—

"পণ্ডিত মহাশয় যে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্টভাবে অবসর গ্রহণ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন, ইহা দুঃখের বিষয়,—বিশেষতঃ তাঁহার যখন অসন্তোষের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যাহা হউক, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে জানাইবেন যে, দেশবাসীর শিক্ষাবিস্তারকল্পে তিনি দীর্ঘকাল উৎসাহের সঙ্গে যে-কাজ করিয়াছেন, তজ্জন্য সরকার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।" (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮)

স্বাস্থ্যের অবনতি কর্ম্মত্যাগের একটি কারণ বটে, কিন্তু পদোন্নতি সম্পর্কে আশাভঙ্গ এবং উপরিতন কর্ম্মচারীর সহিত মতবিরোধই যে বিদ্যাসাগরকে সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহা উপরের চিঠিগুলি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ছোট লাট হ্যালিডে তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত সদয় ও ভদ্রব্যবহার করিতেন সত্য, কিন্তু যাঁহার অধীনতায় পণ্ডিতকে প্রতি দিন কাজ করিতে হইত, সেই সাক্ষাৎ উপরিতন কর্ম্মচারী—শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের প্রতিবন্ধকতাচরণ এবং অনাত্মীয় ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের পক্ষে আর কাজ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং "পণ্ডিত কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্টভাবে অবসর গ্রহণ করিলেন" বাংলা-সরকারের এই মন্তব্য

অযথার্থ। বিদ্যাসাগরের চাকুরীর কাল দশ বৎসরের অধিক নহে; এত অল্প দিনের সরকারী কাজে আংশিক পেনশনেরও অধিকারী হওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তাঁহার সম্পাদিত কর্ম্মের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে এককালীন কিছু টাকা দান করিলেই সরকারের পক্ষে শোভন হইত।

৩ নবেম্বর ১৮৫৮ তারিখে বিদ্যাসাগর নূতন অধ্যক্ষ ই. বি. কাওয়েলকে সংস্কৃত কলেজের কাজ বুঝাইয়া দিলেন।

ইহার কিছু দিন পরেই বিদ্যাসাগর বোর্ড-অফ-একজামিনার্সের সদস্য-পদ ত্যাগ করিলেন (মে, ১৮৬০)। ইহার কারণ তিনি ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎ-আলাপে বিবৃত করিয়াছিলেন।

সরকারের বে-সরকারী পরামর্শদাতা

সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও বে-সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে বিদ্যাসাগর সরকারের বহু উপকার সাধন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার যখনই তাঁহার পরামর্শ চাহিয়াছেন, তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা দান করিয়াছেন। স্বল্প-পরিসর পুস্তকে সে-সকল বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ সম্ভব নয়। এখানে কেবল সংক্ষেপে দুই-চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল মাত্র।

সংস্কৃত কলেজ : বিদ্যাসাগরের অবসরগ্রহণের অল্প দিন পরেই শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সংক্রান্ত এক প্রস্তাব এবং উড্রো, রোয়ার ও সংস্কৃত কলেজের নূতন অধ্যক্ষ—কাওয়েল সাহেবের তদ্বিষয়ক মন্তব্যগুলি বাংলা-সরকারের কাছে পেশ করেন।

এ বিষয়ে ছোট লাট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাহিলে উত্তরে পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন,—

"...কাওয়েল সাহেব কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত মেলে না। আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। স্মৃতি সম্বন্ধে যে-সকল পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত আছে, সেগুলির সাহায্যে শুধু উত্তরাধিকার, পোষ্যপুত্রগ্রহণ প্রভৃতি দেওয়ানী আইন শেখান হয়। এই সকল বিষয় অধিগত করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন, অতএব এ-সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে প্রচলিত দর্শনসমূহের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম। ইহা অধ্যাত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়। কলেজে ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা আমি মনে করি না। এই দুইটি বিষয় এখন যে-ভাবে শিখান হয়, তাহাতে ধর্ম্মগত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আমার বিনীত মত এই, এ-সকলের অধ্যাপনা বন্ধ করিলে কলেজের পাঠ্য-বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।..." (১৭ এপ্রিল ১৮৫৯)

গণশিক্ষা: জনসাধারণের জন্য অল্প খরচার বিদ্যালয়ের কিরূপ ব্যবস্থা করা যায়, সেই বিষয়ে এবং সাধারণভাবে বাংলা-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিসাধনের উপায় সম্বন্ধে ভারত-সরকার বাংলার ছোট লাট গ্র্যাণ্ট সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। নিজের মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ছোট লাট শুধু শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারীদের নহে, গ্রাম্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে অথবা কৃষকের কল্যাণসাধনে যাঁহারা সচেষ্ট, এরূপ কয়েক জন ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকের বক্তব্য জানিতে চাহিলেন। ইহার মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক জন।

বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে ছোট লাটকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"বিলাতে এবং এদেশে এমনই একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করা হইয়াছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মন ফিরাইতে হইবে। শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্ট ও মিনিটগুলি অত্যন্ত অনুকূল ভাবের হওয়ায় বুঝা যাইতেছে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে ভিন্ন অবস্থার কথা প্রকাশ পাইবে।

"একমাত্র কার্য্যকর উপায় না হইলেও বঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারের শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ সরকার, আমার মতে, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে নিজেকে বদ্ধ রাখিবেন। এক শত বালককে লিখন-পঠন এবং কিছু অঙ্ক শিখান অপেক্ষা একটিমাত্র ছেলেকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে প্রজাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাপ্রচারে সরকার অধিকতর সহায়তা করিবেন। সমস্ত দেশটাকে শিক্ষিত করিয়া তোলা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কোন রাজসরকার এরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অথবা সাধন করিতে পারে কি না সন্দেহ। বলা যাইতে পারে, বিলাতে সভ্যতার অবস্থা অতি উন্নত হইলেও শিক্ষা-বিষয়ে তথাকার জনসাধারণের অবস্থা তাহাদের এদেশের ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা কোন প্রকারে ভাল নয়।" (২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯)

ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন: সাক্ষাৎভাবে এক জন বিশ্বস্ত সরকারী কর্ম্মচারীর পরিচালনায় ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের নাবালক জমিদারদিগকে একটি স্বতন্ত্র বাটীতে একত্র রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন

খোলা হয়। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মাসিক তিন শত টাকা বেতনে ইহার পরিচালক নিযুক্ত হন।

কিছু দিন পরে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য চারি জন পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা প্রত্যেকেই বৎসরে তিন মাস করিয়া পরিদর্শন করিবেন স্থির হয়। এই পরিদর্শকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর হইতে বিদ্যাসাগর পরিদর্শন আরম্ভ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি সরকারের নিকট যে বিবরণী দাখিল করেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি যাহাই হোক না, নাবালকদের শিক্ষায় দৈহিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই শাস্তি অনিষ্টকর পরিণামের জন্য সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই বর্জ্জিত হইয়াছে। বেত্র-ব্যবহার না করিয়াও সেই সকল প্রাতষ্ঠানে শত শত ছাত্র পরিচালিত হইতেছে। ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনে ইহার প্রয়োজন কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। আমার মতে এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নাবালক জমিদারদের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার মোটেই শোভন নয়। বালকদের শিক্ষাদান-কার্য্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দৈহিক শাস্তি পরিণামে অশুভজনক; ইহাতে শাস্তিপ্রাপ্ত বালক না শোধরাইয়া বরং নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করিতেছি, এই নিয়ম যেন অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া হয়।" (১১ জানুয়ারি ১৮৬৫)

ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন সম্বন্ধে তাঁহার আর একটি রিপোর্ট হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের উদ্দেশ্য—নাবালক জমিদারদের যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করা এবং তাহাদিগকে সমাজের সুযোগ্য সভ্য

এবং সৎ জমিদাররূপে গড়িয়া তোলা। কিন্তু এখানে তাহারা যে শিক্ষা পায়, তাহা শিক্ষা-নামের অযোগ্য, এবং পল্লীসম্পর্কে প্রায় কিছুই না শিখিয়া কেবল অল্পস্বল্প ইংরেজীর জ্ঞান লইয়া সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠান হইতে বিদায় গ্রহণ করে।…

এখানে শিক্ষিত কতকগুলি যুবকের পরবর্ত্তী নিন্দনীয় জীবন প্রতিষ্ঠানটির অখ্যাতির কারণ হইয়াছে। আমি মনে করি, ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন হইতে নিষ্ক্রান্ত ছাত্রদের সহিত অন্য তরুণ জমিদারের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, শেষোক্ত তরুণরাই ভাল।…" (১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫)

পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটি: ১১ জুলাই ১৮৭৩ তারিখে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিনসন সাহেব ইংরেজী ও বাংলা স্কুলপাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটির সভ্য হইবার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করিলে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"দুইটি কারণে আমি এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি গ্রন্থকার, অতএব কমিটির ব্যবস্থার সহিত আমার স্বার্থ সাক্ষাৎভাবে জড়িত। সেই হেতু আমার বিবেচনায় কমিটির আলোচনায় পক্ষ গ্রহণ করা উচিত হইবে না। তা ছাড়া, আমি মনে করি, আমার উপস্থিতি আমার গ্রন্থগুলির দোষগুণের অপক্ষপাত স্বাধীন আলোচনার অন্তরায় হইবে।"

সহবাস-সম্মতি-আইন: সামাজিক বিষয়েও সরকার সময়ে সময়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ লইতেন। সহবাস-সম্মতি-আইন বিল কাউন্সিলে উপস্থাপিত করিবার প্রাক্কালে, সরকারের অনুরোধে বিদ্যাসাগর যে অভিমত দিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Though on these grounds I cannot support the Bill as it is. I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to childwives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, mare real, and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance.

* * * *

From every point of view, therefore, the most reasonable course appears to me, to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has her first menses...(16 Feby. 1891).

স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে

বিদ্যাসাগরের সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ দেশ ও দশের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর হইয়াছিল। তাঁহার একটা মোটা রকমের আয় কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না—তাঁহার স্বরচিত পুস্তক বিক্রয়ের আয়ই তখন মাসিক তিন-চার হাজার টাকা।* তিনি এইবার স্বাধীনভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইলেন।

---

* ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে, সংস্কৃত প্রেস স্থাপন করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীও চালাইতে থাকেন। সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত সকল পুস্তক বিক্রয়ের জন্য ডিপজিটারীতে মজুত থাকিত। দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ায় ব্যবসায়টি রীতিমত লাভজনক হইয়াছিল।

মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন ঃ মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠা তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইহাই বাঙালীর নিজের চেষ্টায় নিজের অধীনে স্থাপিত উচ্চতর শিক্ষার প্রথম কলেজ। মেট্রোপলিটানের নাম এখন বিদ্যাসাগর কলেজ হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার নাম মেট্রোপলিটান ছিল না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক জন প্রতিষ্ঠাপঃ লোক মিলিয়া শঙ্কর ঘোষের লেনে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে এক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সরকারী স্কুল অপেক্ষা অল্প বেতনে মধ্যবিত্ত ঘরের হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী শিক্ষা দান করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। মিশনরীদের স্কুলে মাহিনা কম ছিল বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইত বলিয়া হিন্দুরা সেখানে ছেলেদের পাঠাইতে চাহিত না। প্রথম কয়েক মাস প্রতিষ্ঠাতারাই স্কুল পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহারা বিদ্যাসাগরকে ও তাঁহার বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল-পরিচালনে সহায়তা করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা স্বীকৃত হইলে এক পরিচালক-সমিতি গঠিত হইল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্য্যন্ত স্কুলটি এই সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। পরিচালকবর্গের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় এই বৎসরে দুই জন প্রতিষ্ঠাতা পদত্যাগ করিয়া এক প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

শিক্ষাপ্রচার এবং বিদ্যালয়-পরিচালনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অসাধারণ। তা ছাড়া তিনি নিঃস্বার্থভাবে সাধারণের কার্য্য করিতেন। ইহা বুঝিয়াই অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাসাগর এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর ও হীরালাল শীলের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনের ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। নূতন কমিটি গঠিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেক্রেটরী

নিযুক্ত হইলেন। স্কুলের নানরূপ সংস্কারে হাত দিয়া বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিলেন। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য—হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সম্যক্‌রূপে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া হইতে বিদ্যালয়টির নূতন নাম হয়—হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন। ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচালনার গুণে ছাত্রগণ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ (ইং ১৮৬৬) এবং হরচন্দ্র ঘোষের (১৮৬৮) মৃত্যুতে এবং তৎপূর্ব্বে অপর তিন জন সদস্যের পদত্যাগে বিদ্যালয় পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার বিদ্যাসাগরের উপর পড়িল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালকে লইয়া তিনি এক কমিটি গঠন করিলেন এবং বিদ্যালয়ে যাহাতে বি. এ. পর্য্যন্ত পড়া যায়, তদ্বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিলেন। বি. এ. পড়াইবার অধিকার না পাইলেও ইহাতে ফার্স্ট আর্টস্ পর্য্যন্ত পড়িতে পারা যাইবে, ইহা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর করিলেন।* ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায়

---

* "এত দিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনটি কলেজে পরিণত হইল। আপাতত উহাতে এল, এ, কোর্স পর্য্যন্ত পড়ান হইবে। গবর্ণমেণ্ট উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিয়া লইতে স্বীকার করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর হইল, এইরূপ একখানি আবেদন করা হয় কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তখন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। দেশীয়দিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল।...আগামী জানুয়ারীর প্রথমেই কলেজটি খোলা হইবে। এল. এ, ক্লাসে আপাতত পাঁচ টাকা বেতন লওয়া হইবে। কলিকাতার মধ্যে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনটি একটি প্রধান স্কুল সুতরাং কলেজ হইলে যে উহা উত্তমরূপ চলিবে তাহা বিলক্ষণ রূপে আশা করা যাইতে পারে।"—'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২।

মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। দেশীয় লোকের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সাট্‌ক্লিফ সাহেব বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত তাক লাগাইয়া দিয়াছেন!" ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান ফার্স্ট গ্রেড কলেজে পরিণত হইল, এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতে ছাত্রেরা বি. এ. পরীক্ষা দিতে প্রেরিত হইল। পরীক্ষার ফল ভালই হইল।

ইউরোপীয় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কোন কলেজ যে ভাল চলিতে পারে অথবা অধ্যাপনা ভাল হইতে পারে, ইহা লোকের ধারণার অতীত ছিল। বিদ্যাসাগর নিজের কলেজে ভারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দেখাইলেন, কলেজের অধ্যাপনায় বিলাতী অধ্যাপকেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়, ভারতীয় শিক্ষকের দ্বারা অনুরূপ, এমন কি, কোন কোন বিষয়ে উৎকৃষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। মেট্রোপলিটানের সাফল্য দেখিয়া অন্যান্য কলেজ হইতে অনেক ছাত্র এই কলেজে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা বিস্তারের এক নূতন দিক্ খুলিয়া দিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, বে-সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার তিনিই প্রবর্ত্তক। তিনি যখন যে-কাজে হাত দিতেন, সে-কাজ সার্থক না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তা ছাড়া, শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল। সারা বাংলার শিক্ষা-বিস্তারে যে-প্রতিভা নিযুক্ত ছিল, তাহা একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে সেই প্রতিষ্ঠান অতুলনীয় সফলতা লাভ করিল।

বিদ্যাসাগরের আর একটি বড় গুণ ছিল। তিনি পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন না, সকল কাজ নিজে দেখিতেন। তিনি অনেক সময় বিদ্যালয়ে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিতেন, নিয়ম-মত

কাজ চলিতেছে কি-না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশ ছিল, শিক্ষকেরা কখনও বালকদের উপর শারীরিক শাস্তি বিধান করিতে পারিবেন না। তিনি বলিতেন, শান্ত সদয় ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের দোষ সংশোধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। যাহাকে সংশোধনের অতীত বলিয়া বোধ হইত, তেমন ছাত্রকে তিনি বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিতেন।

ভারত-সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বাক্‌লাণ্ড সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

> "১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এক সুপরিচিত ঘটনা। এই ধরণের পরবর্ত্তী বহু বিদ্যালয়ের ইহা আদর্শস্থানীয়। মেট্রোপলিটান কলেজের সংশ্লিষ্ট স্কুলে আট শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত; এতদ্ব্যতীত কলিকাতাতেই এই বিদ্যালয়ের চার-পাঁচটি শাখা বিদ্যমান ছিল।"

যে জমির উপর এখন কলেজটি অবস্থিত, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহা কেনা হয়। সুবৃহৎ বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া হইতেই এখানে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়।

হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ড ঃ প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরেরই প্রাণপণ চেষ্টায়, ১৫ জুন ১৮৭২ তারিখে কলিকাতায় একটি হিতকর প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়; ইহা হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ড। আয় অল্প বলিয়াই সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ মৃত্যুকালে স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গের কোনরূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারে না। যাহাতে এরূপ অবস্থার উদ্ভব না হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। ইহার ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও নরেন্দ্রনাথ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত বিদ্যাসাগর তিন বৎসর—১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার কর্ম্মপরিচালনায় কতকগুলি বিশৃঙ্খলা ঘটায় বিদ্যাসাগর আর নিজেকে ইহার সহিত যুক্ত রাখিতে চাহেন নাই। ২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৫ তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন :—

"কলিকাতা হিন্দু ফ্যামিলী এনিউটী ফণ্ড নামক যে একটি আফিস খোলা হইয়াছিল উহা পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও হাইকোর্টের জজ বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং অন্যান্য কয়েক জন প্রধান লোক ইহার সঙ্গে সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ তারিখে তিনি ডিরেক্টরদের যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষের বঙ্গানুবাদ দিতেছি :—

"এই ফণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে আমি আমার সমস্ত মনোযোগ ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছিলাম। এই বৃক্ষের ফল উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া আপনারা আশান্বিত, কিন্তু আমি এইরূপ কোন আশা পোষণ করি না। আমার ধারণা, প্রত্যেকেই স্বদেশের মঙ্গল সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এ বিষয়ে আমার সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা নিয়োগ করি। নিজের স্বার্থসাধন আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এই ফণ্ড সম্পর্কে আমার প্রীতি আপনাদের সকলের অপেক্ষা অধিক, এই কথা যখন বলি—এবং এ কথা আমাকে বলিতেই হইবে—তখন সে-কথা আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি-না জানি না। সম্পূর্ণরূপে সেই প্রীতি বিস্মৃত হওয়ার কত দুঃখ, তাহা আমার অন্তরের অন্তস্তলই জানে। যাঁহাদের আপনারা পরিচালন-

কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না। এই ফণ্ডের সহিত আর সংযুক্ত থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই ফণ্ডের সহিত আমার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতেছি।"

দয়া-দাক্ষিণ্য

দরিদ্র এবং আর্ত্তের সহায়, দয়ালু দাতা এবং জনহিতৈষিরূপে বিদ্যাসাগরের তুলনা নাই। এই মহদ্‌গুণের জন্য আজ তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। কাহাকেও বিপন্ন দেখিলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত এবং লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। আজও তিনি দেশবাসীর নিকট "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" নামে পরিচিত। দুঃস্থ এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করিতে তাঁহার আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত। তাঁহার সাহায্যেই বহু দরিদ্র বিধবার সংসার চলিত। শত শত অনাথ বালকের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার তিনি নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে গৃহে তাঁহার নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হইত। ধনি-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। শুধু বন্ধু এবং সহকর্ম্মীরাই নয়, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার সাহস ছিল অতুলনীয় এবং দাক্ষিণ্য অপূর্ব্ব। অথচ তিনি নিজে নিতান্ত সরল জীবন যাপন করিতেন। এই তেজস্বী দানবীর সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে বড় বড় জমিদারের মাথা আপনি নত হইয়া পড়িত।

নামক যে-পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা [illegible]ত হয় নাই। ঐ রচনার যেটুকু আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে [illegible]তে পারা যায়, বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন. ভাষার শিল্পরূপ তখনও তিনি ধরিতে পারেন নাই। সিবিলিয়ান সাহেবদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে বসিয়া তিনি বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা নিশ্চয়ই মনে মনে পুলক বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে 'উপক্রমণিকা,' 'ঋজুপাঠে'র পথেই তাঁহার গতি দীর্ঘপ্রসারী হইত, 'শকুন্তলা,' 'সীতার বনবাস'কে ভিত্তি করিয়া বাংলা-সাহিত্য আজ এমন বিরাট্ সৌধের গর্ব্ব করিতে পারিত না।

উদারহৃদয় ঈশ্বরচন্দ্র নিজের প্রতিভাগুণে শিল্পিজনসুলভ সৃষ্টির আনন্দে মত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। বাংলা দেশের অসহায় শিশু ও বালক-বালিকাদের কথা স্মরণ করিয়া আপন শিল্পপ্রতিভাকে দমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য 'বর্ণপরিচয়,' 'বোধোদয়,' 'কথামালা,' 'উপাখ্যানমঞ্জরী'রূপ চিরস্থায়ী খেলনা সৃষ্টি করিয়া নিজের বৃহত্তর শিল্পসৃষ্টিকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রতিভা বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া আমরা সাক্ষ্য-স্বরূপ খুব উচ্চ ধরণের কোনও সৃষ্টিকে বিচারকের সম্মুখে দাখিল করিতে পারি না বটে, কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, গোটা বাংলা ভাষাটাই তাঁহার প্রতিভার সাক্ষ্যস্বরূপ দীর্ঘকালের জন্য রহিয়া গেল।

আর একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। যাঁহারা মনে করেন, বিদ্যাসাগরের লেখনী অনুবাদের পথেই স্ফূর্ত্ত হইয়াছে,—তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা নাই, তাঁহারা তাঁহার রচিত মৌলিক রচনাগুলির সহিত পরিচিত নহেন। তাঁহার 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব,' 'বিধবাবিবাহ,' 'বহুবিবাহ,' 'আত্মচরিত' এবং বেনামী রচনাগুলি পাঠ

করিলে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। তাঁহার ভাষা স্থির হইয়া থাকে নাই, উত্তরোত্তর প্রাঞ্জল এবং শিল্পগুণসম্পন্ন হইয়াছে। ভাষা-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও গতানুগতিক ও প্রাচীনপন্থী ছিলেন না; বরং এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে। সময় ও শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুবিধা পাইলেই ভাষার পরিবর্ত্তন ও মার্জ্জনা সাধন করিতেন। বাংলা-গদ্যের ছন্দ সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের যশোবিস্তারের পূর্ব্বে সাহিত্যিক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

> "প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটী স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটীর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটীর নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।...এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" ("বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান")

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বাংলা-সাহিত্যের সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিদ্যাসাগর-চরিতে' অননুকরণীয় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্মের মর্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা, সতত জাতিভ্রংশকর, ধর্মলোপকর কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ সতত সৎকর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এককালে সকল ধর্ম লোপ হইয়া যায়।...

হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না।...

…তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না! ('বিধবাবিবাহ, ২য় পুস্তক')।

সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রাম-সুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশ-পথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম

যদি আপনারা বলেন, তুমি কে হে বাপু; তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা কেন। তুমি, বামন হয়ে, আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও। তোমার এমন কি ক্ষমতা, যে তুমি বিশ্ববিজয়ী দিগ্‌গজ পণ্ডিতের গুণ বর্ণন করিবে। আমার উত্তর এই, সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, সহসা আমায় হেয়জ্ঞান করিবেন না। আমি এক জন; যথার্থ কথা বলিতে গেলে, আমি নিতান্ত যেমন তেমন এক জন নই। আমার পরিচয় শুনিলে, আপনারা চমকিয়া উঠিবেন, সে বিষয়ে এক কড়ারও সংশয় নাই। 'বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও,' এ কথাটি, বোধ হয়, আপনারা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন। আমি কিন্তু, ঠাট্টা না ভাবিয়া, শ্লাঘা জ্ঞান করিতেছি। আমাদের বংশমর্য্যাদা অতি বেয়াড়া। বামন বংশের আদিপুরুষ ভারতবর্ষের পঞ্চম অবতার। তিনি, ত্রিলোকবিজয়ী বলি রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, কি ফেসাৎ, কি কারখানা, করিয়াছিলেন, তাহা কি কখনও আপনাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া
কুছ না রহে তব ভি থোড়া।

যদিও, যুগমাহাত্ম্যে, আদিপুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের না থাকে, কিছু ত থাকিবে। তিনি এক পদে সমস্ত আকাশমণ্ডল আক্রমণ করিয়াছিলেন; আমরা কি, তাঁহার বংশের তিলক হইয়া আকাশমণ্ডলের এক অংশেও হাত বাড়াইতে পারিব না। অবশ্য পারিব। আর, ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, আমি যাঁহাকে ধরিতে চাহিতেছি, তিনি আকাশের চাঁদ নহেন, নদিয়ার চাঁদ। নদিয়ার চাঁদকে ধরিতে যাওয়া, আমার মত বেহুদা বাহাদুরের পক্ষে, নিতান্ত অসংসাহসিকের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। ('ব্রজবিলাস')

ছাগলের বুদ্ধি।—এক ওয়েল্‌স্‌দেশীয় ভদ্রসন্তান ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া, সুরাপানে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রতি দিন সময় বিশেষে শুঁড়ীর দোকানে গিয়া, বিলক্ষণ সুরাপান করিয়া আসিতেন।

এই ব্যক্তি একটি ছাগল পুষিয়াছিলেন। ছাগলটি, ক্রমে ক্রমে, তাঁহার অতিশয় অনুগত হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। সুরাপানের জন্যে, যখন তিনি শুঁড়ীর দোকানে যাইতেন, সে সময়েও ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। যখন তিনি সুরা লইতেন এবং সুরা লইয়া পান করিতেন, সে সময়ে সে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। ফলতঃ, ছাগলটি এক দিনের জন্যেও তাঁহার কাছ ছাড়া হইত না।

এক দিন তিনি কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া ছাগলটির সম্মুখে ধরিলে, ছাগলটি আগ্রহ সহকারে পান করিল। সে অন্যান্য দিন যেরূপ স্বচ্ছন্দে আহার বিহার প্রভৃতি করিত, সুরাপান নিবন্ধন নেশায় অভিভূত হইয়া, সে দিন সেরূপ করিতে পারিল না।

পরদিন যখন তিনি সুরাপান করিতে যান, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে গেল। কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে দোকানের ভিতরে না গিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই দোকানের ভিতরে গেল না। অনন্তর তিনি নিজে পান করিয়া ছাগলকে পান করাইবার জন্য, কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র, সে কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিছুতেই ছাগলকে সুরাপান করাইতে পারিলেন না।

এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ছাগল একবার মাত্র সুরাপান করিয়া, সুরাপানে

কত অসুখ ও কত অনিষ্ট হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তজ্জন্য এত পীড়াপীড়িতেও কোনও মতে আর সুরাপানে সম্মত হইতেছে না। আমি সুরাপানের দোষ বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ সুরাপানে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। অতএব বুদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে আমি পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, প্রাণান্ত ঘটে, তাহাও স্বীকার, তথাপি আর কদাচ সুরাপান করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই দিন অবধি তিনি সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। ('সখা,' জানুয়ারি ১৮৯৪)*

গ্রন্থপঞ্জী : বিদ্যাসাগরের রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে দুই-চারিখানির কথা বাদ দিলে বাকী সমস্তই অনুবাদ, অনুসৃতি বা পাঠ্য পুস্তক। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, তখনকার দিনে এরূপ উত্তম পাঠ্য পুস্তকের বিলক্ষণ অভাব ছিল।

নিম্নে যে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হইল, তাহাতে পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকালেরই উল্লেখ করা হইয়াছে; বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকেরই অনেকগুলি করিয়া সংস্করণ হইয়াছিল। ভাষা সম্বন্ধে প্রগতিশীল ছিলেন বলিয়া তিনি প্রত্যেক সংস্করণেই কিছু-না-কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন।

---

* ১৩১৬ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'মুকুলে' "ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস," 'সখা,' এপ্রিল ১৮৯৩ "মাতৃভক্তি" (হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সহ) ও ১৩১৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ধ্রুব'তে "আমেরিকার আদিম নিবাসীর ন্যায়পরতা" নামে বিদ্যাসাগরের তিনটি শিশুপাঠ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

(ক) রচিত ও সঙ্কলিত

১। **বেতাল পঞ্চবিংশতি।** ১৯০৩ সংবৎ, ইং ১৮৪৭। পৃ. ১৬৩।

বেতালপঞ্চবিংশতি। কালেজ্ আফ্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর জি. টি. মার্শাল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত কলিকাতা শ্রীযুত পি. এস. ডি. রোজারিও কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত সংবৎ ১৯০৩।

২। **বাঙ্গালার ইতিহাস,** ২য় ভাগ। ইং ১৮৪৮।

৩। **জীবনচরিত।** সেপ্টেম্বর ১৮৪৯।

৪। **বোধোদয়।** (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ)। এপ্রিল ১৮৫১।

৫। **সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা।** নবেম্বর ১৮৫১।

৬। **ঋজুপাঠ,** ১ম ভাগ। নবেম্বর ১৮৫১।
২য় ভাগ। মার্চ ১৮৫২।
৩য় ভাগ। ডিসেম্বর ১৮৫১।

৭। **সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব।** মার্চ ১৮৫৩।

৮। **ব্যাকরণ কৌমুদী,** ১ম ভাগ। ইং ১৮৫৩।
২য় ভাগ। ইং ১৮৫৩।
৩য় ভাগ। ইং ১৮৫৪।
৪র্থ ভাগ। ইং ১৮৬২।

৯। **শকুন্তলা।** ডিসেম্বর ১৮৫৪।

১০। **বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব**। জানুয়ারি ১৮৫৫।

১১। **বর্ণপরিচয়,** ১ম ভাগ। এপ্রিল ১৮৫৫।
২য় ভাগ। জুন ১৮৫৫।

১২। **বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব**। দ্বিতীয় পুস্তক।* অক্টোবর ১৮৫৫।

১৩। **কথামালা**। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬।

১৪। **চরিতাবলী**। জুলাই ১৮৫৬।

১৫। **মহাভারত** (উপক্রমণিকাভাগ)। জানুয়ারি ১৮৬০।

১৬। **সীতার বনবাস**। এপ্রিল ১৮৬০।†

১৭। **আখ্যানমঞ্জরী**। নবেম্বর ১৮৬৩।

---

* ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' পুস্তক দুইখানির ইংরেজী অনুবাদ *Marriage of Hindu Widows* নামে প্রকাশ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইহা বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী কর্তৃক মরাঠীতেও অনূদিত হয়।

† ২য়-৪র্থ সংস্করণের পুস্তকে "প্রথম বারের বিজ্ঞাপন"-এর শেষে [illegible] সংবৎ ১ বৈশাখ —এই তারিখ আছে; কিন্তু শেষের কতকগুলি সংস্করণে "১৯১৮ সংবৎ, ১ বৈশাখ" মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম তারিখটিই ঠিক। ২১ মে ১৮৬০ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন:—"শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস নামে একখানি নূতন গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।..."

ইহার মাত্র ছয়টি আখ্যান লইয়া এবং কতকগুলি নূতন আখ্যান দিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী, প্রথম ভাগ,' এবং প্রথম বারের বাকী আখ্যান-গুলির সহিত সাতটি নূতন আখ্যান যোগ করিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ' ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রচারিত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ' নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক।"

১৮। **শব্দমঞ্জরী** (বাঙ্গলা অভিধান)। ইং ১৮৬৪।*

১৯। **ভ্রান্তিবিলাস।** (১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৯)।
শেক্সপীয়রের *Commedy of Errors* অবলম্বনে।

২০। **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার।** (১০ আগস্ট ১৮৭১)।

২১। **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার।** দ্বিতীয় পুস্তক। (১ এপ্রিল ১৮৭৩)।

২২। **নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস।** এপ্রিল ১৮৮৮।

২৩। **পদ্যসংগ্রহ।** প্রথম ভাগ। ইং ১৮৮৮ (২ জুলাই)।
দ্বিতীয় ভাগ। ইং ১৮৯০।

২৪। **সংস্কৃত রচনা।** নবেম্বর ১৮৮৯।

* Cat. of Bengali Books used in the Schools or found in the Libraries of Vernacular Institutions in Bengal. Compiled by the School Book Committee (1875), p. 32.

২৫। **শ্লোকমঞ্জরী** (উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ)। মে ১৮৯০।

২৬। **বিদ্যাসাগর চরিত** (স্বরচিত)। সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

২৭। **ভূগোলখগোলবর্ণনম্**। এপ্রিল ১৮৯২।

(খ) বেনামী রচনা

বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলায় চারিখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এগুলি প্রচারিত হইবার পর হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিত-মহল হইতে অনেকে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিবাদের উত্তরে বেনামীতে কয়েকখানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল এবং সেগুলির রচয়িতা যে বিদ্যাসাগর স্বয়ং, এরূপ প্রসিদ্ধিও চলিয়া আসিতেছে। পুস্তকগুলি:—

১। **অতি অল্প হইল**। (৫ মে ১৮৭৩)।

২। **আবার অতি অল্প হইল**। (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩)।

৩। **ব্রজবিলাস**। (৩ নবেম্বর ১৮৮৪)।

৪। **বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা**। (১১ নবেম্বর ১৮৮৪)। ২য় সংস্করণে ইহার নামকরণ হয় 'বিনয় পত্রিকা'।

৫। **রত্নপরীক্ষা**। (১৯ আগস্ট ১৮৮৬)।

ইহার প্রথম তিনখানি "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" চতুর্থখানি "কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ" এবং পঞ্চমখানি "কস্যচিৎ উপযুক্ত-ভাইপোসহচরস্য" প্রণীত। অন্তর্লীন প্রমাণের সাহায্যে এই বেনামী পুস্তকগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত মনে করা অসঙ্গত নহে।

পুস্তকগুলি তাঁহার "সংস্কৃত যন্ত্রে" মুদ্রিত, এবং বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে তিনিই এগুলির স্বত্বাধিকারী। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত দুই জন সমসাময়িক ব্যক্তির* স্মৃতিকথাতেও এই বেনামী পুস্তকগুলির রচয়িতা হিসাবে তাঁহার নামের উল্লেখ আছে।

আচার্য্য কৃষ্ণকমলের মতে, "'ব্রজবিলাস,' 'রত্নপরীক্ষা,' 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই সকল গ্রন্থে যে সকল হাসি-তামাসার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। এই রসিকতা সে কালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মত গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে; ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য; এবং পিতা পুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই।"

(গ) সম্পাদিত

১। **অন্নদামঙ্গল,** ১ম ও ২য় খণ্ড। ইং ১৮৪৭।

"কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত"।

২। **বৈতাল পচ্চীসী** (হিন্দী)। জানুয়ারি ১৮৫২।

৩। **রঘুবংশম্‌**। জুন ১৮৫৩।

৪। **কিরাতার্জ্জুনীয়ম্‌**। ইং ১৮৫৩।

৫। **সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ**। ইং ১৮৫৩-৫৮।

৬। **শিশুপালবধ**। ইং ১৮৫৭।

* কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২১৩-১৪); হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ,' ভূমিকা, পৃ. ৬)।

৭। **কুমারসম্ভব।** ইং ১৮৬১।

৮। **কাদম্বরী।** ইং ১৮৬২।

৯। **মেঘদূতম্।** এপ্রিল ১৮৬৯।

১০। **উত্তরচরিতম্।** (১০ নবেম্বর ১৮৭০)।

১১। **অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।** জুন ১৮৭১।

১২। **হর্ষচরিতম্।** ইং ১৮৮৩ (২১ মার্চ)।

(ঘ) গ্রন্থাবলী

১৩৪৪-৪৬ সালে মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতি বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনাবলী 'সাহিত্য,' 'সমাজ,' ও 'শিক্ষা ও বিবিধ'—এই তিন খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, তথ্যবহুল ভূমিকা সহ, 'শকুন্তলা' (অগ্রহায়ণ ১৩৫২) ও 'সীতার বনবাসে'র (আশ্বিন ১৩৫৫) প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

চারিত্রিক বিশেষত্ব

বিদ্যাসাগরকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে শুধু এক দিক্ দিয়া দেখিলে চলিবে না, সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে। "দয়ার সাগর" বিদ্যাসাগরের করুণার কথা সকলেই জানেন। ওলাউঠা রোগে মুমূর্ষু রোগী পথে পড়িয়া আছে, বিদ্যাসাগর তাহাকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়াছেন,

অপরিচিতের দুঃখে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন, বহু অনাথা বিধবার প্রতিপালনে এবং অসংখ্য দরিদ্র ছাত্রের বই, কাপড় ও মাহিনা যোগাইতে মাসে মাসে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন,—এইরূপ বহু কথা সকল জীবনীকারই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল কাহিনী হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণ যে কত বড়, তাহা জানিতে পারি। ফরাসী দেশ হইতে কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কবি মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে বলিতেছেন, "যাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি, প্রাচীন ঋষির জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্ম্মশক্তি, এবং বাঙালী মায়ের হৃদয় দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব গঠিত।"* সত্যই বিদ্যাসাগরের হৃদয় বাঙালী মায়ের মতই কোমল ছিল। তিনি কাহারও কষ্ট, কাহারও ব্যথা দেখিতে পারিতেন না, তখনই তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। তাই বিধবার অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণার প্রতিকারকল্পে তিনি নিজের সকল শক্তি, সকল জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছিলেন। করুণ এবং উদারহৃদয় জনহিতৈষী ও সমাজসংস্কাররূপে ঈশ্বরচন্দ্র সকলের নিকটই সুপরিচিত। এই দিক্ দিয়া বিদ্যাসাগরের মহৎ জীবনের যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে, আমরা সে-সম্বন্ধে বেশী কথা বলি নাই। শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব কতটা এবং গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনে তিনি কিরূপ শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কথাই আমরা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি, এবং এ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে-সকল সরকারী এবং বে-সরকারী চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারও পূর্ণ বিবরণ দিয়াছি।

* "The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy af an Englishman, and the heart of a Bengali mother."

এই সকল চিঠিপত্রের মধ্যে আমরা বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বিদ্যাসাগর-চরিতে'র উপসংহারে যে-কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, সর্ব্বাগ্রে তাহাই মনে পড়িতেছে,—

> "তিনি গতানুগতিক ছিলেন না, তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন; শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জুতা তাঁহার নিজেরই চটি জুতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল্‌ কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতি দিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল না থাকিলে জন্‌সনের মনুষ্যত্ব লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা, যাহা তিনি অধিকাংশ সময়ে মুখের কথায় ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।"

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই চটিজুতার কথা বলিতে গিয়াই লিখিয়াছেন,—

> "মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র-উৎকট-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন তেজীয়ান্‌ পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে সমাজমধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্দ্ধাশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে

কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে।"

মহতের চরণশোভিত এই চটিজুতা-মাহাত্ম্যই এই দরিদ্র, লাঞ্ছিত, আত্মবিস্মৃত জাতির মনে অনেক আশার সঞ্চার করিয়াছে, আমরা মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া আছি। প্রতিভার সহিত, সাহিত্য-বুদ্ধির সহিত এই অসাধারণ চারিত্রিক তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্ব যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া 'বর্ণপরিচয়,' 'বোধোদয়,' 'কথামালা,' 'আখ্যানমঞ্জরী,' 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি,' 'শকুন্তলা,' 'সীতার বনবাসে'ই তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ নয়; বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ চেষ্টা এবং বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তনের বিরাট্ কীর্ত্তিও তাঁহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় নয়। সকল গুণ মিলাইয়া তিনি এ সকলের অনেক উর্দ্ধে ছিলেন; এই নিরস্তপাদপ এরণ্ডের দেশে তিনি একক ন্যগ্রোধ-মহিমায় বিরাজিত ছিলেন; শাখা-প্রশাখা-সম্বলিত বটবৃক্ষের বিশালতায় সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার উর্দ্ধে তিনি আপনাকে উৎসারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাটত্বের পরিমাপ করিতে পারে, এমন সমসাময়িক প্রতিভাও কেহ ছিলেন না। আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে দূর হইতে আমরা তাঁহাকে তাঁহার সম্পূর্ণ মহিমায় প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, এই অঘটন কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল! পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের সন্তান কোন্ প্রতিভাবলে এমন জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জ্জন করিলেন, যাহাতে সমসাময়িক সকল সামাজিক অনাচার

ও কুসংস্কারকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না, দৃঢ়হস্তে সকল বাধা অপসারিত করিতে অগ্রসর হইলেন! পাঠ্য পুস্তক ছিল না, পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে বসিলেন, দিকে দিকে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জাতীয় উন্নতির মূল দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্তঃপুরে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের কাজে অগ্রণী হইলেন। এই সংস্কারমুক্ততা, এই সাহস এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর এই নির্ভরশীলতা তাঁহার মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল! তাঁহার পারিবারিক ইতিহাসের মধ্যে—রামজয়-ঠাকুরদাস-ভগবতীর মধ্যে, মেদিনীপুর-বীরসিংহের মধ্যে অথবা সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে এই সমস্যার সমাধান নাই। বাংলা দেশের সকল অভাবনীয়ের মত ১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন (১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাবও আকস্মিক; আমরা সৌভাগ্যবান্ যে, এই আকস্মিকতার ফলভোগ আজিও করিতেছি।

বিদ্যাসাগর যাহা ধরিতেন, তাহা ঐকান্তিকভাবে সম্পন্ন করিতেন। বাধা-বিঘ্ন, বিরোধ, অভাব তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার গুরু ভার যখন তিনি স্কন্ধে বহন করিতেছেন, নিজের দায়িত্বে তখন তিনি গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ভারত-সরকারের শেষ সম্মতির জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। সরকার এ-বিষয়ে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে অবশেষে সম্মত হইলেও তাঁহাকে যে যথেষ্ট ভুগিতে হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবুও স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার আগ্রহ কিছুমাত্র কমে নাই।

নারীর প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া নারীজাতির উন্নতি ও দুঃখ লাঘবের জন্য সকল অনুষ্ঠানে তিনি অগ্রণী ছিলেন।

বিধবা-বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বীটন-কলেজের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে-কোনও কার্য্য তাহার উদাহরণ।

এক দিকে তাঁহার প্রকৃতি যেমন বলিষ্ঠ ছিল, অন্য দিকে তাঁহার স্বভাব ছিল তেমনই কোমল ও সরল। তাই শত্রু-মিত্র সকলেরই তিনি প্রশংসাভাজন ছিলেন।

নানারূপ সমাজ-সংস্কারে হাত দিলেও বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে তিনি কখনও সাহেবদের নকল করেন নাই:—

> "ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। শাদা ধুতি ও শাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্ত্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণ চর্ম্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: "বিদ্যাসাগর-চরিত," 'সাধনা,' ভাদ্র ১৩০২, পৃ. ৩৩৯)

সামাজিক বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ঔদার্য্য ছিল। কাহাকেও তিনি ঘৃণা করিতেন না, কাহাকেও তিনি হীন বলিয়া মনে করিতেন না। সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিতেন, বড়লোক ছোটলোক অথবা উচ্চ জাতি নীচ জাতি বাছিতেন না। নিজেকেও তিনি কাহারও কাছে খাটো করিতেন না। যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, তাহার সহিত

তিনি বন্ধুবৎ আচরণ করিতেন, এবং যে তাঁহার সঙ্গে অসম্মানের সহিত ব্যবহার করিত, ইংরেজ অথবা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হইলেও তিনি তাহার প্রতি অনুরূপ আচরণ করিতে ছাড়িতেন না।

সামাজিক আচরণে ঈশ্বরচন্দ্রের কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা ছিল না। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। সব জিনিস তিনি যুক্তি দিয়া পরখ করিতেন। 'শাস্ত্রে আছে'—ইহাই তাঁহার কাছে শেষ কথা ছিল না। তাঁহার মতামত খুব স্পষ্ট ছিল। এমন কি, এক সময়ে বেদান্তকে তিনি ভ্রান্ত দর্শন বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

তিনি নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। সমাজ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বড়-একটা যোগ দিতেন না। কিন্তু শিক্ষা ও সমাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ছেলেরা ভবিষ্যতে যাহাতে ভাল বাংলা লেখক ও সাহিত্যস্রষ্টা হইতে পারে, তিনি এমনি ভাবে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, সংস্কৃত ও ইংরেজী—এই উভয় ভাষায় ভালরূপ ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে, কেহ ভাল বাংলা লেখক হইতে পারে না। তাই ইংরেজী গদ্যের প্রসাদগুণ এবং সংস্কৃতের ভাবসম্পদ্ তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট।

বিদ্যাসাগরের আর একটি গুণ ছিল—তাঁহার লোক-নির্ব্বাচনের অদ্ভুত ক্ষমতা। এই গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সহজ হইয়াছিল। দু-একটি উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সুবিখ্যাত সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে (১৪ জুন ১৮৬১) তাঁহার নিঃসহায় পরিবারবর্গের মুখ

চাহিয়া, বিদ্যাসাগরের অনুরোধে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কাগজখানি ও ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম কিনিয়া লন। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য কাগজখানির সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। শেষে কালীপ্রসন্ন কাগজ চালাইবার সমুদয় ভার বিদ্যাসাগরের হাতে দেন (ডিসেম্বর ১৮৬১)।

> "এই মাহেন্দ্র যোগে কৃষ্ণদাস পালের উপর বিদ্যাসাগরের দয়া হইল। কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণদাস তখন বালক। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণদাসের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রবন্ধাদি তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া, হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে লাগিলেন।…কৃষ্ণদাস এইরূপে কিয়দ্দিনের জন্য বিদ্যাসাগরের অধীনে থাকিয়া হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকের কার্য্য করেন। এ কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়া শেষে বলিয়া দিয়াছিলেন।…কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকতা প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগরের এই অনুগ্রহ না হইলে হয়ত কৃষ্ণদাসকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় চাকরি করিয়া জীবন শেষ করিতে হইত।" (রামগোপাল সান্যাল : 'কৃষ্ণদাস পালের জীবনী,' পৃ. ২৭-৩০)

দেখা যাইতেছে, বিদ্যাসাগরের লোক চিনিতে ভুল হয় নাই। 'সোমপ্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক পত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম বাহির করেন (নবেম্বর ১৮৫৮)। তখনকার দিনে এরূপ উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল না। যাহা ছিল, তাহাতে রাজনৈতিক বিষয় অথবা ধীরভাবে কোন সামাজিক বা ধর্ম্মনৈতিক বিষয় আলোচিত হইত না। অল্প দিন পরেই তিনি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হস্তে 'সোমপ্রকাশে'র

সম্পাদন-ভার অর্পণ করেন। এখানেও তাঁহার বিবেচনায় কোন ভুল হয় নাই।

বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন। লোকে তাঁহার কথাবার্ত্তা মুগ্ধ হইয়া শুনিত। রসিকতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় জীবনের অপরাহ্ণে তাঁহার মনটা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। "সে আমার নিন্দে করলে কেন, আমি ত তা'র কোন উপকার করি নি"—এইরূপ তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ কথা তাই তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতে শুনিতে পাই।

বিদ্যাসাগরের কর্ম্মশক্তি ছিল অপূর্ব্ব। কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্ত্ত হইত। তিনি ভাবুকের ন্যায় শুধু স্বপ্ন দেখিতেন না,—তিনি কাজের লোক ছিলেন। তাই যে-কাজ অন্যের কাছে প্রায় অসম্ভব ছিল, সেই কাজকেই তিনি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার সমস্ত জীবনের কার্য্যাবলী একটু ধীরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, এক দিক্ দিয়া তিনি যেমন সঙ্কল্পে অটল দৃঢ়চিত্ত পুরুষ ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দূরদর্শিতার সহিত সমস্ত কাজ করিতেন। সঙ্কল্পে এক তিল বিচ্যুত না হইয়াও তাঁহাকে 'গোঁয়ার' অপবাদ শুনিতে হয় নাই। অন্যায়ের সমর্থনে তিনি কখনও জিদ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যেখানে তিনি স্বীয় কার্য্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতেন, সেখানে কিছুতেই কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিত না। প্র্যাট সাহেবের বিদায় গ্রহণের পরও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যখন স্কুল-ইন্স্পেক্টরের পদ দেওয়া হইল না, তদানীন্তন ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের অনুরোধ সত্ত্বেও তখন তিনি পদত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ডাঃ ব্যালান্টাইনের সহিত বিবাদেও তাঁহার বিশেষ স্বাধীনচিত্ততা প্রকাশ

পাইয়াছিল। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তন তাঁহার দুর্জ্জয় দৃঢ়চিত্ততার আর একটি উদাহরণ। দেশের সমগ্র রক্ষণশীল শক্তি সংহত হইয়াও তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন,—

> "বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই।...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

নিজের রচনা ছাড়াও অপরকে বাংলা-সাহিত্যের সাধনায় উৎসাহিত করিয়াও তিনি বঙ্গবীণাপাণির ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন; অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুসূদন দত্তের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অযাচিত উৎসাহ কতখানি কাজ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। 'তত্ত্ববোধিনী,' 'সর্ব্বশুভকরী' প্রভৃতি বাংলা সাময়িক-পত্র তাঁহার সর্ব্ববিধ পোষকতা লাভ করিয়াছিল। 'সোমপ্রকাশ' তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতাও সর্ব্বজনবিদিত। সাহিত্য, সমাজ ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অপর কোনও এক ব্যক্তিকে এতখানি পরিশ্রম করিতে দেখা যায় নাই।

বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় সে কালের পণ্ডিতকুলের অগ্রগণ্য হইলেও তাঁহার মত প্রগতিশীল আধুনিক মন লইয়া কেহ সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারে ব্রতী হন নাই। তিনি নিয়মনিষ্ঠা ভালবাসিতেন, ইংরেজী শিক্ষার

পোষকতা করিতেন, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেই বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করিতে ভীত হন নাই ; বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্ম সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন ; বহুবিবাহ সমর্থন করিতে পারেন নাই। যে তত্ত্ববোধিনী সভাকে সে কালে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধু সৎপরামর্শ নয়, নিয়মিত অর্থসাহায্য—এমন কি, সম্পাদকের কার্য্য করিয়া সেই সভার পোষকতা করিতেন।

১৮২৯ হইতে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ণ এক যুগ কাল সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান হইয়া তিনি যে কেমন করিয়া এই সংস্কারমুক্ততা অর্জ্জন করিলেন, তৎকাল-প্রচলিত জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে এই উদারতার বীজ কোথায় কেমন ভাবে তাঁহার মনে উপ্ত হইল, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও তাহার রহস্য আমাদিগকে অভিভূত করে। আসলে বিদ্যাসাগর দেবত্ব ও ব্রহ্মণ্যের সকল গৌরব-বর্জ্জিত ভাবে মানুষকে মানুষরূপেই মহৎ ও মহনীয় দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহা চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গুরু ও শালগ্রামশিলার দেশে তাঁহাকে অপরিসীম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অকারণ আঘাতে আঘাতে তাঁহার কুসুম-কোমল মন পাষাণ-কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিয়াছেন, কিন্তু এই অসহায় নিপীড়িত সমাজের জন্য তাঁহার কল্যাণ-হস্তকে নিরস্ত করেন নাই ; বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই মানব-প্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু।

এই বিরাট্ পুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবন-কাহিনী আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি দিয়া শেষ করিতেছি,—

"বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বন-জঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশঃই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করিতেন; কিন্তু আমাদের শত সহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্ত্তমান নাই,—কিন্তু তাঁহার মহান্ চরিত্রের যে অক্ষয়বট বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত, দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য্যবীর্য্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"
('সাধনা,' ভাদ্র ১৩০২)

সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর	···বীরসিংহে জন্ম (১২ আশ্বিন ১২২৭, মঙ্গলবার)।
১৮২৯, ১ জুন	···কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ।
১৮৩৯, ২২ এপ্রিল	···হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষাদান; পরবর্ত্তী ১৬ই মে প্রশংসাপত্র লাভ।
১৮৪১, ৪ ডিসেম্বর	···কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে বার বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর কলেজের এবং অধ্যাপক-বর্গের দুইখানি প্রশংসাপত্র লাভ।
২৯ ডিসেম্বর	···ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিত।
১৮৪৬, ৬ এপ্রিল	···সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।
১৮৪৭	···সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা।
এপ্রিল	···প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশ।
১৬ জুলাই	···তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ হইতে বিদায় গ্রহণ।
১৮৪৯, ১ মার্চ	···ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ।
১৮৫০, আগষ্ট	···'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশ।
৫ ডিসেম্বর	···সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক।
ডিসেম্বর	···বীটন নারী-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক।
১৮৫১, ৫ জানুয়ারি	···সাহিত্যের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটরী।

২২ জানুয়ারি…সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল। এই সময় হইতে কলেজে সেক্রেটরীর পদ লুপ্ত হয়।

৯ জুলাই …ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-সন্তানকে কলেজে প্রবেশাধিকার দান।

২৬ জুলাই …অষ্টমী ও প্রতিপদের পরিবর্ত্তে কেবল রবিবার সংস্কৃত কলেজ বন্ধ রাখিবার রীতি প্রচলন।

ডিসেম্বর …যে-কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তানকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান।

১৮৫২, ২৮ আগষ্ট …সংস্কৃত কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের দুই টাকা দক্ষিণা দিবার রীতি প্রচলন।

১৮৫৩ …বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৫৪, জানুয়ারি …বোর্ড-অব-একজামিনার্সের সদস্য।

জুন …সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মাসিক ১৲ বেতন গ্রহণের রীতি প্রচলন।

১৮৫৫, ১ মে …অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া দক্ষিণ-বাংলা স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের পদ। বেতন-বৃদ্ধি—মাসিক ২০০৲।

১৭ জুলাই …নর্মাল স্কুল স্থাপন ও অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধান শিক্ষকরূপে গ্রহণ।

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর…নদীয়ায় পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন।

আগষ্ট-অক্টোবর…বর্দ্ধমানে পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন।

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, নবেম্বর…হুগলীতে পাঁচটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা।

অক্টোবর-ডিসেম্বর…মেদিনীপুরে চারিটি মডেল স্কুল স্থাপন।

৪ অক্টোবর …বিধবাবিবাহ-বিধির জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র।

২৭ ডিসেম্বর …বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র।

১৮৫৬, ১৪ জানুয়ারি…মেদিনীপুরে আর একটি মডেল স্কুল স্থাপন।

১৬ জুলাই …বিধবাবিবাহ-বিধি বিধিবদ্ধ হয়।

৭ ডিসেম্বর …প্রথম বিধবা-বিবাহ। বর—প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন; কন্যা—পলাশডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা-কন্যা কালীমতী।

১৮৫৭, নবেম্বর-ডিসেম্বর…হুগলী জেলায় সাতটি ও বর্দ্ধমানে একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৫৮, জানুয়ারি-মে…হুগলী জেলায় আরও তেরটি (তন্মধ্যে বীরসিংহে একটি), বর্দ্ধমানে দশটি, মেদিনীপুরে (ভাঙ্গাবন্ধ, বদনগঞ্জ ও শান্তিপুরে) তিনটি এবং নদীয়ায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন।

…তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক।

৩ নবেম্বর …সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ ত্যাগ।

১৫ নবেম্বর …'সোমপ্রকাশ' পত্র প্রকাশ।

১৮৫৯, ১ এপ্রিল …কাঁদি (মুর্শিদাবাদ) ইংরেজী-বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা।

২৩ এপ্রিল …রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটীর বাটীতে …'বিধবাবিবাহ' নাটকের অভিনয় দর্শন।

মে …তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হওয়ায় সম্পাদকের পদ ত্যাগ।

১৮৬১, এপ্রিল …কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটরী।

ডিসেম্বর …'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরিচালন-ভার গ্রহণ।

১৮৬৩, নবেম্বর ...ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশনের পরিদর্শক।

১৮৬৪ ...'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামের পরিবর্ত্তে মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন নামকরণ।

৪ জুলাই ...বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনরারি মেম্বর নির্ব্বাচিত।

১৮৬৬, ১ ফেব্রুয়ারি...বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্র।

১৮৭০, জানুয়ারি...ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভায় সহস্র মুদ্রা দান।

১১ আগষ্ট ...২২ বৎসর বয়স্ক পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত খানাকুল কৃষ্ণনগর-নিবাসী শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪ বৎসর বয়স্কা বিধবা-কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ দান।

১৮৭১, ১২ এপ্রিল ...কাশীতে মাতার মৃত্যু।

১৮৭২, ১৫ জুন ...হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ডের ট্রষ্টি।

১৮৭৩, জানুয়ারি ...মেট্রোপলিটান কলেজ।

নবেম্বর (?)...মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামপুকুর শাখা।

১৮৭৫, ৩১ মে ...সম্পত্তির উইলকরণ।

১৮৭৬, ২১ ফেব্রুয়ারি...হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ডের ট্রষ্টি-পদ ত্যাগ।

১২ এপ্রিল ...পিতা ঠাকুরদাসের কাশীলাভ।

...কলিকাতা বাদুড়বাগানের বাটী নির্ম্মাণ।

১-২ আগষ্ট ...চকদীঘির জমিদার সারদাপ্রসাদ রায়ের উইলের মামলায়, উইল প্রকৃত নয় বলিয়া জমিদারপত্নী রাজেশ্বরী দেবীর সপক্ষে বর্দ্ধমানে এজাহার দান।

১৮৭৭, এপ্রিল	··গোপাললাল ঠাকুরের বাটীতে বড়লোকের ছেলেদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা,—ছাত্রদের বেতন মাসিক ৫০৲।
১৮৮০, ১ জানুয়ারি	···সি. আই. ই. উপাধি লাভ।
১৮৮৩,	···পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত।
১৮৮৫,	···মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বউবাজার-শাখা।
১৮৮৭, জানুয়ারি	···শঙ্কর ঘোষের লেনে নবনির্মিত বাটীতে মেট্রোপলিটান কলেজের গৃহপ্রবেশ।
	···মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বউবাজার-শাখা।
১৮৮৮, ১৩ আগষ্ট	···পত্নী দিনময়ীর মৃত্যু।
১৮৯০, ১৪ এপ্রিল	···বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন।
১৮৯১, ২৯ জুলাই	···কলিকাতায় মৃত্যু। (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮, রাত্রি প্রায় ২৷৷০ টা)

দীনবন্ধু মিত্র

১৮৩০—১৮৭৩

প্রায় ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে, ১২৮৩ বঙ্গাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখিবার এখনও সময় হয় নাই।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রায় তিন পোয়া শতাব্দী কালের মধ্যেও সে সময় আর বাঙালীর হইল না। অথচ ইঁহার সম্বন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র সে দিন লিখিয়াছিলেন, "এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না-চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সৌহার্দ্দ ছিল না?" সেই দীনবন্ধুকে আমরা বিস্মৃত হইতেছি।

বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধুর স্থান আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই; তাঁহার নিমচাঁদ, ঘটিরাম, নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ, লীলাবতী বাঙালীর দৈনন্দিন স্মৃতিতেও সজীব; তাঁহার 'সধবার একাদশী,' 'জামাই বারিক' বাংলা দেশের সে-যুগকেও এ-যুগে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে; তাঁহার 'নীলদর্পণ' আজ বাংলা দেশের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর জীবনচরিত লেখেন নাই; আমরাও লিখিতেছি না। তাঁহার জীবনীর উপাদানমাত্র আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। ভবিষ্যতে যদি কোনও সাহিত্যরসিক বাঙালী বাংলা-সাহিত্যে দীনবন্ধুর ঋণশোধ করিতে প্রয়াসী হন, আমাদের এই উপকরণে তাঁহার সাহায্য হইবে।

বাল্য ও ছাত্রজীবন

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র "রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা" লেখেন। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী সম্বন্ধে তাহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য। দীনবন্ধুর বাল্য ও ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনের কয় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে চৌবেড়িয়া নামে গ্রাম আছে। যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদী এই গ্রামকে প্রায় চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছে; এই জন্য ইহার নাম চৌবেড়িয়া। সেই গ্রাম দীনবন্ধুর জন্মভূমি। এ গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বাঙ্গালা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নদীয়া জেলার বিশেষ গৌরব আছে; দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটি গৌরবের স্থল।

সন ১২৩৮ শালে* দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাচাঁদ মিত্রের পুত্র। তাঁহার বাল্যকাল সম্বন্ধীয় কথা অধিক বলিবার নাই। দীনবন্ধু অল্পবয়সে কলিকাতায় আসিয়া, হেয়ার স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করেন।...

দীনবন্ধু হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দু কালেজে যান, এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন। দীনবন্ধুর পাঠাবস্থার কথা আমি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।"

---

* ললিতচন্দ্র মিত্র পিতার জন্ম-তারিখ—"১২৩৬ চৈত্র" বলিয়াছেন।

দীনবন্ধুর ছাত্র-জীবনের কথা বিশেষভাবে জানিতে হইলে সেই সময়কার সরকারী শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টগুলি সযত্নে পাঠ করা আবশ্যক। আমরা এ সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এখানে তাহার উল্লেখ করিব।

দীনবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবেশ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সে সময়ে হিন্দুকলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল বা হেয়ার সাহেবের স্কুল নামেও পরিচিত ছিল; ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্রাঞ্চ স্কুলেরই নামকরণ হয়—হেয়ার স্কুল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তি-পরীক্ষার ফল এইরূপ:—

History 21.25; Geography 23; Garmmar 27; Mathematics 28.5; Trans. from Vernacular 40; Oral examination 17. Total 156.5. Total value 300.*

ইহার পর দীনবন্ধু ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চতুর্থ শ্রেণী হইতে পুনরায় জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং যথাসময়ে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি-পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি:—

FOURTH CLASS.

Literature 36.4; Mental Philosophy 39; History 59-2; Pure Mathematics 39.5; Mixed Mathematics 47.5; English Essay 29; Vernacular Essay 85. Total 276.6,†

---

* General Report on Public Instruction, in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, from 1st October, 1849, to 30th September, 1850, p. ccxxxviii.

† Genl. Rep.......From 1st October, 1850, to 30th September, 1851, p. cxlii.

দীনবন্ধু হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের মধ্যে এই বৃত্তি-পরীক্ষায় বাংলায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

পর-বৎসর—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু হিন্দুকলেজের তৃতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তি-পরীক্ষার ফল এইরূপ :—

THIRD CLASS.

Year in the College—1 Year. Literature 38; Mental Philosophy 36; Pure Mathematics 54.5; Mixed Mathematics 51; History 55; English Essay 22.5; Vernacular Essay 30. Total 287.*

এবারও তিনি হিন্দুকলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে বাংলায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য-তালিকা এইরূপ ছিল :—

THIRD CLASS.

Literature

Prose.—Johnson's Rambler.
Poetry.—Richardson's Selections from Thomson.
History.—Elphinstone's History of India, Vol. II, to end of Book IX.
Mental Philosophy.—Abercrombie's Moral Feelings.
—Intellectual Powers, Part V.

Mathematics.

Conic Sections, (as in Goodwyn.)
Theory of Algebraical Equations.
Mechanics, (as in Potter and Snowball.)

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের সেসন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কোন বৃত্তি-পরীক্ষা হয় নাই। তবে এই বৎসর ১৯এ জানুয়ারি তারিখে দীনবন্ধু

* *Ibid.*, From 1st October, 1851, to 30th September, 1852, p. cixxxviii.

শিক্ষকতা কর্ম্মের পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।* শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে প্রকাশ :—

TEACHERSHIP EXAMINATION. The examination of candidates for employment in the Education Service has been continued, and the names of those candidates who have passed are as follows :—

1853.

19th Jan.,	Khetternath Addy,	...	3rd *Grade.*
	Dinnobundoo Mitter,	...	3rd "

... ...

These examinations were instituted with a view to obtain some classification of the School-masters and to regulate their promotion by the order of merit. The Council regret that they are not better attended.†

দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে দীনবন্ধু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া পুনরায় ৩০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি-পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি :—

SECOND CLASS

No. of Years held Scholarship—1 ; Senior or Junior Scholarship-holder—Senior ; Literature proper 51.8 : Moral Philosophy and Political Economy 33 ; History 60.5 ; Pure Mathemtics

---

* দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে 'তমোলুক পত্রিকা' (১ম পর্ব্ব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৮) লিখিয়াছিলেন :—"দীনবন্ধু বাবু বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কিছু দিন কলিকাতার হিন্দু কালেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকেন...।" কলেজ ছাড়িয়া দীনবন্ধু যে কিছু দিন শিক্ষকতাকার্য্য করেন, 'ভারত-সংস্কারক'ও (৭ নবেম্বর ১৮৭৩) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

† Genl, Rep....From 30th September, 1852, to 27th January, 1855, p. xlvi.

66,5 ; Mixed Mathematics 73 ; English Essay 84.5 ; Translation 34. Total 353.8. Retains Rs. 30 *

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে দীনবন্ধুর নাম পাওয়া যাইতেছে না। তিনি এই বৎসর পাটনার পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন।

সরকারী চাকুরী

দীনবন্ধুর চাকুরী-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৫০৲ টাকা বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ঐ কর্ম্মে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়া যান।...পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু তখন বেতনবৃদ্ধি হইল না; পরে হইয়াছিল।...

উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীল-বিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে 'নীল-দর্পণ' প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।...

ঢাকা বিভাগ হইতে, দীনবন্ধু পুনর্ব্বার নদীয়া প্রত্যাগমন করেন।

* *Ibid.*, Appendix D, p. cccxxv.

ফলতঃ নদীয়া বিভাগেই তিনি অধিক কাল নিযুক্ত ছিলেন; বিশেষ কার্য্য-নির্ব্বাহ জন্য তিনি ঢাকা বা অন্যত্র প্রেরিত হইতেন।

ঢাকা বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন-পরে দীনবন্ধু 'নবীন তপস্বিনী' প্রণয়ন করেন। উহা কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্রটি দীনবন্ধু প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্যের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী হয় নাই।

দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগ হইতে পুনর্ব্বার ঢাকা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। আবার ফিরিয়া আসিয়া উড়িষ্যা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। পুনর্ব্বার নদীয়া বিভাগে আইসেন। কৃষ্ণনগরেই তিনি অধিক কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে একটি বাড়ী কিনিয়াছিলেন। সন ১৮৬৯ সালের শেষে বা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া, কলিতাতায় সুপরনিউমররি ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্যই এ পদের কার্য্য। দীনবন্ধুর সাহায্যে পোষ্ট আপিসের কার্য্য কয় বৎসর অাত সুচারুপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুসাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাছাড় গমন করেন। তথায় সেই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অল্পকালমধ্যে প্রত্যাগমন করেন।

কলিকাতায় অবস্থিতিকালে, তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপনাকে কত দূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ

* "সাপ্তাহিক সংবাদ।...১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।...আমরা সন্তোষ-সহকারে প্রকাশ করিতেছি, বার্ত্তাবহ বিভাগের বিচক্ষণ কার্য্যসচিব শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এবং শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ (২৬ মে ১৮৭১)।

পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেন না, দীনবন্ধু বাঙ্গালি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তুদিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই প্রথমশ্রেণীভুক্ত গর্দ্দভ দেখা যায়।

দীনবন্ধু এবং সূর্য্যনারায়ণ এই দুই জন পোষ্টাল বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। সূর্য্য-নারায়ণ বাবু আসামের কার্য্যের গুরু ভার লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন; অন্য যেখানে কোন কঠিন কার্য্য পড়িত, দীনবন্ধু সেই-খানেই প্রেরিত হইতেন। এইরূপ কার্য্যে ঢাকা, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম, দারজিলিঙ্গ, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা যাইতে। এইরূপে, তিনি বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্ব স্থানেই গমন করিয়াছিলেন, বেহারেরও অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। পোষ্টাল বিভাগের যে পরিশ্রমের ভাগ তাহা তাঁহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অন্যের কপালে ঘটিল।”

দীনবন্ধুর প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের অবিচারের প্রতিবাদ ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ একাধিক বার করিয়াছেন :—

“সুপার নিউমারারি ইনেস্পেক্টার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর বোধ হয় টুইডি সাহেবকে [পোষ্টমাষ্টার জেনারেল] অনেক সাহায্য করিয়াছেন। কারণ, আমরা যখন পোষ্ট আপিস বিভাগের নূতন বন্দবস্তের কথা শুনিতে পাই দীনবন্ধু বাবু প্রায় সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। লুসাই যুদ্ধে অনেক সৈন্য গমন করিয়াছিল তাহাদের নিয়মিত পত্র যাইবার সুবিধার জন্য দীনবন্ধু বাবুকে পাঠান হইয়াছিল, বীরভূমে প্রায় ২।৩ মাসের জন্য তিনি গমন করিয়াছিলেন, কিসের নিমিত্ত তাহা বলিতে পারি না। দীনবন্ধু বাবু নূতন বন্দবস্তের

নিমিত্ত প্রায় বিদেশাভিমুখে গমন করিয়া থাকেন এবং তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসেন তাহার সন্দেহ নাই।

দীনবন্ধু বাবু পোষ্ট অফিসের কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন সেই জন্যে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গে তাঁহার উচ্চপদ এবং বেতন বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট সত্বর তাঁহাকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার পরিশ্রমের যথার্থ ফল তাঁহাকে প্রদান করিবেন। (৭ জুন ১৮৭২)

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। দীনবন্ধু বাবু দীর্ঘকাল ইনস্পেক্টরি কর্ম্ম করিয়া শেষে তাঁহার গত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি কলিকাতায় আনীত হন। এখানে তাঁহার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু তিনি তথাচ দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া২ এক স্থলে থাকায় কতক বিশ্রাম পাইয়াছিলেন। এক্ষণ আবার তাঁহাকে ভ্রমণ কার্য্যে নিযুক্ত করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। যাবজ্জীবন ভ্রমণ করিয়া শেষে একটু শান্তি প্রাপ্ত না হইলে ভারি কষ্টকর বিষয়।" (১৩ অক্টোবর ১৮৭২)

মৃত্যু

অতিরিক্ত পরিশ্রমে দীনবন্ধুর শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ১ নবেম্বর ১৮৭৩ তারিখে তিনি পরিবারবর্গকে অকূলে ভাসাইয়া পরলোকগমন করেন। ডাক-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের অবিচারের ফলেই তাঁহাকে অকাল-মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই লিখিয়াছেন:—

"দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন

পূর্ব্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শত বার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। Charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্ম্মে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।

পুরস্কার দূরে থাকুক শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্য করিতেন। এজন্য তিনি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছু দিন রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে হাবড়া ডিবিজনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেষ পরিবর্ত্তন।"

দীনবন্ধুর মৃত্যুতে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (৬ নবেম্বর ১৮৭৩) যে দীর্ঘ মন্তব্য করেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

We are hardly in a position to dwell much on the death of our dearest friend Babu Deno Bundhu Mitra. The blow has paralyzed us. We wish we could give vent to our pent up feelings, but the shock has stunned us and we can neither weep nor realize the tremendous loss which the country has suffered. We would however for one moment forget our private grief and ask Government in the name of justice to enquire about the following particulars in connection with our lamented friend. A few days before his death, Babu Deno Bundhu while in a very bad state of health told us that he was sure to die and its real cause was the party spirit which was rampant between Mr. Tweedie and Mr. Hogg. Will Government enquire into this matter? Will it call upon Mr. Hogg to explain why was the Babu removed from the Supernumerary Inspectorship of the Calcutta Post Office where he found some rest after 14 years' hard life of a Postal Inspector and which he so well deserved,

and compelled to revert to his former post ? Why was it that the post thus vacated by the Babu was filled up by two European Supernumerary Inspectors who were in every way inferior to him, but who drew double the pay that he used to get ? Why was not the privilege leave for which the Babu earnestly sought a few weeks before he became seriously ill granted him, although during his nineteen years' meritorious service he had never availed himself or a single day's leave ? We distinctly remember to have heard him say that he was denied the privilege of even common etiquette, because he had the misfortune of once being a favourite of Mr. Tweedie. He was thus sacrificed to a party spirit in which he was not in the least concerned. If he was allowed to toil quietly in the Calcutta Post Office instead of being made to travel incessantly with his bad health from one district to another, he would have perhaps lived much longer and did not leave the country to mourn for him so soon. In the name of the whole nation, we ask Government to take into its consideration the above circumstances and award punishment to those who have been instrumental in bringing him to an untimely grave. In justice to the sacred memory of the dead, Government ought to do it. Babu Deno Bundhu was the nation's idol and a dagger penetrated into their hearts could not have given them greater pain than the death of him whom they most adored. Now another word to Government. Babu Deno Bundhu has left a large family in a helpless state. Government is in duty bound to take care of them. Some provision must be made for them, either in the shape of a bonus or annuity. Babu Deno Bundhu was entitled to a pension of one-third of his pay and we beg to propose that the same be allotted to his eldest son till he is in a position to support his family. We hope our other contemporaries will take up this matter and insist upon Government to grant our prayer. If Government thinks that some additional taxes should be imposed on this account, the whole nation will gladly accede to its wish.

রচনাবলী

প্রাথমিক রচনা: পঠদ্দশায় দীনবন্ধু গদ্য-পদ্য লিখিতে সুরু করেন। তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন:—

"[হেয়ার স্কুলে] থাকিতে থাকিতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন। সেই সময় তিনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট পরিচিত হয়েন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদ-পত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণ-বয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু-পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কত দূর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এক্ষণকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, ঈশ্বর গুপ্তের রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল দীনবন্ধুতেই কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়।"

'এলোচুলে বেণে বউ আলতা দিয়ে পায়,
নলক নাকে, কলসী কাঁকে, জল আনতে যায়।'

ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তকে স্মরণ হয়।

* * *

"আমি যত দূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা "মানব-চরিত্র"-নামক একটি কবিতা। ঈশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'সাধুরঞ্জন'-নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজন্য ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণগলিত না হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই।...ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি।

* * *

সেই অবধি, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রণীত কবিতাসকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত। তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ 'সুরধুনী' কাব্য এবং 'দ্বাদশ কবিতা' সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই। তিনি দুই বৎসর, জামাই-ষষ্ঠীর সময়ে, "জামাই-ষষ্ঠী" নামে দুইটি কবিতা লেখেন ['সংবাদ প্রভাকর,' ৫ জুন ১৮৫১ ও ২৫ মে ১৮৫২]। এই দুইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশয্যের সহিত পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের "জামাই-ষষ্ঠী" যে সংখ্যক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। সেই

সকল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, 'সুরধুনী' কাব্য এবং 'দ্বাদশ কবিতা' সেরূপ প্রশংশিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। "জামাই-ষষ্ঠী"তে হাস্যরস প্রধান। সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আশ্রয় মাত্র নাই। প্রভাকরে দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা।

* * *

দীনবন্ধু প্রভাকরে [১৪-১৫ মার্চ ১৮৫৩] "বিজয়-কামিনী" নামে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। তাহার, বোধ হয়, দশ বার বৎসর পরে 'নবীন তপস্বিনী' লিখিত হয়। 'নবীন তপস্বিনী'র নায়কের নামও বিজয় নায়িকাও কামিনী। চরিত্রগত, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নায়কনায়িকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছিল।"

দীনবন্ধুর প্রাথমিক রচনাগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী'তে সংগৃহীত হইয়াছে। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা তাঁহার দ্বিতীয় বারের "জামাই-ষষ্ঠী" কবিতাটি 'সংবাদ প্রভাকর' (২৫ মে ১৮৫২) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আইল সুখের ষষ্ঠী, সুখ জষ্ঠি মাসে।
ধাইল জামাই সব, শ্বশুর-আবাসে॥
ফুটিল প্রেমের ফুল, হৃদয়-কাননে।
ছুটিল কামের তীর, কামিনী-আননে॥
নবীন নায়ক সব, ছিল উচাটন।
পাঁজি দেখে বুঝাইয়ে, রেখেছিল মন॥

আশা-তরি ভাসাইয়ে, সময়-সাগরে।
কাটিয়াছে এত দিন, ধৈর্য্য হালি ধরে॥
ছাড়ায়ে শীতল-ষষ্ঠী, ভাবাকুল মন।
কত শোকে অশোকের, পায় দরশন॥
অশোকে অধীর অঙ্গ, অনঙ্গ-তরঙ্গে।
নানা ভাবোদয় মনে, প্রমদা-প্রসঙ্গে॥
কেহ বলে হেলে আর, নাহি পায় পানি।
দেখি নাই মুখপদ্ম, ধরি পদ্মপাণি॥
মাঝের কদিন হোক্, এখনি যাপন।
অশোকে অরণ্য-ষষ্ঠী, করি উদ্‌যাপন॥
ফলে সহকার পরে, সুখের সঞ্চার।
অরণ্যের আগমনে, আনন্দ অপার॥
সহসা জামাতা যত, উঠিল শিহরে।
শুভ গমনের তরে, সুখে সজ্জা করে॥
কালনাগিনী-পেড়ে ধুতি, পরে সমাদরে।
কোঁচার শেষের ফুল, ভাল শোভা করে॥
শোভিছে লেটের জামা, পেটের উপর।
অপরূপ কপ্ আঁটা, চোনাট্ সুন্দর॥
সবুজ-বরণে বারাণসীর উড়ানি।
সে উড়ানি নায়িকার, নয়ন-জুড়ানি॥
গলায় বিলাতি চেন্, পকেটেতে ঘড়ী।
কাঁটা তার, প্রেম কাঁটা, বেঁধে ঘড়ী ঘড়ী॥
কারপেটি জুতা পায়, শোভা পায় যত।
জুতা নয়, সে জুতায়, জুতা মারে কত॥

করশাখা সুশোভিত করিল অঙ্গুরী।
গলায় রুমাল বেঁধে, বাড়ায় মাধুরী॥
কেশে কাটি বাঁকা সিঁতি, বিলিতি ধরণে।
মনেতে গরব কত, পরব-পালনে॥
রমণীয় পরিণয়ে, পবিত্র প্রণয়।
সমভাবে সকলের, হৃদয়ে উদয়॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা, ধনী কিবা দীন।
পীযূষ-প্রণয়-রসে, সমান বিলীন॥
রম্য হর্ম্যে গজদন্ত, নির্ম্মিত পালঙ্গে।
যত সুখ, ভুঞ্জে ভূপ, রাণী-রসরঙ্গে॥
তৃণশালাবাসী কৃষী, প্রেয়সীর সনে।
ততোধিক হয় সুখী, প্রেম-আলিঙ্গনে॥
কৃষিণীর বিম্বাধরে, করিয়া চুম্বন।
পাতার কুটীর ভাবে, ইন্দ্রের ভবন॥
জামাই-শ্রেণীর মাঝে, দীনহীন যত।
সুমধুর মিষ্টি ভাষে, তুষ্টি-লাভ কত॥
পাঠ করে কুল-কোষ্ঠী, গোষ্ঠী অনুসারে।
জষ্ঠি মাসে, ফষ্টি করি, ষষ্ঠী-পালা সারে॥
রিপু করা ধুতি পরি নাহি ভাবে দোষ।
ভাবে মনে আদি রিপু, কিসে হবে তোষ॥
লোকে বলে এই ধুতি, এনেছিল চেয়ে।
ফলে আর, সুখী কেবা, আছে তার চেয়ে॥
ছেঁড়া সূতা যোড়া দিয়া, যোড়াগাঁথা রয়।
ভেড়াভেড়ি হলে আর, ছেঁড়াছিঁড়ি নয়॥

যে জন হয়েছে, ঘর-জামায়ে, জামাই।
কোন দিন নাহি তার, ষষ্ঠীর কামাই॥
দু-কুলেতে কেহ নাই, কোথা আর যায়।
ষষ্ঠীর বিড়াল হয়ে, মাচ দুদ খায়॥
অপমানে অপমান, কিছু নাহি বোধ।
পেটে খেলে পিঠে সয়, কেন হবে ক্রোধ॥
সদা সহবাসে দারা, স্বসার সমান।
ষষ্ঠীতে শ্বশুরালয়, পিত্রালয় জ্ঞান॥
সতত থাকিয়ে তথা, সুখী নয় মনে।
মাতালে মদের সুখ, জানিবে কেমনে॥
ফলে যদি এ বিষয়ে, দোষ তার ধরি।
বিচারেতে দোষী হন, হর আর হরি॥

দু তিন ছেলের বাপ, যে সব জামাই।
তারাও উঠেছে ক্ষেপে, বলে যাই যাই॥
ছেলে দেখিবারে যাব, বাটা নিতে নয়।
পো-নামে পোয়াতি বাঁচে, সর্ব্ব লোকে কয়॥
এক দিকে বাপ সাজে, আর দিকে ব্যাটা।
ভাইপোরে লজ্জা দিয়ে, সাজিলেন জ্যাটা॥
পুরাণ-জামাই কারো, ধরিবে না মনে।
নবীন-জামাই কথা রচিব যতনে॥
একে একে উপনীত শ্বশুর সদনে।
জামাই আইল দেখি, সবে সুখী মনে॥
কেহ আসি সমীরণ করে সঞ্চালন।
বারি ঝারি আনি কেহ ধোয়ায় চরণ॥

তৈল মাখাইয়ে কেহ দেয় সমাদরে।
মনোসাধে যাদুমণি স্নান পূজা করে॥
অন্তঃপুরে আসি দাসী দেয় সমাচার।
উথলিল মেয়েদের প্রেম-পারাবার॥
খাদ্য দ্রব্য নানামত করি আয়োজন।
অধীর হইল তারা জামাই কারণ॥
মাতা খাস্, যা লো দাসি, বাহিরে সত্বরে।
অবিলম্বে বনমালী আন গে অন্দরে॥
এখানে জামাই বসে পুরুষের দলে।
মন কিন্তু গেছে মনোমোহিনী মণ্ডলে॥
দাসী আসি হাসি হাসি কহে মৃদুস্বরে।
এসো গো জামাই বাবু বাড়ীর ভিতরে॥
এ কথা শুনিলে আর থাকে কোন্ কাজ।
ব্যস্ত কেন যাই বলে উঠে যুবরাজ॥
ধীরি ধীরি সহচরী সহিত গমন।
মুদ্রা দিয়া প্রণমিল শাশুড়ী-চরণ॥
শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ ধানেতে প্রকাশ।
তনয়ার হও দাস—এই অভিলাষ॥
প্রণমিয়ে নটবর সকলের পায়।
হাস্য আস্যে আসনের নিকটে দাঁড়ায়॥
বোস বোস রসময় বলে রামাগণ।
দাঁড়ায়ে রহিলে কেন থাকিতে আসন॥
মনোহর মনোহর স্বরে কথা কয়।
কি কারণ দাঁড়ায়েছি শুন পরিচয়॥

নিরাসনে চন্দ্রাননী তোমরা সকলে।
আসনে অধম আমি বসিব কি বলে ॥
বসিয়া বসাও যদি বসিবারে পারি।
না বসিলে কিসে বসি বসিবারে নারি ॥
হাসিয়ে কহিছে এক তরুণী কামিনী।
হৃদয় জুড়াল শুনে সুমধুর বাণী ॥
প্রণয়-মন্দিরে তুমি নব উপাসক।
জ্ঞান নাই কোথা থাকে বকুল চম্পক ॥
পতির হৃদয়চক্র নারীর আসন।
সতত বিরাজে তায় রমণী রতন ॥
মুহূর্ত্তেক নিরাসনে নাহি কোন নারী।
অনুক্ষণ বোসে আছে উপরি তাহারি ॥
প্রেম-চক্ষু-হীন তুমি দেখিতে না পাও।
সেই হেতু আমা সবে বসাইতে চাও ॥
সরস উত্তর শুনি মোহিনীর মুখে।
আসনে জামাই বসি কহিতেছে সুখে ॥
ক্ষম অপরাধ মম, তব পায় পড়ি।
মানিলাম প্রেমে তুমি দিলে হাতে-খড়ি ॥
কথার কৌশলে হাসি কহিছে রূপসী।
আহা মরি! খাও কিছু, শুক মুখ-শশী ॥
হাবা ছেলে বোবা হয় পীড়ির উপরে।
বোবা বোবা বলে তবু বাক্য নাহি সরে ॥
কৌতুকে কামিনী কহে কৌশল-বচনে।
"ওল্ মানো" বোল তবে ফুটিবে বদনে ॥

পরিহাসে রসালাপ করে যত মেয়ে।
হেঁটমুখে খায় হাবা, নাহি দেখে চেয়ে ॥
কারিগুরি নারীগণ করে অগণন।
জিনিষেতে জাল করে করিয়া যতন ॥
বারিহীন গেলাসের ঢাকনি উপরে।
কলাগাছ-গোড়া কেটে ভাল ডাব করে ॥
বিচুলির জলে করে মিছিরির পানা।
তৃষ্ণায় জামাই খাবে, না করিবে মানা ॥
ঘুণের করেছে চিনি দেখিতে সুন্দর।
পিপীলিকা খায় ভুলে, কোথা আছে নর ॥
কোনমতে মেয়েদের না দেখি কসুর।
কাঁটালের বিচি কেটে করেছে কেসুর ॥
অপরূপ শশা করে ত্যালাকুচা কেটে।
আহ্লাদে হইয়া কাণা দিতে হয় পেটে ॥
তেঁতুলের বিচি বেটে করে ক্ষীর-ছাচ।
প্রভেদ নাহিক তায়, কেবা পায় আঁচ ॥
পিপুলপাতের পানে খিলি বানাইল।
এলাচ নবঙ্গ গুয়া ভেল করে দিল ॥
চতুরের চারি চক্ষু প্রিয়া-পিতাবাসে
করি সব অনুভব বুঝে লয় বাসে ॥
জলপাত্র ঢাকা দেখি করিছে কৌশল।
কোথা আমি হাত ধোব, দেশে নাই জল ॥
বলে বাণী কোকিলবাদিনী সুলোচনা।
সারি সারি বারি-ঘট দেখেও দেখ না ॥

সুরসিক বলে শুন শুন গুণবতি।
দেববাণী-তুল্য মানি তোমার ভারতী॥
কিন্তু কমলিনি কি হে শোন নি শ্রবণে।
বাঁশ-বনে ডোম কাণা বলে সর্ব্ব জনে॥
আর বামা বলিতেছে বচন সরল।
মোচন কর হে পাত্র, পাইবে কমল॥
গুণমণি বলে "ধনি, শুন বলি সার।
ঢাকা পাত্রে দিলে হাত একে হবে আর॥"
শুনিয়ে সরস ভাষা ভুবনমোহিনী।
বারি-পোরা পাত্র আনি দিলেন তখনি॥
অচতুর অগ্রে করে ঢাকনি মোচন।
জীবন না দেখে তায় হারায় জীবন॥
কৌশলে কামিনী বলে মধুর বচনে।
গেলাস খেয়েছে জল তব পরশনে॥
বিষম হাসির ঝড়ে উড়িল পরাণ।
অবাক্ আদুরে ছেলে হয়ে অপমান॥
জলযোগ-পরে হয় ভোজনায়োজন।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অপূর্ব্ব অশন॥
যত রামা করে নানা চাতুরী এখন।
জেনেছে সে সব সেই, ঠেকেছে যে জন॥
মোম গলাইয়া বাটি পূরে ঘৃত ক'রে।
হবি মেখে রেখে দেয় ভাতের উপরে॥
পিটুলির দুদ্ ঢেকে দেয় দুধ-সরে।
সর ফুঁড়ে কার আঁখি যাইবে ভিতরে॥

শাজেতে জামাই সব বেছে বেছে খায়।
একে বা ঠকিয়ে যায় আরে বা ঠকায়॥
জামাই ঘেরিয়ে বসে সুলোচনাগণে।
পয়ো সহ মধুফুল দিয়েছে যতনে॥
চতুরা চতুরে কথা কৌতুক কৌশলে।
খেতে খেতে কত কথা কত জনে বলে॥
কেহ বলে উপরোধে ঢেঁকি গেলে লোক।
পার না কি খেতে তুমি দুদ এক ঢোক॥
অধরে অম্বর দিয়া কহিছে শালাজ।
গোটা কত মিঠে আঁব খাও ত্যজে লাজ॥
নাগর হাসিয়া বলে, আর খেতে নারি।
উপরোধে ভাল চ্যুত দিলে নিতে পারি॥
চতুরা রমণী সেই বুঝিল আভাস।
দিতে পারি মনোমত কিন্তু তাহে আঁশ॥
কি জানি মুকুতা-দাঁতে যদি লেগে যায়।
ব্যাঘাত হইবে শেষ আসার আশায়॥
নাগর কহিছে সব তোমারি ত হাত।
নি-আঁশ বাছিয়া দিলে রক্ষা পাবে দাঁত॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে শালাজ তখন।
অরসিক তুমি তাই বলিলে এমন॥
যাহা তুমি ডান হাতে করেছ গ্রহণ।
নি-আঁশ ও আঁব দেখ মেলিয়ে নয়ন॥
পড়িল খুসির হাসি শশিমুখী-দলে।
থতমত খেয়ে কান্ত কিছু নাহি বলে॥

কামিনী-কৌশল কথা নানামত আছে।
শুনিতে বাসনা যার, এস মোর কাছে ॥
অবশেষ পান খেয়ে যান যুবরাজ।
আহ্লাদে বসেন গিয়া যুবক-সমাজ ॥
সেতার তবলা বাজে, খেলে দাবা তাস।
সন্দেশের টাকা দেন হইয়ে উল্লাস ॥
মন কিন্তু জামায়ের সদাই অস্থির।
কত ক্ষণে আগমন হবে যামিনীর ॥
তাপ বাড়ে, কমে যত তপনের তাপ।
রবি অস্ত দেরি দেখে বাড়িছে বিলাপ ॥
তরুণী তরুণে তাপে তারিতে তরণি।
অবশেষে অস্তে যান ছাড়িয়ে ধরণী ॥
মনের আঁধার যায় দেখিয়া আঁধার।
নিশিতে প্রণয়-নীরে দিবেন সাঁতার ॥
মেয়ের মায়ের মন রসে টলমল।
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া-কমল ॥
সুবেশ করিল বেশ বর্ণনা অশেষ।
সাজাইল উমা যেন তুষিতে উমেশ ॥
মোহিনীর খোপা বাঁধে চিকাইয়া চুল।
চারি পাশে ঘিরে দেয় বকুলের ফুল ॥
জামাই-সোহাগি টিপ ভালে কেটে দিল।
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল ॥
আভরণে আদরিণী আবৃতা হইল।
তরুণ অরুণ যেন উষায় উঠিল ॥

গোধূলিতে ধ্যান পূজা করি সমাপন।
সুখাদ্য জামাই বাবু করেন ভক্ষণ॥
রঙ্গে ভঙ্গে কুরঙ্গনয়না-কুল সনে।
আছেন পরম সুখে কথোপকথনে॥
রহস্যে রজনী বৃদ্ধি, বলে রামাগণ।
চল চল মনমথ, করিতে শয়ন॥
শ্যালকী শালাজ সঙ্গে সানন্দে সুরত।
আইল শয়নাগারে পূর্ণ-মনোরথ॥
প্রিয়তমা সরোজিনী পালঙ্গ-উপরে।
দেখে সুখ বাড়ে দিননাথের অন্তরে॥
সুবদনীগণে বলে সুমধুর স্বরে।
সুরঙ্গে অনঙ্গ রস পালঙ্গ-উপরে॥
নির্জ্জনে নলিনী সনে কর প্রেমালাপ।
আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ॥
শয্যা-সরোবরে রাখি পদ্মিনী ভ্রমরে।
লুকাইয়ে দেখে সব থাকিয়ে অন্তরে॥

কি কথা কহিবে কান্ত করিছে কামনা।
ঘোমটা দেখিছে চেয়ে হইয়ে বিমনা॥
কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে, ভাবিয়ে না পাই।
পরিণত বিধুমুখ, তাহে কথা নাই॥
রূপের গৌরবে বুঝি হয়ে গরবিণী।
প্রেমাধীন জনে দুখ দেও আদরিণি॥
কামিনী কহিল কথা পীযূষের তারে।
প্রভাতে ললিত যেন বাজিল সেতারে॥

সুরসিক তুমি নাথ, আমি হে বালিকে।
বচন-রচনা ভাল রসিকা রসিকে॥
অধরে চুম্বন করি বলেন রসিক।
কিসে প্রাণ-কমলিনি, আমি সুরসিক॥
তব সনে প্রণয়িনি, এই দরশন।
বল দেখি আমি তব হই কোন্ জন॥
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর।
তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর॥
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুরু্ঝির ঠাঁই।
তুমি প্রাণ, হও মোর ঠাকুর-জামাই॥
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল।
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল॥
গুণমণি অধোমুখ সুখ অপমানে।
চতুরা রমণী বলি রমণীরে মানে॥
নানারূপ আলাপনে নিশি হয় শেষ।
যে হয় জামাই সেই জানে সবিশেষ॥
দিনেক দুদিন থাকি মথুরা-নগরে।
বিদায়ি বসন লয়ে যায় নিজ ঘরে॥
মনোসুখে প্রণমিয়া ষষ্ঠীর চরণ।
রচিলেন দীনবন্ধু সুখের পার্ব্বণ॥

গ্রন্থাবলী: দীনবন্ধুর রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **নীল দর্পণং নাটকং।** ২ আশ্বিন ১৭৮২ শকাব্দা, ইং ১৮৬০। পৃ. ৯০+২ শুদ্ধিপত্র।

নীল দর্পণং নাটকং নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং। ঢাকা শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৮২। ২ আশ্বিন।

'নীল-দর্পণ' বাস্তব-ভিত্তির উপর রচিত। 'ভারত-সংস্কারক' (৭ নবেম্বর ১৮৭৩) পত্রে প্রকাশ :—

নীলকর-পীড়িত নিরাশ্রয় প্রজাদের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। নদিয়া ও যশোহর জিলার অনেক স্থান ভ্রমণ করাতে নীলোপদ্রব সম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব ঘটনা জানিতে পারেন ও তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হওয়াতেই তিনি নীলদর্পণ রচনা আরম্ভ করেন। নদিয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দ্দশা নীলদর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি।...

নাটকখানি ১৮৬১ সনে *Nil Durpun, or The Indigo Planting Mirror* নামে "A Native" কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছিল। অনুবাদক আর কেহই নহেন, স্বনামধন্য মধুসূদন দত্ত।

২। **নবীন তপস্বিনী নাটক।** কৃষ্ণনগর, ১২৭০ সাল, ইং ১৮৬৩। পৃ. ১৫৭।

৩। **বিয়ে পাগলা বুড়ো** (প্রহসন)। ইং ১৮৬৬।

ইহা ১৮৬৬ সনের গোড়ায় প্রকাশিত ; ঐ বৎসরের ২১এ জুলাই 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে, তিন মাস পূর্ব্বে প্রহসনখানির সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল।

৪। **সধবার একাদশী** (নাটক)। ইং ১৮৬৬।

২৪ নবেম্বর ১৮৬৬ তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রে সমালোচিত।

৫। **লীলাবতী** (নাটক)। ১২৭৪ সাল (১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৭)। পৃ. ১৯২।

৬। **সুরধুনী কাব্য :**

১ম ভাগ। ১৭৯৩ শক (৪ আগস্ট ১৮৭১)। পৃ. ১২৪।

২য় ভাগ। নবেম্বর ১৮৭৬। পৃ. ৪৭।

৭। **জামাই বারিক** (প্রহসন)। ১৯২৯ সংবৎ (২০ মার্চ ১৮৭২)। পৃ. ৭৮।

জামাই বারিক। প্রহসন। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। "Of all the blessings on earth the best is a good wife; A bad one is the bitterest curse of human life." কলিকাতা। নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। সংবৎ ১৯২৯।

৮। **দ্বাদশ কবিতা**। ইং ১৮৭২ (২৮ মে)। পৃ. ৬৩।

আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে "১২৭২" মুদ্রিত হইয়াছে।

৯। **কমলে কামিনী নাটক**। ১২৮০ সাল (১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩)। পৃ. ১৩৬।

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী। ১৩৫০-৫১ সাল (সাহিত্য-পরিষৎ)

দীনবন্ধুর সমগ্র রচনাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ।

বাগ্মিতা : দীনবন্ধু বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

(মৃত্যু : ১৪ জুন ১৮৬১) স্মৃতিরক্ষার সহায়তাকল্পে একটি বিরাট্ সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই স্মৃতিসভায় তিনি যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন, 'সোমপ্রকাশ' (১১ আগস্ট ১৮৬২) হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সম্প্রতি এক দিন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এই কয় মহাশয় সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কলিকাতা নগরীতে প্রারব্ধ অট্টালিকার সাহায্য করণের মন্ত্রণা করেন। দীনবন্ধু বাবুই প্রধান সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া অকপট যত্ন সহকারে অত্রত্য মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। ২৬এ জুলাই শনিবার বেলা ৪টার সময় পবলিক লাইব্রেরিতে এই সভা সংস্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরস্থ বহুতর ভদ্র ব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সভামণ্ডপ মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় সভাপতি পদে ব্রতী হন। অনন্তর দীনবন্ধু বাবু যে বক্তৃতা দ্বারা সমাগত সভ্যগণকে আর্দ্র করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

"হরিশ বাবু যেরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ পরোপকারী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ সুলেখক ছিলেন, হরিশ বাবু স্বদেশের উন্নতির জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, হরিশ বাবু রাজপুরুষদিগের যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন করা না করা সমান, কারণ তিনি চিরস্মরণীয়, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি ভুলিবার যোগ্য নন, তাঁহাকে ভুলেও ভোলা যায় না। হরিশ বাবুর স্মরণার্থে কোন অট্টালিকা প্রস্তুত হউক বা না হউক তিনি আমাদের অন্তঃকরণ-অট্টালিকায় সতত বিরাজ করিতেছেন, হরিশ বাবুর স্মরণার্থ

কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের হৃদয়-মন্দিরের আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন, হরিশ বাবুর প্রতিমূর্ত্তি কোন রাজপথে স্থাপিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের স্মরণপথে দেদীপ্যমান দণ্ডায়মান আছেন। কিন্তু ভাবি কালে তাঁহার নাম বিলুপ্ত না হয় এবং সকল দেশেই এরূপ সৎ প্রথা আছে যে, দেশের হিতকারী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহোদয়ের পরলোক হইলে তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার দেশস্থ লোকে কোন চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখে, এই জন্য 'হরিশ্চন্দ্র সমাজ' নামক অট্টালিকার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র শিশুকালে উপায়হীন ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতার তাদৃশ সম্পত্তি ছিল না যে তাঁহাকে সুচারুরূপে শিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল, তিনি প্রথমতঃ ইউনিয়ান স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তার পরে আপনি আপনার শিক্ষক হইয়াছিলেন, আপনি আপনার উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, তিনি প্রত্যহ কলিকাতার পবলিক লাইব্রেরিতে গিয়া সকল সংবাদপত্র এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন এবং তাহাতেই যে ভুবনবিখ্যাত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়াট' সংবাদপত্রেই প্রকাশ আছে। পিতা মাতা পরিজন প্রতিপালনের ভার তাঁহার কোমল স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি অতি অল্প বয়সে টালার নিলামে এক ক্ষুদ্র কেরাণির কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। মিলিটারি আডিটার জেনারেল আপীশে ২৫৲ টাকা বেতনের এক কর্ম্ম খালি হইলে তিনি পরীক্ষা দিয়া ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। হরিশ্চন্দ্র শুভক্ষণে মিলিটারি আডিটার জেনারেলের আপীশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐখান হইতেই তাঁহার উন্নতির সোপান হইল। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া তাঁহার মনিব সাহেবেরা অতিশয় সন্তুষ্ট

হইয়াছিলেন এবং যখন পন্থা পাইয়াছিলেন তখনই হরিশের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে আপীশে হরিশের চারি শত টাকা বেতন হইয়াছিল।

শিশুকাল হইতেই হরিশের সংবাদপত্রে অনুরাগ ছিল, কারণ তিনি জানিতেন সংবাদপত্রই দেশের উন্নতির মূল, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের সভ্যতা সাধন হইতে পারে, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের উপকারজনক রাজনিয়মের সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি প্রথমতঃ সংবাদপত্রে স্বদেশের মঙ্গলজনক পত্র প্রেরণ করিতেন কিন্তু সম্পাদকেরা তাঁহার সকল পত্র ছাপিতে সাহসী হইত না, এই জন্যে তিনি বিরক্ত হইয়া আপনি নিজে একখানি সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিলেন, সেই সংবাদপত্রের নাম 'হিন্দু পেট্রিয়াট,' হরিশ্চন্দ্র অর্থলাভ করিবার জন্য হিন্দু পেট্রিয়াট প্রচার করেন নাই, কেবল স্বদেশের উপকার করিবার জ হিন্দু পেট্রিয়াট প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যখন ১০০৲ টাকা বেতন পান, তখনই হিন্দু পেট্রিয়াটের প্রথম সৃষ্টি হয় কিন্তু তখন ঐ পত্রে মাসে ৫০৲ টাকা করিয়া ঘর হইতে দিতে হইত, স্বদেশ অনুরাগী হরিশ্চন্দ্র তার জন্যে এক দিনের তরেও কাতর হন নাই। কাতর হবেন কেন? তাঁহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ, তাঁহার অন্তঃকরণ অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না, কেবল স্বদেশের উপকারই পরমার্থ বলিয়া জানিত। হরিশ্চন্দ্র যে কাগচে লেখনী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন সে কাগচে লোকসান কদিন থাকিতে পারে? হরিশের লেখা যে একবার পড়ে সে-ই মোহিত এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার জগৎবিখ্যাত হিন্দু পেট্রিয়াটের গ্রাহক হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু পেট্রিয়াট হইতে ৩০০।৪০০ টাকা লাভ হইতে লাগিল। হিন্দু পেট্রিয়াট, হিন্দুবন্ধু হরিশ্চন্দ্রের লেখার কৌশলে বঙ্গদেশে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশ কেন বলিতেছি, ভারতবর্ষময়

হিন্দু পেট্রিয়টের গৌরব হইয়াছে। কি মান্দ্রাজ, কি বোম্বাই, কি লাহোর, কি আগরা, সকল স্থানেই হিন্দু পেট্রিয়টকে অতি সাহসী সংবাদপত্র বলিয়া গণ্য করে। ইংলণ্ডেও হিন্দু পেট্রিয়টের অতিশয় আদর হইয়াছে। ইণ্ডিয়া কাউনসেলে আদর হইয়াছিল, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে আদর হইয়াছিল, প্রীবি কাউনসেলে আদর হইয়াছিল। বিলাতে আবওরিজিনিস প্রোটেকশন নামক এক সভা আছে, বিলাতের রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের আদিম বাসেন্দা লোকদিগের উন্নতি সাধন করা সে সভার উদ্দেশ্য। হরিশের হিন্দু পেট্রিয়ট এই সভার চক্ষু হইয়াছিল। হরিশ যে সকল মত প্রচার করিতেন এই সভার সভ্যগণ সেই মত অতিবিধেয় বলিয়া গণ্য করিতেন। কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের এক্ষণে যে গৌরব দেখিতেছেন, সে গৌরব হরিশ্চন্দ্রের লেখনীর জোরে হইয়াছে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের দ্বারা ভারতবর্ষের যে উপকার জন্মিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই, লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে, গবর্ণর জেনেরেলের নিকটে, ইণ্ডিয়া কাউনসেলের সেক্রেটারির নিকটে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের প্রস্তাবাদি অতি আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন এই ভারতবর্ষীয় সভার যে অভিপ্রায় তাহা ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অভিপ্রায়, ভারতবর্ষীয় সভাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভারতবর্ষের সমুদায় লোক সন্তুষ্ট হইবে, তাঁহারা জানিয়াছেন এই ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেণ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহোদয়েরা হরিশের বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল ও রাজকার্য্যে পারদর্শিতা বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা হরিশকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, কোন মহৎ বিষয় সুসম্পন্ন করিতে হইলেই তাঁহারা হরিশকে ভার দিতেন, হরিশ সে বিষয় এমনি সমাধা করিতেন তাঁহারা সকলে চমৎকৃত

হইতেন এবং হরিশ দীর্ঘজীবী হউক, জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণের কি দুরদৃষ্ট! তাঁহাদের কি পরিতাপ! তাঁহারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হরিশের অসাধারণ সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

গত ৫৭ সালের মিউটিনির সময় যে সময় সেপাইগণ রাজবিদ্রোহিতা করিয়াছিল সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। সে কথা মনে করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ অদ্যকার সভার সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ ও ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়। সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজলোকে রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদয় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জন্য চীৎকার-ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাদের এই অসংগত মতে বিমত করে, তখন তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে ফাঁসি হয়, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটী কথা কহিলে তদ্দণ্ডে কাটিয়া ফেলে। আমরা কোন কীটস্য কীট। গবর্ণর জেনেরেল লার্ড ক্যানিং তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কত চেষ্টা হইয়াছিল। এই ভয়াবহ সময়ে আমাদের হরিশ্চন্দ্র, আমাদের হিন্দু বন্ধু হরিশ্চন্দ্র, আমাদের সাহসী হরিশ্চন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে তিনি তাঁহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন, আর দিকে রাগান্ধ ইংরাজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন। এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজবিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং ইংরাজ-রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। আহা! হরিশ্চন্দ্র কিছুমাত্র প্রাণের শঙ্কা করিতেন

না, তিনি কেবল দেখিতেন কিসে স্বদেশের উপকার হইবে, তিনি স্বদেশের উপকারের কাছে তাঁহার জীবন অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে এক জন ইংরাজে যদি বলে এই ব্যক্তি আমাদের মন্দ কথা বলেছে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কোন বিচার না করিয়া কোন প্রমাণ না লইয়া ফাঁসি দেয়, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র পিচপা হবেন, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র যথার্থ কথা লিখিতে সঙ্কুচিত হবেন, তিনি জানিতেন তাঁহার জীবন দিয়া দেশের যদি কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হয় সেই তাঁর যথেষ্ট। লার্ড ক্যানিং মহোদয়, এই সময়ে হিন্দু পেট্রিয়াট সংবাদপত্রকে অতিশয় আদর করিতেন, তিনি রাগান্ধ হন নাই, তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় নাই। তিনি তাঁহার মহানুভব সুপ্রিম কাউনসেলের সভ্যগণের পরামর্শ যেরূপ শুনিতেন সেইরূপ হিন্দু পেট্রিয়াট সংবাদপত্রের পরামর্শও শুনিতেন, তিনি তাঁহার সভার সভ্যগণের দ্বারা যেরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু পেট্রিয়াট পত্রদ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন। লার্ড ক্যানিং প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন হরিশ্চন্দ্র আগামি বারে কি লেখেন। এক দিবস হিন্দু পেট্রিয়াট পৌছিবার সময় অতীত হইয়া গেল, হিন্দু পেট্রিয়াট না আসাতে লার্ড ক্যানিং ব্যস্ত হইয়া তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারিকে বলিলেন এখন পর্য্যন্ত হিন্দু পেট্রিয়াট পাইলাম না ইহার কারণ কি? প্রাইবেট সেক্রেটারি এই কথা তৎক্ষণাৎ হিন্দু পেট্রিয়াট যন্ত্রালয়ে লিখিলেন এবং অবিলম্বে হিন্দু পেট্রিয়াট ক্যানিং মহোদয়ের হস্তগত হইল। সেই মহাত্মা লার্ড ক্যানিং সাহেবের জন্যে এবং আমাদের হরিশের জন্যে আমরা অন্যায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছি। হরিশ্চন্দ্র আমাদের দেশের জন্যে এত করিয়াছেন, আমরা কি তাঁহার স্মরণার্থ অকিঞ্চিৎকর কিঞ্চিৎ অর্থদান করিতে পারিব না। হে সভাস্থ লোক!

অর্থদান করিতে পারিব কি না পারিব বলিয়া জিজ্ঞাসা করা আমার অন্যায়, যখন হরিশ্চন্দ্রের নাম মাত্রে আমাদের প্রাণ প্রফুল্ল হয় যখন অদ্যকার সভার কথা শুনিবামাত্র এখনকার যাবতীয় লোকে আনন্দিত হইলেন এবং উৎসাহপ্রফুল্ল বদনে সভায় আগমন করিয়াছেন তখন যে উদ্দেশে সভা হইয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইবে তাহার সন্দেহ কি।"

দীনবন্ধু ও বঙ্গীয় নাট্যশালা

দীনবন্ধুর সহিত বঙ্গীয় নাট্যশালার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁহার নাটক ও প্রহসনগুলি কলিকাতা ও মফস্বলের সখের নাট্যশালা কর্ত্তৃক বহু বার অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু সখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন-না-কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতে হইত। ক্রমে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। যে মুষ্টিমেয় ভদ্রসন্তান সখের থিয়েটার হইতে শেষে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়—'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা (৭ ডিসেম্বর ১৮৭২) করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা দীনবন্ধুর নিকট কতটা ঋণী, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে উৎসর্গ-পত্র হইতে। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র

মহাশয় শ্রীচরণেষু—

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। ...যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির

সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

দীনবন্ধু ও বাংলা-সাহিত্য

'সধবার একাদশী'-রচনার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা-সাহিত্যে দীনবন্ধুর স্থান নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে; হালকা হাসি ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ছলে যুগ-জীবনের এই মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি তিনি ভিন্ন আর কেহ রচনা করিতে পারিতেন না। এই নাটকখানি উচ্চ স্তরের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন। যাঁহারা সর্ব্বদেশীয় এবং সর্ব্বকালীন নাটক লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বলিতে শুনিয়াছি, বাংলা দেশে সকল দিক্ দিয়া নিখুঁত এই একটি মাত্র নাটকই এখন পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর ব্যঙ্গপূর্ণ হাস্য-রচনাতেই দীনবন্ধুর প্রতিভা বিশেষ ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। এই প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণের জন্য যে যে উপাদানের প্রয়োজন, দীনবন্ধুর তাহা পুরামাত্রায় ছিল; বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা এবং বহু মানুষ সম্বন্ধে তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছিল; বহু স্থানের প্রাদেশিক ভাষা তিনি নিখুঁত ভাবে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। তিনি সুরসিক ও সু-আলাপী ছিলেন। এই হিউমার-বোধের সঙ্গে

কবিত্বশক্তি যুক্ত হইয়া দীনবন্ধুকে বহুচরিত্রসম্বলিত সার্থক নাটক ও প্রহসনের জনয়িতা করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র "দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব" বিষয়ক প্রবন্ধে দীনবন্ধুর সাহিত্য-প্রতিভা, কবিত্ব ও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতেই বাংলা-সাহিত্যের সহিত দীনবন্ধুর সম্পর্ক সবিশেষে বিবৃত হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া দীনবন্ধু-কথা শেষ করিতেছি :—

"১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায়, যে ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য-শিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দুষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।

কিন্তু কবিত্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে এক জাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক

জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভাল বাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্‌সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতে অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীবজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত, প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে, যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা, প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিত-মোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন,

বিপর্য্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

কি উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা! সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয় তাহা জানা নাই।...বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন।...

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরীব দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরীব দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্ব্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্রচরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক তিনি সর্ব্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নিকুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা

হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন-সুখ বিফলীকৃতশিক্ষা, নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম; তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।'

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

বাংলা সাময়িক-পত্র

পরিবর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ : (১ম) মূল্য ৫৲
ঐ (২য়) " ২৷৹

১৮১৮ সনে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি ১৮৬৮ সনে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র উদ্ভব পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের প্রামাণিক ইতিহাস। সাংবাদিকগণের চিত্র-সম্বলিত।

আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ঃ—"বইখানির পাতা যত উল্টাইয়াছি ততই আপনার চিরপরিচিত তথ্যানুসন্ধান, অধ্যবসায় ও সমাহরণ-নৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। আপনার যাবতীয় সমাহরণ গ্রন্থে সত্য নির্ণয়ের নিমিত্ত সবিশেষ যত্নের লক্ষণ আছে। আমার বিশ্বাস বঙ্গদেশে আর কেহ এরূপ গ্রন্থ রচিতে পারিতেন না। ভবিষ্য বংশীয়েরা আপনার পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে থাকিবে।"

প্যারীচাঁদ মিত্র

১৮১৪-১৮৮৩

বংশ-পরিচয় ; বিদ্যাশিক্ষা

গঙ্গাধর মিত্র হুগলী জেলার হরিপাল থানার পানিসেওলা গ্রামের অধিবাসী। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন ; কিছু দিন পরে এইখানেই তাঁহার বসতবাটী নির্ম্মিত হয়। নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে, ঠিক ষ্ট্রাণ্ড রোডের জংসনে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবমন্দির এখনও বিদ্যমান। গঙ্গাধর হাটখোলার ধনকুবের মদনমোহন দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধরের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন ছিলেন ; কোম্পানীর কাগজ, হুণ্ডী প্রভৃতির ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রামনারায়ণের পাঁচ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ প্যারীচাঁদ ও কনিষ্ঠ কিশোরীচাঁদের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ জুলাই (৮ শ্রাবণ ১২২১) কলিকাতায় প্যারীচাঁদের জন্ম হয়। তিনি শৈশবে গুরু মহাশয়ের নিকট বাংলা এবং মুন্শীর নিকট ফার্সী শিখিয়াছিলেন। ৭ জুলাই ১৮২৭ তারিখে তিনি ইংরেজী শিক্ষালাভের জন্য হিন্দুকলেজের একাদশ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। ঠিক কত দিন হিন্দুকলেজে ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। তবে তিনি জ্ঞানবীর ডিরোজিওর নিকট পড়িয়া থাকিবেন ; কারণ,

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ডিরোজিও হিন্দুকলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে প্যারীচাঁদ বিদ্যালয়ে পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই কালে জনসাধারণকে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়গুলি পরিচালন করিতেন হিন্দুকলেজের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রেরা। প্যারীচাঁদও স্বগৃহে এইরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন:—

Besides these pay schools, there were Native free schools for the gratuitous instruction of Hindu youths in English, established and chiefly supported by the Alumni of the Hindu College...Babu Peary Chand Mittra established a similar school at his house at Nimtollah Street; Mr. Derozio and Mr. David Hare took a lively interest in this school frequently visiting and examining the boys and distributing prizes to the most meritorions among them.—"On the Progress of Education in Bengali": Kissory Chand Mittra. *Transactions of the Bengal Social Science Association,* Vol. I, 1867.

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জনসাধারণের জন্য একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। পর-বৎসর ২১এ মার্চ 'দি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি'র দ্বার উন্মোচিত হয়। এস্প্লানেড রো'তে ডাঃ স্ট্রঙের বাড়ীর নিচের তলায় পাঠাগারটি প্রথমে অবস্থিত ছিল। ৮ মার্চ ১৮৩৬ তারিখে লাইব্রেরী-কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম সাধারণ অধিবেশনে প্যারীচাঁদকে এই প্রতিষ্ঠানের "সাব-লাইব্রেরিয়ান" নিযুক্ত করেন। সার

জন পীটার গ্রাণ্টের সুপারিশ-পত্রই যে প্যারীচাঁদকে এই পদ লাভে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি তাহার সাক্ষ্য দেয় :—

Calcutta, 8th July 1836.

Peary Chand Mittra was a student at the Hindoo College when I gave lectures there upon Jurisprudence which he attended and I have known him ever since. I formed a very favourable opinion then of the advantageous use he had made of the opportunities he had possessed of acquiring knowledge and of his love of study and readiness of apprehension. He has been since that time and I believe very much from my recommendation a Sub-Librarian at the Public Library, where I understand he has given satisfaction by his attention and good conduct. I have a very good opinion of his moral character and should be surprised and disappointed to find that he had failed in discharging any duty within his power entrusted to him.

He is an admirable English scholar, has engaging manners, and good temper so far as I can judge. He has correct moral principles, a great attachment to literary pursuits as far as his means have extended, and in my opinion, is likely to make a good teacher of what he already knows and to go on in the acquirement of more knowledge if he has access to books. He is already much better informed than most young men of his age and nation.

J. P. Grant.

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ও ভারতবর্ষীয় কৃষি-সমাজকে এক খণ্ড জমি দান করেন। এই জমির উপর ৬৮ হাজার টাকা ব্যয়ে মেটকাফ-হল নির্ম্মিত হয়; লর্ড মেটকাফ এদেশ ত্যাগ করিলে উপযুক্তরূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে (এখানে লাইব্রেরি ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে উঠিয়া আসে) মেটকাফ-হলের দ্বিতলে স্থানান্তরিত হয়। মেটকাফ-হল নির্ম্মাণে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রায় ১৬৪০০

টাকা ব্যয় বহন করিয়াছিলেন ; এই টাকা প্রধানতঃ প্যারীচাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই সংগৃহীত হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ সেন (এক সময়ে লাইব্রেরি-কাউন্সিলের সদস্য) তৎসম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' লিখিয়াছিলেন :—

In fact Peary Chand Mittra deserves the chief credit for organizing that institution, which, in the days of its small beginning was located in the lower rooms of Doctor Strong's house in the Esplanade Row. Sir Charles Metcalfe having retired at this time from the officiating post of Governor General of India, a public testimonial which had been voted to him for his inestimable services in giving freedom to the Indian Press, took the form of a building to be created from public subscriptions, to be called after his honoured name, and to be appropriated to the accommodation of the then existing two most useful institutions, ***viz.*****, the Calcutta Public Library and the Agricultural and Horticultural Society of India, which were without their own habitations. Peary Chand toiled from morning to eve with laudable zeal and energy in getting subscriptions for the building which has now through his exertions proved an ornament to the town. (30 December 1883)**

লাইব্রেরি-কর্তৃপক্ষ প্যারীচাঁদের যোগ্যতা বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরিয়ান স্টেসি (Stacey) পদত্যাগ করিলে কিউরেটারগণ প্যারীচাঁদকেই ১০০৲ বেতনে লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটরীর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর. ওয়াকার নামে এক জন কিউরেটার ১৯ জানুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে অন্যতম কিউরেটার জন্ বেলকে লেখেন :—

I will with pleasure support the claim of Peary Chand Mittra for the vacancy of Librarian. As far as I have had an opportunity of forming an opinion he is very intelligent and will do our work better than a European....

এত বড় একটি গ্রন্থাগারের সান্নিধ্যে থাকিয়া প্যারীচাঁদ জ্ঞানানুশীলনের যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ এই বৈতনিক পদ ত্যাগ করেন। লাইব্রেরির সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া, যথোপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শনের জন্য লাইব্রেরি-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে "অবৈতনিক সেক্রেটরী ও লাইব্রেরিয়ান" করেন। প্রতিষ্ঠাবধি লাইব্রেরির পরিচালনভার সাধারণতঃ তিন জন কিউরেটারের হস্তে ন্যস্ত ছিল; এই বৎসর হইতে প্যারীচাঁদ "অবৈতনিক কিউরেটার"ও হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নূতন ব্যবস্থা অনুসারে লাইব্রেরি-পরিচালনের জন্য কাউন্সিল গঠিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্যারীচাঁদ প্রতি বর্ষেই এই কাউন্সিলের সদস্য-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কর্তৃপক্ষ ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিতে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির সাব্-লাইব্রেরিয়ান-রূপে কার্য্যকালে প্যারীচাঁদ, কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহযোগে, 'কালাচাঁদ শেঠ এণ্ড কোং' নামে আমদানি-রপ্তানি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন (মার্চ ১৮৩৯)। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তারাচাঁদ অবসর গ্রহণ করিলে পর-বৎসর জানুয়ারি মাস হইতে কালাচাঁদ ও প্যারীচাঁদ উভয়ে মিলিয়া পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কালাচাঁদের মৃত্যু হয়; তাঁহার অছিরা পর-বৎসর মার্চ মাসে হিসাবপত্র চুকাইয়া লন। প্যারীচাঁদ তখন নিজে ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া লইয়া 'প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্স' নামে কারবার চালাইতে থাকেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন

করিয়াছিলেন। সততাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। ইংরেজ সওদাগর-সম্প্রদায় তাঁহার সাধুতার প্রশংসা করিতেন। ফলে তিনি গ্রেট ঈস্টার্ণ হোটেল কোং লিঃ, পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোং, হাওড়া ডকিং কোং লিমিটেড প্রভৃতি বহু বিলাতী কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। চায়ের ব্যবসাও তিনি ভাল বুঝিতেন; বেঙ্গল টী কোং, ডারাং টী কোং লিমিটেড প্রভৃতি তাঁহাকে বোর্ডের ডিরেক্টর করিয়াছিলেন।

সাময়িক-পত্র পরিচালন

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ, বন্ধু রাধানাথ সিকদারের সহযোগে, মহিলাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।* ইহার নাম 'মাসিক পত্রিকা'; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৬ আগস্ট ১৮৫৪। 'মাসিক পত্রিকা' চারি বৎসর চলিয়াছিল। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র প্রায় সমগ্র অংশ প্রথমে ইহারই পৃষ্ঠায় (১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা হইতে) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশের পূর্ব্বে প্যারীচাঁদ "ইয়ং বেঙ্গল"দের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' পরিচালন ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই দুইখানি পত্রিকা হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্র—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইত। 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৮৩১ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' ইংরেজী ও বাংলায় মুদ্রিত দ্বিভাষিক পত্র, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হইয়া

* "He [Radha Nauth Sickdar] conducted with me a monthly Bengali Magazine called 'Masic Patrica' for about three years."—Peary Chand Mittra : *A Biographical Sketch of David Hare*, p. 82.

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লুপ্ত হয়। উভয় পত্রিকাতেই প্যারীচাঁদের অনেক রচনা স্থান পাইয়াছিল। 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' প্রকাশের তিন মাস পূর্ব্বে ১০ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখে রামগোপাল ঘোষ তাঁহার বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিয়াছিলেন :—

The Magazine is to appear, if possible, on the 1st proximo. Kirshna [Mohun Banerjee], Tara Chand [Chuckerburty], and Peary [Chand Mittra] are to be regular contributors. They are pledged each of them to give one article, each number. Tara Chand will also look over the article, generally, and I am to be the puppet show of an Editor, and probably an occasional scribbler.

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগসূত্র

সে সময় দেশোন্নতিবিধায়ক এমন কোন সভা-সমিতি ছিল না, যাহার সহিত প্যারীচাঁদের যোগ না-ছিল। এই সকল সভা-সমিতির সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়া অনাবশ্যক ; মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (The Society for the Acquisition of General Knowledge) : ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত। যুগ্ম-সম্পাদক প্যারীচাঁদ ও রামতনু লাহিড়ী। তিনি এই সমাজে মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদিও পাঠ করিয়াছেন।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি : ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ বাগ্মী জর্জ্জ টমসন ইহার সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ২০ এপ্রিল ১৮৪৩ তারিখে জর্জ্জ টমসনের সভাপতিত্বে যে অধিবেশন হয়,

তাহাতে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাব হইতে সভার উদ্দেশ্য জানা যাইবে:—

> III That a society be now formed and denominated The Bengal British India Society; the object of which shall be, the collection and dissemination of information, relating to the actual condition of the people of British India, and the laws, institutions, resources of the country; and to employ such other means of a peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the welfare, extend the just rights, and advance the interests of all classes of our fellow subjects.

প্যারীচাঁদের সাহায্যে সভা একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহার নাম—*Evidence relating to the Efficiency of Native Agency in the Administration of the Affairs in this Country.*

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন: ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমাবধি প্যারীচাঁদ এই সভার সদস্য ছিলেন। সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২) তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; এই পদে তিনি আমরণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সভা প্যারীচাঁদ কর্তৃক সঙ্কলিত *Notes on the Evidence on Indian Affairs* প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বীটন সোসাইটি: ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের (Bethune) স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে এফ. জে. ময়েট (Mouat) এ-দেশীয় কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহায়তায় কলিকাতায় বীটন সোসাইটি নামে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেন। ডাঃ ময়েট ইহার সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ ও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ ইহার Committee of papers-এর সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

পশুক্লেশনিবারণী সভা (The Calcutta Society for the Prevention of Cruelty to Animals): ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়; প্যারীচাঁদ প্রথমাবধি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কোলস্‌ওয়ার্দী গ্রাণ্টের মৃত্যু হইলে তিনি সভার অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভা (The Bengal Social Science Association): ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্যারীচাঁদ ও এইচ. বেভারলী, সি-এস এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে প্যারীচাঁদ এই পদ ত্যাগ করেন।

কৃষি-বিষয়ে জ্ঞান

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি উইলিয়ম কেরী এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারীচাঁদ এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সমাজ হইতে প্রকাশিত *Journal*-এ প্যারীচাঁদের কোন কোন রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

দেশীয় লোকদের মধ্যে কৃষি-বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের প্রস্তাবে এই সভার *Transactions* ও *Journal* হইতে প্রবন্ধাদি বাংলা ভাষায় প্রচার করিবার জন্য একটি অনুবাদ-সমিতি গঠিত হয়। সমিতির চেষ্টায় 'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' (*The Agricultural Miscellany*) প্রকাশিত হয়; প্যারীচাঁদ ইহা সম্পাদন করিতেন। এই পুস্তকের ১ম-২য় খণ্ড ১৮৫৩,

৩য়-৪র্থ খণ্ড ১৮৫৪, ৫ম খণ্ড ১৮৫৫ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সভার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্য-বিবরণে প্রকাশ :—

Nearly all the papers in the first five numbers are translations from the *Transactions* and *Journals* but those in this number [No. 6] are original articles. The Council conceive that the best acknowledgements of the Society are due to the Translation Committee generally for selecting the papers for the volume in question but more specially to Babu Peary Chand Mittra who has kindly performed the office of Editor and to Babu Shib Chunder Deb to whom the Society are indebted for the long and useful list of plants extending over seventy pages which forms the appendix to this volume.

সভার মুখপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের প্যারীচাঁদ-কৃত বঙ্গানুবাদ 'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহে' মুদ্রিত হইয়াছিল। সভার উদ্যোগে প্যারীচাঁদ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষিপাঠ' নামে যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে এই সকল অনুবাদ, কয়েকটি মূল প্রবন্ধ সহ, স্থান পাইয়াছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের *Agriculture in Bengal* পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে তামাকের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ লিখিয়াছেন, "tobacco although mentioned in some Sanskrit works as *Tamrakut*, is not an indigenous article, and it must have been introduced before 1794 from America." এই প্রসঙ্গে ২১ আগস্ট ১৮৮১ তারিখে প্যারীচাঁদকে লিখিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

My dear, Babu Peary Chand,—The only mention of tobacco in a Sanskrit work occurs in the *Kularnava Tantra.* The word used is তাম্রকূট but the work is of questionable authenticity, and there is nothing to show that the verse is correct or reliable. There *is* no old or complete manuscript of the work available.

The name *Haladhara* is usually derived from Hala or plough which the God used as his armour of offence.

There is a distinct treatise on agriculture in Sanskrit and several long passages in the *Smritis* and the *Tantras* containing rules for agriculture. Yours sincerely, Rajendralala Mitra.

এই সকল রচনা হইতে কৃষি-বিষয়ে প্যারীচাঁদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ছোট লাট সার্ সিসিল বীডনের যত্নে বেলভেডিয়ারে যে বিরাট্ কৃষি-প্রদর্শনী হয়, তাহার Produce বিভাগের বিচারক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন প্যারীচাঁদ।

প্যারীচাঁদ এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির সদস্য ত ছিলেনই, ১৮৫৭ হইতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি দশ বৎসর এই সমাজের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের "অনরারি মেম্বর" নির্ব্বাচিত হন; বাঙালীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন।

এই প্রতিষ্ঠানের জন্য—বিশেষতঃ দেশে কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্য প্যারীচাঁদ যাহা করিয়া গিয়াছেন, সে-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া, সোসাইটি প্যারীচাঁদের একখানি চিত্র কার্য্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন ('ইংলিশম্যান,' ১৫ জানুয়ারি ১৯২৪)।

প্রেততত্ত্বের আলোচনা

প্যারীচাঁদ খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যা বামাকালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিপত্নীক হইলে তিনি ক্রমশঃ প্রেততত্ত্বের (Spiritualism) দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। প্রথম জীবনে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম অনুযায়ী মূর্ত্তিপূজক ছিলেন; কিন্তু কালক্রমে ব্রহ্মবাদী হইয়া উঠেন। তাঁহার *On the Soul* পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশ:—

I was born in 1814, and was brought up as an idolator. I received my education at the Hindu College. I came in contact with a number of congenial friends with whom I had periodical discussions on metaphysics, theology, politics and other subjects. My desire to understand God and his Providence was earnest from the reading of standard works on those subjects and theistic and Christian authors, as well of the Arya works, in Sanskrit and Bengali, produced a living conviction that there is but one God of infinite perfection. I became a theist or a Brahma...In 1860, I lost my wife, which convulsed me much. I took to the study of spiritualism which, I confess, I would not have thought of otherwise nor relished its charms.

তিনি বিলাত ও আমেরিকা হইতে এই বিষয়ে রাশি রাশি গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বৈবাহিক কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেবও প্রেততত্ত্ব আলোচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বিলাত ও আমেরিকার প্রধান প্রধান প্রেততত্ত্ব-আলোচনা-সভার সহিত প্যারীচাঁদের যোগ ছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ব্রিটিশ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্টস্ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্যারীচাঁদ ঐ প্রতিষ্ঠানের অনরারি করেস্‌পণ্ডিং মেম্বর এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্টস্ গঠিত হইলে ঐ সভার অনরারি মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্টস্ প্রতিষ্ঠিত হয়।* প্যারীচাঁদ এই সভার সহকারী সভাপতি, এবং জে. জি.

* প্যারীচাঁদ *On the Soul* পুস্তকের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন :—"A few friends used to meet in Mr. J. G. Meugens' office, No, 3, Church Lane, every Sunday afternoon, to talk on matters connected with spiritualism, and it was thought desirable to organise a society under the name of the United Association of Spiritualists on the 30th May 1880..."

মিউগেন্স (Meugens) ও নরেন্দ্রনাথ সেন যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

প্রেততত্ত্ব বিষয়ে প্যারীচাঁদের বহু রচনা ১৮৭৭-৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লণ্ডনের 'স্পিরিচুয়ালিস্ট,' বোস্টন আমেরিকার 'ব্যানার অব লাইট,' বোম্বাইয়ের 'থিয়সফিস্ট' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ; এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই তাঁহার *The Spiritual Stray Leaves* পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

থিয়সফিতে অনুরাগ

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি গঠিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ ইহার করেস্‌পণ্ডিং ফেলো নির্ব্বাচিত হন। এই সভার সভাপতি ছিলেন—কর্নেল ওলকট্ (Col. H S. Olcott) এবং প্রাণস্বরূপ ছিলেন মাদাম ব্লাভাট্স্কি (Mme. H. P. Blavtsky) ; সভার তৎকালীন উদ্দেশ্য ছিল "to promote the study of the esoteric religious philosophies of the East." লণ্ডনের *Spiritualist* পত্রে প্যারীচাঁদের প্রেততত্ত্ব-বিষয়ক রচনা পাঠ করিয়া, ওলকট্ তাঁহাকে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির 'করেস্‌পণ্ডিং ফেলো' হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। তিনি লিখিয়াছিলেন (৫ জুন ১৮৭৭):—

...the Council have instructed me to respectfully request the privilege of enrolling your name among our Corresponding Fellows. These views of yours are exactly what we are trying to spread throughout this Christian country (where every precept of Christ is constantly violated, and hypocrisy and sensualism stalk through every church under cover of the priestly robe and the episcopal mitre.)

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ওলকট্ ও ব্লাভাট্স্কি বোম্বাইয়ে আসিয়া তথায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্র স্থাপন করেন। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে তাঁহারা *Theosophist* পত্র বাহির করেন। ইহার প্রথম সংখ্যায় "The Inner God" নামে প্যারীচাঁদের একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহার এক স্থলে আছে :—

The end of Spiritualism is Theosophy, Spiritualists and Theosopists should, therefore, be united and bring their thoughts to bear on this great end.

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ মার্চ ওলকট্ কলিকাতা আগমন করেন। পরবর্ত্তী ১লা এপ্রিল তারিখে ওলকটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একটি সান্ধ্য বৈঠকের আয়োজন করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। প্যারীচাঁদ অতিথিকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার পর বলেন :—

...Many of my countrymen understand the object of your establishing the Theosophical Society. What the *Maharshis* and *Rishis* had taught in the *Vedas*, *Upanishads*, *Yoga*, *Tantras* and *Purans*, is, that Divinity is in humanity, and that the life assimilated to Divinity is the spiritual life—the life of *Nirvana* which is attainable by extinguishing the natural life by Yoga, culminating in the development of the spiritual life. It is for the promotion of the truly religious end that you, brother, and that most exalted lady Madame Blavatsky, at whose feet I feel inclined to kneel down with grateful tears, have been working in the most saint-like manner, and your reward is from the God of all perfection...No one who raises himself above the human platform by the life of *Nirvana* can know God, and this explains why some people judge of God by the human standard. Spiritualism, Occultism and Theosophy, all grew and flourished here. Ages of misrule have thrown them back. The study of European sciences have taken their place. They are no doubt good in their way, but they cannot reveal the secrets of nature which can only be known through the soul, the study of which

it is the duty of every God-loving person to encourage in every possible way, and I feel grateful to God and his good angels that by the cultivation of Theosophy, the light, which the *Rishis* had shed on the subject of the soul and its natural connection with God, and which had sunk into obscurity, is being kindled by the indefatigable exertions of Sister Blavatsky and Brother Olcott...

৫ই এপ্রিল ওলকট টাউন-হলে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—Theosophy : the scientific basis of religion. প্যারীচাঁদ এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পরদিন (৬ এপ্রিল) মাদাম ব্লাভাট্স্কি কলিকাতা আসিয়া পৌছান। সেই দিন সন্ধ্যাকালে ওলকটের সভাপতিত্বে একটি সভার অনুষ্ঠান হয় ও থিয়সফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা গঠিত হয়। পরবর্ত্তী ১৭ই এপ্রিল তারিখের সভায় নির্ব্বাচিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণের তালিকা :—

সভাপতি—প্যারীচাঁদ মিত্র

সহ-সভাপতি—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজা শ্যামাশঙ্কর রায়

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—নরেন্দ্রনাথ সেন

সহ-সম্পাদক—বলাইচাঁদ মল্লিক ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্যারীচাঁদের সভাপতিত্বে, ২ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট—ইণ্ডিয়ান মিরর কার্য্যালয়ে, এই সমিতির একটি করিয়া পাক্ষিক অধিবেশন হইত। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্যারীচাঁদ এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন।

প্রতিভার সম্মান

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্যারীচাঁদ "মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োজিত" হন।* অল্প দিন পরেই

* 'সোমপ্রকাশ,' ২৭ এপ্রিল ১৮৬৩।

তিনি "অনরারি জষ্টিসের পদ" লাভ করিয়াছিলেন।* পর-বৎসর (১৮৬৪) এপ্রিল মাসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত ও ১লা জুন (১৮৬৪) "বড় জেল ও হরিণবাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক" নিযুক্ত হন।† এই সময়ে তিনি হাইকোর্টের গ্রাণ্ড জুরর হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত প্যারীচাঁদ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। আইন-পরিষদের সদস্য-হিসাবে তাঁহার একটি কাজ বিশেষভাবে স্মরণীয়; প্রধানতঃ তাঁহারই যত্ন চেষ্টায় পশু-ক্লেশ-নিবারণ-বিষয়ে দুইটি বিল (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ ও ৩ নং অ্যাক্ট) পরিষদে উপস্থাপিত এবং যথাসময়ে আইনে পরিণত হইয়াছিল।

মৃত্যু ; স্মৃতিরক্ষা

২৩ নবেম্বর ১৮৮৩ তারিখে উদরী রোগে প্যারীচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার বন্ধু ও গুণমুগ্ধ জনেরা ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে এক বিরাট্ শোকসভার আয়োজন করেন। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবচন্দ্র দেব, নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন; অনেকে বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদের যথোপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার জন্য এই সভায় একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। স্মৃতি-সমিতির প্রযত্নে যে অর্থ সংগৃহীত

---

* 'সোমপ্রকাশ,' ১৮ মে ১৮৬৩।

† 'সোমপ্রকাশ,' ৬ জুন ১৮৬৪।

হইয়াছিল, তাহাতে দুইটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হয়। ২২৬৮৲ টাকা ব্যয়ে প্যারীচাঁদের একটি আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি টাউন-হলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (৫ জানুয়ারি ১৮৮৬); ভাস্কর—সিনর জেফ্লোস্কি (Signor Geflowsky)। ইহা ছাড়া স্মৃতি-সমিতি ৭ মে ১৮৮৬ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পাঁচ শত টাকা দিয়া একটি গচ্ছিত তহবিলের সৃষ্টি করেন। এই তহবিলের সুদে প্রতি বৎসর, বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে যিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে (যদি তিনি সেই বৎসর অন্য কোন বিষয়ে পদক না পান) একটি রৌপ্য-পদক দিবার বন্দোবস্ত হয়।

পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শোক-সন্তপ্ত মিত্র-পরিবারকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

...He was a link of union between European and Native Society which will be regretted now as a "missing link" by both those communities. No one was more fitted for the highest position open to native ambition than he was, and yet despising worldly ambition and indifferent to self-interest he adhered to the interests of his country and laboured indefatigably for those interests. (27 November 1883)

রচনাবলী

বাংলা : প্যারীচাঁদ বাংলায় যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **আলালের ঘরের দুলাল**। ১২৬৪ সাল (ইং ১৮৫৮)।*
পৃ. ৷০+১৮০।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক 'আলালের ঘরের দুলালে'র একটি প্রামাণিক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। প্যারীচাঁদের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহায্যে ইহার পাঠ নির্ণীত হইয়াছে। তথ্যপূর্ণ ভূমিকা, দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ ও অনেকগুলি চিত্র এই সংস্করণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্যারীচাঁদের অন্যতম পুত্র হীরালাল মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল নাটক' প্রকাশ করেন। ইহা ১৮৭৫ সনে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথমে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ইহা বিলাত হইতে প্রকাশিত *Journal of the National Indian Association*-এ (Nos. 139-48, জুলাই ১৮৮২-৮৩) "The Spoilt Child" নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; অনুবাদ-কার্য্যে মিত্র-মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন—মিরিয়ম এস. নাইট। ১৮৯৩ সনে জি. ডি. অসওয়েল (G. D. Oswell) *The Spoilt Child*; A Tale of Hindu Domestic Life নামে ইহার একটি স্বতন্ত্র ইংরেজী অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

* ইহা যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল, সমসাময়িক পত্রিকার সমালোচনা দৃষ্টে তাহাই মনে হয়। ৮ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইহার এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ২২এ এপ্রিল তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর'ও লেখেন :—"আলালের ঘরের দুলাল' নামক একখান চিত্তসন্তোষকর নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি।"

২। **মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়।** ১২৬৬ সাল (ইং ১৮৫৯)।* পৃ. ৬২।

পরস্পর-অসম্বদ্ধ কয়েকটি গল্পের সাহায্যে ইহাতে "মাতলামি" ও মাতলামি-সঞ্জাত "বখামি"র স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩। **রামারঞ্জিকা।** ইং ১৮৬০। পৃ. ৯৪।

পতি-পত্নীর কথোপকথনচ্ছলে স্ত্রীলোকদের প্রতি সাংসারিক বিষয়ে উপদেশ। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির সংস্কৃত বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য মনীষিগণের জননীদের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। **কৃষি পাঠ।** ইং ১৮৬১। পৃ. ৩১।

কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ-সমষ্টি।

৫। **গীতাঙ্কুর।** ১২৬৮ সাল (ইং ১৮৬১)। পৃ. ১৬।

ব্রহ্ম-বিষয়ক কয়েকটি গানের সমষ্টি।

৬। **যৎকিঞ্চিৎ।** ইং ১৮৬৫। পৃ. ১২৬।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনাশিত্ব, পরলোক ও উপাসনাদি বিষয়ক আলোচনা।

৭। **অভেদী।** ১৫ জানুয়ারি ১৮৭১। পৃ. ৮০।

আধ্যাত্মিক উপন্যাস। নায়ক এবং নায়িকা আত্মবিষয়ক জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত; নানা দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়া তাহাদের পরমার্থলাভ।

---

* ১ জুলাই ১৮৫৯ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' এবং জুন মাসের 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে সমালোচিত।

৮। **ডেবিড হেয়ারের জীবন চরিত।** ১২৮৫ সাল (২৭ মে ১৮৭৮)। পৃ. ২৬।

৯। **এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা।** ১৮০০ শক (২ জানুয়ারি ১৮৭৯)। পৃ. ৪৮।

প্রাচীন মহীয়সী স্ত্রীলোকগণের জীবনকাহিনী।

১০। **আধ্যাত্মিকা।** ১২৮৬ সাল (১০ এপ্রিল ১৮৮০)। পৃ. ১০০।

নারীকল্যাণমূলক উপন্যাস।

১১। **বামাতোষিণী।** ১২৮৮ সাল (১৭ ডিসেম্বর ১৮৮১)। পৃ. ৭২।

নীতিমূলক গল্প ; সন্তান পালনের জন্য পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যজ্ঞানের এবং বালিকাদিগের সং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ : পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বিদ্যা-কল্পদ্রুমে'র ৫ম খণ্ডে (ইং ১৮৪৭) প্রকাশিত "যুধিষ্ঠিরের চরিত্র," "প্লেতোর চরিত্র" ও "বিক্রমাদিত্যের চরিত্র" প্যারীচাঁদ কর্ত্তৃক লিখিত ; এই তিনটি প্রবন্ধ একত্রে পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল।* প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার কয়েকটি অসম্পূর্ণ রচনা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে ; এগুলি :—

ঈশ্বর উপাসনা	...	'পন্থা,' শ্রাবণ ১৩১৬
উপাসনা	...	'নব্যভারত,' আষাঢ় ১৩১৭
পিতা ও পুত্র	...	ঐ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩১৭

ইংরেজী : প্যারীচাঁদ অনেকগুলি ইংরেজী গ্রন্থেরও রচয়িতা। প্রকাশকাল সমেত এগুলির তালিকা :—

* J. Long : *A Return of the Names and Writings of 515 Persons...* 1855, p. 55.

Notes on the Evidence on Indian Affairs. (Under the superintendence of the Bengal British Indian Association.)	...	1853
A Biographical Sketch of David Hare	...	1877, 12 Apr.
The Spiritual Stray Leaves	...	1879, 10 Aug.
Stray Thoughts on Spiritualism	...	1880, 12 July
Life of Dewan Ramcomul Sen	...	1880, 5 Octr.
Life of Colesworthy Grant	...	1881, 26 Apr.
On the Soul : Its nature and development	...	1881, 30 July
Agriculture in Bengal. With Notes by Baboo Joykissen Mokerjea, Zemindar	...	1881, 14 Nov.

প্রবন্ধ : 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা'য় প্যারীচাঁদ দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; উহা সভার কার্য্যবিবরণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে :

(১) State of Hindoostan Under the Hindoos.

পাঁচ কিস্তিতে সম্পূর্ণ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ও ১৩ নবেম্বর ১৮৩৯, ২১ অক্টোবর ১৮৪০, এবং ১২ মে ও ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪১ তারিখের অধিবেশনে পঠিত।

(২) A few desultory Remarks on the "Cursory Review of the Institutions of Hindooism affecting the interest of the Female Sex," contained in the Rev. K. M. Banerjea's Prize Essay on Native Female Education.

১২ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখের অধিবেশনে পঠিত।

প্যারীচাঁদ 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড,' 'হিন্দু পেট্রিয়ট,' 'বেঙ্গলী,' 'বেঙ্গল হরকরা,' 'ইংলিশম্যান,' 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রভৃতি সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু,' 'ইণ্ডিয়া রিভিয়ু' প্রভৃতি পত্রেও তাঁহার অনেকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; এগুলির তালিকা :—

Tarachand Chuckervuttee	...	*India Review*, March 1840
The Zemindar and the Ryot	...	*Calcutta Review*. Octr. 1846
The Agri-Horticultural Society of India*	...	April 1854
The Court Amlas in Lower Bengal	...	April 1854
Marriage of Hindu Widows	...	*Cal. Review*, Octr. 1855
The Department of Revenue, Agriculture and Commerce	...	July 1871
The Development of the Female Mind in India		July 1872
The Indian Wheat	...	April 1878
The Psychology of the Aryas	...	Jany. 1877
Commerce in Ancient India	...	Jany. 1878
Notes on Bengal Rice. *Journal of the Agricultural and Horticultural Socy. of India*, Vol. V., Pt. IV. N. S.		1878
Social Life of the Aryas	...	*Calcutta Review*, Jany. 1879
The Hindu Bengal	...	April 1880
Notes on Early Commerce in Bengal	...	Jany. 1881

প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার কয়েকটি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ইংরেজী প্রবন্ধ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলির দুই-চারিটি আবার পূর্ব্ব-প্রকাশিত রচনার পুনর্মুদ্রণ মাত্র। এই সকল রচনার তালিকা :—

Education in Bengal		*The National Magazine*, *Dec*, 1907 Jany. 1908
Early History of the District Charitable Society		Mar. 1908
Life of Rustomjee Cowasjee	...	Apr., May 1908
Early Recollections	...	June, Aug. 1908
Notes on the Soul	...	Octr., Dec. 1908 Jany., Feb, Apr. 1909
Moral Culture	...	July 1909
Yoga and Spiritualism	...	Dec. 1909
Do.		*The Hindu Spiritual Mag.* Apr. 1909

* ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ম সংখ্যা 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'র পরিশিষ্টে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জর্জ স্মিথ প্রবন্ধলেখক ও তাঁহাদের রচনার যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে ভ্রমক্রমে এই প্রবন্ধটি সার্ রিচার্ড টেম্পলের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ২৩ জুলাই ১৮৭৪ তারিখে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এই ভুল সংশোধন করেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র ও বাংলা-সাহিত্য

এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান"* নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কথাগুলি উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে সামান্য দুই-চারিটি কথা বলিব। সহজ সর্ব্বজনবোধ্য ভাষাকে ভাবপ্রকাশের বাহন করিবার চেষ্টা প্যারীচাঁদের পূর্ব্বে একাধিক জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা হয় মাত্র কথোপকথনে বা কথকতায়, অথবা রচনা-রীতির একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হিসাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কেরী-সঙ্কলিত 'কথোপকথন' প্রথমোক্ত চেষ্টার নিদর্শন; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় দ্বিতীয় চেষ্টার নিদর্শন অনেক আছে। কিন্তু এই ভাষাকে বাংলা-সাহিত্যের সর্ব্ববিধ রচনার বাহন করিবার প্রথম ব্যাপক চেষ্টা প্যারীচাঁদই করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ আরও কৃতিত্বের সহিত এই আন্দোলন চালাইয়াছিলেন; তিনি প্রধানতঃ মৌখিক বুলির সাহায্য লইয়াছিলেন।

'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশে প্যারীচাঁদ এবং তাঁহার সহযোগী রাধানাথ সিকদারের দুঃসাহসিকতা আজও আমাদের বিস্ময়ের বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ইঁহারা এই সাহস প্রদর্শন না করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে আমরা বাংলা-সাহিত্যের এমন উন্নতি ও প্রসার আশা করিতে

---

* ১৮৯২ সনের ডিসেম্বর মাসে ক্যানিং লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'লুপ্তরত্নোদ্ধার বা ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা।

পারিতাম না। সংস্কৃতের কঠিন শৃঙ্খল হইতে প্যারীচাঁদ বাংলা ভাষাকে মুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধু ও চলিত, এই দুই রীতির সংমিশ্রণে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের বাহনস্বরূপ এই গতিশীল ভাষার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বলিখিত আলোচনায় নিজের কৃতিত্বকে বাদ দিয়াছেন বলিয়া তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

"বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। কথাটা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

এক জনের কথা অপরকে বুঝান ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদম্বরী-প্রণেতা এবং ইংরাজীতে* এমর্সনের রচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক্ যে, বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহাপ্রতিভাশালী কবিগণ তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাব সকল তদুপযোগী উন্নত ভাষা ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না, এই জন্য অনেক সময়ে, মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কার স্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত

করেন।* কিন্তু গদ্যের এরূপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক-রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না, কেন না হস্ত-লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ

* কবি যদি ভাষার উপর প্রকৃতরূপে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাকাব্যও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয়। সংস্কৃতে রামায়ণ ও কালিদাসের মহাকাব্য সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরূপ সুখবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতে আর নাই।

'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না,—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুন্দর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার

মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গলা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ্ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তি-বিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ্ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালী লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ্।

এই দুইটি গুরুতর বিপদ্ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং

সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

আমি এমন বলিতেছি না যে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা আদর্শভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ*। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে

পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না! তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি।"

রচনার নিদর্শন: প্যারীচাঁদের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার বিভিন্ন রচনা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইল :—

'আলালের ঘরের দুলাল': সুখের রাত্রি দেখিতে২ যায়। যখন মন চিন্তার সাগরে ডুবে থাকে তখন রাত্রি অতিশয় বড় বোধ হয়। মনে হয় রাত্রি পোহাইল কিন্তু পোহাইতে পোহাইতেও পোহায় না। বাবুরাম বাবুর মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা কৌশল—নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল। ঘরে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত না হইতে২ ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দেখিতে২ ভাঁটার জোরে

বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বলদেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোপার গাধা থপাস্২ করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হুহু করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি২ হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কেহ বলিছে পাপ ঠাকুরঝির জ্বালায় প্রাণটা গেল—কেহ বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাঁটকি—কেহ বলে দিদি আমার আর বাঁচ্‌তে সাধ নাই—বৌছুঁড়ি আমাকে দু পা দিয়া থেত্‌লায়—বেটা কিছুই বলে না; ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে—কেহ বলে আহা এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবা-রাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল—কবে মরি কবে বাঁচি এইবেলা তার বিএটি দিয়ে নি।

এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে স্থানে২ কাণা মেঘ আছে—রাস্তা ঘাট সেঁত২ করিতেছে। বাবুরাম বাবু এক ছিলিম তামাক খাইয়া একখানা ভাড়া গাড়ি অথবা পাল্কির চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না—অনেক চড়া বোধ হইল। রাস্তায় অনেক ছোঁড়া একত্র জমিল। বাবুরাম বাবুর রকম সকম দেখিয়া কেহ২ বলিল—ওগো বাবু ঝাঁকা মুটের উপর বসে যাবে? তাহা হইলে দুপয়সায় হয়? তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে—বলিয়া যেমন বাবুরাম দৌড়িয়া মারিতে যাবেন অমনি দড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। ছোঁড়াগুলো হো২ করিয়া দূরে থেকে হাততালি দিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু অধোমুখে শীঘ্র একখানা লকাটে রকম কেরাঞ্চিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন এবং খন্২ ঝন২ শব্দে

বাহির শিমলের বাঞ্ছারাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঞ্ছারাম বাবু বৈঠকখানার উঁকিল বটলর সাহেবের মুতস্থদ্দি—আইন আদালত—মামলা মকদ্দমায় বড় ধড়িবাজ। মাসে মাহিনা ৫০ টাকা কিন্তু প্রাপ্তির সীমা নাই, বাটীতে নিত্য ক্রিয়াকাণ্ড হয়। তাঁহার বৈঠকখানায় বালীর বেণীবাবু, বহুবাজারের বেচারামবাবু, বটতলার বক্রেশ্বর বাবু আসিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন।

বেচারাম। বাবুরাম! ভাল দুধ দিয়া কাল সাপ পুষিয়াছিলে। তোমাকে পুনঃ২ বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই—ছেলে হতে ইহকালও গেল—পরকালও গেল। মতি দেদার মদ খায়—জোয়া খেলে—অখাদ্য আহার করে। জোয়া খেলিতে২ ধরা পড়িয়া চৌকিদারকে নির্ঘাত মারিয়াছে। হলা, গদা ও আর২ ছোঁড়ারা তাহার সঙ্গে ছিল। আমার ছেলেপুলে নাই। মনে করিয়াছিলাম হলা ও গদা এক গণ্ডূষ জল দিবে এখন সে গুড়ে বালি পড়িল। ছোঁড়াদের কথা আর কি বলিব? দূর২।

'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়': মাতালের কাছে যে সকল লোক যায় তাহারা লক্ষ্মীর বরযাত্রী—মদের লোভেই যায়—মদ না পাইলে সম্পর্ক কি? ভবানীবাবু সকলকে ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠ্‌তে পারিলেন না, আপনি বিলাতি রকম খান, অন্যকে ধেনো গোছ দেন। সঙ্গি বাবুদের বরাবর মিছরি খাইয়া মুখ খারাপ হয়েছিল, এখন মুড়ি ভাল লাগ্‌বে কেন? সুতরাং তাহারা ক্রমে২ ছটকে পড়িতে লাগিল। ভবানীবাবুর এমন অভ্যাস হইয়াছিল কেহ কাছে থাকুক বা না থাকুক আপনি প্রত্যহই পূর্ণ মাত্রাটী লইবেন। এই প্রকার ভাবে কিছুকাল থাকেন, দৈবাৎ একদিন তাঁহার পক্ষাঘাত হইল, এক হাত ও এক পা অবশ হইয়া

পড়িল, কেবল কথা এড়িয়ে যায় নাই এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার মা ও স্ত্রী ও পুত্রেরা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া বসিলেন, দুই এক জন আত্মীয়ের পরামর্শে ডাক্তর হেয়ার সাহেবকে আনাইলেন। ডাক্তর সাহেব ভবানীবাবুর পিতার মুরুব্বি ছিলেন, তাঁহার পিতার বিষয়কর্ম্ম ডাক্তর সাহেবের সুপারিসে হইয়াছিল, তিনিও নানা প্রকারে সাহেবের নিকট উপকৃত হন। ভবানীবাবুর বাল্যাবস্থায় ডাক্তর সাহেবের বাটীতে সর্ব্বদাই যাইতেন কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর একবারও তাঁহার দ্বারে দাঁড়ান্ নাই। ডাক্তর সাহেব ভবানীবাবুর সংক্রান্ত সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া খেদ ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভবানীবাবুর মাতা কাঁদিতে২ ডাক্তর সাহেবের পায়ে জড়িয়া পড়িয়া বলিলেন—বাবা তোমার অন্নে আমাদের শরীর—এক্ষণে ছেলেটিকে যাতে পাই তা কর। ডাক্তর সাহেব অনেক ভরসা দিয়া বিশেষ মনোযোগী হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন হইল মদ কেমন ভবানীবাবু চক্ষে দেখেন নাই—মাতাল বাবুদেরও আসা যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। আপনি বিছানায় পড়ে—উঠিবার তাকৎ নাই—পরিবারেরা কেহ না কেহ ধরিয়া উঠাচ্ছে—বসাচ্ছে—খাওয়াচ্ছে—শোয়াচ্ছে। তিনি যাহাতে সোয়াস্থি পান—যাহাতে ভাল থাকেন, প্রাণপণে তাহাই করে। এইরূপ স্নেহ দেখিয়া ভবানীবাবুর অন্তঃকরণ এক২ বার নরম হইতেছে—তিনি মনে২ কহিতেছেন—হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি! পরিবারকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি, তাহাদিগের কথা কখন শুনি নাই, কিন্তু আমার এই অসময়ে তাহারা প্রাণ দিতে উদ্যত। তিন চার দিবসের পর ডাক্তর সাহেব আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া

বলিলেন—ভবানি! তুমি আরাম হবে, আর কোন ভয় নাই—আমি তোমার কাছ থেকে টাকাকড়ি লব না, তুমি যে ভাল হইলে এই আমার পরম আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু আমার একটি কথা শুনিতে হইবে; তোমার রোগ মদ খাবার দরুণ—তোমাকে একেবারে মদ ত্যাগ করিতে হইবে—মদ খাওয়াতে তোমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, পুনরায় তোমার এরূপ পীড়া হইলে কোন প্রকারেই বাঁচিবে না। ডাক্তর সাহেব গমন করিলে ভবানীবাবুর মাতা বলিলেন—বাবা! আমার মাথা খাও, ডাক্তরের কথাটি শুনিও! আমাকে খেতে পরতে দাও বা না দাও সে ক্লেশ বড় ক্লেশ নহে, তুমি ভাল থাকিলেই আমার লক্ষ লাভ। ক্ষণেক কাল পরে স্ত্রী পায়ে হাত বুলাইতে২ বলিলেন—আমার বড় ভাগ্য যে আবার এ পায়ে হাত দিতে পাইলাম, প্রায় দশ বৎসর হইল বেঁচে আছি কি মরে গিয়েছি একবার জিজ্ঞাসাও কর নাই—বড় অধর্ম্ম না হইলে স্ত্রীজন্ম হয় না—আমরা অবলা—আমাদের কোন চারা নাই—তোমরা যা করবে তাই সহিতে হবে—কখন আমার মুখ দেখ নাই—বরং সর্ব্বদা গালি দিয়াছ তাতে আমার খেদ নাই—আমি আর জন্মে যেমন কর্ম্ম করেছি, তেমনি ফল হচ্ছে—আমার কপালে সুখ না থাকিলে কোথা থেকে হবে? সে যাহা হউক, এখন এই ভিক্ষা দাও আর বাওগুলি রকমে চলিও না। আমি তোমার কাছে টাকাকড়ি চাই নে—গতর থাকলে দাসীগিরি করিয়া ছেলেদের খাওয়া পরা দিতে পারব, এই মাত্র চাহি তুমি ভাল থাক—তোমার রোগ আর যেন আমাকে দেখতে হয় না। পরে বড় পুত্রটী আসিয়া নিকটে বসিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন—ইচ্ছা হইল কিছু বলিবেন কিন্তু মুখ বাধ্২ করে, অবশেষে ভরসা করিয়া প্রথমে আদ২ কহিতে লাগিলেন পরে বলিলেন—বাবা স্কুলে গেলে সকলে

বলে তুই সেই মাতাল বেটার ছেলে, তুইও বাপের মত হবি, তোর উপরে আমাদের বিশ্বাস কি? আমি সেই জন্যে কাহারো কাছে মুখ দেখাতে পারি না। এই সকল কথা শুনিয়া ভবানীবাবু এঁ ওঁ করিয়া অন্যান্য কথা ফেলেন কিন্তু তাঁহার পত্নী তাহাতে ভোলেন না তিনি আপন কথাই উল্‌টে পাল্‌টে ধরেন। কাণাকে কাণা বললে বড় রাগে। ভবানীবাবু অমনি ত্যক্ত হইয়া উঠিয়া উত্তর করিলেন—আ! কি আপদেই পড়লাম! পোড়া ঘায় আর লুণের ছিটে কেন দাও? এমত গঞ্জনা খাওয়া অপেক্ষা যে মরা ভাল ছিল—সে যাহা হউক, আমার বড় দিব্য যদি কখন আর মদ স্পর্শ করি—আজ অবধি শপথ করিয়া ত্যাগ করিলাম।"

'যৎকিঞ্চিৎ': "ত্রিযামা উপস্থিত। নয়ন উন্মীলন করিয়া নভোমণ্ডল অবলোকন কর। অসংখ্য তারা অসংখ্য সূর্য্যস্বরূপ অসংখ্য সৃষ্টির নিয়ামক। এক এক তারা নিরীক্ষণে বহুধা বোধ হইবে। একটী একটী তারা আমাদিগের সূর্য্যের ন্যায় গ্রহাবৃত ও সকল গ্রহ রাশিচক্রে ধাবমান। দূরবীক্ষণ যতই দৃষ্টিক্ষম হইতেছে ততই নূতন২ তারা প্রকাশ হইতেছে। আমাদিগের সূর্য্যের অনুগত যে যে গ্রহ জানা ছিল তাহা অপেক্ষা নূতন নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারাগণ ও গ্রহাদি সকলই প্রাণিময় ও সৃষ্টি অনন্ত। পৃথিবী রাশিচক্রে ধাবমান হইতেছে—সূর্য্যের তারতম্য ঋতুর পরিবর্ত্তন—ঋতুর পরিবর্ত্তনে শস্যের উৎপত্তি—শস্যের উৎপত্তিতে জীব জন্তুর পালন। সূর্য্যের উদয় ও অস্তমিতিতে দিবা রাত্রি—দিবা রাত্রিতে উদ্ভিদের বর্দ্ধন ও জীব সকলের শ্রম ও বিশ্রামের উপযোগিতা। সূর্য্যের তেজে সকল বস্তু হইতে বারি আকর্ষিত হইতেছে ও ঐ বারি ধূমবৎ হইয়া মেঘাকৃতিতে গগন ভূষিত করিতেছে এবং ঐ মেঘ সকল বারিত্ব প্রাপ্ত

হইয়া বৃষ্টি স্বরূপে পতিত হইতেছে। যে সকল পর্ব্বত বারিতে পরিপূর্ণ হইতেছে সেই সকল পর্ব্বত হইতে নদ নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদ নদীর জল চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র হইতে আসিতেছে। বায়ুর এক গতি নহে, দিনে দিনে—সময়ে সময়ে গত্যন্তর হইতেছে। উক্ত কারণ সকল জন্য কৃষি ও বাণিজ্যের কি মহৎ উপকার এবং কৃষি ও বাণিজ্যের মঙ্গলে আমাদিগের কি মঙ্গল! বাহ্য সৃষ্টির প্রকরণ যতই বিবেচনা কর ততই এই নিশ্চয় জানিবে যে, ঐ সকল প্রকরণে আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে কি অদ্ভুত শক্তি ও জ্ঞান দৃষ্ট হয় না? এ কি নিয়ন্তা ব্যতিরেকে হইতে পারে? কার্য্য কারণ ব্যতিরেকে কি রূপে সম্ভবে? কোন গ্রন্থ, লেখক ব্যতিরেকে হইতে পারে? কোন চিত্রপট, চিত্রকর ব্যতিরেকে হইতে পারে? কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাতা ব্যতিরেকে হইতে পারে? এই যে অসংখ্য অচেতন ও চেতন বস্তুর কি আদি কারণ নাই? কাহার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি নির্ব্বাহিত হইতেছে। কে সকলকে পালন ও রক্ষা করিতেছে? এই সকল কার্য্য কি আপনা আপনি হইতে পারে? যদি এ সম্ভবে, তবে সূর্য্য ব্যতিরেকে আলোক, চন্দ্র ব্যতিরেকে জ্যোৎস্না, অগ্নি ব্যতিরেকে দাহিকা শক্তি, বায়ু ব্যতিরেকে শীতলতা, বাষ্প ব্যাতিরেকে মেঘও হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না এ জন্য কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য? যদি সূর্য্য কোন কারণ বশতঃ অদৃষ্ট হইত ও কেবল তাহার তেজ প্রকাশ হইত তবে অদর্শন জন্য ঐ তেজের কারণ কি অবিশ্বাস্য হইত?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান যে স্বভাবসিদ্ধ ও দিগ্‌দর্শন শলাকার ন্যায় আত্মা ঈশ্বরেতে ধাববান তাহা আমরা নানা প্রকারে দেখিতেছি। যখন ঘোর বিপদ্ বিষাদ বা শোক উপস্থিত হয়—যখন এমত অবস্থায়

পতিত যে আর কোন উপায় নাই—যখন কোন নিদারুণ ক্লেশ জন্য শরীর হইতে যেন প্রাণ বিয়োগ হয়—যখন পাপে এমত পরিপূর্ণ যে আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা হইতেছে—যখন মৃত্যু উপস্থিত ও পূর্ব্ব কর্ম্মাদি স্মরণে চিত্ত দহমান হইতেছে, তখন আত্মা কাহাকে চিন্তা—কাহাকে স্মরণ করে? প্রকৃত অবস্থায় না পড়িলে প্রকৃত ভাবের প্রকাশ হয় না। এক্ষণে বিনীত ভাবে সেই কৃপাময়কে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া যে জ্ঞান তিনি প্রদান করিয়াছেন তাহার উন্নতিতে যত্নবান্ হও।

প্রেমানন্দ করজোড়ে উর্দ্ধে দৃষ্টি করত এই উপাসনা করিলেন। হে পরমাত্মন্! তুমি স্বর্গের স্বর্গে বিশেষ রূপে বিরাজ করিতেছ। অসংখ্য দেবতারা সুমধুর সংকীর্ত্তনে মগ্ন থাকিয়া তোমার অভিবাদন ও প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তুমি সামান্যরূপে সকল বস্তু ও জীবে আছ। তুমি জ্যোতি স্বরূপ, গতি স্বরূপ, আকর্ষণ স্বরূপ, শক্তি স্বরূপ, সম্মেলন স্বরূপ, সৌন্দর্য্য স্বরূপ, সুগন্ধ স্বরূপ, সুরম্যধ্বনি স্বরূপ। তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা—সর্ব্বসুখদাতা। বাহ্য রাজ্যে যেমন দিবাকর প্রজ্বলিত, তেমনি অন্তর রাজ্যের তুমি সূর্য্য। তোমার জ্যোতিতে আত্মার মালিন্য ও তিমির তিরোহিত হয়—যে আত্মা নত পরিশুদ্ধ ও জ্ঞানে ও প্রেমেতে পূর্ণ, সেই আত্মাতেই তুমি বিশেষরূপে বিরাজ কর, তখন সেই আত্মাই তোমার স্বর্গের স্বর্গ হয়! তোমার অস্তিত্ব প্রত্যেক নিশ্বাসে, প্রত্যেক দৃষ্টিতে, প্রত্যেক ঘ্রাণে, প্রত্যেক ধ্যানে, প্রত্যেক ভাবে জাজ্বল্যমান। এতদ্বিষয়ক মানবকুসংস্কার ও দুর্ব্বলত্ব পরিহার কর ও যাহাতে তব সম্বন্ধীয় জ্ঞান জ্যোতিতে আমাদিগের চিত্ত উজ্জ্বলিত হয়, এই কৃপা কর।”

উপসংহার

দেশ ও সমাজহিতৈষী কর্ম্মবীর প্যারীচাঁদের জীবনকাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হইল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার স্মরণীয় কীর্ত্তি ছাড়াও সে কালের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা, পরিচালক ও কর্ম্মী হিসাবে তাঁহার কীর্ত্তি সামান্য নহে; তিনি আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এ সকল সত্ত্বেও আজ যে তিনি আমাদের স্মৃতিপথের অন্তরালে চলিয়া যাইতেছেন, সে কেবল আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়া। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের সহিত কোন অপকীর্ত্তি অথবা নিন্দনীয় কর্ম্ম জড়িত নাই; বরং তাঁহার সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার বহু নিদর্শন আছে। তাঁহার অমায়িক নির্ব্বিরোধী চরিত্রের জন্য তিনি দেশী বিদেশী সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

বাংলা ভাষাকে দীর্ঘসমাসবদ্ধ অভিধানগন্ধী শব্দসংযোজনা হইতে মুক্তি দিয়া সাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী করিয়া তুলিবার যে আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরম্ভ হইয়াছিল, প্যারীচাঁদ তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন। শুধু 'আলালের ঘরের দুলালে'র জন্যই যে তাঁহার ভাষা-আন্দোলন স্মরণীয় হইয়া আছে এমন নয়, 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' প্রভৃতি পুস্তকে আলালী ভাষা ক্রমপরিণতি লাভ করিয়া তাঁহার মনের প্রগতিশীলতার প্রমাণ দিতেছে। তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রের অনুযায়ী ছিল তাঁহার ভাষা। আলালী অথবা বিদ্যাসাগরী, যে-ভাষাই তিনি ব্যবহার করিয়া থাকুন, বিশুদ্ধি ও প্রাঞ্জলতার গুণে তাহা সর্ব্বদাই সুখপাঠ্য হইত। তিনি কোনও দিকেই কোনও বিশৃঙ্খলা বা অস্পষ্টতা বরদাস্ত করিতেন না। প্রাগ্‌বঙ্কিম-যুগে ভাষা-ব্যাপারে ইহা যে কত বড় গুণ, অনুশীলনকারী মাত্রেই তাহা বুঝিতে পরিবেন।

রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদকে দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে যোগসূত্র-স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে এই যোগসূত্র ছিন্ন হইল বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাই প্যারীচাঁদের সত্যকার পরিচয় ছিল। নানা ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংঘাতে যে যুগে প্রত্যেকেই আপন আপন গণ্ডী বাঁচাইয়া চলাই নিরাপদ্ বিবেচনা করিত, সে যুগে প্যারীচাঁদের মনের সংস্কার-মুক্তি এবং উদারতা সত্যই অভাবনীয়। তিনি পরার্থপর ছিলেন বলিয়াই ধর্ম্ম, দেশ বা জাতির বন্ধন তাঁহার বিশ্বমৈত্রীর পথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

প্যারীচাঁদের মৃত্যুতে বিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২৬ নবেম্বর ১৮৮৩) সংক্ষেপে যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, তাহার একটি পংক্তিতে প্যারীচাঁদের সুন্দর পরিচয় আছে—"In him the country loses a literary vetern, a devoted worker, a distinguished auther, a clever wit, an earnest patriot, and an enthusiastic spiritual enquirer." অর্থাৎ,—তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন সাহিত্য-নায়ক, একনিষ্ঠ কর্ম্মী, বিশিষ্ট গ্রন্থকার, সুচতুর রসিক, অকপট দেশপ্রেমিক এবং উৎসাহী পরলোক-তত্ত্বান্বেষীকে হারাইল। একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ বাংলা দেশে বড় বেশী দেখা যায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা-সংস্কার ও উপন্যাসরচনার জন্য প্যারীচাঁদকে প্রশংসা করিয়া অমরতা দান করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অপরাপর কীর্ত্তির প্রতিও বর্ত্তমান যুগের বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। আশা করি, প্যারীচাঁদ তাঁহার স্বকীয় মহিমায় স্বদেশবাসীর চিত্তে দীর্ঘকাল জাগ্রত থাকিবেন।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২০

রাধাকান্ত দেব

১৭৮৪—১৮৬৭

রাধাকান্ত দেব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫০
তৃতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫১

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

উপক্রমণিকা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নব্যশিক্ষা লাভের ফলে বাঙালী জাতির নবজীবনের সঞ্চার হয়। যাঁহাদের সুকৃতিগুণে ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব এক জন। রাধাকান্ত প্রাচীন কীর্ত্তি বজায় রাখিয়া তাহার উপর সংস্কৃতির নূতন সৌধ নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহার কোন কোন কার্য্য পরবর্ত্তী কালে নিন্দিত হইয়াছে। আসল মানুষটিকেও এখন আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। তিনি কি ধরণের মানুষ ছিলেন ও সমাজের হিতার্থে কি কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহা জানাও যেন প্রয়োজন বোধ করি না। হিন্দুকলেজের সূচনা হইতে পরবর্ত্তী চৌত্রিশ বৎসরের কার্য্যবিবরণ, স্কুল সোসাইটির কার্য্যবিবরণ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত রাধাকান্তের পত্রাবলী ও সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে তাঁহার সম্পর্কে বহু তথ্য নূতন করিয়া জানা সম্ভব হইয়াছে। এই সব তথ্যের নিরিখে আমরা আসল মানুষটির একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে পারি।

কলিকাতা শোভাবাজার-নিবাসী মহারাজা নবকৃষ্ণ লর্ড ক্লাইবের মুন্‌শী ছিলেন। তাঁহার গৃহে রাজস্ব ও অন্যান্য সংক্রান্ত কয়েকটি সরকারী আপিস ছিল। নবকৃষ্ণ এ-সবের কর্ত্তা ছিলেন। ক্লাইভ ও বিস্তর সাহেব-সুবা তাঁহার গৃহে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। নবকৃষ্ণের পরিবারের লোকজন ইংরেজ-চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

রাধাকান্ত দেব মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পোষ্যপুত্র রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র। তিনি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজ-চরিত্রের একটি দিক্ পিতা-পুত্র উভয়ের নিকটই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তাহা হইল—ইংরেজের স্বদেশ ও স্বজন-প্রীতি। দেশবাসী মাত্রেই যে পরমাত্মীয় এবং তাহাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ-সাধন যে মহত্তম কার্য্য, এই বোধ রাজা গোপীমোহনের ভিতর প্রথম উদ্রিক্ত ও পুত্র রাধাকান্তের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হয়। এ-কারণ ধনীর দুলাল হইয়াও রাধাকান্ত যৌবনের উন্মেষেই জনসেবায় রত হইয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই, কলিকাতা প্রাচ্য সংস্কৃতির একটি বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইংরেজ তখনও ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পূর্ব্ব-প্রচলিত আর্বী, ফার্সী ও সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষায় তাহারা উৎসাহ প্রদান করিত। কলিকাতা মাদ্রাসায় ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই সব ভাষার চর্চ্চা হইতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সরকারী সিবিলিয়াগণ এই ভাষাত্রয় বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিত। দেশীয় ভাষাসমূহও তাহাদের শিখিতে হইত। সম্পন্ন গৃহস্থরা ও উচ্চাভিলাষী ভারতীয়েরা এই প্রাচীন ধারা অনুসরণ করিয়া শৈশব হইতেই দেশীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ভাষাগুলি অধ্যয়নে ব্যাপৃত হইতেন। রাধাকান্ত দেবেও ইহার ব্যতিক্রম দেখি না। অল্প বয়সেই তিনি আর্বী, ফার্সী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

এই সময় ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। ইংরেজ—শাসক, ইংরেজ—বণিক্; কাজেই শাসন-ব্যাপারে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর অহরহ মিশিতে হইত। শীঘ্রই কলিকাতায় ইংরেজীর প্রথম পাঠ শিক্ষা দানের জন্য

কতকগুলি প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হইল। কানিংহাম সাহেবের ক্যালকাটা একাডেমি এইরূপ একটি স্কুল। রাধাকান্ত এই স্কুলে তাঁহার ইংরেজী প্রথম পাঠ শেখেন। তখনকার বাঙালীরা দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাইবার নিমিত্ত কতকগুলি ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করিয়া লইত। তাহাদের ইংরেজী শিক্ষার এইরূপেই অবসান হইত। কানিংহামের স্কুলে রাধাকান্ত ইংরেজীর প্রথম পাঠ লইলেন বটে, কিন্তু এখানেই তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। তিনি নিজের চেষ্টাযত্নে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করিয়া সে-যুগের একজন খ্যাতনামা ইংরেজীনবীসও হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত লব্ধ প্রাচীন ও নব্য শিক্ষা তাঁহার সকল কর্ম্মকে নিয়মিত করিয়াছে।

রাধাকান্ত প্রথম জীবনে কি ধরণের কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর গবর্মেণ্টকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে পাওয়া যায়। তাহা হইতে আবশ্যক অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

> Babu Radhakanta Deb, who is a director of the Hindoo College, Member of ihe Calcutta School Book Society, Native Secretary to the Calcutta School Society, Vice-President of the Agricultural and Horticultral Society of India, Corresponding Member of the Royal Asiatic Soeiety of Great Britain and Ireland, Member of the Asiatic Society of Bengal and was a Member of the late Saugor Island Society, has compiled, translated and corrected several publications for the School Book Society. In 1821, he published a Bengali Spelling Book after Lindley Murray's plan, and also an abridgement thereof in 1827. He translated a collection of Fables [*Nitikatha*] from English into Bengali and revised the Bengali translation of an Easy Introduction to Astronomy. He made his house first the Depository of the Society's publications, and distributed them among the Natives, and persuaded the

indigenous school masters to use them, pledging himself there should not be introduced any religious matter therein ; as particularised in the first and fourth reports of the Calcutta School Society.

He has for many years, been engaged in the compilation of a Sanscrit dictionary, entitled *Sabada-Kalpadruma* in imitation of the *Encyclopædia Britannica* of which three volumes have since been issued from the press, containing nearly 3,000 Quarto pages, and it will take some years more to complete the work. An account of this dictionary may be found in the Second Report of the Calcutta School Book Society, page 50 ; *Friend of India* of 1820, N. I. page 140 : Perface to Dr. H. H. Wilson's Sanscrit and English dictionary, edition 1, page 38 ; as well as in the perface to the Revd. W. Morton's Bengali and English dictionary, page 6. The author has received the thanks and appreciation of those learned Europeans and Natives to whom he presented copies of the work, for which applications are daily made to him from different quarters.

Radhakanta Deb was favoured with Diploma, dated May 17th 1828, from the Royal Asiatic Society, in testimony of the valuable information they received from him, and a very kind letter from Sir Alexander Johnston, knight, Chairman of the Society, bearing date the 4th July 1828, stating in the concluding part thereof, that 'I shall, by the present opportunity, forward to the Governor General of India, a copy of the enclosed resolution, in order that he may be aware of the high respect which the Society entertains for your talents, and that he may promote, by such means as he may think proper, the literary pursuits in which you are engaged.' Radhakanta has lately translated into English an extract from a Horticultural work in Persian, and transmitted it to the Royal Asiatic Society on the 3rd December 1832.

At the request of the Native community, he prepared addresses in the English, Bengali and Persian languages, on

the occasion of the departure of the Hon'ble Sir E. H. East, Kt., late Chief Justice, and the Most Noble the Marquis of Hastings, late Governor General, and read them before those gentlemen. He transmitted to the Oriental Literary Society, through one of its members, his remarks on Happiness, etc. and received their thanks for the same.

His first correspondence was published in the Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, volume 2nd, Appendix, pages 46, 61 and 63, Note 4 and 5. His accounts of the Agriculture of the 24-Parganas, etc., were among several useful papers contributed by him, inserted in the Transactions of the Agricultural and Horticultural Society of India, volume 1, pp. 48 and 62, and Volume 2nd, part 1st, page 1, and his two letters on Native Inoculation and Small Pox, were subjoined to Dr. Cameron's report on the present state of Vaccine Inoculation in Bengal.

In 1822 he, at the desire of Mr. H. T. Prinsep, the late Persian Secretary, furnished him with the accounts of all respectable and opulent Natives of the Presidency.*

হিন্দুকলেজ

উক্ত পত্রে রাধাকান্ত দেব প্রথমেই হিন্দুকলেজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কলেজ-প্রতিষ্ঠা হইতে দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তিনি ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এ কথা এখন সকলেই জানেন যে,

* শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী নথিপত্র হইতে এই পত্র উদ্ধার করিয়া ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পত্রের প্রতিলিপি রাধাকান্ত দেবের অপ্রকাশিত পত্রাবলীর মধ্যেও আমি দেখিয়াছি।

হিন্দুকলেজের মত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা ডেভিড হেয়ারের। এই পরিকল্পনা যাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে কার্য্যে পরিণত হয়, তাঁহাদের মধ্যে শোভাবাজারের রাজা গোপীমোহন দেব ও তৎপুত্র রাধাকান্ত দেব অন্যতম। হিন্দুকলেজ বা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও নিয়মাদি রচনার জন্য ১৪ মে ও ২১ মে ১৮১৬ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের ভবনে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া পর পর দুইটি সভার অধিবেশন হয়। শেষোক্ত দিবসের সভায় দশ জন ইউরোপীয় ও কুড়ি জন ভারতীয় লইয়া একটি সাব্-কমিটি গঠিত হইল। রাধাকান্ত দেব এই সাব্-কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। কলেজের কার্য্য আরম্ভ হয়, ৩০৪ নং চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের ভবনে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি। এই দিন কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব উপস্থিত ছিলেন। রাধাকান্ত তখনই সাহিত্যিকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে।

সূচনা হইতেই রাজা গোপীমোহন দেব হিন্দুকলেজের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। রাধাকান্ত ইহার ডিরেক্টর হন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা-পুত্র বহুদিন একযোগে কলেজের কর্ম্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবার পরই রাধাকান্ত ইহার কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে থাকেন। ছুটি, কার্য্য আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির সময়, ছাত্রদের ভর্ত্তি হইবার নিয়ম, মাসিক বেতন, কলেজে ছাত্রদের অনুপস্থিতি, অনুপস্থিত হইলে অভিভাবকের কার্য্য, ছাত্রদের প্রতি শাস্তিবিধানের তারতম্য, প্রতি বৎসর পাঠ্য বিষয়ের পরীক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি নিয়মাবলী গঠন করেন ও ইহা পরিচালক-সভা দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লন।

হিন্দুকলেজ প্রথম হইতেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। কলেজ-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় হিন্দুদের এককালীন দান হইতে প্রাপ্ত সুদ ও ছাত্রবেতন হইতেই সম্পূর্ণ নির্ব্বাহিত হইত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিছু কাল ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না। হিন্দুকলেজের প্রথম দলের ছাত্রদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শিবচন্দ্র ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কলেজের নির্দ্দিষ্ট আয় হইতে ব্যয় সঙ্কুলান কঠিন হইয়া পড়িলে কলেজ-কমিটি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া সরকারের নিকট আবেদন করেন। এই আবেদনের ফলে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত ঘরভাড়া এবং একজন বিজ্ঞান-অধ্যাপকের বেতন বাবদে সরকার মাসে দুই শত আশী টাকা মঞ্জুর করিলেন। এই সাফল্যের মূলে ছিল—রাধাকান্তের আগ্রহ ও চেষ্টা। অতঃপর সংস্কৃত কলেজের জন্য কলিকাতা পটলডাঙ্গায় গৃহ নির্ম্মিত হইলে তাহার এক অংশে হিন্দুকলেজ ১ মে ১৮২৬ তারিখে উঠিয়া আসে। এই মাস হইতে হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দুকলেজে শিক্ষকের পদে বৃত হন।

এই সময় কলেজ-পরিচালনায়ও কতকটা নূতনত্ব ঘটে। ১৭ এপ্রিল ১৮২৫ তারিখে হিন্দুকলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানী দেউলিয়া হওয়ায় মূলধন উদ্ধারের আশা রহিল না। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে অগত্যা সাহায্যের জন্য সরকারের দ্বারস্থ হইতে হইল। সরকার কলেজকে একটি মাসহারা দেওয়া স্থির করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সর্ত্ত করা হইল যে, সরকার-তরফেও কমিটিতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি থাকিয়া কলেজ-পরিচালনাকার্য্যে সহায়তা করিবেন। ডক্টর হোরেস হেমান উইলসন সরকার-পক্ষে কমিটিতে গৃহীত হইয়া ইহার ভাইস-প্রেসিডেন্ট হইলেন। ডেভিড হেয়ার ১৮১৯ সন হইতে

কলেজের ভিজিটর বা পরিদর্শক মাত্র ছিলেন; ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনিও ইহার একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুকলেজের মূল নিয়মাবলীর মধ্যে এইরূপ একটি নিয়ম ছিল যে, ইহার গবর্ণরদ্বয় প্রত্যেকে দুই জন এবং ডিরেক্টরগণ প্রত্যেকে এক জন করিয়া ছাত্রকে বিনা বেতনে কলেজে পড়াইতে পারিবেন। হিন্দুকলেজের কার্য্য-বিবরণে দেখা যায়, গোপীমোহন ও রাধাকান্ত দেবের আনুকূল্যে বহু ছাত্র কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে উন্নতি করিয়াছিলেন। স্বনামধন্য পাদ্রি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় কিরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি রাধাকান্তের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় (১৪ মে ১৮৬৭) মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

হিন্দুকলেজের শিক্ষায় এক দিকে যেমন সুফল ফলিতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনই নব্যশিক্ষার প্রথম আভায় প্রচলিত আচার-ব্যবহারে বীতরাগ হইয়া যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ইহাতে প্রমাদ গণিলেন এবং অনেকে কলেজ হইতে নিজ সন্তানদের সরাইয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহারা সন্তানদের এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য কলেজের অন্যতম শিক্ষক ডিরোজিওকে দোষী করিলেন। কলেজ-কমিটির অধিকাংশ দেশী সভ্যও এ জন্য ডিরোজিওকে দায়ী করিয়া তাঁহার পদত্যাগ দাবি করেন। ডিরোজিও নিজ অপবাদ ক্ষালনের জন্য উইলসন সাহেবকে এক পত্র লেখেন। রাধাকান্ত এ সম্পর্কে সম্পাদককে লিখিলেন (২৭ এপ্রিল ১৮৩১),—

As to the excuses contained in Mr. Derozio's resignation, they are of no use and shall not be attended to when he was dismissed on the public feeling.

রাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠানটিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিনি তখন ঐরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করায় হিন্দুকলেজ আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

ইহার পর হইতে কলেজের শিক্ষক নির্ব্বাচনে রাধাকান্ত দেব বিশেষ সতর্ক হইলেন। ডিরোজিওর অপসারণের অব্যবহিত পরেই কলেজের প্রধান শিক্ষক ডি. আনসেলম্ পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে জি. টি. এফ. স্পীড প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ অনুমোদন করিয়া রাধাকান্ত তাঁহাকে যে পত্র লেখেন (৬ জুলাই ১৮৩১), তাহার একটি অংশ এই,—

> Allow me therefore to recommend that you should pay strict attention equally to the study and morals of the Hindoo students and adhere to the rules and regulations passed to the effect and be careful to check any evils similar to those for which one of the teachers was recently removed.

ঠিক এই সময় হইতেই কলিকাতায় কয়েক জন খ্রীষ্টান পাদ্রি কলেজের নব্যশিক্ষিত ছাত্রদের নিকট খ্রীষ্টতত্ত্ব-প্রচারে উদ্‌গ্রীব হইলেন। তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দু যুবকদের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা। ইহার সূচনা হয় সাধারণ সভায় পাদ্রিদের বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা দ্বারা। কলেজ-কমিটি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আদেশে ছাত্রগণকে ঐ সব বক্তৃতা শ্রবণ হইতে নিরস্ত করা হইল। কোন পাদ্রি বা অজ্ঞাতকুলশীল ইংরেজ যাহাতে হিন্দুকলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত না হয়, সে দিকে রাধাকান্ত দেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। রামমোহনের বন্ধু উইলিয়ম এডামকে ব্যবহারশাস্ত্র ও অর্থনীতির অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব হইলে তিনি উইলসনকে ১৯ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখে লেখেন,—

> For my part I cannot entrust the morals and education of those I regard, to such an one that was once a Missionary, then

a Vaidantic or disciple of Rammohan Roy and lastly a Unitarian."

ইহার পর বিলাত হইতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স জেম্‌স এডাম্‌সনকে কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিয়োগের সুপারিশ করিয়া ভারত-সরকারকে পত্র লেখেন। কলেজ-কমিটির দেশীয় সদস্যগণের ঘোরতর আপত্তি থাকায় এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়েও রাধাকান্ত অগ্রণী হইয়াছিলেন।

সপারিষদ বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ধার্য্য করেন যে, হিন্দুকলেজ-কমিটির সকল সভ্যই জেনারেল কমিটি অব্ পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্শন বা সরকার-নিযুক্ত শিক্ষাবিষয়ক কমিটির সম্মানিত সদস্য (Honorary Member) হইবেন এবং ইহার কার্য্য-পরিচালনে সহায়তা করিবার জন্য উহা দুই জনকে এই কমিটিতে প্রেরণ করিতে পারিবেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে কলেজ-কমিটি রাধাকান্ত দেব ও রসময় দত্তকে শিক্ষা-কমিটিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠান। ১৮৩৫ ও '৩৬ এই দুই বৎসর এবং পরে ১৮৪১-৪২, '৪২-৪৩, '৪৩-৪৪, এই তিন বৎসর রাধাকান্ত দেব ইহার সদস্য ছিলেন।

হিন্দুকলেজে ইংরেজী শিক্ষার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইত। সুতরাং ছাত্রদের বাংলার মাধ্যমে সুষ্ঠু ভাবে শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৩৯, ১৪ই জুন কলেজের সংলগ্ন একটি বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। রাধাকান্ত দেব পাঠশালা-প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীদের মধ্যে এক জন ছিলেন। ইহার কার্য্য পরিচালনে, ছাত্রদের পরীক্ষাদি গ্রহণে ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ পরিচালনে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এত দিন গবর্মেণ্ট অর্থসাহায্য করিলেও, কলেজ-সংক্রান্ত বিষয়ে কমিটির

দেশীয় সদস্যদের মতামতই বলবৎ থাকিত। শিক্ষা-কমিটির ইহা কখনই মনঃপূত হয় নাই। তাঁহারা অন্যান্য স্কুল-কলেজের মত হিন্দুকলেজকেও তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার প্রস্তাব করিয়া উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক বিবৃতি পেশ করিলেন। সরকার এই বিবৃতির নিরিখে এমন কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিলেন, যাহাতে শিক্ষা-কমিটির কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাধাকান্ত দেব এই সময়ে একাদিক্রমে তিন বৎসর শিক্ষা-কমিটির সদস্য ছিলেন; হিন্দুকলেজ পরিচালনার্থ ইহার গবর্ণর, ম্যানেজার এবং শিক্ষা-কমিটির দুই জন প্রতিনিধি লইয়া ইহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে যে কমিটি গঠিত হইল, তিনি তাহারও সদস্য রহিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃত্ব ঐরূপে দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় শিক্ষা-কমিটি ও কলেজ-কমিটি উভয়ের মধ্যে এই সময় হইতে প্রায়ই দ্বন্দ্বের উদ্ভব হইতে থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন দুইটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে এই দ্বন্দ্ব চরমে উঠে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে হিন্দু সমাজে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কলেজ-কমিটির যে-সভায় এ বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহাতে উপস্থিত তিন জন দেশীয় সদস্যের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেব খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত কৈলাসচন্দ্র বসুকে কলেজের কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দিবার দাবি করেন। সংখ্যাল্পতা হেতু তাঁহাদের দাবি অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু তাঁহাদের—সুতরাং হিন্দু সমাজের—মনোভাব গবর্মেণ্টের গোচরে আনিবার জন্য শিক্ষা-কমিটিকে অনুরোধ করিতে সকলেই সম্মত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শিক্ষা-কমিটিতে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে যে-সব ইউরোপীয় সদস্য পূর্ব্বে সম্মত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই এখানে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন; ফলে হিন্দু সমাজের মনোভাব গবর্মেণ্টের গোচরে আনা আর সম্ভবপর

হইল না। ইহার প্রতিবাদস্বরূপ প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলেজের গবর্ণর-পদে ইস্তফা দেন।

ইহার কিছু কাল পরে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, গুরুচরণ সিংহ নামে কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্র দ্বারা কমিটিকে ইহা জানাইলে এ বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য সদস্যগণের মতামত আহ্বান করা হয়। দেশীয় ও ইউরোপীয় সদস্যগণ ছাত্রটিকে কলেজ হইতে অপসারণের পক্ষেই মত দিলেন; গুরুচরণ সিংহও কলেজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মূল নীতির ব্যাখ্যা লইয়া শিক্ষা-কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (তখন কলেজ-কমিটিরও প্রেসিডেণ্ট) এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হয় ও ইহার জের পর-বৎসর পর্য্যন্ত চলে। রাধাকান্ত দেব অবশেষে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন কলেজের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কলেজের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগের মূল কারণ যে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এইরূপ মতভেদ ও মনান্তর, ৭ই অক্টোবর ১৮৫১ তারিখে ডক্টর হোরেস হেমান উইলসনকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের নিম্নলিখিত পত্রাংশে তাহা সুস্পষ্ট,—

From the period that the former [Hindoo College] was placed under the Government patronage the Council of Education had been gradually encroaching on the privilege of the Managing Committee till under the presidentship of the late Mr. Bethune this encroachment became so complete as to render the native members mere non-entities. This invasion of their rights has often brought the Council and the Committee in open collisions with each other. On one occasion a serious difference arose between these two bodies on a subject involving the violation of certain fundamental rules of the College which terminated in the retirement of Baboo Prosunnocumar Thakoor the Governor

of the College from his post. On a similar subject, after an interchange of many angry minutes between myself and the late President my feelings were so exasperated that I was obliged to dissolve my connection with the institution. Virtually there is no native management at present.

হিন্দুকলেজের তদানীন্তন কমিটি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ মে রাধাকান্ত দেবের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিয়া তাঁহারা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষা ও মিশনরী আন্দোলন

ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেবের আরও কয়েকটি কার্য্যের কথা এখানে স্মরণীয়। খ্রীষ্টান পাদরিদের আন্দোলনের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু যুবকদের মনে যখন প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের প্রতি সংশয় ও অনাস্থা উপস্থিত হইল, তখন সুযোগ বুঝিয়া খ্রীষ্টান পাদরিরা প্রচারকার্য্য সুরু করেন। এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেন ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ। হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর কয়েক বৎসরের মধ্যে একে একে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। একবার, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হিন্দুকলেজের সম্মুখেই পাদরিরা কৃষ্ণমোহনকে দিয়া একটি গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করাইতে প্রয়াসী হন। কিন্তু রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির চেষ্টায় তাহা সম্ভব হয় নাই।

খ্রীষ্টান পাদরিদের প্রচার-কার্য্য কিন্তু অবাধ গতিতে চলিতে লাগিল। কলিকাতায় ও অন্যত্র তাঁহারা অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন

করিয়া শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্বও তরুণ ছাত্রদের শিখাইতে থাকেন। ফলে নানা স্থানে খ্রীষ্টান হইবার ধুম পড়িয়া যায়। সুবিধা পাইলে অল্পবয়স্ক বালকদেরও তাঁহারা জোর করিয়া খ্রীষ্টান করিতেন। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই ইহাতে শঙ্কিত হইলেন। পাদরিদের এবম্বিধ কার্য্যের বিরুদ্ধে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আন্দোলন সুরু করিলেন। ইহার অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদ্রব দূরীকরণের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এই কার্য্যে সহায় হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। মিশনরীদের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিই খ্রীষ্টানীর কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। দরিদ্র হিন্দু ছাত্রগণকে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য এই সব বিদ্যালয়ে না যাইতে হয়, সেজন্য হিন্দু নেতৃবর্গ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ২৫ মে ১৮৪৫ তারিখে এই উদ্দেশ্যে সহস্রাধিক হিন্দুর একটি জনসভা হয়। এই দিনকার সভায় এককালীন চল্লিশ হাজার টাকা দান ও মাসিক চারি শত টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। এই বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (আষাঢ় ১৭৬৭ শক) লেখেন, "বিশেষতঃ রাজা রাজাকান্ত বাহাদুর পক্ষপাত শূন্য হইয়া এ বিষয়ের সুসিদ্ধির জন্য যে প্রকার যত্নবান্ হইয়াছেন, ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিতেছি।" বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে কমিটি স্থাপিত হয়, রাধাকান্ত দেব তাহার সভাপতি হইলেন, সম্পাদক হইলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন সেন।

প্রস্তাবিত বিদ্যালয় ১ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে স্থাপিত হইল। ইহার নাম হইল হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বা Hindu Charitable

Institution।* কমিটি হিন্দুকলেজের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষক নির্ব্বাচনেও যে রাধাকান্ত দেবের বিশেষ হাত ছিল, তাঁহার লিখিত পত্রাবলী হইতে তাহাও জানা যায়। বিদ্যালয়ের কার্য্য দুই বৎসরের অধিক কাল বেশ সুষ্ঠুভাবে চলে। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের ফলে বিদ্যালয়ের প্রায় সমুদয় সঞ্চিত টাকা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পরও স্কুলটি চলিয়াছিল; কিন্তু তখন ইহার নিতান্তই হীনাবস্থা। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পাঠে জানা যায়, তখনও হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল।

এই সময় শিক্ষা-বিভাগ ছাড়া সরকারী অন্যান্য বিভাগগুলিতেও মিশনরীদের প্রভাব লক্ষিত হয়। রাধাকান্ত দেব ডক্টর উইলসনকে পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রে লেখেন,—

> Missionary influence is now on the ascendant; every department from the fountain head of Government to the lowest course of office is infected with it.

এই পত্রেরই আর এক স্থানে তিনি লেখেন,—

> The Christian bigots have marked me out as the butt of their rancour and hostility for my rigid adherence to principles.

রাধাকান্ত দেব এদেশে খ্রীষ্টান পাদরিদের ধর্ম্মপ্রচারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তার প্রশংসা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি কাশীর জয়নারায়ণ ঘোষাল কলেজের অধ্যক্ষ পাদরি জে. মাকাইকে ১ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক

* "The Hindu Charitable Institution...happily came to the birth on Sunday last, the 1st of March."—*The Friend of India*, March 5, 1846. Weekly Epitome of News. March 8.

পত্রে এই মর্মে লেখেন যে, প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচারে প্রথম শ্রেণীর অক্লান্তকর্মা নিষ্ঠাবান্ মিশনরীদের প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসীরা ইহা দ্বারা আশানুরূপ লাভবান্ হয় নাই, কারণ, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার এই শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। খ্রীষ্টান মিশনরীদের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য ব্যাহত করিবার জন্য এক দিকে যেমন অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, অন্য দিকে তেমনি যে-সব হিন্দু ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাদের পুনরুদ্ধারের জন্য ঐ সময় "পতিতোদ্ধার সভা" গঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রথম সাধারণ সভা হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মে চিৎপুরস্থ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি গৃহে, এবং ইহার সভাপতিত্ব করেন রাজা রাধাকান্ত দেব। পতিতোদ্ধার সভার পক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতদের নিকট হইতে পাঁতি সংগ্রহ করিয়া ভিন্নধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুদের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৭৫ শকে (১৮৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রিত বহু পণ্ডিতের নাম, তাঁহাদের প্রদত্ত পাঁতি এবং পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা-সম্বলিত একখানি পুস্তিকা রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। রাধাকান্তের নেতৃত্বে আরব্ধ এই আন্দোলনকে সে যুগের বিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (৫ জুন ১৮৫১) ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ("One of the most important events that has occurred in India in the present century.")।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের সহিত রাধাকান্তের সংস্রব ছিন্ন হয় বলিয়াছি। ইহার দুই বৎসর পরে শিক্ষা সম্পর্কে অন্য যে একটি আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হিন্দুকলেজে হিন্দুদের কর্তৃত্ব তখন নামে মাত্র বিদ্যমান ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে হীরা বুলবুল নামে কলিকাতাবাসী এক পশ্চিমা গণিকার পুত্র হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হয়। ইহা লইয়া হিন্দুদের মধ্যে পুনরায় তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। সরকারী শিক্ষা-সমাজ (Council of Education) কিন্তু স্থির করিলেন, কলেজ হইতে এই গণিকাপুত্রকে সরাইয়া দেওয়া হইবে না। হিন্দুরা ইহার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহারা হিন্দুকলেজের মত আর একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিলেন। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ দেব প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই প্রচেষ্টায় বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। ইহার ফলে ২ মে ১৮৫৩ তারিখে চিৎপুর সিঁদুরিয়াপটীর রামগোপাল মল্লিকের বৃহদ্বাটীতে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। মতিলাল শীলের শীল্‌স্ ফ্রী কলেজ ও গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হেয়ার একাডেমি সমুদয় ছাত্র, আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম সমেত এই কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত হইল। রাধাকান্ত দেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে কলেজ-পরিচালন-কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। পৃষ্ঠপোষক—মতিলাল শীল; পরিচালন-কমিটিতে রহিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ দেব প্রভৃতি। হিন্দুকলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কবি ও সাহিত্যিক ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইহার প্রধান বাংলা অধ্যাপক হইলেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। কলেজটি কিছুকাল বেশ সমারোহে চলিয়াছিল। রাণী রাসমণি ইহার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুদের মধ্যে

'অনৈক্য ও অমনোযোগ' বড় কলেজটি রূপান্তরিত হইয়া একটি মাত্র স্কুলে পর্য্যবসিত হয়।

জনশিক্ষা

প্রত্যেক ব্যক্তির মাতৃভাষা আয়ত্ত করা অবশ্যকর্ত্তব্য। রাধাকান্ত বঙ্গসন্তানদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাতৃভাষা শিক্ষার দিকেও অবহিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে, সেই 'অন্ধকার' বিশৃঙ্খল যুগেও বঙ্গদেশে পাঠশালার অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু এ সমুদয় পাঠশালায় আগেকার সঙ্কীর্ণ প্রথায়ই শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন পাঠ্য পুস্তকেরও একান্ত অভাব ছিল। যুগোপযোগী পাঠ্য পুস্তক ও সুপরিচালিত পাঠশালার অভাব বিশেষরূপ অনুভূত হইতে লাগিল। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় মাস পরে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি গঠিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য লোকেরা একযোগে কার্য্য করিতেন। এ ব্যাপারেও ইহার অন্যথা হইল না। স্কুল-বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইতেই রাধাকান্ত দেব ইহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন এবং কখনও একাকী, কখনও অপরের সহযোগে পুস্তক লিখিয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা ও চর্চ্চার পথ সুগম করিয়া দিলেন। প্রারম্ভে প্রদত্ত ইংরেজী পত্রে প্রকাশ, সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বহু পুস্তক তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। রাধাকান্ত পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' রচনাকালে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেন।

শুধু পাঠ্য পুস্তক রচনা দ্বারাই উন্নত ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার সম্ভব নয়। সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষ ইহা স্থাপনের অল্প কাল পরেই বুঝিতে

পারিলেন, দেশীয় পাঠশালাসমূহে নব-রচিত পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তিত করাইতে হইলে ইহাদের সংস্কার সাধন আবশ্যক। তাঁহারা এজন্য ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপন করিলেন। পুরাতন দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধন ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য; কতকগুলি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করাও ইহার উদ্দেশ্য-মধ্যে গণ্য হইল। তাঁহাদের ধারণা—বঙ্গসন্তানেরা এইরূপে মাতৃভাষা আয়ত্ত করিয়া হিন্দুকলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের দ্বারা দেশাভ্যন্তরে শিক্ষা-প্রচার ও প্রসার সহজ হইয়া উঠিবে।

স্কুল-বুক সোসাইটির আনুকূল্যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু ইহার কার্য্য-পরিচালনের ভার পড়িল একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কমিটির উপর। প্রথম হইতেই রাধাকান্ত দেব ইহার নেটিব সেক্রেটরী বা দেশীয় সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সোসাইটির এই দেশীয় সম্পাদকের কার্য্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখন কলিকাতায় যে-সব প্রাথমিক স্কুল বা পাঠশালা ছিল, তৎসমুদয় একে একে সোসাইটির নিয়মশৃঙ্খলাধীনে আনা ছিল তাঁহার প্রধান কার্য্য। এই সময় খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রচার-পুস্তকগুলি ভাষায় রচিত হইতেছিল। সাধারণের মনে তখন এ ধারণা স্বতঃই উদিত হয় যে, পাঠ্য পুস্তকের নামে ঐ সব প্রচার-পুস্তক বুঝি বা পাঠশালাগুলিতে চালাইবার ব্যবস্থা হয়। রাধাকান্ত দেব প্রথমেই তাঁহার স্বদেশবাসীদের মন হইতে এই ধারণা নিরসন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি তখনকার পাঠশালাগুলি সুনিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সোসাইটির ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণে তাঁহার নিজের লেখা বিবরণ হইতেই তাহা আমরা জানিতে পারি। তিনি এই মর্ম্মে লেখেন,—

> সোসাইটির স্কুলসমূহে অনুসৃত শিক্ষা-পদ্ধতির উপকারিতা আমার স্বদেশবাসীরা এখন বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ছেলেদের অভিভাবক ও শিক্ষক—যাঁহারা পূর্ব্বে শঙ্কান্বিত হইয়া পাঠ্য পুস্তক গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তাঁহারাও এখন সোসাইটিভুক্ত হইবার জন্য লালায়িত। সোসাইটির সূচনায় আমি মাত্র ষোল কি সতর জন গুরুমহাশয়কে পাঠ্য পুস্তক ব্যবহার করাইতে ও পরবর্ত্তী ২রা জুন [১৮১৯] এই সব পুস্তকের উপর বালকদের পরীক্ষা লওয়াইতে এই বলিয়া রাজী করাই যে, ইহাতে [খ্রীষ্ট] ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিষয়ই লেখা নাই। এই সময় কলিকাতা নগরীতে ১৬৬টি পাঠশালা ছিল। আমি শহরটিকে চারি ভাগে ভাগ করিলাম ও চারি জন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক স্থির করিলাম। এই পাঠশালাগুলির মধ্যে ৮৫টি এখন পর্য্যন্ত সোসাইটির আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি শীঘ্রই করিবে। কলিকাতায় ইতিমধ্যে কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় সোসাইটির ত্রিশটি পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে।

রাধাকান্ত দেব নিজ শোভাবাজারের বাটীতে স্কুল-বুক সোসাইটির পুস্তকগুলি আমানত রাখিতেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যথাসময়ে সে সব বিতরণ করিতেন। এখনও তাঁহার নিজ গ্রন্থাগারে এই সব পুস্তকের অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সোসাইটিভুক্ত পাঠশালাগুলিকে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার জন্য তিনি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেন। স্কুল-বুক সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার স্কুল সোসাইটির পাঠশালাসমূহের পরিদর্শক (আধুনিক কালের ইন্সপেক্টর) নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য বাড়িয়া গেলে রাধাকান্ত দেব সোসাইটির পক্ষে তাঁহার কয়েক জন সহকারী নিয়োগ করিলেন।

রাধাকান্ত নির্দ্দেশ দিলেন যে, পাঠশালার গুরুমহাশয়গণকে বাংলা ব্যাকরণ বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে। তিনি স্বয়ং চতুর্থ বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য করিতেন। নিজ শোভাবাজারস্থ বাটীতে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সোসাইটির অন্তর্গত পাঠশালাসমূহের ছাত্রদের বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হইত। মেধাবী ছাত্রদের প্রতি বৎসর পারিতোষিক দেওয়া হইত, গুরুমহাশয়গণও নিজ নিজ ছাত্রদের কৃতিত্ব অনুযায়ী সাময়িক বৃত্তি লাভ করিতেন। কোন কর্ম্মব্যপদেশে কলিকাতার বাহিরে গেলে অনুপস্থিত কালের জন্য তিনি উপযুক্ত লোকের উপর কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া যাইতেন। তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ মার্চ সোসাইটিকে দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁহার কৃতিত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া সভাপতি জে. পি. লার্কিন্স লেখেন,—

> Nothing can be more satisfactory and encouraging than the report now submitted by our Native Secretary, the correctness of whose statement needs no construction...To the zeal and exertion of Radhakant Deb the Society owes much of its success with which their endeavours to disseminate instruction to the unenlightened Natives have been crowned and the Committee I am sure feel as they ought their obligation to the individual. To Mr. Hare, too, their expressions of their best acknowledgement is due for his personal exertion in furthering the institution.

ডেভিড হেয়ারও স্কুল সোসাইটি স্থাপনের সময় হইতেই ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি শিমুলিয়া, ঠনঠনিয়া ও পটলডাঙ্গায় তিনটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সোসাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক ডব্লিউ. এইচ. পিয়ার্স অসুস্থ হইয়া পড়িলে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর এই কর্ম্মে ইস্তফা দেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভেই ডেভিড হেয়ার তাঁহার স্থলে ঐ পদে নিযুক্ত হন। তদবধি সোসাইটি যত দিন বিদ্যমান ছিল, তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বলা বাহুল্য,

রাধাকান্ত দেব দীর্ঘকাল হেয়ারের সঙ্গে একযোগে পাঠশালাসমূহের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিয়াছিলেন। সোসাইটির তত্ত্বাবধানে পাঠশালাসমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্গসন্তানগণ কিরূপ উপকৃত হইতেছিল, রাধাকান্ত দেব ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত রিপোর্টের শেষে তাহার এইরূপ উল্লেখ করেন,—

> In concluding this, I think it proper to add that in my opinion the Society has afforded considerable benefit to the Natives of the country by patronising the Indigenous Schools in the Metropolis. The children of all respectable Natives are taught therein as the schools are situated within their own houses or very near them and the exertion of the Society has occasioned a great improvement and their progress is increasing daily, for which the Society's kind attention to the Indigenous department is very desirable.

সোসাইটি প্রতি বৎসর পাঠশালাসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রকে (প্রথমে কুড়ি জন ও পরে ত্রিশ জন) নিজ ব্যয়ে হিন্দুকলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে বহু দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র তৎকালীন উচ্চ শিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতি মাসে সোসাইটিকে পাঁচ শত টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন। কিন্তু ইহার ব্যয় বেশীর ভাগ চাঁদা-দাতাদের অর্থেই নির্ব্বাহিত হইত। কলিকাতায় ১৮৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বড় বড় বাণিজ্য-কুঠী দেউলিয়া হয়। ইহার ফলে দেশী-বিদেশীনির্বিশেষে সম্পৎশালী ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহাদের পক্ষে সোসাইটিকে অর্থ সাহায্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সময় সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ম্যাকিণ্টস কোম্পানীরও পতন ঘটে এবং এখানে গচ্ছিত অর্থ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তখন ইহার কেবলমাত্র সম্বল থাকে গবর্মেণ্ট-প্রদত্ত সাহায্য মাসিক পাঁচ শত টাকা। সোসাইটির বহু

সমস্ত দেশীয় পাঠশালার সাহায্য ও এতৎসম্পৃক্ত সমুদয় কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়া মাত্র ইংরেজী স্কুলগুলি রক্ষার সপক্ষে মত দেন। রাধাকান্ত দেব ইহার বিরোধিতা করিয়া এই মর্ম্মে একটি বিবৃতি দেন,—

> দেশী পাঠশালাগুলির সাহায্য বন্ধ করা কোন মতেই সমীচীন নহে। সোসাইটি একমাত্র ইংরেজী স্কুলগুলি রক্ষায় যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা রদ করা উচিত। কেন না, শহরে এখন ইংরেজী স্কুলের অভাব নাই, ইহার সংখ্যা অতি দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু দেশী পাঠশালাগুলি রক্ষার জন্য স্কুল সোসাইটি ভিন্ন অপর কোন প্রতিষ্ঠানই এ পর্য্যন্ত মনোযোগী হয় নাই। যে পাঁচ শত টাকা সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে হিন্দুকলেজে সোসাইটির ছেলেদের পড়াইবার জন্য ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট দুই শত টাকা পাঠশালা বিভাগের জন্য ব্যয় করা হউক।

এই বিবৃতিতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় নাই। সোসাইটি অতঃপর কিরূপ ভাবে তাহার কার্য্য সঙ্কুচিত করিলেন, রাধাকান্তের কথায়ই তাহা বলিতেছি,—

> The School Society "was on account of the great mercantile failures in the year 1833 and the loss it sustained by the failure of its treasurers Messrs. Mackintosh & Co., so much reduced that it was obliged to relinquish the whole of its Bengalee schools—Indigenous and others and only to retain the two English schools which were united into one at Putuldanga in Calcutta. This school has continued ever since and is still flourishing with upwards of 470 pupils under the care of Mr. D. Hare."*

---

* ১৫ই নবেম্বর ১৮৪০ তারিখে ক্যাপ্টেন আর্ভিনকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের পত্র হইতে।

স্ত্রীশিক্ষা

রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা প্রচারেও সমান অবহিত ছিলেন। পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার তাঁহার 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই [মহিলারাই] লেখাপড়া বিদিত আছেন।" কলিকাতা রাজবাটী বলিতে শোভাবাজার রাজবাটী বুঝাইত। তখন প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ভদ্র হিন্দু কন্যাদের পড়াইবার রেওয়াজ ছিল না। সম্পন্ন হিন্দুরা শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া মেয়েদের পড়াইতেন। ২ জুন ১৮২১ তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় কথা উঠে যে, হিন্দু নারীদের বিদ্যাশিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই। এ সভার সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের (বর্ত্তমান হাইকোর্ট) প্রধান বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই মর্ম্মে এ কথার জবাব দেন যে, স্ত্রীজাতির শিক্ষাকল্পে এ-যাবৎ হিন্দুপ্রধানগণ প্রকাশ্যে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু ইহা বড়ই সন্তোষের বিষয় যে, তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ অবহিতই আছেন। তাঁহারা কেহ কেহ নিজ পরিবারের মধ্যে নারীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাধাকান্ত প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের পাঠাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা ও সমর্থক ছিলেন, এবং সমসময়ে ও পরবর্ত্তী যুগে এ-বিষয়ে অগ্রণী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারস্থ ভবনে স্কুল সোসাইটির ছাত্রগণের যে বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হইত, তাহাতে ফিমেল জুবিনাইল সোসাইটির পাঠশালার বালিকারাও প্রথম প্রথম যোগদান করিত। ছেলেদের মত তাহাদেরও গুণানুসারে পারিতোষিক দেওয়া

হইত, জলযোগাদিরও তাহারা ভাগ লইত। খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঐ সব বালিকা-বিদ্যালয় কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে কখনও জনপ্রিয় হয় নাই। নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র হিন্দু বালিকারাই বেশীর ভাগ এখানে অধ্যয়ন করিত। খ্রীষ্টান মহিলারা দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া ছাত্রীদের অনেককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। কোন রকম ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইবে না—এই সর্ত্তে কলিকাতায় প্রথম সাধারণ প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে। ভারত-সরকারের আইন-সচিব ও শিক্ষা-সমাজের সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন উক্ত শিক্ষা-সমাজের অন্যতম সদস্য রামগোপাল ঘোষ, এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তখনকার দিনের প্রগতিশীল সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সম্বাদ ভাস্কর' এই প্রচেষ্টার সমর্থন করিলেও অন্য বহু পত্রিকা ইহার নিন্দা করিতে থাকে। এই সময়ে বেথুন সাহেব 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র একটি অভিনব সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। এই পুস্তকখানির প্রকাশ এবং সাধারণ ভাবে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে রাধাকান্ত দেব ও বেথুন সাহেবের মধ্যে পত্র-ব্যবহার হয়। একখানি পত্রে (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১) রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে লেখেন,—

> My literary occupations leave me little or no time to look over the newspapers but I have learnt....that impudent publications are appearing therein to sully your reputation. They are certainly the vituperation of malignant mind that cannot rest without doing evil.

আর একখানি পত্রে তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত এবং ত্রিশ বৎসর যাবৎ এই উদ্দেশ্যে তিনি কি কি করিয়াছেন, তাহার একটি

সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন (২০ মার্চ ১৮৫১)। ইহার মর্ম এখানে দিতেছি,—

আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এতটা প্রয়াসী হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার অভিমত সম্পর্কে বিপরীত ধারণা দূর করিবার জন্য আমি এই সুযোগে বলিয়া রাখি যে, আমি নিজে এত কাল উপদেশ ও কর্ম্মের দ্বারা দেখাইয়াছি যে, আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখ বৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না।

গত স্কুল সোসাইটির অধীনে কলিকাতায় যে-সব দেশী পাঠশালা বিদ্যমান ছিল, তাহাতে ছাত্রদের সঙ্গে বহু বুদ্ধিমতী বালিকাও অধ্যয়ন করিত। বালিকারা পিতার বা প্রতিবেশীদের গৃহে বসিয়া পড়াশুনা করিত। সোসাইটির পণ্ডিত ও সহকারীরা আমার ভবনে বালিকাদের পরীক্ষা লইতেন ও তাহাদের পরিতোষিক বিতরণ করিতেন। আমি নিজে সোসাইটির নেটিব সেক্রেটরী ছিলাম এবং এই ব্যবস্থার প্রশংসনীয় কার্য্যকারিতা দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিতাম। এ কার্য্যের কেহই দোষ ধরিত না, বা ইহার কেহ নিন্দাবাদও করিত না। আমার একান্ত বাসনা, এই ব্যবস্থা আবার অবলম্বিত হয়।

সেই হেষ্টিংসের আমলেই প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু তদবধি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই এরূপ বিদ্যালয়ে কন্যাদের প্রেরণ মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। আমি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্সকে যে পত্র লিখি, তাহাতে এই কয় পঙ্‌ক্তি ছিল,—

'আমরা আমাদের কন্যাদের বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা পড়াইয়া থাকি। সকলে অবশ্য এরূপ করেন না। আমার আশঙ্কা হয়, শিক্ষকগণ ধনী এবং সম্রান্ত লোকদের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ছাত্রীরূপে পাইবেন না।'

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি হিন্দু নারীদের শিক্ষাকল্পে কুমারী কুককে [পরে বিবি উইলসন] এ দেশে পাঠান, তখনও প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে হিন্দু মেয়েদের প্রেরণে বিশেষ আপত্তি হয়। আমি তখন উক্ত ভদ্রলোককে হিন্দু সমাজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া এই মর্ম্মে লিখি,—

'শিক্ষয়িত্রী দ্বারা বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদের বাংলা পড়ানো সম্বন্ধে সকলকেই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এখনই কোন কোন পরিবারে গৃহশিক্ষক রাখিয়া বিবাহের পূর্ব্বে আট-নয় বৎসর বয়স্ক মেয়েদের পড়াইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সব কারণে সাধারণের পক্ষে আমি এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, কুমারী কুক দ্বারা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বলিকাদের শিক্ষাদান সম্পর্কে বিবেচনার্থ সোসাইটির কোন অধিবেশন আহ্বানের আবশ্যক নাই। কুমারী কুক প্রয়োজন হইলে দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য সম্প্রতিষ্ঠিত মিশনরী-স্কুলগুলিতে শিক্ষা দানে লিপ্ত হইতে পারেন।'

আর একখানি পত্রে আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম,—

'হিন্দুরা তাঁহার [কুমারী কুকের] প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবেন, যদি দরিদ্র অথচ সদ্বংশজাত হিন্দুনারীরা তাঁহার নিকট সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ও যান্ত্রিক বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে। এরূপ শিক্ষিত নারীরা পরে হিন্দু-প্রধানগণের নারীদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ইহাতে হিন্দুদের চিরাচরিত

রীতিনীতির উপর আদৌ হস্তক্ষেপ করা হইবে না ; অথচ নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার লাভ করিবে।'

ইহা হইতে এখন পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, বালিকাদের জন্ত সাধারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হিন্দুদের বিরূপ মনোভাব নূতন নহে, বিদ্যালয় স্থাপয়িতাদের প্রতি ঈর্ষামূলক মনোবৃত্তি হইতেও ইহা উদ্ভূত হয় নাই।...

আমার অভিমত এই যে, কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য সাধারণ বিদ্যালয়ে নবশাক-কন্যাদের ভর্ত্তি করা উচিত। নবশাকগণ সমাজের খুব নিম্ন শ্রেণীস্থ নহেন। স্কুল সোসাইটির মত একটি সোসাইটি গঠিত হইয়া বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দিলে ভাল হয়। ভাবী সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের জন্য আবশ্যক শিক্ষয়িত্রীগণ ঐরূপ প্রকাশ্য বিদ্যালয় হইতে সরবরাহ হইবেন।

বেথুন স্কুল (তখনকার নাম 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল') প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালে রাধাকান্ত দেব নিজ ভবনে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ২৯ মে ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন,—

কলিকাতা নগরে বালিকাদের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয়। —আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র ভদ্র বালিকাগণকে ইংরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় শিক্ষাদান করিতেছেন।

ধর্ম্মে ও সামাজিক ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী হইলেও, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার-কল্পে রাধাকান্ত দেব যে সে-যুগে অগ্রণী ছিলেন, উগ্র প্রগতিপন্থী পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া গিয়াছেন। ঐ বৎসর হেয়ার-স্মৃতিসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেন,—

Are we to hear in 1849 objections which were so ably refuted as early as 1824 by the President of the Dhurmo Sabha himself ?...Have Wilson and Macauley and Ryan and Cameron... produced educated men who are found to oppose that which Rajah Radhakant had himself publicly sanctioned so many years ago... ?

সংস্কৃত শিক্ষা

শোভাবাজার রাজপরিবারের সংস্কৃতপ্রিয়তা সর্ব্বজনবিদিত। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহারাজা নবকৃষ্ণের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। গোপীমোহন দেব সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্ম হাতীবাগানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন—সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার। রাজা রাধাকান্ত সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে সমান অবহিত ছিলেন।

রাধাকান্ত কৈশোরে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ করেন। শেষ-জীবন পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃতের অনুশীলন অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন—স্বদেশবাসীর উন্নতি জন্ম এক দিকে যেমন ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ আবশ্যক, অন্য দিকে তেমনই ব্যাপক ভাবে দেবভাষা মূল সংস্কৃত এবং তাহাতে লিখিত সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চ্চার প্রবর্ত্তনও একান্ত দরকার, এবং ইহা বুঝিয়াই তিনি যুগপৎ সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে মনঃসংযোগ করেন। এইখানেই রাধাকান্ত দেব এবং রামমোহন রায়ে প্রভেদ লক্ষ্য করি। রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি যুক্তি-প্রমাণ সহযোগে ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে সংস্কৃতের চর্চ্চা দেশবাসীর মনকে নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিবারই প্রকৃষ্ট পন্থা।

তখন সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন আবশ্যক হইয়াছিল। রাধাকান্ত দেব সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করিয়া ইহার চর্চা সহজ-সাধ্য ও সহজলভ্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কালে রাধাকান্তের প্রচেষ্টার যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হইয়াছে।

ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বলিয়াছিলেন—সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কারের ফলে পরবর্ত্তী বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের রেনেসান্স বা পুনর্জন্ম লাভ হইবে। এ কথা এখন একরূপ স্বীকৃত যে, সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা অনেকখানি বদলাইয়া দিয়াছে। এই শতাব্দীতে দেশ-বিদেশে সংস্কৃতের অনুশীলনে রাধাকান্ত দেবের প্রচেষ্টা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। গত শতাব্দীর মধ্যভাগেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংস্কৃত চর্চ্চার ধুম পড়িয়া যায়। তথাকার উইলসন, ম্যাক্সমূলর, ব্রুনো প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ও রাধাকান্ত দেবের মধ্যে প্রায়ই পত্রের আদান-প্রদান চলিত।

'শব্দকল্পদ্রুম' রাধাকান্তের অবিনশ্বর কীর্ত্তি। রাধাকান্ত একখানি আধুনিক সংস্কৃত অভিধানের অভাব অনুভব করিয়া ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শব্দ চয়ন আরম্ভ করিয়া দেন। ১৮০৯ সন নাগাদ একখানি অভিধান প্রকাশের মত শব্দ সংগৃহীত হইল। কিন্তু যখন দেখিলেন, বহু প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারিক শব্দ ইহা হইতে বাদ পড়িয়াছে, তখন তিনি সাহিত্য, দর্শন, অলঙ্কার ব্যাকরণ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি নানা বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শব্দ চয়নে মন দিলেন। নিজ গৃহে একটি সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্র বসাইয়া ১৮১৯ সনের আগস্ট মাসের মধ্যে 'শব্দকল্পদ্রুমে'র স্বরবর্ণ সম্বলিত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল।* এই

---

* The Calcutta School-Book Society, *2nd Report*, Appendix No. IX, pp. 50-51.

অভিধান প্রকাশ সম্পূর্ণ হইতে তাঁহার চল্লিশ বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছিল। সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হইলে এই অভিধানখানি সঙ্কলনের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি ম্যাক্সমূলরকে ১৮৫১, ১৮ই নবেম্বর এইরূপ লেখেন,—

> When I ventured to assume the character of a Lexicographer my most ambitious wish was but to revive the study of Sanscrit in my own country where it has been on the decline. But I should not dissemble that love of fame stimulated my exertion through worldly tribulations where patience must have failed and perseverance wearied.
>
> I have devoted the greatest portion of my life and no inconsiderable labour and expense to the execution of the work and though as an Encyclopædist I have no claims to originality or to the merits of a genius yet I trust my industry and application will at least be applauded when I may be considered as a pioneer of Sanscrit learning.

উদ্ধৃত অংশে রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশের উদ্দেশ্য সুব্যক্ত। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার ব্যবহারে বিশেষ উপকৃত হন ও সঙ্কলয়িতা রাধাকান্ত দেবের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইউরোপের বহু নৃপতির নিকট হইতে রাধাকান্ত পদক ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশের পর 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর কার্য্য পরিসমাপ্তি হয়। ইহার এক বৎসর পরে, ১৮৫৯, ২৫এ নবেম্বর কলিকাতাস্থিত রাধাকান্ত দেবের স্বদেশবাসীরা এবং ইউরোপীয় মনীষীরা তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। মানপত্রদাতাদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র সিংহ, সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজেন্দ্র মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরি ভক্ৎ (নেপাল মহারাজার প্রতিনিধি), শম্ভুনাথ পণ্ডিত, অনুকূলচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হাকিম মির্জ্জা আলী, এসলি ইডেন, উইলিয়ম কে, জেমস্ লঙ প্রমুখ সে যুগের বহু ধনী, মানী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রাচীনপন্থী, প্রগতিবাদী এবং খ্রীষ্টান মিশনরী ছিলেন। তাঁহারা মানপত্রে রাধাকান্তের ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধনার এবং অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন।*

বঙ্গদেশেও সংস্কৃত-বিদ্যার পুনঃপ্রচারে রাধাকান্ত দেবের কৃতিত্ব অনেকখানি। এ-কারণ সরকার-প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র সংস্কৃত কলেজকে যখনই নানা ভাবে পঙ্গু করিবার চেষ্টা চলিত, তখনই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করা সাব্যস্ত হইলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মাসহারা প্রথমে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং পণ্ডিত ও অধ্যাপকের সংখ্যা হ্রাস ও ভাতা কমাইবারও প্রস্তাব করা হয়। রাধাকান্ত দেব ইহাতে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বিলাতে হাইড ঈস্ট, উইলসন ও অন্যান্য শিক্ষানুরাগী সুপণ্ডিত বন্ধুগণকে পত্রে তাঁহার ক্ষোভের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সঙ্কোচ করিতে শিক্ষা-সমাজ উদ্‌গ্রীব হইলেন এবং কেহ কেহ ইহা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যে মূলতঃ ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন—এইরূপ ঘোষণা করিলেন। তখন রাধাকান্ত দেব ইহার প্রতিবাদে এক তীব্র মন্তব্য পেশ করেন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজের অবস্থা সত্য সত্যই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব্বে ডক্টর উইলসন প্রমুখ সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের নির্দ্দেশে সংস্কৃত কলেজের কার্য্য সুষ্ঠুরূপেই নির্ব্বাহিত হইত। বাঙালীদের মধ্যে সুবিদ্বান্ রামকমল সেন চারি বৎসর কাল (১৮৩৫-৩৮) ইহার সম্পাদক

* *Rajah Sir Radhakant Bahadur, K. C. S. I.*, pp. 25-26.

ছিলেন। স্বয়ং রাধাকান্ত দেবও স্বল্পকাল রামকমল সেনের অনুপস্থিতি সময়ে (১৮৩৬ ডিসেম্বর হইতে ১৮৩৭ মার্চ্চ পর্য্যন্ত) ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ সরকার যে রকম কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করেন, তাহাতে এদেশে সংস্কৃত-চর্চ্চার উন্নতি সম্বন্ধে তিনি হতাশ হইয়া পড়েন। সংস্কৃত কলেজের পরিচালন-ভার দীর্ঘকাল এমন সব লোকের উপর ন্যস্ত ছিল, যাঁহারা সংস্কৃতের এক বর্ণও বুঝিতেন না। তাই ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর রাধাকান্ত দেব উইলসন সাহেবকে এক পত্রে দুঃখ করিয়া লিখিলেন,—

> As for the Sanscrit College you can well imagine its fate it being placed under the superintendence of a body of men not one of whom understands a bit of or cares a whit for, Sanscrit ?

তবে যখনই সুযোগ পাইতেন, সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে রাধাকান্ত বিরত হইতেন না। ১৮৪৭ সনে সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সংস্কৃতের প্রশ্নকর্ত্তারূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত বৈদ্যনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে রাধাকান্ত দেবের উল্লেখ পাই। *(General Report on Public Instruction, etc. for 1847-48.)*

রাধাকান্ত স্বদেশবাসীর মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য স্বয়ং শোভাবাজারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরের ৯ই ফেব্রুয়ারী 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন,—

> নূতন সংস্কৃত কলেজ। আমরা অসীম আনন্দ সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি অত্র নগরীর অদ্বিতীয় মান্যাগ্রগণ্য সুধির পণ্ডিত মণ্ডলী উজ্জ্বল নৃপবর শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর সম্প্রতি অভিনব সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।...পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র তর্কপঞ্চানন তথা শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি

শ্রীযুক্ত কালীকমল তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। বেলা ১০ দশ ঘণ্টাবধি ... প্রহর চারিঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠের কাল নির্ণীত হইয়াছে,১২ বারো জন বিদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। ঐ অভিনব কলেজে আপাততঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কার, গণ, ভট্টি, কুমার, কাব্যাদি শব্দশাস্ত্র এবং নব্য প্রাচীন স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা হইতেছে নিযুক্ত অধ্যাপকদিগের কথাই নাই, ঐ সকল বিদেশীয় ছাত্রগণেরাও রাজসংসার হইতে আহারীয় নগদ বৃত্তি পাইতেছেন…।

সমাজ-সেবা ও জনহিতকর কার্য্য

রাধাকান্ত দেবের প্রধান কার্য্যসমূহের এ-পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ছাড়া, তিনি নানা সভাসমিতি এবং সরকারী ও বেসরকারী বহু কমিটিতে যোগদান করিয়া নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমতে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এখানে কয়েকটি প্রধান কার্য্যের মাত্র উল্লেখ করিব।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার হিন্দুকলেজে শিক্ষিত, পণ্ডিত ও গণ্যমান্য বাঙালীরা মিলিত হইয়া গৌড়ীয় সমাজ স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য—'এতদ্দেশীয় লোকেদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জ্জন'। রাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গৌড়ীয় সমাজের কর্ম্মকর্ত্তৃ-সভায় ছিলেন লাডলিমোহন ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকান্ত ঘোষাল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামজয় তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, কাশীনাথ মল্লিক ও রামকমল সেন। এই সভা অনুমান দুই বৎসর চলিয়াছিল।

শোভাবাজার-রাজপরিবারে কখনও সতীদাহ-প্রথা অনুসৃত হয় নাই। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ সতী হইলে রাধাকান্ত বিশেষ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেন। তবে কোন সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে সরকার হস্তক্ষেপ করেন, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। এ-কারণ ১৮২৯, ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আইনের বলে সতীদাহ-প্রথা রহিত করিলে যাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া লিখিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, রাধাকান্ত তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। বেণ্টিঙ্ক তাঁহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিলে হিন্দু প্রধানগণ প্রধানতঃ ইহার প্রতিকারার্থ এদেশে ও বিলাতে আন্দোলন চালাইবার জন্য ২৪ জানুয়ারী ১৮৩০ তারিখে 'ধর্ম্মসভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার পক্ষে বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে আবেদন করা হইয়াছিল। আড়াই বৎসর পরে ১৮৩২, ১১ই জুলাই প্রিভি কৌন্সিল এই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া সতীদাহ-নিষেধক আইন বহাল রাখেন।* ধর্ম্মসভা ইহার পরও বহুদিন চলিয়াছিল। রাধাকান্ত দেব বরাবর ইহার সভাপতি ছিলেন।

গবর্মেণ্টকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের যে পত্রখানি গোড়ার দিকে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগের উল্লেখ আছে। এ দেশে কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্যই মূলতঃ এই সভা স্থাপিত হয়। ইহা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন উইলিয়ম কেরী। রাধাকান্ত দেব একাধিক বার ইহার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

---

* রাধাকান্ত দেব ১৮৩২, ১৭ই নবেম্বর তারিণীচরণ মিত্রকে লেখেন,—"I deeply regret to inform you that the Suttee Petition was dismissed after a long argument for three days. The dismissal, however, was not unanimous and impartial as 4 Lords of the Privy Council were in favour of the Petition and 6 against it."

রচনাবলীতে চব্বিশ-পরগনা জেলায় কৃষির উন্নতিবিষয়ক তাঁহার একটি প্রস্তাব মুদ্রিত হয়।

স্বদেশের শিল্পোন্নতির দিকেও রাধাকান্তের মন অভিনিবিষ্ট ছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে নূতন সনন্দ লাভ করে, তাহার ফলে ভারতবর্ষে ইহার একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত হয়। এই সনন্দে আরও নির্দ্দেশ থাকে যে, শিক্ষিত ভারতবাসী দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দেই প্রথমটির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বেসরকারী লোকদের দ্বারা ভারতবর্ষে চা উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হইলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে 'টি কমিটি' গঠন করেন। রাধাকান্ত দেব এই কমিটির একজন সদস্য নিযুক্ত হইলেন। এই কমিটি কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি-গণ আসামে যে প্রচুর চা জন্মে, তাহা সর্ব্বপ্রথম সভ্য-জগতের গোচরীভূত করেন। সে যুগের বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ ডক্টর এন. ওয়ালিচ এই দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

বেণ্টিঙ্কের আমলেই উচ্চশিক্ষিত দেশীয় যুবকদের ডেপুটি কলেক্টর প্রভৃতি উচ্চ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। পরিণতবয়স্ক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও গুরুত্বপূর্ণ অবৈতনিক পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং জেম্স কিড সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় অবৈতনিক জাষ্টিস অফ দি পীস নিযুক্ত হইলেন। সপ্তাহে দুই দিন রাধাকান্ত দেব জাষ্টিসের কার্য্য করিতেন।*

---

* এই সম্পর্কে রাধাকান্ত দেব ডক্টর হোরেস হেমান উইলসনকে ৫ মার্চ ১৮৩৬ তারিখে একখানি পত্রে লেখেন,—

"The renewal of the Company's charter....extended the powers of the Moonsiffs, Sudder Ameens, and Principal Sudder Ameens, nominated Native Deputy Collectors as well as Magistrates where-

রাধাকান্ত দেব বিশ্বাস করিতেন—তাঁহার স্বদেশবাসীরা বিচার কার্য্যে সুপটু, তাহাদের বিচারকার্য্য তাহারা নিজেরাই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করিতে পারে। দীর্ঘকাল আন্দোলনের পর জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতের সকল অধিবাসীই ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে গ্রাণ্ড ও পেটি উভয় প্রকার জুরী হইবার অধিকার লাভ করে। ভারতীয় জুরীরা কিরূপ যোগ্যতার সহিত বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, রাধাকান্ত ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ জুন সার্ হাইড ঈস্টকে লিখিত এক পত্রে তাহার সবিশেষ উল্লেখ করেন।

সরকার যখন লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তির উপর কর বসাইতে মনস্থ করেন, তখন ইহার প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হয়। রাধাকান্ত দেব ছিলেন ইহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন। এই আন্দোলনের ফলে ১৯এ মার্চ ১৮৩৮ কলিকাতায় জমিদার-সভা গঠিত হইল। রাধাকান্ত দেব এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে জমিদার-সভার উদ্দেশ্য ও গবর্মেণ্টের তাৎকালিক শাসন-নীতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায়। রাধাকান্ত দেব বলেন,—

> ইঙ্গলণ্ডীয়দের রাজ শাসনের অধীনে প্রথমতঃ লোক সকল বিলক্ষণ সুখে কালযাপন করিতেন কিন্তু এইক্ষণে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে এবং ভূম্যধিকারিরাও উদ্বিগ্ন আছেন। পক্ষান্তরে গভর্ণমেণ্ট প্রজারদের হিতার্থ কি কার্য্য করিয়াছেন কএক বৎসর হইল যখন দেশের কোনং অংশ বন্যাপ্রযুক্ত

---

by Mr. J. Kyd, Dwarkanath Tagore and I have been appointed honorary Justices of the Peace for the Town in Calcutta in August last. I am doing the duty of the conservancy department two days in a week, and the Tagore that of the assessment department."

উপক্রম হইল তাহাতে গভর্ণমেন্ট কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত আপনাদের দাওয়া স্থগিত রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে সুদ সমেত উসুল করিলেন তাহাতে অনেক জমিদারী ভ্রষ্ট হইল ও প্রজাদের অত্যন্ত ক্লেশ ঘটিল। প্রজাদের যে সকল অনিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ হয় তন্মধ্যে প্রধান অনিষ্টকর নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ। অতএব সময় মতে আমাদের এক সমাজ স্থাপন করা উচিত হয় এইরূপ সমাজের দ্বারা উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে এমত নহে কিন্তু তাবৎ দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নানা জিলার সঙ্গে এই সমাজের লিখন পঠন চলিতে পারিবে।...এই সমাজের দ্বারা যাহার যে অনিষ্ট বিষয় অনায়াসে গভর্ণমেন্টের নিকট জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। এমত উক্ত আছে যে একগাছি তৃণ অঙ্গুলির দ্বারা অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তি বন্ধন করিতে পার্‌া যায় অতএব প্রজালোকের ঐক্য বাক্য হওয়া অতি উচিত এবং গভর্ণমেন্টের কর্ম্মকারকদের উপর চৌকি দেওনের নিমিত্ত এবং গভর্ণমেন্টের নিকটে আমাদের দরখাস্ত জ্ঞাত করণের নিমিত্ত এমত এক সমাজ স্থাপন করা উপযুক্ত বোধ হয়।*

জমিদার-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় রাধাকান্ত দেব সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সভা কিছু কাল বেশ সমারোহে চলে ও জনহিতার্থ কোন কোন কার্য্য সম্পাদনে সাফল্য লাভ করে। এক একটি গ্রামে পঞ্চাশ বিঘা পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্র ছাড়িয়া দিবার নিয়ম এই সভার উদ্যোগেই হইয়াছে।

ইহার চৌদ্দ বৎসর পরে ১৮৫১, ২৯এ অক্টোবর কলিকাতায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হয়। ইহার

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭। এই অধ্যায়ের প্রথম দিক্‌কার দুইটি তথ্য এই পুস্তকের ১ম খণ্ড হইতে গৃহীত।

উদ্দেশ্য ছিল আরও ব্যাপক—ইংরেজ-অধিকৃত ভারতীয় সমুদয় অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম সম্পাদক হইলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। রাধাকান্ত সভাপতি-পদ গ্রহণে সম্মতি জানাইয়া সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথকে পরবর্ত্তী ৭ই নবেম্বর যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে তাঁহার অকপট দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রে তিনি বলেন,—

> Although my age will not permit me to take an active part in the proceedings of the Society yet as I cannot forego the pleasure of participating in an undertaking so laudable and conducive to the future interests of our country I request you to inform the Society that I would feel myself honoured by their proposing me as Honorary Member and President of the Institution.
>
> The necessity of the formation of a well-organised Society to represent the wants and grievances of our country before the British Parliament has too long been felt but it grows imperative on so momentous an occasion as the termination of the East India Company's Charter. The noble objects therefore contemplated by the Society cannot but receive my hearty concurrence.
>
> As the attempts which have hitherto been made by our countrymen in furtherance of the above views have proved abortive I trust the Society will be guided by such sound principles as to secure the permanent existence and give efficiency to all its proceedings.

রাজা রাধাকান্ত দেব মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা ও বার্দ্ধক্যজনিত অপটুতা সত্ত্বেও তিনি সভার প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় হয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যোগদান করিতেন, নতুবা এ সম্বন্ধে

পত্র দ্বারা লিখিতভাবে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিতেন। ভারতবর্ষে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। ঐ বৈষম্য দূর করিবার প্রথম উদ্যোগ করেন ভারত-সরকারের আইন-সচিব লর্ড মেকলে। পরে আইন-সচিব ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার ইহার জন্য চেষ্টা করেন। তৃতীয় বার এই উদ্দেশ্য আইনের পাণ্ডুলিপি প্রচারিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে তৎকালীন আইন-সচিব বঙ্গের পরবর্ত্তী লেফ্টেনাণ্ট গবর্নর সার জন পিটর গ্রাণ্ট কর্ত্তৃক। ভারতবাসীরা আইনের উপকারিতা অনুভব করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজেরা প্রস্তাবিত আইনের ঘোর বিরোধী ছিল এবং ১৮৩৬ সনেই ব্যঙ্গ করিয়া ইহার নাম দিয়াছিল 'ব্লাক অ্যাক্ট' বা কালো আইন। অন্যান্য বারের মত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করে। কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষে ভারতবর্ষীয় সভা আইনের সমর্থনে কলিকাতা টাউন হলে ৬ই এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখে একটি বিরাট্ জনসভার অনুষ্ঠান করেন। অসুস্থতা নিবন্ধন সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলেও পত্র দ্বারা তাঁহার অভিমত সভায় জানাইয়াছিলেন। ১০ এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রখানির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ দিয়াছেন,—

> সকল প্রকার প্রজার বিচারকার্য্য এক প্রকার নিয়মে নির্ব্বাহ করাই রাজার কর্ত্তব্য হয়। শ্বেতাঙ্গদিগের বিচার কেবল সুপ্রিম কোর্টে এবং এতদ্দেশীয় কৃষ্ণাঙ্গগণের বিচার মফঃস্বল আদালতে হইলে রাজার পক্ষপাত হয়, অতএব প্রস্তাবিত নিয়ম সর্ব্ববিধায়েই উত্তম হইয়াছে, ইংরাজেরা যখন এদেশের প্রজারূপে গণনীয় হইয়াছেন তখন তাঁহারদিগের অপরাধের বিচার নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রকার নিয়ম করা কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না,…।

এই সভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র ও ভারত-বন্ধু জর্জ টমসন বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র-কৃত 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইলে এতদ্দেশীয় শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে। তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, এই অনুবাদের জন্য পাদ্রী লঙ্ সাহেব দায়ী, তখন তাহারা কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে। লঙ্ সাহেব ১৮৬১, ২০এ জুন নিজ মতামত সম্বলিত একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত করেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে তেতাল্লিশ জন বাঙালী প্রধান ইহার সমর্থনে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। মোকদ্দমায় কিন্তু লঙ্ সাহেব রেহাই পাইলেন না, তাঁহার এক মাস কারাদণ্ড ও এক সহস্র টাকা জরিমানা হইল। মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারপতি সার্ মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স বাঙালী-জাতির চরিত্রের উপরে দোষারোপ করেন। লঙ সাহেবের মোকদ্দমায় যেমন, বিচারাসন হইতে ওয়েলসের এইরূপ কটূক্তিতেও তেমনি ভারতবাসীদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ২৬ আগস্ট ১৮৬১ তারিখে রাজা রাধাকান্তের শোভাবাজারস্থ বাটীর নাটমন্দিরে তাঁহারই সভাপতিত্বে একটি বিরাট্ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার গণ্যমান্য প্রায় সমুদয় লোকই ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। রাধাকান্ত দেবের সহায়ে সভার উদ্দেশ্য কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে ১৪ এপ্রিল ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' এইরূপ লেখেন,—

> ...অতঃপর লঙ্ সাহেব নিজের নাম ব্যক্ত করিলেন। নীলকরদিগের ব্যয়ে তাঁহার নামে মোকদ্দমা হইতে লাগিল। সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স বিচারাসনের অনুচিত পক্ষপাত, রূঢ়তা, ঔদ্ধত্য ও অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া লঙ্ সাহেবের একমাস

> কারাবাস ও ১০০০ টাকা জরিমানার আজ্ঞা দিলেন।...রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তাঁহার উকীলের ব্যয় ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা দিলেন।...লঙ্ সাহেবের বিচারকালে সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্স যাবতীয় বাঙ্গালীকে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশী সমুদায় প্রধান লোক একত্র হইয়া সভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে এক সভা করিয়া সর মর্ডাণ্ট ওয়েলেসের দুঃস্বভাবের বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারীর গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আবেদন পত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় এক মাস চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়, ইংলিশমান হরকরা সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ একতা হইয়াছিল যে, তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন নাই। সর চার্লস উড আবেদনের উত্তর দান কালে মর্ডাণ্ট ওয়েল্সকে সাবধান করিয়া দিলেন।...

প্রথম ভারত-সচিব সার্ চার্লস উড এই ব্যাপারে এবং নীলকরদের স্বার্থমূলক অন্যান্য আইন বিধিবদ্ধ হইতে সম্মতি না দেওয়ায় এই সময়ে ভারতবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করেন। বলা বাহুল্য, স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণ অহরহ এই হেতু তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে থাকে। ভারতবাসীরা যে সার্ চার্লসের ভারত-হিতে বিশেষ অবহিত, ইহা প্রদর্শনের জন্য ভারতবর্ষীয় সভা তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রেরণের উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছিলেন। এ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষীয় সভা-গৃহে হিন্দু মুসলমান প্রধানেরা মিলিত হইয়া ১৪ মার্চ ১৮৬৩ তারিখে যে সভা করেন, তাহারও সভাপতিত্ব করেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তিনি স্যার্ চার্লস উডের মঙ্গলকর কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শিক্ষা-সম্পর্কীয় বিষয়সমূহের আলোচনাকালে গবর্মেণ্ট রাধাকান্ত দেবের অভিমত চাহিয়া পাঠাইতেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড স্টানলি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক ডেস্‌প্যাচ বা সরকারী বিধান আলোচনা করিয়া প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষের দেশীয় ভাষাসমূহই (provincial lauguages) তথাকার শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। বাংলা-সরকার এই উপলক্ষ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিক্ষানীতি-বিদের অভিমত আহ্বান করেন। ইঁহাদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব এক জন। রাধাকান্ত শুধু মাতৃভাষা শিক্ষার উপর জোর দেন নাই, মাতৃ-ভাষা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিয়া যুবকগণ যাহাতে কৃষি ও শিল্পশিক্ষা লাভ করিতে পারে, সে জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষেও মত দেন। তাঁহার কথায়—

> As soon as the people will begin to reap the fruits of a solid vernacular education, agricultural and industrial schools may be established in order to qualify the enlightened masses to become useful members of society. Nothing should be guarded against more carefully than the insensible introduction of a system whereby, with a smattering knowledge of English, youths are weaned from the plough, the axe and the loom, to render them ambitious only for the clerkships for which hosts would besiege the Government and Mercantile offices, and the majority being disappointed (as they must be), would (with their little knowledge inspiring pride) be unable to return to their trade, and would necessarily turn vagabonds.

রাজা রাধাকান্ত দেব সুরাপান নিবারণ প্রচেষ্টারও একজন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। একেশ্বরবাদী আমেরিকান পাত্রী সি. এইচ. এ. ডাল সাহেব গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সুরাপান নিবারণের জন্য কলিকাতায় আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে ভারতীয় যুবকদের দ্বারা এই কথাগুলি স্বাক্ষর করাইয়া লইতে আরম্ভ করেন—

'আমরা কখন মাদকদ্রব্য সেবন করিব না।' রাধাকান্ত দেব এই বিষয় সম্পর্কে ডাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি ডাল সাহেবের 'টেম্পারেন্‌স্ প্লেজ' বাংলায় অনুবাদ করিয়া পঞ্চাশ খণ্ড তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। রাধাকান্ত তাঁহাকে সুখচর হইতে ২৩এ নবেম্বর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম 'সোমপ্রকাশে' (১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৩) প্রকাশিত হয়। আমরা পত্রখানি এখানে দিলাম,—

> প্রিয় সুহৃদ্! আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমার মনোবৃত্তিসকল অদ্যাপি যুবার ন্যায় সবল আছে। বিশেষ হিবর সাহেব এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় অবধি বঙ্গদেশের যে আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি মহৎ বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই সমুদয় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কতকগুলির নিমিত্ত পরমারাধ্য পরমেশ্বরকে অহরহ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। আর কতকগুলি বিষয় এইরূপ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, যাহাতে দুঃখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। ঐ সকলের মধ্যে মদ্যপান স্পৃহা বহু বিস্তৃত হইয়াছে, এবং দিন দিন সাতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে। সুরাপান যে কত দোষাবহ তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, এতদ্দেশীয় কি অন্য দেশীয় শাস্ত্রকারেরাও তাহা নিন্দনীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। পানদোষ বৃদ্ধির প্রথম কারণ এই যে, মদ্যশালার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে যেমন মক্ষিকাগণ মাকড়সার জালে বদ্ধ হয়, সেইরূপ অবিমৃষ্যকারী যুবকগণ উহাতে প্রলোভিত হইতেছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ আপনার দোষে এই নিন্দনীয় দোষে দূষিত হইতেছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, লোকে যাহাতে মাদকদ্রব্য হইতে পরাঙ্মুখ হয়, সেই বিষয়ে যত্নসহকারে চেষ্টা করুন এবং এতদ্দেশীয় যুবকগণকে মদ্যপানরূপ বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার

করিবার নিমিত্ত সতর্ক হইয়া পরিশ্রম স্বীকার করুন। সাধ্যানুসারে যত দূর পারেন, মাদক নিবারণরূপ পবিত্র ব্রতে লোকদিগকে সৈন্যরূপে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করুন। আমি অবগত আছি যে, শত শত হিন্দু যুবকগণ উপদেশ ও পরামর্শ প্রাপ্তির আশায় আপনার নিকট গমন করিয়া থাকেন এবং আপনি ভ্রমণকালীন কিংবা কোন সাধারণ সমাজে দেখিতে পাইলে, তাঁহাদিগকে চিত্তোন্মাদক মাদক দ্রব্য হইতে বিরত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। প্রিয়তম ড্যাল! আমার এই সকল অভিমতবাক্যের যত অনুসরণ করিতে পারেন, তত চেষ্টা করিবেন।—রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর

রাজসম্মান ও মৃত্যু

রাধাকান্ত দেব জনসেবার পুরস্কার-স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে সরকারের নিকট হইতে বিশিষ্ট চিহ্ন ও উপাধি লাভ করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট খেলাৎ ও শিরপেচ দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। তিনি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই রাজা বাহাদুর এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রিল বৃন্দাবনবাসকালে কে. সি. এস. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতবাসীদের মধ্যে রাধাকান্তই সর্ব্বপ্রথম শেষোক্ত উপাধি লাভ করেন।

রাধাকান্ত দেব সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন হইতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন। এখানে তিন বৎসর অবস্থানের পরে ১৮৬৭, ১৯এ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

রাধাকান্ত দেব প্রাচীনপন্থী ছিলেন, এই জন্য পরবর্ত্তী কালে এক শ্রেণীর লোকের নিন্দাভাজনও হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসময়ে

ধর্ম্মে নিষ্ঠা, জ্ঞানে গভীরতা, বিশুদ্ধ চরিত্র, মধুর ব্যবহার এবং সমাজ-হিতৈষণার জন্ত তিনি বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আদর্শ প্রজারঞ্জক জমিদাররূপেও তাঁহার খ্যাতি সুবিস্তৃত ছিল। ১৮৩২, ২৭ জুন শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন,—

> বাবু রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে যদ্যপিও আমারদিগের তাদৃশ আলাপাদি নাই তথাপি আমরা ইহা জানি যে যখন যাঁহার সঙ্গে তাঁহার আলাপাদি হইয়া থাকে সে অতি শিষ্টতারূপ। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক আচার ব্যবহারেতে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় যাহা কহিবেন সুতরাং তাহাই আমারদের বিশ্বাস্ত। উক্ত বাবু স্বয়ং বিবিধ বিদ্যাতে বিদ্বান্ এবং সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের প্রধান পোষক ও প্রয়োজক ইহা কে না অবগত আছেন। তিনি প্রথমাবধি হিন্দু কলেজ ও স্কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু পাঠশালার কর্ম্মে অন্যাপেক্ষা অত্যন্ত মনোযোগী আছেন এবং চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়াপেক্ষা অগ্রসর হইয়া তিনি স্বদেশীয় বালিকারদের বিদ্যাধ্যয়নের বিষয়েও পোষকতাচরণ করিয়াছেন। স্মরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরম্ভকালে ত্রিশ জন বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে তাঁহার বাটীতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার মধ্যে প্রথম যে হিন্দু কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে আনীতা হয় সে ঐ বালিকারা। এবং শ্রীমতী বিবি উইলসনের পাঠশালাতে যে অনেকবার বালিকাগণের পরীক্ষা হয় সে স্থানেও ঐ বাবুকে আমরা দেখিয়াছি বোধ হয় এবং তিনি বালিকারদের যাহাতে বিদ্যাশিক্ষাতে উত্তেজনা হয় এমত অনেক প্রস্তাবোপদেশ তাহারদিগকে দিয়াছেন এবং বিদ্যালাভে কীদৃশ উপকার এমতও তাহারদিগকে অনেক উপদেশকতা করিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। আমরা ইহা হইতেও অধিক বাবুকে প্রশংসা করিতে পারি তাঁহার কিয়ং জমীদারী দিয়া আমাদের গমনাগমন থাকাতে তাঁহার কতক

এঁহাদের সঙ্গেও পরিচয় আছে অতএব আমরা সানন্দে লিখিতেছি জমীদারস্বরূপেও তিনি অতি সুবিবেচক ও প্রশংসাপাত্র এমত আমরা জ্ঞাত আছি।

রাধাকান্ত দেব তাঁহার সময়ে বহু বিষয়েই অগ্রণী ছিলেন। পরবর্তী যুগে যাঁহারা তাঁহাকে পুরাতনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত, সে-যুগের অগ্রবর্তী দলের প্রথমস্থানীয় পাদ্রি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিই তাহা সপ্রমাণ করে। রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিসভায় (১৪ মে, ১৮৬৭) প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

> To the remarks made on the Rajah's retrograde movements and his obstructions to progress, I can only say that it is unfair to compare him with persons who were his juniors by more than half a century, as unfair, indeed, as it would be to disparage the statesmanship of a by-gone politician, such as Mr. Pitt, by saying that he was no reformer, or that he did not propose household suffrage. A man in this respect can only be compared with his own contemporaries. Judged by such a standard, the Rajah would certainly appear not behind, but in advance of his equals in age.

রাজেন্দ্রলাল মিত্র অন্তত: ২৫ বৎসর কাল রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে রাধাকান্তের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া উক্ত সভায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন,—

As the President of the British India Association he will be long remembered for his earnestness and zeal for the good of the community at large. He was the chairman of every public meeting, and foremost in every movement for the social, moral, and political amelioration of our race. He may not have been all that some so-called reformers of our day could wish. He may have pleased himself in opposition to many of them. A Hindu brought up in the faith of his ancestors he may have set his face against infantile and juvenile conversion; he certainly objected to the

slaughter of the cows and strongly reprobated licentious indulgence in spirituous liquors, which to many appears as the stepping stone to reformation.......He was no enemy to real reformers. He found no fault with those who dissected the human body in the Medical College. He subscribed as freely to the fund for sending native youths to England to prosecute their studies in medicine as for any orthdox undertaking. As a man of fascinating and popular manners he had no equal, and justly did Sir Lawrence Peel, Chief Justice of the late Supreme Court, say that "he was a pattern of gentlemanliness which we would all do well to imitate." But I must now pass on to say a few words on his scholarship. It is a matter of regret that Sanskrit learning is not held in sufficient estimation in our day, and Raja Radhakant's services in the case of the ancient classics of our country may not, therefore, be duly appreciated by many ; but as an humble labourer in the field of Indian literature I beg to assure you, gentlemen, that those services are of the highest order. The Raja....adopted the hard life of a scholar, and devoted a whole lifetime to the cultivation of our ancient literature. It was by dint of unremitting labour of years—of protracted labour of forty long years,—that he produced the great work of his life the Sabdakalpadruma, which has been the theme of praise to all who have seen it. Those who are best able to weigh the importance of literary productions, who are the great guardians of the republic of letters and who bestow praise with the greatest descrimination, I mean, the learned societies of Europe, were the first to recognise the merits of the Raja's lexicon, and not slow in giving expression to their sense of its value. The Imperial Academy of St. Petersburgh, the Royal Academy of Berlin, the Kaiserlicher Academy of Vienna, the Royal Asiatic Society of Great Britain, the Oriental Societies of Germany and America, the Asiatic Society of Paris, and the Royal Society of Northern antiquities, sent him diplomas of honorary or corresponding membership. Those are testimonies the value of which can never be shaken.

গ্রন্থাবলী

সর্ব্ববিধ শিক্ষা-প্রচেষ্টায় ও সমাজ-কল্যাণে ব্রত থাকিলেও রাধাকান্ত আসলে ছিলেন সাহিত্যসেবী। আর্বী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী—এই পাঁচটি ভাষা তিনি সমভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের নিদর্শন তাঁহার বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। রাধাকান্ত-বিরচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থগুলি এই—

১। **নীতিকথা**। এপ্রিল ১৮১৮। পৃ. ৩৫।

> নীতিকথা পাঠশালার নিমিত্তে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা করিয়া সংগ্রহ ও মুদ্রিত করা গেল C. S. B. S. কলিকাতা শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা হইল ইং ১৮১৮ এপ্রিল মাস

ইংরেজী ও আর্বী হইতে ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অনুবাদ করেন রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র ও রামকমল সেন।*

২। **শব্দকল্পদ্রুমঃ**। ইং ১৮১৯-৫৮।

> শব্দকল্পদ্রুমঃ অর্থাৎ এতদ্দেশস্থ সমস্ত কোষাশেষ শাস্ত্র সঙ্কলিতা-কারাদি বর্ণক্রম বিন্যস্ত ধাতু শব্দ তদনুবহু লিঙ্গ নানার্থ পর্য্যায় প্রমাণাদি সহিত তত্তচ্ছব্দ প্রসঙ্গোত্থিত কাব্যালঙ্কার ছন্দঃ প্রভৃতি লক্ষণোদাহরণ দ্রব্যগুণ রোগনিদান স্মৃতি ব্যবস্থাদি সংযুক্ত সর্ব্বদর্শন মতানুসারি সংস্কৃতাভিধানং

প্রথম খণ্ড ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ও শেষ (সপ্তম) খণ্ড ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

---

* এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ১৪-সংখ্যক পুস্তক 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত', পৃষ্ঠা ২৩-২৪ দ্রষ্টব্য

৩। বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ। ইং ১৮২১। পৃ. ২৮৮।

ইহার ভূমিকার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি,—

স্কুল সোসাইটি···তদ্দারা পাঠশালার উপযোগি নানা প্রকার ব্যুৎপাদক গ্রন্থ প্রস্তুত ও···করিয়া কলিকাতার সকল পাঠশালায় এবং অন্যত্র বিতরণ ও গুরুরদিগের অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করা হইতেছে। তাহাতে বালকেরদিগের জ্ঞান বৃদ্ধির দ্বারা উপকার বৃদ্ধি হইতেছে।

ঐ সমাজ সংস্থাপন হইলে পর তাহার হিতৈষী এবং গ্রন্থকর্তার ···কোন ইংরেজের প্রার্থনাতে এক সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপুস্তক ইংরেজী রীত্যনুসারে প্রস্তুত করা গিয়াছিল। কিছু কালান্তরে সেই পুস্তক ঐ সমাজস্থ সকলে গ্রাহ্য করিয়া ছাপাইবার অনুমতি দিলে পর তাহাতে নানা উপকারক বিষয় সংযুক্ত করিয়া এই বাহুল্য গ্রন্থ প্রস্তুত করা গিয়াছে। ইহার বিস্তারিত নির্ঘণ্টে ব্যক্ত হইবেক। ইহাতে আর২ অনেক আবশ্যক বিষয় সংকলন করিবার বাঞ্ছা ছিল কিন্তু গ্রন্থকারের অনবকাশ এবং ঐ সমাজস্থ সাহেবলোকের ত্বরা প্রযুক্ত এবার তাহা সংগ্রহ করা হইল না। বারান্তরে তাহা একত্র করিয়া এবং এই গ্রন্থে যদি কোন দোষ থাকে তাহা শুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ছাপান যাইবেক। শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে। এবং অনেক সংস্কৃত শব্দ ভাষায় চলিত আছে। এবং লোকে কহে যে সাধুভাষা সে সংস্কৃতানুযায়িনী। এবং সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে শুদ্ধ লেখন পঠন ও কথন···না এ কারণ এই গ্রন্থ ভাষা সংস্কৃত মিশ্রিত রচিত হইয়াছে। অতএব গুণী ও গুণজ্ঞের নিকট প্রার্থনা এই ইহার কোন ত্রুটি গ্রহণ না করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহ্য করেন ইতি॥

'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে' বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতাদি বিষয় আছে। ইহা হইতে 'সাঙ্কেতিকবাক্য'গুলি (পৃ. ১৭৭-৮১) এখানে দিলাম।

অরণ্যে রোদন—নির্দ্দয়ের নিকট আত্মদুঃখ কথন

অর্দ্ধচন্দ্র দেও—গলাটিপি দেও

আগড়া ভাঙ্গা—নিষ্ফল কর্ম্ম করা

ইন্দ্রের শচী—যখন যাহার নিকট থাকে তখন তাহারি

উদারপিণ্ড বুধার ঘাড়ে—একের কর্ম্মে অন্যকে নিযুক্ত করে

উড়কুড় তুলে দেওয়ন—সুশৃঙ্খল কর্ম্মে বিশৃঙ্খল করণ

উনপঞ্চাশ হইয়াছে - পাগল হইয়াছে

ওর নাই—সীমা নাই

কাণে মাটি—অধোদেশ দর্শন হইতেছে

কাতলা পড়িয়াছে—ডাকাইতে মানুষ কাটিয়াছে

কালীঘাটের চণ্ডীপড়া—এক কর্ম্ম অনেকের বলিয়া প্রতারণা করা

কুকুরের লেজ ঘি দিয়া মলা—বাঁকা সোজা হয় না

গাদা পিটিয়া ঘোড়া করা—অধমকে উত্তম করা

চম্পট করিল—পলায়ন করিল

চাকি ডুবিল—সূর্য্য অস্ত গেল

চাক্তি নাই—টাকা নাই

চূড়ান্ত হইল—শেষ হইল

চেগরা বিচি—তণ্ডুল

ছাতারিয়ার নৃত্য—কর্ম্মের শৃঙ্খলা নাই

জনার্দ্দন হয় নাই—ভোজন হয় নাই

তেলা মাথায় তেল দেওয়া—যাহার আছে তাহাকে দেওয়া

দক্ষিণহস্তের ব্যাপার—ভোজন

দা কুমড়ায় সম্বন্ধ—হেস্তনেস্তকর্ত্তার সম্বন্ধ

দীর্ঘসূত্র—চিরকারী

দুর্ব্বাবনে মুক্তা ছড়ান—মূর্খ নিকটে সদালাপ

পঞ্চত্ব পাইয়াছে—মরিয়াছে

পটোল তুলিয়াছে—পলায়ন করিয়াছে

পদ্মনাভ হইয়াছে—শয়ন হইয়াছে

পল কিনিয়াছে—পলায়ন করিয়াছে

পলা কড়ি তুলিল—পলায়ন করিল

পাছুড়ীগায় দেও—শাগুড়িয়া হও

ফুটফাট হইয়াছে—প্রকাশ হইয়াছে, ছাড়াছাড়ি হইয়াছে

ফুলতোলা করিয়া লও—সর্ব্বত্র হইতে কিঞ্চিৎ লও

বকধার্ম্মিক—কাল্পনিক ধার্ম্মিক

বকে গিয়াছে—অকর্ম্মণ্য হইয়াছে

বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী—উভয় পক্ষে যে থাকে

বর্ষণে ভেকা—বধূকর্ম্মা হওয়া

বাঘের মাসি হইলেন—পুনরাগমন করিলেন

বাঘের ঘা করিয়াছে—ক্ষত ঘুটে২ বাড়াইয়াছে

বাড়ন্ত—নাই

বাহাত্তরিয়া হইয়াছে—অজ্ঞান হইয়াছে

বামনের গরু—অল্প আহার করিয়া অনেক দুগ্ধ হয়

বাইশের দফা—ভোজন

বিড়াল তপস্বী—ভণ্ড তপস্বী

বুড়া সালিকের ঘাড়ের রোঁয়া উপড়ান—প্রাচীনকে শিক্ষা দেওন

বেগুন তোলা—অগ্রহং লওয়া

বেঁড়েকে চোমরা করা—ছোটকে বড় করা

ভস্মে ঘৃত ঢালা—কর্ম্ম নিষ্ফল হওয়া

ভিটায় ঘুঘু চরান—সর্ব্বনাশ করা

ভুদেখান—ফাকী দেওন

মটকা মারিয়াছে—নিদ্রা ছলে আছে, শেষ করিয়াছে

মূলা তোলা—মূলোৎপাটন করা

রুক্ষ মাতায় তেল দেওয়া—যাহার নাই তাহাকে দেওয়া

শাক খাও—পাগুড়িয়া হও

শেয়ালের যুক্তি—রাত্রিতে পরামর্শ হয় প্রাতে নাই

শ্রীঘরে পাঠাও—কারাগারে পাঠাও

শ্রীহরি কর—গমন কর

সটকিয়াছেন—পলাইয়াছেন

সাত কথার মধ্যে পাঁচ কথা—এক কথার উপর অন্য কথা, বড় কথার উপর ছোট কথা

হাত যোড়া আছি—কর্ম্মে নিযুক্ত আছি

হাত মারা—ফাকি দিয়া লওয়া, অধিক লওয়া

হাত লাগিয়াছে—হস্তগত হইয়াছে

৪। **সংক্ষিপ্ত বাঙ্গলা শিক্ষা-গ্রন্থ।** ইং ১৮২৭। পৃ. ১১১।

'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

৫। **পদাবলী।** বৃন্দাবনবাসকালে (১৮৬৪-৬৭) দুই ভাগে প্রকাশিত। ১ম ভাগের সমাপ্তি এইরূপ :—

অথ ভনিতা।

গুরুপদ করি আস, রাধাকান্ত দেব দাস
রাজোপাধি কলিকাতা বাস।
এবে বৃন্দাবন স্থিতি, রচে পয়ার সংহিতি,
গান করে গদাধর দাস ॥*

৬। Translation of an Extract from a Horticultural work, in Persian, by Baboo Radhakant Deb, of Calcutta. Pp. 32.

রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে ইহার এক খণ্ড আছে।

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০২।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২২

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮—১৮৯৪

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫০
তৃতীয় সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৫২

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

বংশ-পরিচয়; বাল্যজীবন

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নয়টার সময় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়।

অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সংগ্রহ 'সঞ্জীবনী-সুধা'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাদের বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

> অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় একশ্রেণীর কুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ও যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের দৌহিত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই জন—শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র; কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য; 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় সম্পাদক এবং 'পালামৌ,' 'জাল প্রতাপচাঁদ,' 'কণ্ঠমালা,' 'মাধবীলতা'র লেখক সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে খ্যাত হইয়া আছেন।

পিতা যাদবচন্দ্র ফার্সী ও ইংরেজীতে শিক্ষালাভ করেন; অল্প বেতনের সরকারী চাকরি করিতে করিতেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের (বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-বৎসরে) জানুয়ারি মাসে তিনি মেদিনীপুরে ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (১৩ মাঘ ১২৮৭) ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঁচ বৎসর বয়সে বঙ্কিমের 'হাতে খড়ি' হয়। পরে গ্রাম্য পাঠশালার গুরু মহাশয় রামপ্রাণ সরকার বাড়ীতে তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৈশবেই মেধাবী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

গ্রামে পাঠ সমাপ্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে আগমন করেন; ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে তিনি সেখানকার ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে এফ. টীড্ নামে এক জন সাহেব মেদিনীপুর ইংরেজী স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য-ভাগে তিনি ঢাকায় বদলি হইলে তাঁহার স্থলে সিন্‌ক্লেয়ার নিযুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সহোদর এবং প্রায়-সহাধ্যায়ী পূর্ণচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

> বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে।...তাঁহাকে একজন private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত।—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সঙ্কলিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ. ৪২।
>
> বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটী হাই স্কুল ছিল। টিড নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড্‌মাষ্টার ছিলেন।...তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রোমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না।...মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নূতন Session খুলিলে, তথায় ভর্ত্তি হইবেন, স্থির হইল। তাঁহার জন্য গৃহে একজন প্রাইভেট্ টিউটর নিযুক্ত হইল।—ঐ, পৃ. ৩৪-৩৬।

সৌভাগ্যক্রমে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই শৈশব-শিক্ষার সামান্য বর্ণনা দিয়াছেন—

> আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন ; কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ্ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুরে গেলাম। সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল।...পরীক্ষার (জুনিয়র স্কলারশিপ, সঞ্জীবচন্দ্রের) অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম...।

"কাঁটালপাড়ায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা কবিতা শিখিলেন।"* কাঁটালপাড়া-নিবাসী শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ নামক এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট তিনি পাঠ লইতেন।† "বাঙ্গালা কবিতাগুলি—যাহা সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহা কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচিত।" 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জনে'র অনেক কবিতা তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভাল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার সংস্কৃত আবৃত্তি শুনিয়া প্রীত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার ঘরে আসিতেন ও মহাভারতের কথা শুনাইতেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপবর্ণন ও গীতগোবিন্দের 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে' কবিতাটি তিনি প্রায়ই আওড়াইতেন। শৈশবে হলধর তর্কচূড়ামণির নিকট তিনি প্রথম

---

* 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ. ৩৬।

† অক্ষয় দত্তগুপ্ত : 'বঙ্কিমচন্দ্র,' পৃ. ৩৩।

জন্মিয়াছিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র।"* এই বীজ হয় ত উত্তরকালে 'কৃষ্ণচরিত্র'-রূপ মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র খেলাধুলা ভালবাসিতেন না—তাঁহার শরীর এই কারণে অপটু ছিল। তিনি তাসখেলা পছন্দ করিতেন। "বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড় গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া ছাদে উঠিতে পারিতেন না, সাঁতার জানিতেন না,...কখনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না।"* অথচ মাঝে মাঝে বৃহৎ ব্যাপারে অসম-সাহস দেখাইতেন। ইতিহাস অধ্যয়নে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঝোঁক ছিল।†

মেদিনীপুর হইতে কাঁটালপাড়া প্রত্যাবর্ত্তনের কিছু দিনের মধ্যেই ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কাঁটালপাড়ার সন্নিকটস্থ নারায়ণপুর গ্রামের পঞ্চমবর্ষীয়া একটি সুন্দরী বালিকার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়।

ছাত্র-জীবন

হুগলী কলেজ

২৩ অক্টোবর ১৮৪৯ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে (তখন 'মহম্মদ মহসিনের কলেজ' নামেও পরিচিত) প্রবেশ করেন। তখন তাঁহার বয়স সাড়ে এগার বৎসর। কলেজে রক্ষিত হস্তলিখিত পুরাতন

---

* 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ. ৪১, ৪৫।

† দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বঙ্গদর্শন,' শ্রাবণ, ১৩১৮।

নথিপত্রের মধ্যে একটি বিপুলায়তন "অ্যাডমিশন বুক" (১৮৬২) আছে, তাহার ১০১ সংখ্যক লিপিপংক্তি অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

		Age	Date of Admission	Date of Withdrawal
101.	Bankim Chunder Chatterjee	11½	23 Oct. 1849	12 July 1856 Transfd. to Pres. College,

তৎকালে বিদ্যায়তনে সম্বৎসর (সেসন) গণনা হইত ১ অক্টোবর হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর মাসেই বৃত্তি-পরীক্ষা ও বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়া "দশহরা"র দীর্ঘ অবকাশের পর নূতন পড়া আরম্ভ হইত। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ছুটির তালিকায় পাওয়া যায়, সম্বৎসর-মধ্যে মোট ছুটি মাত্র ৬১ দিন, তন্মধ্যে ৩৫ দিন পূজার ছুটি মহালয়া হইতে আরম্ভ। তখনও গ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহালয়া ছিল ১৬ সেপ্টেম্বর; সুতরাং বৎসরারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র ভর্ত্তি হইয়াছিলেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ যে-বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশ করেন, হুগলী কলেজের ইংরেজী বিভাগ—কলেজ ও স্কুলে বিভক্ত ছিল। স্কুল-বিভাগের উচ্চ ভাগে (সিনিয়র ডিবিসনে) তিনটি শ্রেণী, প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন এবং নিম্ন ভাগে (জুনিয়র ডিবিসনে) চারিটি শ্রেণী, প্রথম তিনটি শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর "এ" সেকশনে ভর্ত্তি হন। তখন জুনিয়র ও সিনিয়র ডিবিসনের ছাত্রদিগকে মাসিক বেতন যথাক্রমে দুই টাকা ও তিন টাকা দিতে হইত। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র বৈতনিক ছাত্র ছিলেন।

স্কুলের প্রত্যেক সেকশন এক জন মাত্র শিক্ষকের অধীন থাকিত

এবং তিনি বাংলা ভিন্ন সমস্ত বিষয়েই অধ্যাপনা করিতেন। যাঁহার হস্তে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়, তাঁহার নাম নবীনচন্দ্র দাস (১-৫-১৮৫০ তারিখে বেতন ১০০৲, বয়স ২৭)। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পায়ু যদুনাথ দাস হুগলী কলেজেরই অতিপ্রসিদ্ধ কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নবীনচন্দ্র ১৫০৲ বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত বীরভূম-স্কুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী কালে বহু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি তন্তুবায়-জাতীয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-শ্রেণীতে ভর্তি হন, তাহা বহু কৃতী ছাত্রে পরিপূর্ণ। এই বৎসরের বাৎসরিক পরীক্ষার সম্পূর্ণ বিবরণ মুদ্রিত পাওয়া যায়।* "এ" সেকশনে দুই জন সাধারণ পারদর্শিতার পুরস্কার পাইয়াছিলেন—উমেশচন্দ্র শূর ও বঙ্কিমচন্দ্র। কৌতূহলী পাঠকের জন্য এই শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা প্রদত্ত হইল :—

Literature :	Azimghur Reader 2nd Poetical Reader Pinnock's Catechism of English History
Grammar :	Lennie's Grammar (to 20th Rule of Syntax) Writing
Arithmetic :	Extraction of the Square Root Vulgar fraction
Geography :	Stewart's Geography (Europe, Asia and Africa)
Bengali :	History of Bengal (বঙ্গেতিহাস) 51 pp. Gynarnub (জ্ঞানার্ণব) 95 pp.

১৮৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র ডিবিসনের তৃতীয় শ্রেণীর "এ" সেকশনে পড়িয়াছিলেন এবং এবারও বৎসরান্তে সাধারণ পারদর্শিতার

---

* *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency* for the year 1 Oct. 1849 to 30 Sept. 1850, pp. 101-05.

পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বতন প্রতিদ্বন্দ্বী উমেশচন্দ্র শূরও "বি" সেকশন হইতে অনুরূপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। "এ" সেকশনের শিক্ষক ছিলেন মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১-৫-৫০ তারিখে বেতন ১৩০৲, বয়স ৩৩)—প্রথিতনামা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। "বি" সেকশনের শিক্ষক Ure সাহেবের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন নাই।

পর-বৎসর (ইং ১৮৫১-৫২) দ্বিতীয় শ্রেণীর "এ" সেকশনে বিখ্যাত শিক্ষক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের* নিকট বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন,—"বি" সেকশনের ক্লারমণ্ট (F. W. Clermont) সাহেবের নিকট পড়েন নাই। তখনও শিক্ষা-বিভাগে বহু সাহেব শিক্ষকতা করিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতৃযুগল দেশীয় শিক্ষকদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু সাহেবদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইঁহাদের পদোন্নতি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রিকায় হুগলী কলেজের প্রধান শিক্ষক গ্রেভস (Graves) ও নবনিযুক্ত ব্রেণ্ডাণ্ড (Brennand) সাহেবদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাপূর্ণ কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশ্যে অস্বীকৃত হইলেও, কলেজের অধ্যক্ষ কার্ (Kerr) সাহেব তাঁহার ১৯-৯-৫০ তারিখের সুদীর্ঘ পত্রে ঐগুলি বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতৃদ্বয়েরই লেখা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।† দ্বিতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র পুরস্কার পাইতে পারেন নাই—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই শ্রেণীর পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন যাদবচন্দ্র রায় (সেকশন "বি") ও যদুনাথ মিত্র (সেকশন "এ")।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে তিনি প্রথম শ্রেণীর "বি"

* *Hooghly College Register* 1836-1936, p. 158.

† Zachariah : *History of Hooghly College*, p. 59.

সেকশনে উন্নীত হন। পর-বৎসর হইতে বিদ্যালয়ের সম্বৎসর (সেসন) পরবর্ত্তিত হইয়া ১ মে হইতে ৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় এবং কলেজ-বিভাগে গ্রীষ্মের ছুটি (১৬ এপ্রিল হইতে ৩১ মে পর্য্যন্ত দেড় মাস) নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।* সুতরাং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সকল শ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রথম শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল শিক্ষকের নিকট পড়েন, তাঁহারা—

Head Master	**J. Graves B.A. :**	**Literature and History**
Second Master	W. Brennand :	**Mathematics and Geography**

ইঁহারা উভয়েই কলেজেও পড়াইতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রেন্যাণ্ড সাহেব ঢাকায় বদলি হইয়া যান—তাঁহার স্থলে প্রায় এক বৎসর পরে (১৮-২-৫৪ তারিখে) ফোগো (D. Foggo, B. A.) নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ব্রেন্যাণ্ড সাহেবের কার্য্যভার অধস্তন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্লারমণ্ট সাহেব ভাগাভাগি করিয়া লন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ঈশানবাবু বদলি হইয়া যান এবং তাঁহার জায়গায় বীন্‌ল্যাণ্ড (J. G. Beanland) সাহেব আসেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্ক ও ভূগোল শিক্ষা অল্পবিস্তর উক্ত পাঁচ জন শিক্ষকের নিকটই ঘটিয়াছিল।

তখনও এন্‌ট্রান্স ও বি. এ. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই; ছাত্রেরা জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দিত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে

---

* Circular of 15-9-53 : General Report...for 1852-55, p. ccciv. কলেজে মোট ছুটির দিন বৎসরে ৬৫, তাহার মধ্যে গ্রীষ্মের ছুটি ৪৫ দিন ও পূজার ছুটি ১৫ দিন। ১৬-৯-৫৩ তারিখের সার্কুলার অনুসারে স্কুল-বিভাগের ছুটির সংখ্যা ৫০ দিন নির্দ্দিষ্ট হয়—৩৫ দিন পূজার ছুটি পূর্ব্ববৎ, কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটি নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা তখন প্রত্যেক স্থানে পৃথক্ পৃথক্ লওয়া হইত। হুগলী কলেজে ও তাহার অধীন স্কুলসমূহ হইতে মোট ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বতন প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষার বিস্তৃত ফলাফল মুদ্রিত হইয়াছে।* (বাংলা ভিন্ন) মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে ছয়টি বিষয়েই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, কেবল এক বিষয়ে (অনুবাদ) তাঁহার স্থান দ্বিতীয়। বৃত্তি-পরীক্ষার সৃষ্টি অবধি, মফস্বলের দুই তিন জন পরীক্ষার্থীর কথা ছাড়িয়া দিলে, আর কেহই বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। যাঁহারা বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত হইল :—

	ব্যাকরণ	ইতিহাস	গণিত	ভূগোল	সাহিত্য	অনুবাদ	মৌখিক পরীক্ষা	মোট
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৫	৪১	৩০	৪৬	৪০	৩৪.৫	৩৯	২৭৫.৫
যাদবচন্দ্র রায়	৪১	৩১	৩০	২১.৫	৩৭	৩৬.৭৫	৩২	২২৯.২৫
রসিকলাল দত্ত	৪৩	২৯	১৫	৪০.৫	৪০	২৬.৭৫	৩৪	২২৮.২৫
শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৪৩	৩৩	২৪	২৯	৩৫	৩৩.৭৫	২৮	২২৫.৭৫
কুমুদচরণ বসু	৩৬	৩৮	১৬.৫	৩৪	৩৯	২৭	৩২	২২২.৫
উমেশচন্দ্র শূর	৪২	২২	২৩	৩৫	৩৭	৩১	২৭	২১৭
নবকৃষ্ণ রায়	৪৩	৩০	১৫.৫	২৯.৫	২৫	৩১.২৫	৩৬	২১০.২৫

বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী (প্রথম শ্রেণী, "বি" সেকশন) মোট ৩৫ জন, তন্মধ্যে ২৩ জন বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়াছিল। ইহাদের বয়স গড়ে ১৭ ছিল।

* General Report...1852-55. App. D. pp. cccxxxviii—cccxlv.

"এ" সেকশনের ছাত্রদের বয়স ছিল ১৮। বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষার সময় ১৬ বৎসর উত্তীর্ণ হন নাই।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা এই* :—

Prose :	Selections from Goldsmith's Essays, Cal. Ed.
Poetry :	Selections from Pope, Prior and Akenside
	Poetical Reader No. III pt. II (last ed.)
History :	Keightley's History of England, Vol. I
Grammar :	Crombie, part II
Geography and Map Drawing	
Mathematics :	Euclid Books VI and XI
	Algebra to the end of simple Equations.
	Arithmetic
Bengali :	বেতালপঞ্চবিংশতি (2nd Ed.)
	Bengali Grammar

পরীক্ষা পাঁচ মাস পিছাইয়া যাওয়ায় এ বৎসর অতিরিক্ত (Supplementary) পাঠও নির্দ্দিষ্ট হয়,† যথা—

Prose :	Moral Tales, Encyclopaedia Bengalensis No. X
Poetry :	Poetical Reader Part I, No. III (Cal. Ed.)
	Crombie's Etymology & Syntax, part I.

বাংলার পাঠ্যেও নূতন সার্কুলার করিয়া‡ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ছাড়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৭৪ শকাব্দা, ১০৫-১১৬ সংখ্যা) নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই বৎসর (ইং ১৮৫৩) বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাটির নাম "কামিনীর প্রতি উক্তি। তোমাতে লো ষড়ঋতু," ইহা

---

* General Report...for 1851-52, p. xxvi.

† *Ibid.* for 1852-55, App. C, p. cciv.

‡ *Ibid.* p. ccxcix and cccl.

১৮ মার্চ ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।* এই প্রসঙ্গে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের একখানি পত্র উদ্ধৃত হইল :—

To the Secy. to the Council of Education, Fort William.

Hooghly the 20th Feb. 1854

Sir,

I have the honour to report for the information of the Council of Education that I have received twenty rupees to be awarded to Bunkim Chunder Chatterjee, a pupil of the first class of the Senior School, for some good poetical Compositions in Bengalee. The poetical compositions appeared in the Probakur Newspaper. The prize of twenty rupees was awarded by Baboos Romonymohun Roy and Kally Churn Roy Chowdhury Zemindars of Rungpore and was sent through Baboo Isser Chunder Goopto the Editor of the abovementioned Journal.

J. Kerr

Principal

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, হুগলী কলেজে পড়িতে পড়িতেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনার আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' গদ্য পদ্য রচনা সুরু করেন। দুই বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গদ্য পদ্য রচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশস্তি সমেত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইতে থাকে।

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক ৮৲ বৃত্তি পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এইবার কলেজ-বিভাগের চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ারে উন্নীত হন। কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য একই, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা পৃথক্ পৃথক্ ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য† :—

English : Addison, (pp. 1-382) as far as No. 265.
Pope, as contained in Richardson's Selections.

* 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী,' "বিবিধ," পৃ. ২৩-২৯ দ্রষ্টব্য।

† General Report...for 1855, p. xiv.

Moral Philosophy : Abercrombie's Moral Feelings.
History : Keightley's Hist. of England Vol- II
Physical Geography : Hughes' Physical Geography, pp. 1-93.
Mathematics : Euclid I-VI & XI (up to 21st proposition)
Algebra and Plane Trigonometry.
Surveying and Plan Drawing
Bengali ; নির্দ্দিষ্ট পুস্তক কোন শ্রেণীতেই ছিল না, কেবল Translation ও Grammar.

এই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নলিখিত অধ্যাপকের নিকট পড়েন :—

Literature :	Principal J. Kerr, M.A. (সপ্তাহে দুই দিন)
	J. Graves, B.A. (Hd. Master)
History :	J. Graves
Mathematics :	R. Thwaytes, B.A. ও D. Foggo, B.A.
	E. Lodge, B A. (succeeded Foggo from 8-12-54)

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার নাম "Senior Scholarship Examination" হইলেও তাহা উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং প্রশ্নপত্রও পৃথক্। এই পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং তাঁহার বৃত্তি (৮৲) দ্বিতীয় বৎসরের জন্য পুনঃপ্রদত্ত হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল উদ্ধৃত করিতেছি :—

Literature Proper (70)—39 ; Moral Philosophy and Political Economy (60)—43 ; History (70)—56½ ; Pure Mathematics (100)—49.5 ; Mixed Mathematics (100)—34 : English Essay (60)—30 ; Translation (50)—24. Total 560—276.

তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত কার্ (Literature), থোয়েট্স (Physics and Mathematics) এবং গ্রেভ্স (History) সাহেবদের নিকটই পড়িয়াছিলেন। লজ্ সাহেব বদলী হইয়া যান এবং তৎস্থলে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্নিযুক্ত হইয়া আসেন (১০-১-৫৬ হইতে)। ঈশানবাবু তৃতীয় শ্রেণীতে Sheodler's *Book of Nature*

পড়াইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণী হইতে ১৩ জন সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দেন—একমাত্র বঙ্কিমই বৃত্তি-ধারী এবং তিনিই একাকী হুগলী কলেজ হইতে সে বৎসর "Highest Proficiency in all the subjects" দেখাইয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ বৃত্তি লাভ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ থার্ড ইয়ারে উন্নীত হন। এই পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি :—

Literature 55, History 82, Mathematics 67 5, Natural Philosophy 74.8, Translation 76, Total 354.80.

গ্রীষ্মের ছুটির পর, প্রায় এক মাস দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র ২৮ জুন ১৮৫৬ তারিখে ট্রান্সফারের জন্য দরখাস্ত করেন। তদানীন্তন অস্থায়ী অধ্যক্ষ থোয়েট্স সাহেব দরখাস্ত প্রেরণকালে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "Bunkim Chunder is a youth of good character and acquirements." পরবর্ত্তী জুলাই মাসের ১২ই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন* এবং আইন পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তির এই টাকা হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগে তিন বৎসরের জন্য ১৩।০ হারে বেতন এবং নগদ ২৲ করিয়া tuition fee দিবার ব্যবস্থা হয়।†

* যে-সকল ছাত্র সে বৎসর হুগলী কলেজ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতেও দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র "থার্ড ইয়ার" হইতেই ট্রান্সফার লইয়াছিলেন। Report of the D. P. I. (1-5-56 to 30-4-57), App. A, p. 185.

† বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিম-জীবনী'তে (৩য় সং, পৃ. ৭৭) লিখিয়াছেন, "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।" ৭৪ পৃষ্ঠাতেও এইরূপ উক্তি আছে। অনেকে তাঁহাদের পুস্তকে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্যে হাতেখড়ি যাঁহাদের হস্তে হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম পৃথক্ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পঠদ্দশায় হুগলী কলেজের ছয় জন পণ্ডিত বাংলার অধ্যাপনা করিতেন, তন্মধ্যে সুপারিণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন কেবল কলেজ-বিভাগে পড়াইতেন। বাকি পাঁচ জনের মধ্যে দুই জন—গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি ও ভগবচ্চন্দ্র রায় বিশারদ সিনিয়র ডিবিসনে এবং তিন জন জুনিয়র ডিবিসনে পড়াইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নতম পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত বিশারদ ও গোপালচন্দ্র বিদ্যানিধি, এই দুই জনের নিকট পড়েন নাই। তাঁহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন কাশীনাথ তর্কভূষণ। জুনিয়র ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য পুস্তক পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—বঙ্গেতিহাস ও জ্ঞানার্ণব।

সিনিয়র ডিবিসনে উন্নীত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ ভগবচ্চন্দ্র রায় বিশারদের নিকট পড়েন। ইনি এক জন প্রথিতনামা ব্যক্তি। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইঁহার 'সুখবোধ' বাংলা ব্যাকরণ দেশের সর্ব্বত্র পঠিত হইত।

সিনিয়র ডিবিসন, তৃতীয় শ্রেণীর "এ" সেক্‌শনের বাংলা পাঠ্যগ্রন্থ মাত্র একখানি—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' অনুবাদ-রচনাদির উপরই বিশেষ জোর ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনুবাদ ও রচনা ছাড়া পৃথক্ পাঠ্য পুস্তক মোটেই ছিল না।

প্রথম শ্রেণীতে দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণির নিকট পড়েন। ইনি কুমারহট্ট-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র। এই শ্রেণীর পাঠ্য ছিল—'বেতালপঞ্চবিংশতি' (২য় সং) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৭৪ শকাব্দা)।

সুপারিণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন অবসরগ্রহণের

পূর্ব্বেই ৪ নবেম্বর ১৮৫৪ তারিখে (৫৯-৬০ বৎসর বয়সে) হঠাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হন—তাঁহার নিয়োগ-তারিখ ছিল ২০-৮-৩৬। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে উঠিয়া তাঁহার নিকট পাঁচ মাস পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎস্থলে ২৫-১-৫৫ হইতে গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ই নিযুক্ত হন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলীর শিক্ষকদের মধ্যে শিরোমণির সংস্পর্শ ই দীর্ঘতম (অন্যূন তিন বৎসর) হইয়াছিল।

পরিশেষে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তৎকালে সংস্কৃত কলেজ ব্যতীত অন্য কোন বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে কোথাও সংস্কৃত পড়েন নাই—ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের সাহায্যে বাড়ীতেই সংস্কৃত পড়িয়া ব্যুৎপন্ন হন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর ৩০-৩-৬৪ তারিখের আদেশমূলে এক জন সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপকের পদ হুগলীতে ১৫০৲ বেতনে প্রথম সৃষ্ট হয়। এই পদে স্থায়ী লোক গোপালচন্দ্র গুপ্তের নিয়োগের পূর্ব্বে শিরোমণি মহাশয় এক মাস কাল (মে-জুন ১৮৬৫) অস্থায়িরূপে ছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সে বৎসর উত্তরপাড়া স্কুল হইতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্ত্তমানে হেয়ার স্কুল) হইতে শিশিরকুমার ঘোষ, সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, এবং হিন্দু স্কুল হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিও এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সর্ব্বসমেত

History and Geography	E. B. Cowell, Esq., M.A., Professor, Presidency College.
Mathematics and Natural Philosophy	The Revd. T. Smith, Professor, Free Church Institution.
Natural History and Physical Sciences	H. S. Smith, Esq., B A., Professor, Civil Engineering College.
Mental and Moral Sciences	The Revd. A. Duff., D. D.

—University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 125.

১১ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে ভাইস-চ্যান্সেলার তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিলে পর, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসুকে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। তৎপরে উভয়কেই বি-এ উপাধি প্রদত্ত হয়।*

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার পর বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে লাগিলেন। কলেজের হাজিরা-বইয়ে প্রকাশ, তিনি "3rd year Law Student" হিসাবে পরবর্ত্তী ৭ই আগস্ট পর্য্যন্ত কলেজে হাজিরি দিয়াছিলেন। ইহার পর বঙ্কিমের আর কলেজে উপস্থিত হইতে হয় নাই; তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন।

চাকুরী করিতে করিতে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বি-এল পরীক্ষায় কি কি বিষয়ে প্রশ্নপত্র ছিল, তাহার একটি তালিকা পরীক্ষকদিগের নাম সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার হইতে উদ্ধৃত করা হইল :—

---

* Minutes of the Syndicate, for the Year 1858. The 11th December. P. 121.

Jurisprudence	...	Mr. C. J. Wilkinson.
Personal Rights and Status	...	do
The Law of Contracts	...	do
Rights of Property	...	Mr. W. Jardine, M.A., LL. M.
Procedure and Evidence	...	do
Criminal Law	...	do

সরকারী চাকরী

বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার দীর্ঘ (৩৩ বৎসর) কর্ম্মজীবনের ইতিহাস কম চিত্তাকর্ষক নয়; তাহা ঘনাবহুল আঘাত-সংঘাতের ইতিহাস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাসও সুষ্ঠুভাবে লিখিত হয় নাই; এলোমেলো টুকরা টুকরা ঘটনার আভাস এর ওর-তার স্মৃতিকথায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের সাধ মিটে না। আমরা শুধু দেখিতে পাই, তেত্রিশ বৎসরের পুরাতন কর্ম্মচারীকে গবর্মেণ্ট রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি দিয়া সম্মান করিয়াছেন এবং তাঁহারই উর্দ্ধতন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিতে বসিয়া লিখিয়াছেন—

> By 1885 he had risen to the first grade in the Subordinate Executive (now the Provincial) Service, and for some time acted as an Assistant Secretary to the Government of Bengal. He rendered good service in a number of districts and also acted as Personal Assistant to the Commissioners of the Rajshahi and Burdwan Divisions. In June 1867, he was Secretary to a Commission appointed by Government for the revison of the salaries of ministeral officers. While in charge of the Khulna Sub-division (now a district) he helped very largely in suppressing river *dacoities* and establishing peace and order in the eastern canals.—*Bengal under the Lieutenant-Governors*, pp. 1078-79.

বঙ্কিমের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সমব্যবসায়ীর এইটুকু প্রশস্তি ছাড়া অন্য কোনও প্রামাণিক উক্তি পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিমের জীবনীতে বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল গল্পের পুনরুল্লেখ ভরসা করিয়া করা যায় না।

বঙ্কিমের বারুইপুর ও আলীপুরের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার সহকর্ম্মী কালীনাথ দত্ত মহাশয় 'প্রদীপে' একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে (আষাঢ়-ভাদ্র, ১৩০৬) কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবনে'ও বঙ্কিমের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত আছে। ভূদেব-পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'আমার দেখা লোক' পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের ডেপুটিগিরির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত "বারুইপুর পরিদর্শন" শীর্ষক প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র হইতে বুঝা যায়, কোন ডাকাইতি মকদ্দমায় মিথ্যা পীড়নের দায়ে অভিযুক্ত পুলিস কর্ম্মচারীকে বঙ্কিমচন্দ্র শাস্তি দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ৯ই নবেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুরের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে, সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের এলাকাবাসিগণ শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পাইয়াছেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ, বিচার বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসা-ভাজন। ইনি চতুর্ব্বিধ কার্য্য করেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টর, দলিলের রেজিষ্ট্রার ও ষ্ট্যাম্পের সংগ্রহাধ্যক্ষ।...বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচারকার্য্য সম্পাদন করেন। কার্ত্তিকী পুর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযাত্রা হয়, তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তিস্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন।

সকার্য্য বিবর্জ্জিনী কর্ত্তব্যতা পক্ষেও ইঁহার নিকটে অনেক বিচারক পরাস্ত হন।...অতএব বঙ্কিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায়নিষ্ঠ দুঁদে ডেপুটি ছিলেন; আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহ কখনও তাঁহার নিকট কোনও সরকারী ব্যাপারে প্রশ্রয় পান নাই। একটু সুবিধা চাহিতে গিয়া কেহ কেহ লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইয়াছেন। শচীশচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এরূপ এক-একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

অত্যন্ত স্বাধীনচেতা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল; উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারীরা অন্যায় করিলে তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, ফলে কয়েক ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটদের সহিত তাঁহার ঘোর বিবাদ বাধিয়াছিল। এই বিবাদের ফলে তিনি কম বিপন্ন হন নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কখনও তাঁহাকে মাথা নত করিতে দেখা যায় নাই।

মামলায় ন্যায়বিচারে তাঁহার সুনাম ছিল; সকলে সর্ব্বত্র তাঁহার বিচার-কৌশলের উল্লেখ করিত। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'নবকথা'য় "বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার" নামে এরূপ কয়েকটি গল্প প্রচার করিয়াছেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২৩এ তারিখে তিনি বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী ছিলেন। হঠাৎ ঐ পদ উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে অন্যত্র বদলি করাতে ইউরোপীয় মহলেও চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল; ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৮৮২) 'স্টেট্‌সম্যান' লিখিয়াছিলেন—

> Baboo Bankim Chandra Chatterji is a man of high character and attainments....and we confess our inability to understand the reasons that justify the step.

ভূদেববাবু বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই চাকুরীর প্রধান অলঙ্কার। তথাপি এই স্বর্ণশৃঙ্খলভূষিত দাসত্বের প্রতি তাঁহার বরাবর একটা ধিক্কার ছিল।

নবীনচন্দ্র সেন, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার এই মনোভাব বহু বার ব্যক্ত হইয়াছে। মুকুন্দদেবের স্মৃতিকথা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতাকে পুলিসের লোক এমনই ভয় করিত যে, পারতপক্ষে তাহারা তাঁহার এজলাসে মকদ্দমা দিতে চাহিত না।

সরকারী মহলে বঙ্কিমবাবুর ইংরেজী লেখার খুব সুখ্যাতি ছিল। নথিপত্রের উপর তাঁহার মার্জ্জিন-মন্তব্য এমনই সুলিখিত হইত যে, ঊর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তাঁহার রচনা-কৌশলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন; তাঁহার লেখার সংক্ষিপ্ত-তীব্রতার জন্য অনেক সময় তিনি তাঁহাদের বিরাগভাজনও হইয়াছেন; এক জন নেটিবের লেখায় অত তেজ অনেকে বরদাস্ত করিতে পারিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র কত দিন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং কখন্ কোথায় কি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের কোন জীবনীতে পাইবার উপায় নাই, অথচ বঙ্কিমের জীবনচরিত-রচনায় এরূপ একটি তালিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

সুখের বিষয়, এরূপ একটি তালিকা সঙ্কলন করা দুরূহ নহে। এই কার্য্যের জন্য দুইটি উপকরণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি, পুরাতন 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নরের রাজকর্ম্মচারী-নিয়োগাদির আদেশগুলি। দ্বিতীয়টি, অ্যাকাউন্টেণ্ট-জেনারেলের আপিস হইতে সঙ্কলিত *History of Services of Officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal.* এই ইতিহাসের ১৮৮৯, ১৮৯০ ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের তিনটি খণ্ড দেখিয়াছি। এ তিনটি খণ্ডে প্রদত্ত তারিখগুলি সর্ব্বত্র একরূপ নহে। কিন্তু ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের (এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্য

হইতে অবসর গ্রহণ করেন) খণ্ডটি 'Corrected to 1st July 1891" বলিয়া আমরা এই খণ্ডটিকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিতে পারি।

এই দুইটি উপাদানের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকার্য্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাসের তারিখের সহিত 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত নিয়োগাদির তারিখের সর্ব্বত্র মিল নাই; যে-যে স্থলে ব্যতিক্রম আছে, পাদটীকায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। নিয়োগের তারিখ ও কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া কর্ম্মভার গ্রহণের তারিখের মধ্যে সে সময়ে সচরাচর পনর-ষোল দিনের ব্যবধান থাকিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ২১ জানুয়ারি ১৮৬০ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াঁর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর-পদে নিযুক্ত হইলেও তিনি তথায় পৌছান ৭ই ফেব্রুয়ারি এবং কর্ম্মভার গ্রহণ করেন পরবর্ত্তী ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
যশোহর	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৫৮, ৭ আগস্ট[১]
নেগুয়াঁ	ঐ	১৮৬০, ২১ জানুয়ারি[২]
(মেদিনীপুর)	ঐ (৫ম শ্রেণী)	১৮৬০, ৭ নবেম্বর

১ বঙ্গের লেপ্টেনান্ট-গবর্নর কর্ত্তৃক নিয়োগের তারিখ ৬ আগষ্ট ১৮৫৮।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ আগষ্ট ১৮৫৮।

২ মেদিনীপুরে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে শ্রীযুক্ত বি. আর. সেন বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি পত্রের নকল পাঠাইয়াছেন। এই দুইখানি পত্রে প্রকাশ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬০ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াঁ পৌছান এবং পরবর্ত্তী ৯ই তারিখে তথাকার কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
খুলনা	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৬০, ৯ নবেম্বর৩
	ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ হইতে ১৫ দিন	
	ঐ	১৮৬১, ৫ অক্টোবর
	ঐ (৪র্থ শ্রেণী)	১৮৬৩, ১৩ জানুয়ারি
বারুইপুর (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৬৪, ৫ মার্চ৪
	ঐ (অস্থায়ী) ডায়মণ্ডহারবার	১৮৬৪, ২৪ অক্টোবর
	ঐ (৩য় শ্রেণী)	১৮৬৬, ৫ মার্চ
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ২২ জুন ১৮৬৬ হইতে ১ মাস ১৬ দিন	
	ঐ	১৮৬৬, ৭ আগস্ট
	গবর্মেণ্ট আমলাদের বেতন-নির্দ্ধারণ জন্য কমিশনের কাজ	১৮৬৭, ৩১ মে৫
	ঐ (অস্থায়ী) আলিপুর, ২৪-পরগণা	১৮৬৭, ১৪ আগষ্ট
	ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ৫ জুন ১৮৬৯ হইতে ৬ মাস*	
	ঐ	১৮৬৯, ৫ ডিসেম্বর

৩ "The 9th November 1860,—Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, B.A., Dy. Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the Sub-Division of Khoolnah, and to exercise the full powers of a Magistrate in Jessore."—*The Calcutta Gazette*, 17th Nov. 1860.

৪ "The 5th March 1864.—Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, Dy. Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the Sub-Divison of Barripore, and to exercise the full powers of a Magistrate in the 24-Pergunnahs."—*The Calcutta Gazette*, 9th March 1864.

৫ 'ক্যালকাটা গেজেট,' ৫ জুন ১৮৬৭ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাসে তারিখটি ২ জুন ১৮৬৭ আছে।

* ২১ মে ১৮৬৯।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ২৬ মে ১৮৬৯।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
মুর্শিদাবাদ	ডে. ম্যা. ও ডে. ক.	১৮৬৯, ১৫ ডিসেম্বর[৬]
	ঐ (২য় শ্রেণী)	১৮৭০, ২৫ নবেম্বর
	বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টান্ট (অস্থায়ী)	১৮৭১, ২৫ এপ্রিল[৭]
	ঐ	১৮৭১, ২৮ মে
	মুর্শিদাবাদে কলেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্তি	১৮৭১, ১০ জুন[৮]
	ছুটি : বিনা-মঞ্জুরীতে দুই দিন—১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল ১৮৭৩	
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ হইতে ৩ মাস	
বারাসত (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৭৪ ৪ মে[৯]
	মালদহে রোড-সেস কার্য্যে (অস্থায়ী)	১৮৭৪, ২৫ অক্টোবর[৯]
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ২৪ জুন ১৮৭৫ হইতে ৮ মাস ২৬ দিন	
হুগলী	ঐ	১৮৭৬, ২০ মার্চ[১০]
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ হইতে ১১ দিন	
	ঐ	১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি
	ঐ এবং বর্দ্ধমান-ডিবিসন কমিশনারের অস্থায়ী পার্সন্যাল অ্যাসিস্টান্ট	১৮৮০, ৬ নবেম্বর
হাবড়া	ঐ ঐ	১৮৮১, ১৪ ফেব্রুয়ারি[১১]

৬ ২৯ নবেম্বর ১৮৬৯।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১ ডিসেম্বর ১৮৬৯।

৭ ১৫ এপ্রিল ১৮৭১।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৯ এপ্রিল ১৮৭১।

৮ 'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৪ জুন ১৮৭১।

৯ ২৮ এপ্রিল ১৮৭৪।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ২৯ এপ্রিল ১৮৭৪।

৯ ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪।—১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাস।

১০ ১৩ মার্চ ১৮৭৬।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৫ মার্চ ১৮৭৬।

১১ ৬ জানুয়ারি ১৮৮১।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১২ জানুয়ারি ১৮৮১।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
কলিকাতা	বেঙ্গল গবর্মেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটরী (অস্থায়ী)	১৮৮১, ৪ সেপ্টেম্বর[১২]
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ডে. ম্যা. ও ডে. ক. ২য় শ্রেণী (অস্থায়ী)	১৮৮২, ২৬ জানুয়ারি[১৩]
বারাসত	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ৪ মে[১৪]
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ১৭ মে
জাজপুর (কটক)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ৮ আগস্ট[১৫]
হাবড়া	ঐ	১৮৮৩, ১৪ ফেব্রুয়ারি[১৬]

ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ ২০ নবেম্বর ১৮৮৩ হইতে ১৩ দিন[১৭]

	ঐ (১ম শ্রেণী)	১৮৮৪, ১ নবেম্বর[১৮]

১২ ১৬ আগষ্ট ১৮৮১ ।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৭ আগষ্ট ১৮৮১ ।

১৩ ২৩ জানুয়ারি ১৮৮২ ।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ২৫ জানুয়ারি ১৮৮২ ।

১৪ ২৯ এপ্রিল ১৮৮২ ।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ৩ মে ১৮৮২ ।

১৫ ২৬ জুলাই ১৮৮২ ।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ২ আগষ্ট ১৮৮২ ।

১৬ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ ।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ ।

১৭ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাস ।

১৮ ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৪ ।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৪ ।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
ঝিনাদহ (যশোহর)	ডে. ম্যা. ও ডে. ক.	১৮৮৫, ১ জুলাই
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ হইতে ৩ মাস		
ভদ্রক (কটক)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮৬, ১৭ মে[১৯]
হাবড়া	ঐ	১৮৮৬, ১০ জুলাই[২০]
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ হইতে ৬ মাস		
মেদিনীপুর	ঐ	১৮৮৭, ১৯ মে[২১]
ছুটি : বিনা-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২০ দিন		
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৮৮, ১৬ এপ্রিল[২২]
ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ ৩১ মার্চ ১৮৯০ হইতে ১ মাস ১৭ দিন		

অবসরগ্রহণ—১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

---

১৯ ১২ মে ১৮৮৬।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৯ মে ১৮৮৬। বালেশ্বরের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইয়াছেন, "...from the old correspondence of the year 1886, it appears that Babu Bankim Chandra Chatterjee, Dy. Mag. and Dy. Collr. held charge of the Bhadrak subdivision temporarily from the 17th May to the 26th June 1886—for a period of 41 days only,"

২০ ৫ জুন ১৮৮৬।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ৯ জুন ১৮৮৬।

২১ ১০ মে ১৮৮৭।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ মে ১৮৮৭।

২২ ১০ এপ্রিল ১৮৮৮।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ এপ্রিল ১৮৮৮।

সাহিত্য-জীবন

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার যে মুদ্রিত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে (বয়স ১৩ বৎসর ৮ মাস) লিখিতে সুরু করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে (৫৫ বৎসর ৯ মাস) মৃত্যুর ঠিক এক মাস পূর্ব্বে লেখার কাজে বিরত হন; অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র পুরা ৪২ বৎসর বাণীর সেবা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন তাঁহার ছাত্রজীবন হইতে আরম্ভ হইয়া, সমগ্র কর্ম্মজীবন অধিকার করিয়া শেষ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; তাঁহার সাহিত্য-জীবন স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়ীভূত হইলেও এই কথাটা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনকে আমরা মোটামুটি চারিটি পর্ব্বে বিভক্ত করিতে পারি।

১। আদিপর্ব্ব: ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকরে' রচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত ১৩ বৎসর।

২। উদ্যোগপর্ব্ব: ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত (বৈশাখ ১২৭৯ সাল) ৭ বৎসর।

৩। যুদ্ধপর্ব্ব: ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রচার' পত্রিকার বিদায়কাল পর্য্যন্ত ১৭ বৎসর।

৪। শান্তিপর্ব্ব: ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত ৫ বৎসর।

প্রথম দুই পর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক, তৃতীয় পর্ব্বে সম্পাদক ও সমালোচক এবং চতুর্থ পর্ব্বে তিনি পিতামহ ভীষ্মের মত উপদেষ্টা।

আদিপর্ব্ব

এই পর্ব্বে গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং সতীর্থ দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের ছাত্র। কলিকাতার সাহিত্য-সমাজে 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বড় প্রাধান্য; সাহিত্যযশোলোলুপ ছাত্রসমাজের উপর তাঁহার অসীম প্রভুত্ব। তাহারা তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া তখন গদ্য ও পদ্য মক্স করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লিখিতেছেন—

> বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ত ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট্ যথার্থ ই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য।...দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্তায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী।

এই শিষ্যত্বের ফল 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি ঋতুবর্ণনা অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা, কবিতাকারে একটি 'বিচিত্র' ও একটি 'বিষম বিচিত্র' নাটক এবং দুই-একটি টুকরা গদ্য-রচনা। 'ললিতা ও মানস' কাব্যও এই প্রভাবের ফল।

এই কালের রচনা হইতে ভবিষ্যৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা দুরূহ; পয়ারে বা ত্রিপদীতে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যর্থ অনুকরণ, রচনা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট এবং স্থানে স্থানে স্পষ্টতঃ অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট। যে প্রতিভা এক দিন সমগ্র বাংলা দেশকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল, তাহার কোনও আভাস এগুলিতে পাওয়া যায় না। তবে এক জন চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে এই ধরণের রচনা যে বিস্ময়কর,

তাহাতেও সন্দেহ নাই ; আর কিছু না থাকুক, এগুলিতে অকালপক্কতার নিদর্শন আছে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ললিতা ও মানস' প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র তথাকথিত কাব্যচর্চা এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। উপন্যাসের মাঝে মাঝে তিনি দুই-একটি ছড়া অথবা সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অথবা 'বঙ্গদর্শনে' কচিৎ কখনও দুই-একটি গাথা অথবা ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা লিখিয়াছেন—পরবর্ত্তী কালে ছন্দোবদ্ধ কাব্যসরস্বতীর সহিত তাঁহার এই মাত্র সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যতি ও মিলের সংস্রব ত্যাগ করিলেও বঙ্কিমের কবিপ্রকৃতি কখনও স্বধর্ম্মচ্যুত হয় নাই; তাঁহার উপন্যাস মাত্রেই কাব্যধর্ম্মী, তাঁহার গদ্য—গদ্যকাব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মন বিশেষকে ত্যাগ করিয়া সামান্যকে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার হাতে বাংলা-সাহিত্য এতখানি ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইতে পারিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ও কাব্য-জীবন ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে।

অতি শৈশব হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বাণীপ্রকৃতি প্রকাশের যে সুযোগ খুঁজিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত-প্রদর্শিত পথে এবং তাঁহার আদর্শে তাহা সার্থকতা লাভ না করিলেও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ তখনই ঘটিয়াছিল; সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধান পাইয়া ভিতরের আবেগ তখন পুষ্টিলাভ করিয়াছে। "ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল" সম্ভবতঃ "স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয়" হয় নাই, সেকালের শিক্ষিত সমাজের রুচি ও শিক্ষার মাপকাঠিতে ঈশ্বর গুপ্তের "রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত" ছিল না বলিয়াই "তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন।"* বঙ্কিমচন্দ্রও ভিন্ন পথে গমন করিয়া গুরুর ঋণ অস্বীকার করেন নাই। তিনি "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে" লিখিয়াছেন—

* বঙ্কিমচন্দ্র : 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী'।

> প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান।...আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়।...আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার আদিপর্ব্বের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত ও াহার অপর দুই শিষ্য—দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের নামও বিশেষভাবে রণীয়। এই যুগের ইতিহাস সম্পূর্ণ জানিবার উপায় নাই; অধুনাপ্রাপ্য 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় ইহার কিছু পরিচয় আছে। শিষ্যেরা চনা পাঠাইয়াছেন, গুরু উৎসাহসূচক টিপ্পনী-সহযোগে তাহা প্রকাশ রিতেছেন, কখনও কখনও উপদেশও দিতেছেন, এই রীতি এ যুগে ার দেখা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র এই উৎসাহ পাইয়াছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার্ াহেব, রংপুরের তুষভাণ্ডারের জমিদার রমণীমোহন চৌধুরী ও কুণ্ডি রগণার ভূস্বামী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রকে নানা ভাবে ৎসাহিত করিয়াছেন, কিন্তু সকল উৎসাহের মূলে ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত; তনি শুধু পিঠ চাপড়াইতেন না, পথও দেখাইতেন। কথিত আছে, তনিই বঙ্কিমচন্দ্রকে পদ্য ছাড়িয়া গদ্য-রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আদিপর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা যদি বা পড়া যাইত, তাঁহার গদ্য ছল অপাঠ্য, বিষম!

> যে বদনেন্দু শতং শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত ভূমণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অম্বুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী

যথাযাজ্ঞে সে জরাদোৎপাটিব করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক।

'কপালকুণ্ডলা,' 'কমলাকান্ত,' 'দেবী চৌধুরাণী,' 'সীতারাম'-লেখকের উপরোক্ত রচনা আজিকার দিনে আমাদের ভীতি ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য-রচনা প্রাঞ্জল ছিল না, কিন্তু বঙ্কিমের রচনা দৃষ্টে তিনিও শঙ্কিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

ইঁহার লিপিনৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন…।

[বঙ্কিম]…রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন্ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিমভাবা ব্যবহার না করেন…।

বঙ্কিমের এই জাতীয় গদ্য ও পদ্য রচনা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সম্ভবতঃ সমাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার 'ললিতা'। পুরাকালিক গল্প। তথা 'মানস' নামক কাব্যগ্রন্থখানিও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের রচনা।

ছাত্র-জীবনে বঙ্কিমের উপর দীনবন্ধুরও কিছু প্রভাব ছিল। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় প্রকাশিত "মানব-চরিত্র" শীর্ষক দীনবন্ধুর একটি কবিতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণগলিত না হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রায় সাতাইশ বৎসর হইল; এই কাল মধ্যে ঐ কবিতা আর কখন দেখি নাই; কিন্তু ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি।—'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী'।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ তখনও 'প্রভাকরে' লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। দীনবন্ধুর রচনা তাঁহাকে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করিয়া থাকিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলেও ইহার মুদ্রণকাল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন নাই। ইহার পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত বঙ্কিমের বঙ্গবাণী-সেবার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একটু অধিক পরিমাণ ইংরেজীনবিশ হইয়া থাকিবেন; কলেজে ইংরেজীতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল, সংস্কৃত-কাব্য ও ইউরোপীয় ইতিহাস তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই কালে যে তিনি ইংরেজী রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে *Indian Field* নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত তাঁহার ইংরেজী উপন্যাস *Rajmohan's Wife*-এ পাই। 'ললিতা ও মানসে'ও তাঁহার ইংরেজীনবিশির যথেষ্ট পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী কালে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের নিকট বলিয়াছিলেন, "বরাবর বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজী লেখা ও বলা তাঁর পক্ষে অধিক সহজসাধ্য" ('সাধনা,' শ্রাবণ, ১৩০১)।

১৮৫৩ হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা রচনার একটিমাত্র পৃষ্ঠার সমসাময়িক মুদ্রিত নিদর্শন আছে—তাহা ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ললিতা ও মানসে'র বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা, গদ্যে লিখিত। এ গদ্যও ভয়াবহ। 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি স্বরচিত ইংরেজী উপন্যাস *Rajmohan's Wife*-এর অনুবাদ স্বয়ং সুরু করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর ২৫ বৎসর পরে শচীশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'বারিবাহিনী' নামক উপন্যাসে যুক্ত হইয়াছে। এই অনুবাদের কথা পরে আলোচিত হইতেছে।

'ললিতা ও মানসে'র "বিজ্ঞাপন"টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়া পুনর্মুদ্রিত করা হইল।—

> সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতা দ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুতীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।
>
> তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্য দ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনো[illegible] হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। [illegible]কার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।
>
> গ্রন্থকার।

এই রচনাটি লইয়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিস্তৃত আলো[illegible] করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> অতি অল্প বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি কবিতার রস উপভোগ করিতে পারিতেন। এই সময় হইতেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে থাকেন; কিন্তু সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজি সাহিত্যে তিনি অধিকতর প্রবেশ লাভ করেন।
>
> —'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ. ১২৭, ১৩১।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের নিতান্ত দুরবস্থা ছিল না। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন—

> ১৮৫৬ সালের বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপন-পাঠে মনে হয়, এই গদ্য-সম্পৎ বঙ্কিমবাবু একান্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন।...সমস্ত লেখাটী পড়িলেই মনে হয়, সাগরী যুগের রঙ্গ এই লেখায় একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। সেই অপূর্ব্ব গদ্যের প্রসাদগুণের প্রভাব এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় নাই। মনে হয়, গ্রন্থকার সেই গদ্যের প্রভাব তখন অনুভব করেন নাই—প্রত্যুত সেই গদ্য একান্ত উপেক্ষাই করিয়াছেন।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ. ১২৭, ১৩১।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার যাবতীয় নিদর্শন তাঁহার 'ললিতা ও মানস' পুস্তকে ও 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় রক্ষিত আছে। 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে কয়েকটি গদ্য ও পদ্য রচনা শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; বাকি যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী'র "বিবিধ" খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমের বাল্যশিক্ষার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, শৈশবে মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি স্থানীয় স্কুলের হেড মাস্টার মিঃ টীড্ ও স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মলেটের গৃহে খুব বেশী যাতায়াত করিতেন; টীড্-পত্নী ও মলেট-পত্নী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং আপন আপন ছেলেমেয়েদের লইয়া তাঁহার সহিত প্রায়ই গল্পগুজব করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার ভিত্তিপত্তন একটু দৃঢ় ভাবেই হইয়া থাকিবে। তাহার পর হুগলী কলেজে ইংরেজী লিখনে পঠনে বঙ্কিমচন্দ্র এত দূর দক্ষ হইয়াছিলেন যে, পঠদ্দশাতেই বাংলার চর্চ্চা ছাড়িয়া দেন। এই অবস্থায় তাঁহার মনোবৃত্তি কিরূপ ছিল, তিনি স্বয়ং পরবর্ত্তী কালে (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বেঙ্গল সোশ্যাল

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে প্রদত্ত "A Popular Literature for Bengal" বক্তৃতায় বর্ণনা করেন—

> আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতে অভিলাষী নহেন।...যে তীব্রবুদ্ধি, তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারে, সে মনে করে, বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীনবৃত্তি-মাত্র,...।*

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বেনামী প্রবন্ধে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন—

> অর্দ্ধ-শিক্ষিত ক্ষিপ্র লেখকগণই বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রণয়নে ব্রতী। এই কার্য্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিজাতীয় ঘৃণা আছে, এবং ইঁহারা মাতৃভাষায় লেখা নিতান্ত অপমানজনক মনে করেন।†

বঙ্কিমচন্দ্রের এই যুগের ইংরেজী রচনা যে আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহাও নহে। 'বঙ্কিম-জীবনী'-লেখক *Adventures of a Young Hindu*-র উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১০৮), কিন্তু তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' পুস্তকে বঙ্কিমের কাব্যচর্চ্চা ত্যাগের একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পদ্যরচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে

---

* পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ : 'সাহিত্য,' জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, পৃ ৯৮-৯৯।

† শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের অনুবাদ : 'বাঙ্গালা সাহিত্য,' পৃ. ১৫।

পারিয়াছিলেন যে সে পথ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি গুভক্ষণে গদ্যরচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকালের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় বঙ্কিম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।—২য় সং, পৃ. ২৫২।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, সপ্তম অধিবেশনের (কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার অভিভাষণে বঙ্কিমের এই যুগের সাধনার কথা কিছু উল্লেখ করিয়াছেন—

বঙ্কিমবাবু ইতিহাস ও নবেল পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না ও হয়ও নাই। বঙ্কিমবাবু ইউরোপের ইতিহাস খুব ভাল জানিতেন। ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে যে সকল ইতিহাস ছিল, তাহা সমস্তই তিনি পড়িয়াছিলেন। কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়েন নাই। টোলে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক অনেকগুলি পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন স্কুলে পড়েন, তখন ঈশ্বর গুপ্তের খুব প্রভাব। তাঁহার সংবাদ প্রভাকর সকলেই পড়িতেন। বঙ্কিমবাবু, দীনবন্ধুবাবু ও জগদীশ তর্কালঙ্কার, এই তিন জন ঈশ্বর গুপ্তের নিকট বাঙ্গালা লেখার শিক্ষানবিশী করিতেন। এই শিক্ষানবিশীতে পরিপক্ক হইয়া বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা নবেল লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতায় ছাত্র-জীবন; এই সময়ে তিনি সম্ভবতঃ পড়াশুনা ও পরীক্ষা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট হইতে তাঁহার চাকুরী-জীবন আরম্ভ হয়। যশোহরে গিয়াই দীনবন্ধুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার নব

আসক্তির মূলে এই ঘনিষ্ঠতা কতখানি কাজ করিয়াছে, আজ তাহা আমরা আন্দাজ মাত্র করিতে পারি ; কিন্তু যশোহর হইতে নেওয়াঁ হইয়া খুলনায় আসা পর্য্যন্ত তাহার কোনই পরিচয় পাই না। খুলনায় তিনি *Rajmohan's Wife* রচনা করেন ও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক গবেষণার দিকে তখন পর্য্যন্ত যে তাঁহার ঝোঁক ছিল, তাহার প্রমাণ, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট হইতে তাঁহাকে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যতালিকাভুক্ত হইতে দেখি ; মধুসূদন-বন্ধু গৌরদাস বসাক ঐ বৎসরের ১লা জুলাই তারিখে তাঁহার নাম প্রস্তাবিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সভ্যরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

খুলনা হইতেই অর্থাৎ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশ-নন্দিনী'-রচনায় হাত দেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ বঙ্কিমের সূচনা দেখা দিয়াছে। নিষ্ঠার সহিত বিমাতার সেবা করিয়া মাতৃভক্ত বঙ্কিমের তৃপ্তি হয় নাই, *Rajmohan's Wife* রচনা করিয়া তাঁহার মনে ধিক্কার আসিয়া থাকিবে। কল্পনা তখনও দিগন্তবিস্তারী নয়, মূলধনও কম—বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ নিজেই নিজের ইংরেজী উপন্যাসের অনুবাদ করিতে বসিলেন। এক অধ্যায়, দুই অধ্যায়, তিন অধ্যায়—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে কোনও কিছুর পুনরাবৃত্তি সুখপ্রদ ও সহজসাধ্য নয়। অনুবাদ অগ্রসর হইল না। 'রাজমোহনের স্ত্রী' সূত্রপাতেই বিনষ্ট হইল।

কিন্তু পাতা কয়টা রহিয়া গেল—সন্দিগ্ধ ব্রীড়াবনতা প্রতিভার প্রথম লজ্জারুণ বিকাশ! একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই কয়েকটি পৃষ্ঠায় লক্ষণীয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র আদর্শে যে ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন ছিল, 'রাজমোহনের স্ত্রী' লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাকে নির্ম্মম ভাবে

ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। টেকচাঁদ ঠাকুর—প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা' এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' তখন তিনি দেখিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে নিজেই বলিয়াছেন—

> "আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।...উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা যায়...। এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।—"বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান।"

এই "বাঙ্গালি লেখক" বঙ্কিমচন্দ্র নিজে। বিষয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যাসাগরী রীতি ('কাদম্বরী' ইহার চরম) এবং আলালী রীতির সমন্বয় সাধন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। *Rajmohan's Wife*-এর অনুবাদটুকু এই অপূর্ব্ব সমন্বয়-চেষ্টার প্রথম নিদর্শন হিসাবে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান্।

কিন্তু অভ্যাস তখনও প্রবল। অভ্যাসবশে পুরাতন রীতি আত্ম-প্রকাশ করিতেছে এবং নূতন রীতি তখনও রপ্ত হয় নাই বলিয়া অনুকরণের দুর্ব্বলতা দেখা যাইতেছে। এই দ্বন্দ্ব দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝানো সহজ।

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রমণীকুসুম মধুমতী-তীরজ নহে—ভাগীরথী-কূলে রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক। তরুণীর আরক্ত গৌরবর্ণছটা মনোদুঃখে বা প্রগাঢ় চিন্তাপ্রভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছিল; তথাচ যেমন মধ্যাহ্ন রবির কিরণে স্থলপদ্মিনী অৰ্দ্ধ প্রোজ্জ্বল, অর্দ্ধশুষ্ক হয়, রূপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরূপ কমনীয় ছিল; অতি বৰ্দ্ধিত কেশজাল অযত্নশিথিল গ্রন্থিতে স্কন্ধদেশে বদ্ধ ছিল; তথাপি অলককুন্তল সকল বন্ধন দশায় থাকিতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাদি ঘিরিয়া বসিয়াছিল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে নির্দ্দোষ বঙ্কিম ভ্রূযুগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নয়নপল্লবাবরণে লোচনযুগল সচরাচর অর্দ্ধাংশমাত্র দেখা যাইত; কিন্তু যখন সে পল্লব ঊর্দ্ধোত্থিত হইয়া কটাক্ষস্ফুরণ করিত, তখন বোধ হইত যেন নৈদাঘ মেঘমধ্যে সৌদামিনীপ্রভা প্রকটিত হইল।—'বারিবাহিনী,' পৃ. ৪।

মাধব হাসিয়া কহিল, "শুধু এ সকল সুখের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি না, আমার কাজও আছে।"

মথুর। কাজ ত সব জানি।—কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন গাড়ি—ঠক্ বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান—তেল পুড়ান—ইংরাজি-নবিশ ইয়ার বক্‌শিকে মদ খাওয়ান—আর হয়ত রসের তরঙ্গে চলাচল্। হাঁ করিয়া ওদিকে কি দেখিতেছ? তুমি কি কখন কন্‌কিকে দেখ নাই? না ওই সঙ্গের ছুঁড়িটা আসমান থেকে পড়েছে?—তাইত বটে!—'বারি-বাহিনী,' পৃ ৯।

প্রাচীন ও নবীন রীতির এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের আদিপর্ব্বের সমাপ্তি এবং ভবিষ্যৎ বঙ্কিম-প্রতিভার স্ফুরণ। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা অগ্রসর হইতেছে। আয়োজন এবং উপকরণ সম্পূর্ণ ছিল; ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস ও ভাষায় অসামান্য দখল, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার, বিদ্যাসাগর ও টেকচাঁদের আদর্শ। যুগাবতারের প্রতিভাস্পর্শে যে সৌধের ভিত্তিপত্তন হইল, সমগ্র বাঙালী

জাতিকে যে তাহা একদিন আশ্রয় দিবে, সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে কে তাহা কল্পনা করিতে পারিয়াছিল ?

উদ্যোগপর্ব্ব

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

> ৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে এক দিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষ কালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।—'দুর্গেশনন্দিনী,' ১ম সং, (১৮৬৫), পৃ. ১।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দিগন্ত-সংস্থিত ঘোরতর অন্ধকারে স্বীয় প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে বঙ্কিমচন্দ্র পথ চলিতে লাগিলেন।

বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত এবং বহু রসিক ও গুণী সমালোচক বহু পুস্তক ও পুস্তিকায় এবং সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার শেষ আজিও হয় নাই। এই বহু-আলোচিত ইতিহাসের বিস্তারিত পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্য অতঃপর প্রধান প্রধান

রচনা এবং বঙ্কিমের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবন গঠনে যে সকল আলোচনা সহায়তা করিয়াছিল, সেগুলির উল্লেখ মাত্র করিব। যে-সকল আলোচনা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য, প্রয়োজনমত সেগুলি অংশতঃ উদ্ধৃত করিব।

শচীশচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার যে ইতিবৃত্ত দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ইহা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমের ২৪ বৎসর বয়সে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার খুলনায় অবস্থানকালে শেষ হয়। পুস্তকের গুণাগুণ নিজে ঠাহর করিতে না পারিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে পাণ্ডুলিপি পড়িতে দেন। তাঁহারা পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করাতে "বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান" করেন।*

১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-সংখ্যা 'প্রদীপে' বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্ম্মী কালীনাথ দত্ত-লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক স্মৃতি-কথা পাঠে বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে আসিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' সমাপ্ত করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে বদলি হন। সুতরাং শচীশ-বাবুর উক্তি ঠিক নহে। 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধেই প্রকাশিত হয়।

• 'দুর্গেশনন্দিনী'র 'আইভ্যান্‌হো'-সম্পর্কিত একটা অপবাদ বরাবর আছে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও কালীনাথ দত্তের নিকট বলিয়াছিলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার পূর্ব্বে তিনি 'আইভ্যান্‌হো' পড়েন নাই। কালীনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহার honesty unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।"† শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

---

* 'বঙ্কিম-জীবনী,' ৩য় সং, পৃ. ২৬১।

† কালীনাথ দত্ত: 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ,' পৃ. ২১৫।

তৎপ্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকের ৬৮-৭৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্কটের পুস্তকের সহিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র সাদৃশ্য থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা।

সমসাময়িক সমালোচক-মহলে 'দুর্গেশনন্দিনী' লইয়া দুই পরস্পর-বিরোধী মত প্রচারিত হইয়াছিল। কাহারও মতে 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নিকৃষ্ট রচনা; কেহ কেহ ইহাকে শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম বলিয়াছেন।

উদ্যোগপর্ব্বের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও রচনারীতি লইয়া পণ্ডিতসমাজ আক্রমণ চালাইয়াছিলেন, কিন্তু এই আক্রমণ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রীতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কারণ, তিনি অন্তরে অন্তরে এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, ভাষা লইয়া তিনি যাহা করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব; পুরাতনপন্থীদের তাহা হজম করা শক্ত, কিন্তু বাংলা ভাষাকে অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাহন করিয়া তুলিতে হইলে এই অভিনবত্ব একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু সে যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশেই বাংলা সাহিত্যের নূতন বিপুল সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই হঠাৎ-চমক ও আনন্দ-কলরবের কথা সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত বাঙালী রমেশচন্দ্র দত্ত এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

> যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটী নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটী নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটী নূতন

ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।—'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' শ্রাবণ, ১৩০১, পৃ. ৪।

এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র পর পর অত্যল্প কালের মধ্যে আরও দুইটি উপন্যাস রচনা করেন; 'কপালকুণ্ডলা' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'মৃণালিনী' ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিন বৎসরের ব্যবধানে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে যদিও বা সন্দেহ ছিল, 'কপালকুণ্ডলা'তে সকল সন্দেহের নিরসন হইল, বঙ্কিমচন্দ্র অবিসম্বাদিতরূপে বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইলেন। 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় প্রতিভা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের দ্বিধাও সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল এবং বাংলা-সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধপর্ব্ব

শুধু উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, বঙ্কিমচন্দ্র শিশু বাংলা-গদ্যের সকল বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। উপকরণ সবই ছিল, উপকরণের যথাযথ প্রয়োগে যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্র বাণীমন্দিরে মাতৃভাষার এমন একটা মোহিনী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, নিতান্ত বিমুখ ও অত্যন্ত অলস ব্যক্তিকেও একবার কৌতুক ও কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিতে হইল। এক মুহূর্ত্তে বিপুল সম্ভাবনার সূচনা দেখা দিল। বাংলা দেশে 'বঙ্গদর্শন' বাহির হইল।

...বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য!...বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।—রবীন্দ্রনাথ: 'আধুনিক সাহিত্য,' ২য় সং, পৃ. ২।

'মৃণালিনী' প্রকাশের মাসাধিক কালের মধ্যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। বঙ্কিম-জীবনের বহরমপুরের এই কয়েক বৎসর বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। বহুদিন হইতেই বঙ্কিম-চন্দ্রের বাসনা ছিল, একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। যোগাযোগের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুরের ১নং পিপুলপটী লেন হইতে সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে ব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল। বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আসর—সাহিত্য-চর্চ্চার যেন বান ডাকিয়াছিল। ভূদেব, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন,

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (তখন উকীল),—এই সুধী এবং সাহিত্য-সমাজে বঙ্কিমচন্দ্র যোগদান করিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল। যে সৌরমণ্ডলী বঙ্কিম-সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘকাল বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রদীপ্ত প্রভায় বিরাজ করিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে'র সহায়তায় তাঁহারা ধীরে ধীরে ভাস্বর হইয়া উঠিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই একটু স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী, রাশভারি প্রকৃতির লোক ছিলেন, আপন স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্য লইয়া জনতা হইতে ত দূরে থাকিতেনই, সাহিত্যিক মজলিশেও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। এই কারণে দাম্ভিক বলিয়া তিনি নিন্দাভাজনও হইয়াছেন। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশের উন্মাদনায় অসামাজিক বঙ্কিম সামাজিক হইয়া উঠিলেন; নিজে সব্যসাচীর মত লেখনী প্রয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, গোষ্ঠীপতিরূপে নির্ব্বাচিত লেখকদের দিয়া আপন ফরমাশ অনুযায়ী প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি লেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই সাহিত্যিক উন্মাদনার আভাস "বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা"তে আছে। এই সময়ে এই বহরমপুরেই বঙ্কিমের প্রভাবে পড়িয়া সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র বাংলা লিখিতে প্রতিশ্রুত হন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিও বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণেই বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন; পরবর্ত্তী কালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কেও তিনি সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত করেন।

"বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা"য় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

> এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন।

বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি সে দিন সুকৌশলী সেনাপতির মত বঙ্গবাণীর বিচ্ছিন্ন সেবকদের 'বঙ্গদর্শনে'র ব্যূহমধ্যে সংস্থাপিত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে অত্যল্পকাল মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের এতখানি প্রসার সম্ভব হইত না। তিনি নিজে পুরোভাগে থাকিয়া এক দিকে প্রাচ্য জড়তা ও অন্য দিকে অস্বাস্থ্যকর-মোহজাত পাশ্চাত্যের অনুকরণবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঙালী-জাতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র "সূচনা" হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রচারে'র "বিদায়" পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্কিমচন্দ্রের রণোন্মাদের কাল।

'বঙ্গদর্শনে' পর পর 'বিষবৃক্ষ,' 'ইন্দিরা' (ছোট), 'চন্দ্রশেখর,' 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'লোকরহস্য,' 'বিজ্ঞানরহস্য,' 'কমলাকান্তের দপ্তর,' 'সাম্য' খণ্ডশঃ বাহির হইতে থাকে—সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাহিত্যিক বিবিধ বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করিতে থাকেন। শেষোক্ত প্রবন্ধ ও সমালোচনাগুলিকে বঙ্কিম যুদ্ধকালীন আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন; এইগুলির সাহায্যে তাঁহার আদর্শ-নিষ্ঠাও প্রতি দিন বাঙালী পাঠক-সমাজে প্রকট হইত।

আবর্জ্জনা-দূর ও আদর্শ-প্রতিষ্ঠার কাজে যিনি আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহার বহুবিষয়িণী ও নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা থাকা প্রয়োজন। বক্তব্য একঘেয়ে হইলে অবজ্ঞাত হইবার আশঙ্কা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভা ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই তিনি ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য-সমালোচনা ও

ব্যঙ্গকৌতুক স্বয়ং লিখিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন; মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাকেও বাদ দিতে পারেন নাই। স্বীয় স্বভাবধর্ম্মে পলিটিক্‌স্‌কে বাদ দিয়া চলিলেও তিনি যে একান্তভাবে তাহা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় 'সাম্যে' আছে।

বহরমপুরে অবস্থানকালেই (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। উদ্যোগ-পর্ব্বের রোমান্স ও ঐতিহাসিক রোমান্সে যে কাজ হয় নাই, এই সামাজিক উপন্যাস দুইটির প্রকাশে সে কাজ সহজেই সাধিত হইল। বাংলা দেশের সাধারণ বাঙালীর বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবন যে উপন্যাসের বিষয় হইতে পারে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতি সে দিন পুলকবিহ্বল হইয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ যে বাংলা-সাহিত্যকে ঘৃণায় বর্জ্জন করিয়া চলিতেন, সেই শিক্ষিত সমাজই বাংলা-সাহিত্যের পরম সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আশ্বস্ত ও প্রলুব্ধ হইয়া উঠিলেন; বাংলা-সাহিত্য পশ্চাতের খিড়কিদ্বার হইতে একেবারে সদরে সমারোহের সহিত উন্নীত হইল।

> ...বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল।...অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত।...
>
> এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গ-ভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কি যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরেজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরেজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে?…

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধন রত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকলপ্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম।…সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয় বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

...সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্য্যে এক হস্ত নিবারণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

...মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচকপদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।... কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্ত্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন। কোনো দিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

...বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন।...বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন! এখন যাঁহারা সঙ্গ-সাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল।...সাহিত্যমহারথী বঙ্কিম, দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।—রবীন্দ্রনাথ : 'আধুনিক-সাহিত্য'।

এই সব্যসাচী, দণ্ডবিধাতা, কর্ম্মযোগী, খড়্গধারী, দর্পহারী, মহারথী, বীরশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র সেই মহাদুর্য্যোগের কালে দৃঢ়হস্তে বঙ্গসাহিত্য-তরণীর কর্ণধার হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহা বানচাল হয় নাই, তাঁহার আবির্ভাবের শতাব্দীপাদের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও সম্ভব হইয়াছে।

প্রথমে এই পর্ব্বের প্রবন্ধগুলির কথাই বলি। 'বিজ্ঞানরহস্য' ও 'সাম্যে'র উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্রের বহু কীর্ত্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'বিবিধ প্রবন্ধে'র উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন। 'বঙ্গদর্শনে'র জন্যই এগুলি সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব একটা সামান্য সাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, বাংলা-সাহিত্যের পরবর্ত্তী সমস্ত ইতিহাসই এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব যেমন বাংলায় নূতন কাব্যধারার প্রবর্ত্তন করিয়া সার্থক হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব যেমন বাংলার কথাসাহিত্যকে সঞ্জীবিত ও পল্লবিত করিয়া সার্থক হইয়াছিল, 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাবের

সার্থকতা তেমনই বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের অভিনব বিকাশ ও বিস্তারের মধ্যে। বস্তুতঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' 'সর্ব্বশুভকরী,' 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,' 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভ' প্রভৃতিতে যে সম্ভাবনার আংশিক আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ণবিকশিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রবন্ধ-সমালোচনা যে কতকগুলি সংবাদ (news) ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রস-সংযোগে সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও খোরাক জোগাইতে পারে, 'বঙ্গদর্শনে'ই সেই সত্য সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হইল।

অবশ্য ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বই পনর আনা; তাঁহারই আদর্শ, উদ্দীপনা ও উপদেশে জগদীশনাথ রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতি স্বনামধন্য পণ্ডিতেরা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নব নব উদ্ভাবনী প্রতিভা গতানুগতিকতা ও একঘেয়েমির হাত হইতে প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব—এমন কোনও বিষয় নাই, যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই, এবং যাহাতেই তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাই সাহিত্য হইয়াছে। বাংলায় যে প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের আমরা আজ গৌরব করি, তাহা একা বঙ্কিমচন্দ্রেরই সৃষ্টি। তাঁহার এই সৃষ্টিকাল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুড়ি বৎসর বিস্তৃত এবং এগুলি 'বঙ্গদর্শন,' 'ভ্রমর,' 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করে। এই যুগের প্রারম্ভে ও শেষে প্রধানতঃ 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে'র

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও "সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং-মেনে"র আগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীতেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' চারি বৎসরকাল প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বন্ধ হইয়া যায়। তৎপূর্ব্বেই তিনি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রঙ্গরহস্যমূলক প্রবন্ধগুলি ও বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ 'কমলাকান্ত,' 'লোকরহস্য' ও 'বিজ্ঞানরহস্য' নাম দিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইবার পরেই তিনি সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত নয়টি প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচন' নামে কাঁটালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়। তখনও অনেক প্রবন্ধ অবশিষ্ট থাকে। তাহারও দশটি লইয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাঁটালপাড়া হইতেই 'প্রবন্ধ পুস্তক' প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' তখন পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র নূতন নূতন প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ('বঙ্গদর্শন' দ্বিতীয় পর্য্যায় তখন বন্ধ হইয়াছে, 'প্রচার' ও 'নবজীবন' চলিতেছে) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ সমালোচন' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক' বাতিল করিয়া উভয় পুস্তকের প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া ও দুই-একটি বর্জ্জন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ। প্রথম ভাগ' প্রকাশ করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' নূতন লিখিত এবং 'প্রচারে' প্রচারিত প্রবন্ধগুলি নিতান্ত এলোমেলো ভাবে সাজাইয়া প্রায় বিনা সম্পাদনায় 'বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশ করেন। বঙ্কিমের যে সকল মূল্যবান্ প্রবন্ধ এত দিন পর্য্যন্তও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ছিল, পরিষৎ-সংস্করণ-

গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" খণ্ডে সেগুলির অধিকাংশ স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি পাঠে যোদ্ধা বঙ্কিমের একটা রূপ পাঠকের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠে; সে রূপ শুধু স্রষ্টার নয়—পালকেরও।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'লোকরহস্য,' ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' পরে (১২৯২ বঙ্গাব্দে) পরিবর্দ্ধিত আকারে 'কমলাকান্ত' নামে বাহির হয়। 'বিজ্ঞানরহস্য,' 'সাম্য' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে' এবং পরবর্ত্তী জীবনের অনুশীলন-তত্ত্বমূলক রচনাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের যে দিক্‌টির পরিচয় পাই, তাহাকে তাঁহার গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ গম্ভীর দিক্ বলা যায়। 'বঙ্গদর্শনে'র সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য এবং প্রধানতঃ বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য সব্যসাচী বঙ্কিমকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও রসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে—'কমলাকান্ত,' 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিপরীত বা লঘু দিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লঘু নহে। তাঁহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে। প্রবন্ধগুলিতে যে চরম কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারেন নাই, বিদ্রূপের আবরণে সে সকল কথা তিনি অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। বাংলা দেশের চিরন্তন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে কমলাকান্তী বঙ্কিমের এই বিদ্রোহ বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে।

'কমলাকান্ত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্রতম সৃষ্টি; বস্তুতঃ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র

তাঁহার কমলাকান্ত-চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন। কমলাকান্ত বলিতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝিয়া থাকি। কমলাকান্ত আইডিয়ালিস্ট—আদর্শবাদী এবং বাস্তবের উর্দ্ধলোকে তাঁহার কল্পনা-বিহার। কমলাকান্ত কবি, প্রেমিক এবং বাংলা-সাহিত্যের যাহা প্রথম—স্বদেশপ্রেমিক।

গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় মন প্রথমটা 'লোকরহস্যে'র সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া কতক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মাসের পর মাস নিছক রহস্য সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত থাকিবার মত পল্লবগ্রাহী মন তাঁহার ছিল না। প্রবহমাণ সংসার-স্রোতের উপরিভাগে আপাতমনোহর তরঙ্গভঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তীক্ষ্ণধী বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কখনও গভীর রহস্যগহনে তলাইয়া যাইতেন এবং মরণশীল মানবের ও বিশেষ করিয়া যে-সকল হতভাগ্য জীব তাঁহার আশে পাশে চিন্তাহীন নিঃশঙ্কতায় ভাসমান, তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আপন অন্তরে অনুভব করিয়া হাস্য হাসির বুদ্বুদ-বিলাসে তাঁহার মন সায় দিত না। অর্দ্ধোন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাঁহার উপায় ছিল না। সোজাসুজি সজ্ঞানে যে-সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যঙ্গের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিক্স্‌, সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। কমলাকান্ত-জন্মের ইহাই ইতিহাস। কমলাকান্তের দর্শনকে

অর্থসঙ্গতি দেওয়ার জন্য নসীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী এবং পৃথিবীতে প্রচারের জন্য ভীষ্মদেব খোশনবীসকেও সৃষ্টি করিতে হইল।

'আনন্দমঠে'র "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, 'মৃণালিনী'তে যাহার সূত্রপাত, 'কমলাকান্তে' সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ। বাঙালী-জাতির পরাধীনতার সুগভীর ধিক্কার এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতৃপূজার মন্ত্র শিখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন এই 'কমলাকান্তে'। আধুনিক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃত পক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা সুরু।

বর্ত্তমান জগৎ, সুতরাং বাংলা দেশও অধুনা ভোগসুখলোলুপতায় উন্মাদের মত যে লেলিহান বাসনাবহ্নির ইন্ধন জোগাইবার জন্য ছুটিতেছে, এবং যে সোশ্যালিজ্‌মের প্রচণ্ড আঘাতে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান প্রায় ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেই 'কমলাকান্ত' তাহারও দুঃস্বপ্ন দেখিয়া "পতঙ্গে" ও "বিড়ালে" যে মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছিল, আজও তাহা পুরাতন হইয়া যায় নাই—কমলাকান্তের মনের এই চিরসজীবতা ও নবীনতা বিস্ময়কর। অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে কোনও সাহিত্যস্রষ্টা কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিতে পারেন না; বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তে' যে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তিনি অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বহিঃপৃথিবীর প্রচণ্ড সংঘাত আশঙ্কা করিয়া বাঙালীকে স্বদেশের স্বল্পপরিসর মৃত্তিকায় সচেতন ও আত্মস্থ হইয়া দাঁড়াইবার যে ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা দিয়াই আমরা তাঁহার প্রতিভার বিরাট্ত্বের বিচার করিব। শাশ্বত

শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগে একক ছিলেন, তাঁহার সকল দেশপ্রেম ও স্বজাতিকতাকে ছাপাইয়া তাঁহার সেই নিঃসঙ্গ মনের আর্ত্তনাদ আমরা আজও শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি।

এইবার উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগে মোট এগারখানি ক্ষুদ্রবৃহৎ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালের ক্রম ধরিয়া সেগুলি এই :—১। বিষবৃক্ষ—১৮৭৩, ২। ইন্দিরা (ছোট)—১৮৭৩, ৩। যুগলাঙ্গুরীয়—১৮৭৪, ৪। চন্দ্রশেখর—১৮৭৫, ৫। রাধারাণী—১৮৭৫, ৬। রজনী—১৮৭৭, ৭। কৃষ্ণকান্তের উইল—১৮৭৮, ৮। রাজসিংহ (ছোট)—১৮৮২, ৯। আনন্দমঠ—১৮৮২, ১০। দেবী চৌধুরাণী—১৮৮৪ এবং ১১। সীতারাম—১৮৮৭। পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা' (১৮৯৩) ও 'রাজসিংহ' (১৮৯৩) স্বতন্ত্র উপন্যাস বলিয়া ধরিলে এই যুগে মোট উপন্যাসের সংখ্যা তের। এই তেরখানি উপন্যাসকে দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে ভাগ করা যায়। 'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিনখানি এক পর্য্যায়ে পড়ে; বাকী দশখানি (দুই 'ইন্দিরা,' দুই 'রাজসিংহ') অপর পর্য্যায়ভুক্ত। শেষোক্ত পর্য্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিছক কবি এবং শিল্পী; প্রথম পর্য্যায়ে তিনি কবি এবং শিল্পী ছাড়াও জাতিগঠনপ্রয়াসী প্রচারক। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসগুলি লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে এবং বহু সমালোচক এই আলোচনাগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আলোচনা ও বাদানুবাদ পরিহার করিয়া সংক্ষেপে এই উপন্যাসগুলির রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র বর্ণনা করিব।

উদ্যোগপর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র তিনখানি ঐতিহাসিক রোমান্সধর্মী উপন্যাস লিখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা দেশকে সম্পূর্ণ জয় করিতে হইলে

সমসাময়িক সমাজ-সমস্যাকে এড়াইয়া গেলে চলিবে না। এই কারণে যুদ্ধপর্ব্বে অন্যান্য আয়োজনের সঙ্গে সে যুগের বাঙালী-সমাজের যে দুইটি বৃহত্তম সমস্যা—বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ, তাহা লইয়াই তিনি উপন্যাস রচনা করিতে বসিলেন। যুদ্ধপর্ব্বের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র ইহাই গোড়াপত্তন। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রার্থিত ফল ফলিয়াছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা হইতে ইহার ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার প্রতি দীর্ঘ দিনের অবহেলা বিস্মৃত হইয়া এই অপূর্ব্ব চমকপ্রদ কাহিনীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এই 'বিষবৃক্ষে'র দ্বারা বঙ্কিম-চন্দ্রের মনের গোপন উদ্দেশ্য প্রভূত পরিমাণে সাধিত হইল। 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশের পর বাংলার শিক্ষিত মহলে যে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, সমসাময়িক সমালোচনায় তাহার পরিচয় আছে। সুবিখ্যাত 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রের সমালোচক লিখিয়াছিলেন :—

> This novel...was to be found in the *baitakhana* of every Bengali Babu throughout the whole of last year. It is quite of a different character from its predecessors While the others were all historical. "men and women as they are, and life as it is," is the motto of the present one.—*The Calcutta Review*, No. cxiv, Critical Notices, pp. v-vi.

উদ্যোগপর্ব্বের এবং যুদ্ধপর্ব্বের 'বিষবৃক্ষ'-পর্য্যায়ের উপন্যাসগুলির পার্থক্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী কালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন—

> বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়াছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী

কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ।...বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।—'প্রবাসী,' আশ্বিন, ১৩৩৮, পৃ. ৮০৬-৭।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র যতগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটি নামে ঐতিহাসিক উপন্যাস অথবা রোম্যান্স পর্য্যায়ে পড়িলেও, ইহাদের প্রত্যেকটি আসলে এই অভিজ্ঞতামূলক বাস্তবতাধর্ম্মী। তিনি প্রয়োজন মত কল্পনাকে অবাধ বিস্তার দান করিবার জন্য অতীত পরিবেশের সাহায্য লইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাচীন পরিবেশের মধ্যেও বঙ্কিমের সমসাময়িক সমাজকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। 'ইন্দিরা' (১৮৭৩ ও ১৮৯৩), 'রাধারাণী' (১৮৭৫), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) নিঃসংশয়ে আধুনিক সামাজিক বাস্তব উপন্যাস ; 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) ও 'রাজসিংহ' (১৮৮২ ও ১৮৯৩) রোম্যান্স হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী রোম্যান্সের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা হইতে ইহাদের ভূমিকার দূরত্ব সত্ত্বেও ইহাদের মুখ্য উপকরণ সেই দূরত্ব নয়। এই সকল উপন্যাসের মূল ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত সমসাময়িক মানুষের মনোজগতের সংঘাতের মিল আছে। 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাসের আশ্রয় তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না ; রামানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং রামচরণ তাঁহারই মানস পুত্র ; ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহাদিগকে সজীবতা দিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীর কাসিমের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। নিতান্ত

সামাজিক পটভূমিকায় প্রতাপ-শৈবলিনীকে লইয়া তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 'ইন্দিরা' ও 'রজনী'তে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; সর্বত্র উপন্যাসকার গল্প বলিয়াছেন, 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরাই বক্তা, 'রজনী'তে বিভিন্ন চরিত্র নিজেরাই আপন আপন বক্তব্য বলিয়া গল্পের ধারা বজায় রাখিয়াছে। উইল্কি কলিন্সের *Woman in White*-এ অবলম্বিত পদ্ধতি যে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা "বিজ্ঞাপনে" স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নায়িকাও লর্ড লিটনের *Last Days of Pompeii*-এর অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়ার স্মরণে চিত্রিত হইয়াছে। নানা অসঙ্গতি ও অভাব সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে 'রজনী'র বিশিষ্ট স্থান থাকিবে; ইহা বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। ইহাতে নায়ক নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব এবং চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতকে ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে; সে যুগের বর্ণনা-বহুল রোমান্টিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পগুলিকে তিনটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়, পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছি। প্রথম স্তরে, উদ্যোগপর্ব্বের তিনখানি উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'; তৃতীয় স্তরে 'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'; বাকী সবগুলি গল্প ও উপন্যাস দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত। দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' এবং শেষ উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। অবশ্য সময়ের দিক্ দিয়া বিচার করিলে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরেও দ্বিতীয় স্তরে তাঁহার "ক্ষুদ্র কথা" 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের 'রাজসিংহ'কে উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৮৩ পৃষ্ঠার

এই চটি গল্পের বইটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণে বর্তমান রূপ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ অধুনা-প্রচলিত 'রাজসিংহ'কে নানা কারণে তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত।

দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র (১৮৭৮) প্রকৃতিগত সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ। শেষোক্ত উপন্যাসে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী সর্ব্বাপেক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে। অনেকের মতে নিছক রসরচনা হিসাবে এইটিই তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ বই। কোনও কোনও সমসাময়িক লেখক এমনও সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে করিতেন।

দ্বিতীয় স্তরের শেষ উপন্যাস 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে ১৩০০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'সাধনা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "রাজসিংহ" প্রবন্ধে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার সত্য পরিচয়। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' পুস্তকে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ইহার পরেই মোড় ফিরিয়াছে; শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র জাতিগঠনের উদ্দেশ্য লইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) এই নবতন পদ্ধতির প্রথম উপন্যাস। পরবর্ত্তী দুইটি উপন্যাস—'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারামে' (১৮৮৭) এই ধারাই পরিণতি লাভ করিয়াছে। "ত্রয়ী" নামে খ্যাত তাঁহার এই শেষ উপন্যাস-তিনটি উদ্দেশ্য ও প্রচার-দোষ-দুষ্ট বলিয়া বহু সাহিত্যিকের নিন্দাভাজন হইয়াছে; আবার অনেকে এই তিনটিকে তাঁহার পরিণত বয়সের মহোত্তম কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত দলে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং শেষোক্ত দলে শ্রীঅরবিন্দ, পাঁচকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

> এই তিনখানি উপন্যাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; দেবী চৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা State বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে, তাহার পর্য্যায় দেখাইয়াছেন।...সন্ন্যাসীর গৈরিক লেখা তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই দুই জাতি ছাড়া সমাজের কোনরূপ ভাঙ্গা গড়া হয় নাই। তাই তিনি এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।...এই তিনখানা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীত্বের শ্লাঘা ও অপহ্নব ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই।—'নারায়ণ,' বৈশাখ, ১৩২২।

আসল কথা, শাস্তিপর্ব্বে যে অনুশীলন-তত্ত্ব লইয়া তিনি অবিরত মাথা ঘামাইতেন, তাহারই সহজ প্রচারের জন্য তিনি এই তিনটি উপন্যাস প্রচারের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই এগুলিকে "অনুশীলন-তত্ত্ব" প্রচারের একটা "কল" বলিয়া গিয়াছেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে শোভাবাজার-রাজবাটীর একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া পাদরী হেস্টি 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্মের উপর যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, "রামচন্দ্র" এই ছদ্ম নামে তাহার জবাব দিতে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। ইহা 'আনন্দমঠ' প্রকাশের অব্যবহিত পরের

ঘটনা। তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত "পজিটিভিস্ট" যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লিখিত বঙ্কিমের *Letters on Hinduism* ইহারই ফল। এই অসম্পূর্ণ পত্রগুলিতে হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যার একটা প্রয়াস আছে। ইহার পরেই 'দেবী চৌধুরাণী'—ইহার দ্বিতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' বিলুপ্ত হয়। সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই। ঐ বৎসরের জুলাই মাস (শ্রাবণ, ১২৯১) হইতে বঙ্কিমচন্দ্র-পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। ঐ শ্রাবণ মাস হইতেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন' বাহির হইতে থাকে। এই দুইটি সাময়িক-পত্রের সহায়তায় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার নূতন ধারণা প্রচার করিতে থাকেন। এই প্রচারে 'সীতারাম' অন্যতম "কল" মাত্র। প্রথম সংখ্যা 'প্রচার' হইতেই উহা বাহির হইয়া ১২৯৩ বঙ্গাব্দের মাঘ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; মধ্যে কয়েক মাস বন্ধ ছিল।

মতবাদ যাহাই হউক, শিল্পসৃষ্টির দিক্ দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস তিনখানিতে অনেক বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্কিমের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী এইখানেই চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষার সহিত 'সীতারামে'র ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে নিত্য প্রগতিশীল ছিলেন। ভাষা সরল ও সহজবোধ্য করিবার জন্য তিনি অলঙ্কার ও অন্যান্য উপকরণ বর্জ্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই। যাঁহারা মনে করেন, এই পর্ব্বের শেষের দিকে তাঁহার প্রচারবুদ্ধি শিল্পবুদ্ধিকে খণ্ডিত করিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত 'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহে'র পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ভাল করিয়া দেখিলেই মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। এই 'রাজসিংহ'ই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শেষ

জীবনে শিল্পসৃষ্টিকেই জীবনের চরম কীর্ত্তি মনে করিতে না পারিলেও শেষ পর্য্যন্ত শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে নাই।

যুদ্ধপর্ব্বের শেষের দিকে 'প্রচার' ও 'নবজীবন' মারফৎ বঙ্কিমচন্দ্র নানা তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া একটা ব্যাবহারিক হিন্দুধর্ম্ম আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন—'ধর্ম্মতত্ত্বে,' 'কৃষ্ণচরিত্রে' এবং তাঁহার 'গীতা' ও বেদের ব্যাখ্যায় তাহার সাক্ষ্য আছে। তিনি কদাপি জনতার মুখ চাহিয়া আপনার মতকে খাটো করেন নাই, সকল গোঁড়ামি ও অবিশ্বাসকে প্রয়োজনমত উপেক্ষা করিয়া নির্ভীকভাবে নিজের মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আশ্চর্য্য শিল্প-প্রতিভার গুণে এগুলিও বাংলা-সাহিত্যের বিষয় হইয়া আছে এবং চিরকাল থাকিবে।

শান্তিপর্ব্ব

যুদ্ধপর্ব্বের শেষ কয়েক বৎসর হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে শান্তিপর্ব্ব প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র সূচনাকাল হইতেই তিনি শান্তির পথসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন এবং পিতামহ ভীষ্মের মত পথভ্রান্ত বাঙালীকে পথের নির্দ্দেশ দিতে চেষ্ট করিয়াছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যকে তিনি সম্মান করিতেন এবং সাময়িক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মবিস্মৃতিই হিন্দুজাতির অবনতির কারণ। আত্মবিস্মৃতকে আত্মসচেতন করাই তাঁহার শেষ জীবনের লক্ষ্য ছিল। এই মহদুদ্দেশ্যে তিনি এক প্রকার আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে'র তৃতীয় বৎসরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র সমালোচনা

উপলক্ষ্যে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যকে যাঁহারা অপবিত্র, অরুচিকর ও অশ্লীল বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলেন :—

> যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এত কাল স্থায়ী হইত না। কেন না অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এই অনুসন্ধানের ফলই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'। এই ফল সম্পূর্ণ ফলিতে অনেক দেরি হইয়াছিল। তিনি কিছু কালের জন্য এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। 'প্রচারে'র আশ্বিন-সংখ্যা হইতে পুনরায় 'কৃষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাগ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র' (সম্পূর্ণ গ্রন্থ) বাহির হয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

> বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্ত্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্ম্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।—'আধুনিক সাহিত্য'।

১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'নবজীবনে'র প্রথম প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"। ইহাই 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র আদি। ঐ শ্রাবণ হইতে ১২৯২ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত 'নবজীবনে' বিবিধ প্রবন্ধে তিনি অনুশীলন-ধর্ম্ম

বুঝাইতে চেষ্টা করেন। এইগুলিই পরিবর্ত্তিত আকারে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে 'ধর্ম্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন' নামে পুস্তকাকারে বাহির হয়। '

'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র দেবতত্ত্ববিষয়ক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন, 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা'রও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এই দুইটিই তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা বাহির হয়। এই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে বাহির হয়। দেবতত্ত্ববিষয়ক অসম্পূর্ণ রচনা পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী "বিবিধ" খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তাঁহার প্রতিভা কখনই নিষ্ক্রিয় থাকে নাই। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। ' তিনি ঐ বৎসরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে "সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেনে"র (পরে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট) সাহিত্য-বিভাগের সভাপতিরূপে বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে ইংরেজীতে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর ইংরেজী খণ্ডে এগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

'প্রচার' যে বৎসর প্রচারিত হয়, সেই বৎসর উপন্যাসাদি লঘু রচনার বিরুদ্ধে তিনি প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; কিন্তু পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয় ও তিনি বলেন :—

> জ্ঞানের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞানের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না। বিশেষ মনুষ্য-জীবন বিচিত্র ও বহুবিষয়ক; এজন্য জ্ঞানেরও বৈচিত্র্য"ও বহুবিষয়কতা চাই। যাহা বিচিত্র ও বহুবিষয়ক নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধেও সফলতা ঘটে না।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, "বিবিধ," পৃ. ৪০৪।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এই ভাবে ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানকে সাধারণের বোধ্য করিবার জন্ম প্রাচীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে দুইখানি উপন্যাস রচনা করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। এই ইচ্ছা কার্য্যকরী হয় নাই।

রমেশচন্দ্র দত্ত তৎসম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্রে'র (১৩০২ বঙ্গাব্দ) "ভূমিকা"য় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের শেষ বৎসরের আর একটি ইচ্ছার কথা এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

> আজ তিন বৎসর হইল, একদিন প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিপুল হিন্দুশাস্ত্রসমূহের সার সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তকরূপে প্রকাশ করা সম্ভব কি না?...বঙ্কিমচন্দ্র উদারমনা, উৎসাহশীল, স্বদেশহিতৈষী লোক ছিলেন, অন্যে যে প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হইত, তিনি সেরূপ প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দিত হইলেন; অন্যে যে কার্য্যে ভীত হইত, তিনি সে কার্য্যে উৎসাহিত হইলেন। আহ্লাদের সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এবং কয়েক জন স্বধর্ম্মপ্রিয় বন্ধুর মত লইবার প্রস্তাব করিলেন।
>
> কয়েক দিন পর তাঁহার গৃহে ঐরূপ কয়েক জন পণ্ডিত সমবেত হইলেন। প্রস্তাবিত কার্য্যে সকলেই মত দিলেন।...উৎসাহী বঙ্কিমচন্দ্র নিজে মহাভারত ও ভগবদ্গীতা অংশের সঙ্কলনের ভার লইলেন।
>
> বঙ্কিমচন্দ্রের উজ্জ্বল প্রতিভা সাহিত্যের যে ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রই উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গীতপূর্ণ স্বর সাহিত্যের যে প্রদেশে ধ্বনিত হইয়াছে, সেই প্রদেশই সঙ্গীতপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ হইয়াছে। অদ্য যদি বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এই পুস্তক বঙ্গদেশে গৌরবালোকে আলোকিত হইয়া প্রকাশিত হইত।...আশ্বিন, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি বাংলা দেশের তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিকদিগকে নানা উপদেশ দিয়া সাহিত্য-সেবায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

বাংলা-সাহিত্যের লেখক-সম্প্রদায়ের প্রতি পিতামহ বঙ্কিম শান্তি-পর্ব্বে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সার কথাগুলি এই ভাবে "নিবেদন" করিয়াছেন :—

> যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।...
>
> যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ মহাপাপ।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, 'বিবিধ প্রবন্ধ,' ২য় ভাগ, পৃ. ২০৬।

পরিশেষে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্ব্বদা আপনাকে আড়ালে রাখিয়া নিজের সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ স্থির ছিল; জীবনে যত অগ্রসর হইয়াছেন, সেই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তাঁহার তত বাড়িয়াছে। তিনি শয়নে স্বপনে একাগ্রচিত্ত হইয়া দেশের এবং দশের কল্যাণকামনা করিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিটি আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—

> সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্ম্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মের তাহা এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্ম্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, 'বিবিধ প্রবন্ধ,' দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৮২।

শান্তিপর্ব্বে বাংলা-সাহিত্যে পিতামহ ভীষ্মস্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্রের ইহাই চরম কথা। এই আদর্শ তিনি নিজের জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। এই মতবাদের জন্য বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-শিল্পিসম্প্রদায় যে তাঁহাকে একদিন সাহিত্য-সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন, এই আশঙ্কা তিনি কখনই করেন নাই; নির্ভীকভাবে জীবনের আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী

বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজি প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :—

১। **ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস।** ইং ১৮৫৬। পৃ. ৪১।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যত্রয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল।

২। **দুর্গেশনন্দিনী**। ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস। ইং ১৮৬৫। পৃ. ৩০৭।

৩। **কপালকুণ্ডলা**। ইং ১৮৬৬। পৃ. ১২৪।

৩ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' 'কপালকুণ্ডলা'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

৪। **মৃণালিনী**। সংবৎ ১৯২৬ (১০ নবেম্বর ১৮৬৯)। পৃ. ২৪১।

৫। **বিষবৃক্ষ**। ১২৮০ সাল (১ জুন ১৮৭৩)। পৃ. ২১৩।

১২৭৯ সালের বৈশাখ-ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

৬। **ইন্দিরা**। উপন্যাস। বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। ১২৮০ সাল (২৫ আগষ্ট ১৮৭৩)। পৃ. ৪৫।

১২৭৯ সালের চৈত্রসংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণের পুস্তকে (১৮৯৩, পৃ. ১৭৭) 'ইন্দিরা' "পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত" হয়।

৭। **যুগলাঙ্গুরীয়**। ১২৮১ সাল (২ জুন ১৮৭৪)। পৃ. ৩৬।

১২৮০ সালের বৈশাখসংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

৮। **লোকরহস্য।** ১২৭৯।৮০ সালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। কৌতুক ও রহস্য। ইং ১৮৭৪ (২৬ নবেম্বর)। পৃ. ৯৯।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৭৪) প্রকাশিত হয়। "দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "লোকরহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্দ্ধেক পুরাতন ও অর্দ্ধেক নূতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নূতন, আটটি পুরাতন; এবং একটি (রামায়ণের সমালোচন) পুরাতন হইলেও নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সকলগুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত।"

৯। **বিজ্ঞানরহস্য** অর্থাৎ ১২৭৯।৮০ সালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ। ইং ১৮৭৫ (১৯ এপ্রিল)। পৃ. ১৭০।

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (জুলাই ১৮৮৪, পৃ. ৭৯) "সর উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা" প্রবন্ধের পরিবর্ত্তে ১২৮১ সালের চৈত্রসংখ্যা 'ভ্রমরে' প্রকাশিত "চন্দ্রলোক" প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম সংস্করণেও ১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শন' হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত আছে।

১০। **চন্দ্রশেখর।** উপন্যাস। ১২৮২ সাল (১ জুন ১৮৭৫)। পৃ. ১৯৫।

১২৮০ শ্রাবণ—১২৮১ ভাদ্রসংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

১১। **কমলাকান্তের দপ্তর।** (বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত) ইং ১৮৭৫ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬)। পৃ. ১৬২।

ইহা প্রথমে ১২৮০-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে; পুস্তকের আখ্যা-পত্রে এই তারিখই

দেওয়া আছে। ১২৯২ সালে (সেপ্টেম্বর ১৮৮৫) 'কমলাকান্ত' নামে (পৃ. ২৫০) ইহার পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এই গ্রন্থ কেবল 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র পুনঃ সংস্করণ নহে। "কমলাকান্তের দপ্তর" ভিন্ন ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে।..."চন্দ্রালোকে" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত; এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত।...কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি হইয়াছে। "বুড়া বয়সের কথা" যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও "কমলাকান্তের পত্র" মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।"

'কমলাকান্ত' পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণে (জুলাই ১৮৯১) ১২৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "ঢেঁকি" নামক প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। এই সংস্করণের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল দেওয়া নাই।

১২। **বিবিধ সমালোচন।** (বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত)। ইং ১৮৭৬ (১৬ জুলাই)। পৃ. ১৪৪।

গ্রন্থকার পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন, "বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানেং পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।"

১৩। **রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী।** ইং ১৮৭৭। পৃ. ১/০।

ইহা সর্ব্বপ্রথম ১২৮৩ সালে (এপ্রিল ১৮৭৭) 'দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী'র সহিত প্রকাশিত হয়।

১৪। **রজনী**। উপন্যাস। ১২৮৪ সাল (২ জুন ১৮৭৭)। পৃ. ১২২।

ইহা প্রথমে ১২৮১-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে, যে ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ব্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে। প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি "কাণা ফুলওয়ালী" আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়।"

১৫। **উপকথা**। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ। ইং ১৮৭৭ (২৪ নবেম্বর)। পৃ. ৮৩।

ইহাতে 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' একত্র পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা দ্বিতীয় বার (পৃ. ৮৫) মুদ্রিত হয়।

১৬। **কবিতাপুস্তক**। ইং ১৮৭৮ (১৮ আগষ্ট)। পৃ. ১১২।

'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমরে' প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা 'ললিতা' ও 'মানস' এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে (পৃ. ১৪৪) এই পুস্তকের নামকরণ হয় 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'। দ্বিতীয় বারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। "পুষ্পনাটক" প্রথম 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল। "দুর্গোৎসব" 'বঙ্গদর্শন' হইতে এবং "রাজার উপর রাজা" প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। 'কবিতাপুস্তক' অপেক্ষা 'গদ্য পদ্য' নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এই জন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্ত্তন করা গেল।"

১৭। **কৃষ্ণকান্তের উইল**। ইং ১৮৭৮ ([illegible] আগষ্ট)। পৃ. ১৭০।

১২৮২ ও ১২৮৪ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

১৮। **সাম্য**। ইং ১৮৭৯ (৬ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ৬৮।

"এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ [১২৮০ ও ১২৮২ সালের] বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঐ পত্রে [১২৭৯ সালে] প্রকাশিত "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক প্রবন্ধ হইতে নীত।"

১৯। **প্রবন্ধ-পুস্তক**। (২৭ এপ্রিল ১৮৭৯)। পৃ. ১৫৮।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে কোন তারিখ নাই। এই প্রবন্ধগুলি পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছিল ; কেবলরাম শর্ম্মার প্রণীত "বুড়া বয়সের কথা" 'কমলাকান্ত' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২০। **রাজসিংহ**। ক্ষুদ্র কথা। ১২৮৮ সাল (৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২)। পৃ. ৮৩।

১২৮৪ চৈত্র—১২৮৫ ভাদ্রসংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি (পৃ. ৪৩৪) বর্ত্তমান আকারে "পুনঃপ্রণীত"।

২১। **আনন্দ মঠ**। ১২৮৯ সাল (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। পৃ. ১৯১।

১২৮৭-৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

২২। **মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত**। (১২৮৭ সালের বঙ্গ-দর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত) ১২৯০ সাল (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪)। পৃ. ৪৭।

২৩। **দেবী চৌধুরাণী।** ১২৯১ সাল (২০ মে ১৮৮৪)। পৃ. ২০৬।

১২৮৯-৯০ সালের 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত।

২৪। **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস।** ইং ১৮৮৬।

ইহা প্রকৃত পক্ষে 'উপকথা'। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ পুস্তকের (নং ১৫) তৃতীয় সংস্করণ। ইহাতে 'ইন্দিরা' (৪র্থ সং), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (৪র্থ সং), 'রাধারাণী' (৩য় সং) এবং 'রাজসিংহ' (২য় সং) একত্রে স্থান পাইয়াছে।

২৫। **রাধারাণী।** ইং ১৮৮৬ (২৫ জুন)। পৃ. ৩৮।

১২৮২ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৭৭ ও ১৮৮১ সনে প্রকাশিত 'উপকথা'র দুইটি সংস্করণে এবং ১৮৮৬ সনে 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসে' ৩য় সংস্করণ-রূপে পুনর্মুদ্রিত হয়; ৩য় সংস্করণের এই অংশই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে সর্ব্বপ্রথম বাহির হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি (পৃ. ৬৫) পরিবর্দ্ধিত।

২৬। **কৃষ্ণচরিত্র।** প্রথম ভাগ। (১২ আগষ্ট ১৮৮৬)। পৃ. ১৯৮।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "কৃষ্ণচরিত্র…'প্রচার' নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল…প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু…আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।…আগে অনুশীলন ধর্ম্ম পুনর্মুদ্রিত করিয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, "অনুশীলন ধর্ম্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।"

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্পাংশমাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তা ছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উপক্রমণিকাভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্পাংশ মাত্র। অধিকাংশই নূতন।"

২৭। **সীতারাম।** ১২৯৩ সাল (৪ মার্চ ১৮৮৭)। পৃ. ৪১৯।

প্রথম তিন বর্ষের 'প্রচারে' (১২৯১-৯৩) প্রকাশিত।

২৮। **বিবিধ প্রবন্ধ।** প্রথম ভাগ। ১২৯৪ সাল (৭ জুলাই ১৮৮৭)। পৃ. ২৮০।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, 'বিবিধ সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক'—"দুই-খানি পৃথক্ সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ' নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বে 'বিবিধ সমালোচনা' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে' প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল।"

২৯। **ধর্ম্মতত্ত্ব।** প্রথম ভাগ। **অনুশীলন।** ১২৯৫ সাল (১৭ মে ১৮৮৮)। পৃ. ৩৫৯।

পুস্তকের "ভূমিকা"য় প্রকাশ, "এই গ্রন্থের কিয়দংশ 'নবজীবনে' [১২৯১-৯২] প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

৩০। **বিবিধ প্রবন্ধ।** দ্বিতীয় ভাগ। (বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত) ইং ১৮৯২ (২৫ মে)। পৃ. ৩৫৬।

৩১। **সহজ রচনাশিক্ষা।**

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক (পৃ ৩২) দেখিয়াছি।

৩২। **সহজ ইংরেজী শিক্ষা।**

ইহার ৩য় সংস্করণ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক আমরা এখনও দেখি নাই।

৩৩। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।** ইং ১৯০২ (১ নবেম্বর)। পৃ. ৩১৮+৯।

দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় "সংগ্রহকারের নিবেদন"-স্বরূপ লিখিয়াছেন, "…'প্রচারে' [শ্রাবণ-পৌষ ১২৯৩; বৈশাখ-চৈত্র ১২৯৫] এই গীতাব্যাখ্যার প্রথম কিয়দংশ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।…'প্রচারে' যেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হস্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাহা এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল।…"

৩৪। **Rajmohan's Wife.** ইং ১৯৩৫। পৃ. ১৫৬।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে এই ইংরেজী উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবাসী'-কার্য্যালয় হইতে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র এই ইংরেজী উপন্যাসখানির প্রথম সাত অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। স্বর্গত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'বারিবাহিনী' পুস্তকের প্রথম নয় অধ্যায় *Rajmohan's Wife* পুস্তকের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত অনুবাদ।

৩৫। **বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী**—জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ। ইং ১৯৩৮-৪২।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একমাত্র প্রামাণিক সংস্করণ। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকগুলি ছাড়া তাঁহার ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থ

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে। জার্ম্মান, সোয়েডিশ ও ভারতীয় বহু ভাষাতেও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সকলগুলির তালিকা করা আপাততঃ সম্ভব নয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ প্রকাশিত হয় :—

ইংরেজী : 'কপালকুণ্ডলা'—গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, *National Magazine*, Calcutta, 1876-77 ; 'দুর্গেশনন্দিনী'—চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, Calcutta, 1880 ; 'বিষবৃক্ষ'—Miriam S. Knight, London, 1884 ; 'কপালকুণ্ডলা'—H. A. D. Phillips, London, 1885.

জার্ম্মান : 'কপালকুণ্ডলা'—Curt Klemm, Leipzig, 1886.

হিন্দুস্থানী : 'দুর্গেশনন্দিনী'—K. Krishna, Lucknow, 1876 ; 'মৃণালিনী'—K. Simha, Lucknow, 1880 ; 'বিষবৃক্ষ'—G. Quadir, Sialkot, 1891 ; 'দেবী চৌধুরাণী'—Tulasi Rama, Amritsar, 1893.

হিন্দী : 'যুগলাঙ্গুরীয়'—K. R. Bhatt, Patna, 1880 ; 'দুর্গেশনন্দিনী'—G. Simha, Benares, 1882.

কানাড়ী : 'দুর্গেশনন্দিনী'—B. Venkatachar, Bangalore, 1885.

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টক্‌হল্‌ম্‌ হইতে 'বিষবৃক্ষে'র সোয়েডিশ অনুবাদ *Det giftiga Tradet* নামে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্ভবতঃ বঙ্কিমের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রকাশিত।

এই তালিকা সম্পূর্ণ না হইতেও পারে। পাঠকদের সুবিধার্থ আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের একটি স্বতন্ত্র তালিকা দিয়ে দিলাম। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর তাঁহার বহু পুস্তক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় (অনেকগুলি একাধিক বার) অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকা এখনও সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

1. *Durgesa Nandini*; or The Chieftain's Daughter: trans. into English prose by Charu Chandra Mookerjee. Calcutta, 1880.
2. *The Poison Tree*: trans by Miriam S. Knight. With a preface by E. Arnold. London, 1884.
3. *Kopal Kundala*: trans. by H. A. D. Phillips. London, 1885.
4. *Krishna Kanta's Will*: trans. by Miriam S. Knight, with introduction, glossary, and notes by J. F. Blumhardt, M. A. London, 1895.
5. *The Two Rings*: trans. by Rakhal Chandra Banerjee, B. A. Calcutta, 1897.
6. *Sitaram*: trans. by Sibchandra Mukherji. Calcutta, 1903.
7. *Chandrasekhar*: trans. by Manmatha Nath Ray Chowdhury. Calcutta, [Nov.] 1904.
8. *Chandrashekhar*: trans. by Debendra Chandra Mullick, B. L. Calcutta, [Oct.] 1905.

9. *Ananda Math* : "*The Abbey of Bliss*" : trans. by Naresh Chandra Sen Gupta. Calcutta, [28 Dec.] 1906.
10. *Radharani* : trans. by R. C. Maulik. Calcutta, 1910.
11. *Yugalanguriya* (The Story of the Two Rings) : trans. by P. N. Bose and H. W. B. Moreno. Calcutta, 1913.
12. *Krishnakanta's Will* ; trans. by Dakshina Charan Roy. Calcutta, [1918] (Reviewed in the *Modern Review* for Feb. 1918.)
13. *Indira and other Stories* : trans. by J. D. Anderson (Indira, Radharani, the Two Rings, Doctor Macrurus or Vyaghracharya Brihal-langul.) Calcutta, 1919.
14. *Kapalkundala* : trans. by Debendra Nath Ghosh. Calcutta, [Aug.] 1919.
15. *The Two Rings and Radharani* : trans. by D. C. Roy. Calcutta, 1919.
16. *Sree*, an Episode from Sitaram : trans. by P. N. Bose and Moreno. Calcutta, 1919.
17. *Rajani* : trans. by P. Majumdar. Calcutta, [Dec.] 1928.
18. *Anandamath* : trans. by Sree Aurobindo and Sree Barindra Kumar Ghosh. (Basumati)

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রকাশিত *The Indian Magazine and Review* পত্রের মার্চ সংখ্যায় মিরিয়ম এস. নাইট বঙ্কিমচন্দ্রের 'স্বর্ণগোলকে'র ইংরেজী অনুবাদ "The Globe of Gold" নামে প্রকাশ করেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাটকাকারে অভিনয়

(ইং ১৮৭২—১৮৭৫)

৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের যে-সকল উপন্যাস নাটকাকারে অভিনীত হয়, তাহার একটি তালিকা সঙ্কলিত হইল।—

অভিনীত পুস্তক	থিয়েটারের নাম	অভিনয়ের তারিখ
কপালকুণ্ডলা	ন্যাশনাল থিয়েটার	১৮৭৩—১০ মে
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	—২০ ডিসেম্বর
ঐ	ঐ	—২৭ ডিসেম্বর
ঐ	ঐ	১৮৭৪— ৩ জানুয়ারি
কপালকুণ্ডলা	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার	— ৭ ফেব্রুয়ারি
ঐ	ঐ	—১৪ ফেব্রুয়ারি
মৃণালিনী	ন্যাশনাল থিয়েটার	—১৪ ফেব্রুয়ারি
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	—১৪ ফেব্রুয়ারি
ঐ	ঐ	—২১ ফেব্রুয়ারি
মৃণালিনী	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার	—২১ ফেব্রুয়ারি
ঐ	ঐ	—২৮ ফেব্রুয়ারি
কপালকুণ্ডলা	ঐ	— ৪ এপ্রিল
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	— ২ মে
ঐ	ঐ	—১৫ আগষ্ট
ঐ	ঐ	— ৩ অক্টোবর
ঐ	ঐ	— ৫ ডিসেম্বর
ঐ	ঐ	—১২ ডিসেম্বর
কপালকুণ্ডলা	ঐ	১৮৭৫—১৩ ফেব্রুয়ারি
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	—২৫ মার্চ
বিষবৃক্ষ	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার	— ১ মে

জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নয়টার সময় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। এই জন্ম-তারিখ বঙ্কিমচন্দ্রের কোষ্ঠী হইতে গৃহীত।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। সেখানে তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কাঁটালপাড়ার সন্নিকটস্থ নারায়ণপুর গ্রামের পঞ্চমবর্ষীয়া একটি বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ অক্টোবর ১১½ বৎসর বয়সে তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম বাল্যরচনা (কবিতা) এবং ২৩ এপ্রিল তারিখে প্রথম গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'ললিতা ও মা... পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচনা করেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পান।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' প্রকাশিত হয়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবর্ত্তিত এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান (দ্বিতীয় বিভাগ) অধিকার করেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়েন।

এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হইল। পরবর্ত্তী কালে ছাত্র-জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলিয়াছিলেন—

> আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কালেজে এক আধটু শিখেছিলেম ঈশান বাবুর কাছে। ক্লাসে কখনও থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখনও ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয় নি; নীতিশিক্ষা কখনও হয় নি।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ. ১৯৪।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের অর্ডারে যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টররূপে তাঁহার নিয়োগ বিজ্ঞাপিত হয়। ৭ই আগষ্ট হইতে তাঁহার চাকুরীর দিন গণনা করা

হইলেও সম্ভবতঃ তিনি ২৩এ আগষ্ট প্রথম কা[illegible] যোগদান করেন। যশোহরেই দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার প্রথম [illegible]রিচয় হয়।* এই পরিচয় উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হ[illegible]য়াছিল। যশোহরে অবস্থানকালে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটী আসিলেন†, বন্ধুপ্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ;.... ।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি তিনি যশোহর হইতে মেদিনীপুরের নেগুয়াঁ মহকুমায় বদলি হইলেন ; ৭ই ফেব্রুয়ারি নেগুয়াঁ পৌঁছিয়া তিনি ৯ই তারিখে সেখানকার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরি-বাড়ীর কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হইল। দ্বাদশবর্ষীয়া পত্নীকে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ম্মস্থানে লইয়া গেলেন। নেগুয়াঁয় অবস্থানকালে সমুদ্র ও অরণ্যের শোভা দেখিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র বীজ তাঁহার মনে উপ্ত হয়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় বদলি হন এবং সেখানে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মার্চ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি 'এডুকেশন গেজেটে' কিছু কিছু লিখিতেন। তাঁহার ইংরেজী উপন্যাস *Rajmohan's Wife* এবং প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' এখানেই অংশতঃ রচিত হয়। *Rajmohan's Wife* [illegible]পারীচাঁদ

---

* পূর্ণচন্দ্রের কথায়—প্রভাকরে লিখিবার সময় "পত্রের দ্বারা...ইঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল।...সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত,—আদরের কবিতা, কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত।"

† বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরীর ইতিহাসে এই ছুটির উল্লেখ নাই।

মিত্র-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' (*Indian Field*) পত্রে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়।

শচীশবাবু-প্রোক্ত ('বঙ্কিম-জীবনী,' পৃ. ১০৮) বঙ্কিমচন্দ্রের *Adventures of a Young Hindu* নামক উপন্যাসের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা ঐ কালেই রচিত হওয়া সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের খুলনা-শাসন সম্পর্কে সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড লিখিয়াছেন—

> While in charge of the Khulna sub-division (now a district) he helped very largely in suppressing river *dacoities* and establishing peace and order in the eastern canals....
>
> While at Khulna Bankim Chandra began a serial story named "Rajmohan's Wife" in the *Indian Field* newspaper, then edited by Kisori Chand Mitra. This was his first public literary effort.
> —*Bengal under the Lieutenant-Governors*, ii. 1879.

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণার বারুইপুর মহকুমায় বদলি হন। এখানে তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছিলেন; মধ্যে অস্থায়ী ভাবে কিছু দিনের জন্য ডায়মণ্ড হারবার (১৮৬৪, অক্টোবর) ও আলিপুরে (১৮৬৭, আগষ্ট) বদলি হন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বঙ্কিম-জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর; এই বৎসরে চট্টোপাধ্যায়-পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধের বীজ উপ্ত হয়। যাদবচন্দ্র উইল করিয়া কাঁটালপাড়ার ভদ্রাসন মধ্যম পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে ভাগ করিয়া দেন। শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হন। এই বৎসরেই তাঁহার প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়।

বারুইপুরে অবস্থানকালেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষাংশ লিখিয়া থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে কালীনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—

> এই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন। এ সময় তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি, সাক্ষীর এজেহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে—তাঁহার study room-এ প্রস্থান করিতেন··· ।—'প্রদীপ,' ১৩০৬, পৃ. ২১৯।

'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'ও এই সময়ে রচিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে। 'মৃণালিনী'র প্রকাশকাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

'মৃণালিনী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি কিছু দিনের জন্য কাশী ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন। এবং সেখানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। মধ্যে অস্থায়ী ভাবে তিনি বহরমপুরস্থ রাজসাহী কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্টের কাজ করেন (১৮৭১, এপ্রিল), এবং শেষের তিন মাস অসুস্থতাবশতঃ ছুটি লন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয়।

বহরমপুরে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন। "On the Origin of Hindu Festivals" ও "A Popular Literature for Bengal" নামক প্রবন্ধ দুইটি তিনি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনে পাঠ করেন—প্রথমটি বহরমপুরে আসিবার পূর্ব্বেই পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ দুইটি

উক্ত সমিতির বিবরণী-বহিতে যথাক্রমে ১৮৬৯ ও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' ত্রৈমাসিকের ১০৪ ও ১০৬ (ইং ১৮৭১) সংখ্যায় যথাক্রমে তাঁহার "Bengali Literature" ও "Buddhism and the Sankhya Philosophy" বেনামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে'র শম্ভুচন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ১৮৭২ ডিসেম্বর ও ১৮৭৩ মে মাসে যথাক্রমে উক্ত পত্রে তাঁহার "The Confessions of a Young Bengal" ও "The Study of Hindu Philosophy" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই সময়ে লিখিত কয়েকটি পত্র 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেসেণ্টে' বাহির হইয়াছে। এই সময়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দিত হইয়াছিলেন। যে স্যার্ জর্জ ক্যাম্পবেলকে তিনি পরে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই যে কেন সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা আজও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তখনকার 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

> ...According to his [Bunkim Chunder Chatterjee the Dy. Collector of Berhampoor] opinion, "much of the general feeling of distrust towards the Government which has often been the comment, is due to the action of the native press."...We are taken by surprise at the remarks of an educated native like Bunkim Babu, who holds no inconsiderable positton in our society. Certainly in a free country such remarks from a person of Bunkim Babu's position would have brought down upon him universal condemnation, but under the pressure of a foreign government even the truest patriot turns a traitor to his country. —16 Octr. 1873.
>
> ...This mischievous remark of the Babu, as may be easily supposed, has met with the approval of his Honor,...What Bunkim Babu said was simply silly in the extreme. He might have as

well said that the native press seeks the interests of the people.... If Babu Bunkim and Sir George following mean to insinuate that the native press sows sedition, we can only say that there is a vague and indefinite law on the subject, which might be easily enforced if necessary.

...Babu Bunkim Chandra draws but only Rupees 600 per mensem and already his zeal has met with the approbation of his Honor, and it is to be expected that a promotion would increase his zeal tenfold...Before concluding this we would make the remark regarding Bunkim Baboo which the late Mr. Anstey made of Mr. Paul when eulogising Lord Mayo. "I hope my learned colleague will meet his reward in after life as surely as he is to receive tho reward here."—28 Octr. 1873.

'বঙ্গদর্শনে' পর-পর 'বিষবৃক্ষ,' 'ইন্দিরা,' 'চন্দ্রশেখর,' 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'লোকরহস্য,' 'বিজ্ঞানরহস্য,' 'কমলাকান্তের দপ্তর,' 'সাম্য' খণ্ডশঃ বাহির হইতে থাকে—বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধ এই সময়ে তিনি লিখিয়া প্রকাশ করেন। বহরমপুর থাকা কালেই 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ক্যাণ্টনমেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিনের সহিত এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ লইয়া বহরমপুরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; এই বিবাদ আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। ৮ জানুয়ারি ও ১৫ জানুয়ারি (১৮৭৪) তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

We are grieved to learn from the *Moorshidabad Patrika* that Babu Bunkim Chunder Chatterjee, the Dy. Magt. while returning home from office on the 15th Dec. last, was assaulted by one Lt. Colonel Duffin of the Berhampore Cantonment, and received

several violent pushes at his hands. It appears that the Babu was passing in a palkee across a cricket ground where Mr. Duffin and some Europeans were playing. This was deemed a great *beadubee* on the part of the Babu and Mr. Duffin felt himself fully justified in chastising him with blows. The *Patrica* says that the Babu has brought a criminal case against his aggressor and it has caused as it ought great sensation in Berhampore.... —8 Jany. 1874.

...It appears that the Colonel and the Babu were perfect strangers to each other, and he did not know who he was when he affronted him. On being informed afterwards of the position of the Babu, Col. Duffin expressed deep contrition and a desire to apologise. The apology was made in due form in open Court where about a thousand spectators, native and European, were assembled.—15th Jany. 1874.

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৮০) কাঁটালপাড়ায় বঙ্গদর্শন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা হইতে বঙ্গদর্শন কার্য্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'ভ্রমর' নামক একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে লিখিতেন ও ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণা জিলার বারাসত মহকুমায় বদলি হন এবং সেখানে কয়েক মাস থাকিতে না থাকিতেই অক্টোবর মাসে মালদহে রোড-সেসের কাজে নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন হইতে দীর্ঘ অবসর (প্রায় ৯ মাস) গ্রহণ করেন। এই সময়ে 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাধারাণী' (১৮৭৫) ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' 'রজনী' আরম্ভ হয়।

নয় মাস ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়ায় অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করেন। সেই সময় তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা আসিতেন। এই সময়েই রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'এমারেল্ড বাওয়ারে' দ্বিতীয় কলেজ-রিইউনিয়ন নামক মিলন-সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলী হন এবং সেখানে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে তিনি অস্থায়ী ভাবে বর্দ্ধমান ডিবিসনে কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট নিযুক্ত হন।

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়া হইতেই হুগলী যাতায়াত করিতেন; 'বঙ্গ-দর্শন' ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূরা দমে যাদবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জীবচন্দ্রের পরিদর্শনে ও বঙ্কিমের সম্পাদনায় বাহির হইতেছিল। 'রজনী' ও 'রাধারাণী' শেষ হইয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ধারাবাহিকভাবে চলিতে চলিতেই হঠাৎ ১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র-সংখ্যা বাহির হইয়া অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের শেষ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিয়া দেন। 'বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক-সংখ্যা তখন খুব বেশী। ঠিক এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। যাদবচন্দ্র তাঁহার উইলে বঙ্কিমকে কাঁটালপাড়ার বাড়ীর অংশ দেন নাই; ভ্রাতাদের মধ্যেও সদ্ভাবের অপ্রতুল হইতেছিল। কিন্তু এগুলি ঠিক 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিবার কারণ না হইতে পারে। ছুটিতে কাঁটালপাড়ায় আরামে কাটাইয়া চাকুরীতে যোগ দিবার প্রাক্কালে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইয়াছিল; চাকুরীর চাপও ইহার কারণ হইতে পারে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কয়েকটি সমালোচনা 'বিবিধ সমালোচন' নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি

The Bane of Life নাম দিয়া 'বিষবৃক্ষে'র অনুবাদ সুরু করেন। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে লাট-পত্নী লেডী এলিয়টুকে এই অনুবাদই উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেন কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশের কথা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র স্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখাপড়া করিয়া দান করিলেন (১২ অগ্রহায়ণ ১২৮৩)।

ধূমায়িত বহ্নি তখন জ্বলিয়াছে, ভ্রাতৃবিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাস উঠাইয়া চুঁচুড়ায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে উঠিয়া গেলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় উহা পুনঃপ্রকাশিত হইল; অসমাপ্ত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সমাপ্ত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের "ক্ষণভিন্নসুহৃৎ" দীনবন্ধুর ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল; ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম-লিখিত জীবনী-সম্বলিত হইয়া দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল।

হুগলীতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়—'রজনী' (১৮৭৭), 'উপকথা' (ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী একত্রে, ১৮৭৭), 'কবিতাপুস্তক' (১৮৭৮), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'প্রবন্ধ-পুস্তক' (১৮৭৯), 'সাম্য' (১৮৭৯)।

চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়াঘাটের বাড়ীতে কলিকাতা হইতে হেমবাবু, যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অনেকে যাতায়াত করিতেন; ভূদেববাবুর সহিত এই সময়ে তাঁহার খুবই দেখা-শোনা হইত। অধ্যাপক গোপালচন্দ্র

গুপ্ত, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ভূদেবের গৃহে সমবেত হইয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিখে চুঁচুড়া হইতে বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি তৎকালে ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস* ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনা করিতেছিলেন।

ডিবিসনাল কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্টরূপেই বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে হাবড়ায় বদলি হন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। হাবড়ায় আসিয়াই বিচারের রায় লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাক্ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অস্থায়ী অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী স্বরূপ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর-রূপে অস্থায়ী ভাবে ২৪-পরগণায় আলিপুরে বদলি হন; মধ্যে মে মাসে কয়েক দিন বারাসতে ছিলেন। ১৮৮২, ১৭ই মে হইতে ৭ই আগষ্ট পর্যন্ত পুনরায় আলিপুরে থাকিয়া ৮ই আগষ্ট তারিখে তিনি জাজপুরে (কটক) বদলি হন।

উপরোক্ত সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' (১৮৮২) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

---

* বঙ্কিমচন্দ্র একটি খসড়া-খাতায় এই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই খাতায় নিম্নলিখিত ভাবে বিষয়-বিভাগ করা হইয়াছে—Character of the Ancient Hindus, Maritime power and habits, External commerce, Manners and customs (women and widow marriage), Dates of authors, Wealth of ancient India, Government, Military power, Arab expeditions, Arab Geographers, Historicai and Miscellaneous.

হাবড়া হইতে কলিকাতায় বদলি হওয়ার পর জাজপুর গমন পর্য্যন্ত বঙ্কিমের বাসা কলিকাতার বউবাজার ষ্ট্রীটে ছিল; সেখানে প্রায় প্রত্যহই সাহিত্যিক বৈঠক বসিত; 'আনন্দমঠে'র পাণ্ডুলিপি পড়া হইত। চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাকুমার কবিরত্ন, বলাইচাঁদ দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও সঞ্জীবচন্দ্র নিয়মিত সেই আড্ডায় জুটিতেন। বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদটি হঠাৎ লুপ্ত হওয়াতে সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া 'বেঙ্গলী,' 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' প্রভৃতি দৈনিক পত্রে খুব লেখালেখি হয়।

'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া গভীরভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন—পজিটিভিজ্‌ম্ সম্বন্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার আলোচনা হইত। পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ব্যাপারে এই সময়ে বঙ্কিমের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাদ হয়। সঞ্জীবের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' তখন অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র মিঃ ব্লাইদকে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটরীর চার্জ বুঝাইয়া দেন। সেই দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাটীতে বঙ্কিমকে লইয়া যান। সেই দিন ১১ই মাঘ ছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্কিম কলেজ-রিইউনিয়নের সভায় যোগদান করেন। ৫ই ফাল্গুন (১৬ ফেব্রুয়ারি) তারিখে কলিকাতায় সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হয়—সেই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' রচনা করেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগষ্ট হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে

জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ পাদরি হেষ্টির সহিত হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব লইয়া 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় তাঁহার বাদাহুবাদ হয়।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'আনন্দমঠ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় বদলি হন। সেখানে আসিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েস্টমেকট্ সাহেবের সহিত তাঁহার খিটিমিটি বাধে। এই বিবাদের ফলে বঙ্কিমকে হয় ত চাকুরী ত্যাগ করিতে হইত, কিন্তু ওয়েস্টমেকট্ বদলি হওয়াতে তাহা করিতে হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসা তখন কলিকাতায়, তিনি প্রথমে সেখান হইতে হাবড়া যাতায়াত করিতেন, কিন্তু পরে বাধ্য হইয়া হাবড়ায় বাড়ী ভাড়া করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত বঙ্কিম হাবড়ায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ও 'দেবী চৌধুরাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'দেবী চৌধুরাণী' 'বঙ্গদর্শনে' সমাপ্ত না হইতেই 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ হয়—সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় তাহা আর নিয়মিত বাহির হইতেছিল না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্য্যন্ত (চৈত্র ১২৮৯, নবম বৎসর সম্পূর্ণ) কোনও প্রকারে বাহির হইয়া 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইয়া যায়। তখন চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; বউবাজার ষ্ট্রীটের বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাট ইহার প্রকাশক হন। ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক হইতে (১৮৮৩ অক্টোবর) 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশিত হইয়া মাঘ মাসে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও 'বঙ্গদর্শনে'র উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে

পুরোভাগে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' নামক ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে 'প্রচার' প্রচারিত হয়। ইহার ঠিক ১৫ দিন পূর্ব্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' পত্রিকার প্রকাশ স্থরু হয়।*

'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হইতে থাকে; 'ধর্ম্মতত্ত্ব—অনুশীলনে'র প্রবন্ধগুলি 'নবজীবনে' বাহির হয়। এই দুই পত্রিকার সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার পরিণত বয়সের মতামত প্রচার করিতে থাকেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র প্রথম বৎসরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে সে সময় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আলোড়ন হইয়াছিল। এই তর্কের ফলে বঙ্কিমের মতামতগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। তত্ত্ববোধিনীর আড়ালে থাকিয়া যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রনাথ বসু এই যুদ্ধে বঙ্কিমের পক্ষে ছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তারিখে আলিপুরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল বঙ্কিমচন্দ্রকে ঝিনিদহ (যশোহর), ভদ্রক (কটক), হাবড়া ও মেদিনীপুর ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। এই ৩২ মাস সময়ের মধ্যে ১৩ মাস তিনি অসুস্থতাবশতঃ ছুটিতে কাটাইয়াছেন। তিনি হাঁপানিতে

---

* "নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম্ম—যে হিন্দুধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

এই কালে খুব ভুগিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে 'প্রচারে' তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আগষ্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং 'ইন্দিরা,' 'যুগলাঙ্গুরীয়,' 'রাধারাণী' ও 'রাজসিংহ' একত্র 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' নামে বাহির হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ, ১ম ভাগ' তাঁহার সম্পাদনায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে উল্লিখিত "জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ"-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র দ্বিতীয় পরিবর্ত্তিত সংস্করণ 'কমলাকান্ত' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সীতারাম' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম ভাগ' পুস্তকাকারে বাহির হয়।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখস্থ প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে একটি বাটী খরিদ করিয়া সেখানেই বাস করিতে থাকেন। তখন তিনি হাবড়ায় ডেপুটি ছিলেন; ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি মেদিনীপুর যান। তৎপূর্ব্বে ৬ মাসের ছুটি লইয়া তিনি বিশ্রাম ও হৃত স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মার্চ তারিখে তিনি জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে উত্তর-ভারত পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। মির্জ্জাপুর, বিন্ধ্যাচল, কাশী, আগ্রা হইয়া তাঁহারা মথুরা-বৃন্দাবন অবধি গিয়াছিলেন। মথুরায় জ্যেষ্ঠের সহিত সঞ্জীব ও বঙ্কিমের মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি একা জয়পুর চলিয়া যান। বঙ্কিম ও সঞ্জীবচন্দ্র এলাহাবাদে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ মার্চ তারিখের সন্ধ্যায় এলাহাবাদে খসরুবাগে তাঁহাকে লইয়া একটি সাহিত্য-সভা হয়। প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত

ছিলেন। ২রা এপ্রিল তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'প্রচার' পত্রিকায় এই সময় তাঁহার 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই; কারণ, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'প্রচার' বন্ধ হয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুর হইতে বঙ্কিম আলিপুরে বদলি হন। কলিকাতার বাড়ী হইতেই তিনি আলিপুর যাতায়াত করিতেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন' প্রকাশিত হয়।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চাকুরী করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতাতেই অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার নিম্নলিখিত নূতন অথবা পরিবর্দ্ধিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।—

'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'		—১৮৯১
'বিবিধ প্রবন্ধ,'	দ্বিতীয় ভাগ	—১৮৯২
'কৃষ্ণচরিত্র,'	২য় সংস্করণ	—১৮৯২
'ইন্দিরা,'	৫ম সংস্করণ	—১৮৯৩
'রাধারাণী,'	৪র্থ সংস্করণ	—১৮৯৩
'রাজসিংহ,'	৪র্থ সংস্করণ	—১৮৯৩

তাঁহার 'সহজ রচনা শিক্ষা' ও 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা' এই কালেই প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি এনট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'Bengali Selections' প্রকাশ করেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের যে গ্রন্থাবলী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'লুপ্ত-রত্নোদ্ধার' নামে প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন,

এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সঞ্জীবনী-সুধা' নাম দিয়া সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সঙ্কলন সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী সহ প্রকাশ করেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রায় বাহাদুর ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে সি. আই. ই, উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে পরীক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে "শিক্ষার হের-ফের" শীর্ষক একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। উহা ১২৯৯ সালের পৌষ-সংখ্যা 'সাধনা'য় বাহির হয়। প্রবন্ধটি পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন। পত্রখানি অংশতঃ ঐ বৎসরের চৈত্র-সংখ্যা 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের টিপ্পনী সমেত প্রকাশিত হয়। সেই অংশ এই—

> বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুই বার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেক বার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"—কিন্তু কেন যে তাঁহার "ক্ষীণস্বর" কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হৌসের মহতী সভা "অসংখ্যবালক-বলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে" কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণ স্বর যদি বা কর্ণ ভেদ করিতে না পারে, তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।—পৃ. ৪৪০-৪১।

সেন্ট্রাল টেক্স্ট বুক কমিটির ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাব-কমিটিতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ আগষ্ট তারিখে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন' নামীয় সভার প্রতিষ্ঠাদিবসে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-শাখার স্থায়ী সভাপতি হন। এই সভার নাম পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তি—উক্ত সভার উদ্যোগে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত বৈদিক সাহিত্য-বিষয়ক ইংরেজীতে দুইটি বক্তৃতা; এই বক্তৃতা দুইটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে'র ঐ বৎসরের গোড়ার দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার বহুমূত্র রোগ অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পায়, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন; ২৩ দিন সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৫ই এপ্রিল হইতে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাক্‌রোধ হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল (২৬ চৈত্র ১৩০০) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) কৃষ্ণবাবু মুখাগ্নি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

বঙ্কিমের পুত্রসন্তান হয় নাই; তিনটি কন্যা জন্মিয়াছিল—শরৎকুমারী, নীলাজকুমারী ও উৎপলকুমারী। তাঁহারা কেহই এখন বর্ত্তমান নাই।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২০

মধুসূদন দত্ত

১৮২৪—১৮৭৩

মধুসূদন দত্ত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫০
পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৫২

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

যশোহর নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে কপোতাক্ষ-তীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। প্রচলিত জীবন-চরিতগুলির মতে মধুসূদনের জন্ম-তারিখ—১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার (২৫ জানুয়ারি ১৮২৪)।*

সাগরদাঁড়ী গ্রাম মধুসূদনের জন্মভূমি হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ খুলনা জিলার অন্তর্গত তালা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতামহ

---

* মধুসূদনের এই জন্ম-তারিখ তাঁহার কোষ্ঠী হইতে পাওয়া কি না, চরিতকারগণ উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু শুধু সন নয়, মাসের দিন ও বার বিনা প্রমাণে আসিতে পারে না, এই কারণে তারিখটি ঠিক বলিয়া মনে হয়। আমরা বয়স বলিবার সময় সচরাচর চলিত বৎসর বলিয়া থাকি, কদাচিৎ বলি—এত বর্ষ গত হইয়াছে। এইরূপে বয়স-গণনায় এক বৎসরের ভুল হইতে পারে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিশপস কলেজে প্রবেশকালে কবির বয়স "২১" বৎসর ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহার অর্থ ২০ গত, "২১" চলিতেছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লিখিত কবির একখানি পত্রে আছে :—"I...study English at the Hindoo College in Calcutta I am now in my eighteenth year,..." (যোগীন্দ্রনাথ বসু : 'জীবন-চরিত,' ৪র্থ সং, পৃ. ১১৪)। এখানেও ১৭ গত, "১৮" চলিতেছিল ধরিতে হইবে। কবির গুণমুগ্ধ বন্ধু ও ভক্তগণ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তাঁহার যে সমাধি-স্তম্ভ স্থাপন করেন, তাহাতে তাঁহার জন্ম-বৎসর "১৮২৩" খ্রীষ্টাব্দ উৎকীর্ণ আছে (নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধু-স্মৃতি' পুস্তকে সনটি ভ্রমক্রমে "১৮২৪" মুদ্রিত হইয়াছে)। এখানে সন ১২৩০ সালটি ধরা হইয়াছে, কিন্তু জন্ম-মাস ধরা হয় নাই। পৌষের মাঝামাঝি নূতন খ্রীষ্টাব্দ হয়।

রামনিধি দত্ত। রামনিধি সাগরদাঁড়ীতে মাতামহের নিকট আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চারি পুত্র, সকলেই বিদ্বান্, কৃতী ও উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ দত্ত মধুসূদনের পিতা।

পারস্য ভাষায় রাজনারায়ণের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; লোকে তাঁহাকে 'মুন্‌শী রাজনারায়ণ' বলিত। মধুসূদনের বয়স যখন ৭ বৎসর, তখন রাজনারায়ণ ওকালতী উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আগমন করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিরূপে পরিগণিত হন। তিনি কলিকাতার অন্তর্গত খিদিরপুরে বড় রাস্তার উপরে একটি দ্বিতল বাটী ক্রয় করিয়া তথাকার এক জন সম্ভ্রান্ত অধিবাসিরূপে গণ্য হন। তাঁহার চারি বিবাহ; মধুসূদনের জননী জাহ্নবী তাঁহার প্রথমা পত্নী। মধুসূদন পিতার একমাত্র জীবিত সন্তান ছিলেন।

মধুসূদনের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, "তিনি [রাজনারায়ণ] ব্যবহার-শাস্ত্রে এরূপ পারদর্শী ছিলেন যে, প্রথমে তাঁহাকে সরকারী উকীল নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যোগাড়-যন্ত্র করিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন" ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৩)। এই উক্তি ঠিক নহে। ১২ এপ্রিল ১৮৪৮ (১ বৈশাখ ১২৫৫) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত "সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ" মধ্যে দেখিতে পাই :—

> পৌষ [১২৫৪] :—সদর আদালতের জজেরা খাস আপীল ঘটিত মোকদ্দমায় উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম সবদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন। পরন্তু রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি কএকজনকে অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত করিলেন

রাজনারায়ণ পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। মধুসূদন প্রথমে সাগরদাঁড়ীতে মাতার নিকট থাকিয়া পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। তৎকালে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে পারস্য ভাষা শিক্ষা করার চলন ছিল, মধুসূদনও শৈশবে ফার্সী শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে খিদিরপুরে আনয়ন করিয়া কলিকাতার বিখ্যাত হিন্দুকলেজে ভর্তি করাইয়া দিলেন।

ছাত্র-জীবন

হিন্দুকলেজ

মধুসূদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ বৎসর বয়সে মধুসূদন হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। এই উক্তি ভিত্তিহীন। মধুসূদন ইহার অনেক আগেই হিন্দুকলেজে যোগদান করিয়াছিলেন।

সেকালের হিন্দুকলেজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—জুনিয়র স্কুল ও সিনিয়র স্কুল। এই দুই ভাগে সর্ব্বসমেত ১৩টি শ্রেণী ছিল;* জুনিয়র স্কুলে ১৩শ হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত আটটি (অর্থাৎ ৮ম হইতে ১ম জুনিয়র) শ্রেণী, এবং সিনিয়র স্কুলে ৫ম হইতে ১ম পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্রেণী ছিল।

* "হিন্দুকালেজের ছাত্ত্রেরদিগের পরীক্ষা।—২১ জানুয়ারি শনিবার পটলডাঙ্গার হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্ত্রেরদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল…।

…১৩ হইতে ১ কেলাস অর্থাৎ পংক্তিপর্য্যন্ত ছাত্ত্রেরা…"। ('সমাচার দর্পণ', ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭)। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সং), পৃ. ৩২।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের রিপোর্টেও (পৃ. ৪) প্রকাশ, হিন্দুকলেজের কলেজ-বিভাগে ১ম হইতে ৫ম শ্রেণী, এবং লোয়ার স্কুলে ১ম, ২য় ও ছয়টি নিম্ন শ্রেণী ছিল।

জুনিয়র স্কুলে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রেরা ইংরেজী ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পর তবে ৭ম জুনিয়র (অর্থাৎ ১২শ) শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত। ৮ বৎসরের কম ও ১২ বৎসরের অধিকবয়স্ক ছাত্রকে জুনিয়র স্কুলে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত না।*

মধুসূদন কোন্ সালে হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে অর্থাৎ ৮ম জুনিয়র, বা সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া ১৩শ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তাহা দেখা যাক। তিনি যে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জুনিয়র স্কুলে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী বা ৮ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তাহা নিঃসন্দেহ; কারণ, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুকলেজের ৭ম শ্রেণীতে (সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া সপ্তম শ্রেণী, অর্থাৎ জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ২য় শ্রেণীতে) প্রবেশ করেন ও মধুসূদনকে সাহাধ্যায়িরূপে পান।† গৌরদাস বসাকও লিখিয়াছেন

---

* "The college is divided into a junior and senior school. In the former, boys not less tan eight, and not more than twelve, are admitted. In the latter, none are admitted above twelve, unless qualified to enter one of the senior classes. The utmost limit of admission is fourteen. The students begin in the junior school with the rudiments of English, and rise to the 7th class, by which time they have acquired a tolerable command of the English language, have mastered its grammar, have advanced in arithmetic to vulgar fractions, and have some acquaintance with the elements of geography...*Calcutta Cour.* May 16."—*Asiatic Journal*, Nov. 1832, Asiatic Intelligence, p. 115.

† ভূদেব ১৪ বৎসর বয়সে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—"মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত।"—'ভূদেব-চরিত', ২য় ভাগ, পৃ. ৪৫-৪৬।

যে, তিনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণী বা জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম শ্রেণীতে সহাধ্যায়িরূপে মধুসূদনের সহিত পরিচিত হন।* তাহা হইলে মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বনিম্ন বা ৮ম জুনিয়র শ্রেণীতে (অর্থাৎ উপর হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া ১৩শ শ্রেণীতে) প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি যে জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের সকল শ্রেণীতেই পাঠ লইয়াছিলেন, তাহাও নিশ্চিত; কারণ, আমরা তাঁহাকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ টাউন হলে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী সভায় শেক্সপীয়র হইতে আবৃত্তি করিতে দেখি।† আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মধুসূদন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেবের সহিত ২য় জুনিয়র শ্রেণীতে পড়িতেছেন, সুতরাং ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৭ম জুনিয়র শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। স্কুল-কলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আবৃত্তি ব্যাপারে সচরাচর সুপরিচিত পুরাতন ছাত্রদেরই নির্ব্বাচিত করা হয়। এই কারণে মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বনিম্ন বা ৮ম জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন—এরূপ মনে করাই সঙ্গত। আরও একটি কথা, ৭ম

---

* "My acquaintance with Modhu began in 1840, when we were in the 6th Class" ("1st class, Junior Department) of the old Hindu College."—Reminiscences of Michael M. S. Datta.

† "পুরস্কার বিতরণ।—গত শুক্রবার [৭ মার্চ ১৮৩৪] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল।...

ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল।...

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্লাষ্টর।

ষষ্ঠ হেনরি।	...	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।
গ্লাষ্টর।	...	মধুসূদন দত্ত।

—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড (২য় সং), পৃ. ১৯-২০

জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জুনিয়র স্কুলের ছাত্রদিগকে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে পাঠ লইতে হইত।

মধুসূদন হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে কোন্ বৎসর কোন্ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার সুবিধার জন্য একটি হিসাব দিতেছি :—

	সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম শ্রেণী হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া জুনিয়র শ্রেণীর সংখ্যা	নিম্নতম শ্রেণী হইতে উপর দিকে গণনা করিয়া জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের শ্রেণীর সংখ্যা
ইং ১৮৩৩	১৩শ	সর্ব্বনিম্ন বা ৮ম
১৮৩৪	১২শ	৭ম
১৮৩৫	১১শ	৬ষ্ঠ
১৮৩৬	১০ম	৫ম
১৮৩৭	৯ম	৪র্থ
১৮৩৮	৮ম	৩য়
১৮৩৯	* ৭ম	২য়…ভূদেব সহাধ্যায়ী
১৮৪০	৬ষ্ঠ	১ম…গৌরদাস সহাধ্যায়ী

* জুনিয়র স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মধুসূদন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ৫ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই বৎসর সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়; সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়র বৃত্তি, এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিত। মধুসূদন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই পরীক্ষার ফল ৭ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Hindoo College.—The annual distribution of scholarships and prizes to the students of the Hindoo College took place yesterday at 10 a m. at the Town Hall,...

Students who obtained Junior Scholarships.

Jugdishnath Roy,...Junior Scholarship.	
Bhoodeb Mookerjee,...	Do.
Rajunderneuth Mittre,	Do.
Obotarchunder Gangooly,...	Do.
Bonnomally Mittre,...	Do.
Muddoosoodun Dutt,...	Do.
Shamachurn Law,...	Do.

(Cited by the *Friend of India* for Jan. 13. 1842, p. 23).

বৃত্তি-পরীক্ষার ফলে মধুসূদন আট টাকা জুনিয়র-বৃত্তি লাভ করেন। মধুসূদন এবং তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ভূদেব ও শ্যামাচরণ বৃত্তি লাভ করিয়া ৫ম শ্রেণী হইতে পর-বৎসর (ইং ১৮৪২) একেবারে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হন; কিন্তু এ বৎসর তিনি জুনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার স্থলে ৩য় শ্রেণী হইতে অভয়চরণ বসু বৃত্তি পান।* দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাজনারায়ণ বসু মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় রামগোপাল ঘোষ, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে-দুই জন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, গুণানুসারে তাহাদের দুইটি পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধুসূদন এই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক, এবং ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন। রচনাগুলির পরীক্ষক ছিলেন—ইণ্ডিয়ান ল কমিশনের সভাপতি ও সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য সি. এইচ. ক্যামেরন্। মধুসূদনের এক জন চরিতকার লিখিয়াছেন,

* *General Report on Public Instruction*....for 1842-43. Appendix C, p. xvi.

"প্রথম শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, তিনি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন।" ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ১৩) প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই।*

মধুসূদন হিন্দুকলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীতে তাঁহার রীতিমত অধিকার জন্মিয়াছিল। ছাত্রজীবনে—বিশেষতঃ সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টে পঠদ্দশায় তিনি বহু ইংরেজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; ইহার কিছু কিছু 'জ্ঞানান্বেষণ' (ইংরেজী-বাংলা), *Literary Gazette*, *Literary Gleaner* প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল কবিতার অনেকগুলি তাঁহার জীবন-চরিতগুলিতে মুদ্রিত হইয়াছে। মধুসূদন বিলাতে *Bentley's Misscellany* ও *Blackwood's Magazine* প্রভৃতি পত্রেও কবিতা পাঠাইতেন। তিনি ইংরেজী কবিতা রচনায় ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের নিকট বিলক্ষণ উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। মহাকবি হইবার ও বিলাত যাইবার ইচ্ছা হিন্দুকলেজে পঠদ্দশায় তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এই সময় তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন:—"Oh! how should

* "It is right here also to mention, that a Native Gentleman having offered a Gold Medal for the best, and Silver Medal for the second best Essay on Native Female Education, considered especially with reference to its effect on children of the next generation. Mr. Cameron, the Examiner, awarded the prizes thus—the 1st to Modoosoodun Dutt, and No. 2 to Bhoodeb Mookerjee of the 2d class. The first class were unwilling to compete for these honors.—"Hindoo College Annual Report for 1842" dated "31st December, 1842." *Ibid.*, App. K, p. lxxiv.

মধুসূদনের পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাটি উল্লিখিত শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে (Appendix K, pp. xcv-xcvi) মুদ্রিত হইয়াছে।

I like to see you write my 'Life', if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be, if I can go to England."

"ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙ্গালাভাষার কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই। বাঙ্গালাভাষা অশিক্ষিতের ও বর্ব্বরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল, হিন্দু কলেজের অন্য অনেক ছাত্রের ন্যায় তাঁহারও এই সংস্কার ছিল। একবার মাত্র তাঁহার প্রিয়সুহৃদ্ গৌরদাস বাবুর অনুরোধে বর্ষাঋতু বর্ণনাচ্ছলে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে acrostic বলে, কবিতাটি সেই শ্রেণীর। ইহাতে যে কয়টি পংক্তি আছে, তাহার প্রথম বর্ণগুলি একত্র করিলে "গউর দাস বসাক" এইরূপ হইবে।...

বর্ষাকাল।

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
সাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়।"

—'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত,' ৪র্থ সং, পৃ. ১০০-১০১।

মধুসূদন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজে পড়িয়া হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করেন। তাহার পর যে ব্যাপার ঘটে, তাহাতে মধুসূদনের হিন্দুকলেজে পড়িবার আর অধিকার রহিল না।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ

মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ২য় শ্রেণীর ছাত্র (ইং ১৮৪২), সেই সময় তাঁহার পিতামাতা এক ভূম্যধিকারীর পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবাহে মধুসূদনের মত ছিল না। ২৭ নবেম্বর বন্ধু গৌরদাসকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে দেখিতে পাই :—

> ...You don't know the weight of my afflictions I wish (oh! I really wish) that somebody would hang me! At the expiration of three months from hence I am to be married;—dreadful thoughts! It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine! My betrothed is the daughter of a rich zemindar;—poor girl! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity! You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more,—I must either be in E—d or cease "to be" at all;—*one of these must be done!*

মধুসূদন বিবাহ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি শেষে খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। খ্রীষ্টান হইলে বিবাহের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে, বিলাত গমনেরও সুবিধা হইতে পারে। তৎকালে কালাপানি উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুর জাতিনাশ হইত, কিন্তু খ্রীষ্টান হইলে মধুসূদনের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পাদরি কৃষ্ণমোহনের লিখিত একখানি পত্রে আমরা দেখিতে পাই :—

> I was then living in Cornwallis Square as minister of Christ Church, He called one day and introduced himself to me as a religious inquirer *almost persuaded to be a Christian.* After two

or three interviews and a great deal of conversation. I was impressed with the belief that his desire of becoming a Christian was scarcely greater than his desire of a voyage to England. I was unwilling to mix up the two questions, and while I conversed with him on the first, I candidly told him that I could lend him no help as regarded the second question. He seemed somewhat disheartened and came to me less frequently after that.... One day I incidentally mentioned to a friend of mine, high in office, the curious case of a student of the Hindu College wishing at the same time to be a Christian and to go to England. My friend felt very much interested in the case and expressed a desire of seeing the enterprising youth. I mentioned the fact to Dutta, when I saw him next and at his own desire I gave him a note of introduction to the gentleman I have referred to. That gentleman received him very cordially and gave him every encouragement in his views, and even introduced him to Mr. Bird, then Deputy Governor of Bengal.—K. L. Haldar; "Michael Madhu Sudan Dutt."—*National Magazine*, Jany. 1892, p. 35.

ইহার পর হঠাৎ এক দিন মধুসূদন নিরুদ্দেশ হইলেন, কোথাও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। রব উঠিল, মধুসূদন খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন। ক্রমে জানা গেল, পাছে তাঁহার প্রতি বল প্রয়োগ হয়, এই ভয়ে লাট-পাদরির সাহায্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন, শীঘ্রই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া সহপাঠী গৌরদাস বসাক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মিশন রো-স্থিত ওল্ড মিশন চার্চ নামক ধর্ম্মমন্দিরে আর্চডিকন ডেয়াল্‌ট্রি (Dealtry) "মাইকেল" নাম দিয়া মধুসূদনকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অনুষ্ঠানে

বাধাবিপত্তির আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপক্ষ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে "নির্ব্বাচিত সাক্ষী" ("Chosen Witness") ছিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি; তাঁহার পুত্রের খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণে শহরময় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রের স্তম্ভে বাহির হইল :—

THE CONVERSION AND BAPTISM OF A HINDOO YOUTH.

A student of the Hindoo College, (2d class, senior department.) named Modoosoodun Dutt, had for some time past determined to renounce the religion of his fathers and to embrace Christianity. It is very singular, that before he had actually made up his mind to take this step, he had received no clerical instruction whatever,—having been in the habit of reading books and tracts by himself. A few weeks ago, he presented himself before a clergyman, in Calcutta, as a catechuman, and stated his willingness to embrace *the religion which reasan, conscience, experiencc, all conspired to tell him was the true one.* He was shortly after introduced to the Archdeacon, who was highly satisfied with the proofs he exhibited in himself of a sound faith and a well-grounded conviction. His relations having been men of wealth and respectability, he was subjected to a great deal of annoyance and trouble. He withstood their opposition with great firmness and continued unshaken in his determinations. A thousand rupees in Government security were sent to him, with a request, that he should immediately take his passage to England and get baptized there,—that no obloquy might be cast upon his family by his embracing Christianity on the spot. He refused to accept of the gift upon such conditions, and was baptized in the Old Church last Thursday, by the Venerable Archdeacon Dealtry. He had been accustomed to write poetry in the Hindoo College, and several of his productions were printed in the *Literarp Gasette* and other periodicals. He composed a hymn on the occasion of his baptism, of which the following is a copy :—

HYMN—BY M. S. DUTT.
[A Hindoo Youth.]

I.

Long sunk in Superstition's night,
By Sin and Satan driven,—
I saw not,—cared not for the light,
That leads the Blind to Heaven ;

II.

I sat in darkness,—Reason's eye
Was shut,—was closed in me ;—
I hastened to Eternity
O'er Error's dreadful Sea !

III.

But now, at length thy grace, O Lord !
Bids all around me shine :
I drink thy sweet,—thy precious word,—
I kneel before thy shrine !

IV.

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake ;—
All, all I love beneath the skies
Lord ! I for Thee forsake !

9th February, 1843. (Cited by the *Friend of India* for 16 Feby, 1843.)

বিশপ্‌স কলেজ

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অচিরেই মধুসূদনের বিলাত গমনের সুবিধা হইল না। তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন :—

...I won't go to England till December next. I am now about to come and live with or rather near to my father ; I am not going to England with Mr. Dealtry ; my father won't allow that...

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও মধুসূদন পিতা-মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন, ইহাই তাঁহার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই কারণে মধুসূদন শিবপুরে বিশপ্‌স কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন; হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান ছাত্রের স্থান ছিল না। রাজনারায়ণ পুত্রের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

মধুসূদনের চরিতকারেরা মধুসূদনের বিশপ্‌স কলেজে প্রবেশের সঠিক তারিখ দিতে পারেন নাই। মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বিশপ্‌স কলেজে প্রবেশ করেন নাই,—করিয়াছিলেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে। পাদরি লং তাঁহার ***Hand-Book of Bengal Missions etc.***, (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়—খুব সম্ভব বিশপ্‌স কলেজ রেজিস্টার হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

List of the Students connected with Bishop's College in 1846.

Name	Date of Admission	Age yrs. ms.	On what Endowment.
*	*	*	*
Mudhu Suden Dut	Novr. 1844	21	Lay Student.

কিন্তু বেশী দিন মধুসূদনের বিশপ্‌স কলেজে থাকিয়া পড়াশুনা করা সম্ভব হইল না। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কোন কারণে রাজনারায়ণ পুত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার অর্থসাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। বিশপ্‌স কলেজে তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তাহাদের মুখে মাদ্রাজের কথা শুনিয়া, ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এক দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অকস্মাৎ কয়েক জন মাদ্রাজী সহাধ্যায়ীর সহিত মধুসূদন মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন।

মধুসূদন তিন বৎসর বিশপ্‌স কলেজে ছিলেন। এখানে তিনি গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি পরবর্তী কালে একখানি পত্রে বিশপ্‌স কলেজে মধুসূদনের ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

I do not remember the exact date of his entry into Bishop's College. I fancy it was in the course of the year 1848...He entered as a 'lay-student' and the college charges were paid by his father, about Rs. 60/- per month.

Symptoms of Datta's poetical talent had appeared while he was a student of the Hindoo College. He was fond of writing English verses and at his baptism was sung by the congregation to the music of the Church organ an English hymn composed by himself for the occasion. But he never wrote anything at that time in Bengali which he affected to hold in utter contempt as a 'patois'. He was a person of great intellectual power,—somewhat flighty in his imagination, strong in his opinions and sentiments, of an independent mind and very tenacious of personal rights. This brought him into a momentary collision with the authorities of Bishop's College about his 'dress'.

The ecclesiastical authorities had an idea at the time that natives of India should not be encouraged to imitate the English dress—the tail coat and the beaver hat. It would have been infinitely better if they had not interfered with questions beyond their province—for it was this interference which goaded a fiery spirit like Datta's into an obstinate resistance. The collegiate costume was a black cassock and band and the square cap. There was nothing in these things that was peculiarly English. The authorities wished him to put on a white cassock instead of black. Datta said '*either the collegiate costume or his own national dress.*' The former not being allowed Datta appeared in the latter—which was a white silk kaba with a coloured turban like the pleader's headpiece and shawl roomal worked all over. This looked too much like a fancy dress to be held as suitable for a student of Bishrp's College. I did not 'intervene'

as you had heard I had no right to do so, but the senior Professor consulted me on the subject saying *his dress had more colours than the rainbow.* I cannot say that they were going to strike his name off the rolls—the authorities were certainly annoyed. The upshot of the thing was that Datta was allowed to wear the usual college costume which he adopted for use in college, and took to the English coat and beaver hat as his habit in society out of college.

He left college, I believe, on his father discontinuing the payment of callege charges. A great many students of Bishop's College were of the Presidency of Madras, and having contracted cordial friendship with some of them, Datta was induced to go with them to Madras as an adventurer.—K. L. Haldar: "Michael Madhu Sudan Dutt." *National Magasine*, Jany. 1892, pp. 85-86.

মাদ্রাজ-প্রবাস

বিবাহ

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মধুসূদন মাদ্রাজ আসিয়া উপস্থিত হন। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য প্রথমে তাঁহাকে ব্ল্যাকটাউনে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ মেল অর্ফান অ্যাসাইলামে ইংরেজী শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল (ইং ১৮৪৮)। এই বিদ্যালয়ের সহিত একটি বালিকা-বিভাগও সংশ্লিষ্ট ছিল। বালিকা-বিভাগে রেবেকা ম্যাক্টাভিস নামে এক নীলকর-কন্যা অধ্যয়ন করিতেন। মধুসূদন এই কুমারীর রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ও চাকুরীর কথা মধুসূদন গৌরদাসকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

...When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that *you alone* did not receive a valedictory visit from me. I never communicated my intentions to more that 2 or 3 persons. Since my arrival

here, I have had much to do in the way of procuring a standing place for myself,—no easy matter, I assure you,—especially, for a friendless stranger. However, thank God, my trials are, in a certain measure, at an end, and I now begin to look about me very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale! —Here's a simile for you, my boy!

Your information with regard to my matrimonial doings is quite correct. Mrs. D. is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this Presidency; I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against the match. However, "all is well, that ends well!"—Madras Male Orphan Asylum, Black Town, 14th February, 1849.

...As for me, I am a poor 'usher' in a poor school—viz, "the Madras Male Asylum for the children of Europeans and their descendants"!—all my pupils are Europeans and East Indians. I dress like them, both on account of my good lady, and the situation I hold. Did you ever see me in my European clothes? I make a passable "Tash Feringee."—Madras, 19th March 1849.

সংবাদপত্র-পরিচালন

মান্দ্রাজ-প্রবাসের অধিকাংশ কাল মধুসূদন তিনখানি স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই তিনখানি সংবাদপত্র—*Madras Circulator and General Chronicle, Athenaeum* ও *Spectator.** তিনি প্রধান সম্পাদক-রূপে *Athenaeum* পত্র কিছু দিন কৃতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন।

---

* ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাহার শেষাংশ এইরূপ:—

"P. S. I am at present Sub-editor of the 'Spectator', the only daily in this town."

এই সংবাদপত্রগুলি ছাড়া মধুসূদন মাদ্রাজে *Hindu Chronicle* নামে একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে *Hindu Chronicle* প্রথম প্রকাশিত হয়। মধুসূদনকে লিখিত বন্ধু গৌরদাস বসাকের দুইখানি পত্রে প্রকাশ :—

My attention was drawn by the 'Hurkaru' to an extract made from a paper named 'Hindu Chronicle' which, it was said, is edited by you. I was delighted to see that you have betaken yourself to the resources of "the Fourth Estate" by a very fair way to make yourself rich and reputed.—29 July 1851.

...It is with great sorrow I learnt from a newspaper that you have retired from the Editor's chair...20 April 1852

মধুসূদনের অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা এই সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়; এগুলির কোন কোনটি কলিকাতার 'হরকরা' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে *Madras Circulator* পত্রে মধুসূদনের 'A Vision' ও ইহার অব্যবহিত পরেই 'Captive Ladie' কাব্য এবং অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতায় তাঁহার নিজ নাম থাকিত না, Timothy Penpoem, Esq. এই ছদ্মনাম ব্যবহৃত হইত। এই সকল কাব্য ও খণ্ডকাব্যের কিছু কিছু 'মধু-স্মৃতি' পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

'মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি'র হাই-স্কুল ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক

মাদ্রাজে মধুসূদন অ্যাডভোকেট-জেনারেল জর্জ নর্টনকে পৃষ্ঠপোষক-রূপে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত ছিলেন। ৬ জুলাই ১৮৪৯ তারিখে গৌরদাসকে লিখিত মধুসূদনের একখানি পত্র হইতে ইহা আমরা জানিতে পারি। মধুসূদন লিখিয়াছিলেন :—

...You will, I am sure, be surprised—agreeably surprised to hear that, a short time ago, I was sent for by the Advocate General, Mr. Norton. The old man received me as kindly as I could expect, and after making enquiries about my prospects and so forth, told me that he was going to procure for me Government employ of an infinitely more respectable and lucrative kind than my present place. It seems, they are going to establish Provincial College, like our Dacca, Benares, Hooghly affairs etc. I have the promise of a Head-mastership or an Inspectorship. Mr. Norton said that he was happy to see me in Madras, because (I give you his own words) had I been in Calcutta, the many accomplished individuals who are to be found there, would have kept me at bay—if not altogether,—at least for some time, whereas there is not the least fear of that here. We correspond like friends, and he has given me a most valuable number of classical works, as a "token of his regard." He has moreover, introduced me to E. B. Powell, Esqr,—the head-master of the University here.

জর্জ্জ নর্টন ও পাওয়েলের সুপারিশে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন "মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি"র হাই-স্কুল ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ লাভ করেন। মাদ্রাজ ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (জানুয়ারি ১৮৫৬) তিনি এই সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে "মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি" নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হয়।

প্রথম পুস্তক প্রকাশ

সংবাদপত্রে ইংরেজী কবিতা প্রকাশ করিয়া মাদ্রাজে মধুসূদন কবি হিসাবে যশোলাভ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালেই তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা *Captive Ladie*; ইহার সহিত Visions of the Past সংযুক্ত হইয়াছিল। ইহার প্রকাশকাল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। জর্জ্জ নর্টন তৎকালে মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট-জেনারেল, "মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি"র সভাপতি ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা

ছিলেন। মধুসূদন পুস্তকের প্রথম সর্গ ও দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া পুস্তকখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি ভিক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯ মার্চ ১৮৪৯ তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে লিখিতেছেন :—

...You have no idea what a kind and flattering reply I got from him. He says he will consider it an honour to have a work "exhibiting such great powers and promise" dedicated to him. I have great hopes from his patronage.

'ক্যাপটিভ লেডী' মধুসূদনকে মাদ্রাজের কৃতবিদ্য-সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার সংবাদপত্র-মহলে ইহা তেমন আদৃত হয় নাই।

গৌরদাসের অনুরোধে এবং তাঁহারই সাহায্যে মধুসূদন এক খণ্ড 'ক্যাপটিভ লেডী' কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি, স্বনামধন্য ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনকে উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। পুস্তকখানি পাইয়া বীটন উত্তরে গৌরদাসকে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

I beg that you will convey my thanks to your friends for the gift of his poem. It seems an ungracious return for his offering that I should take this opportunity through you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is, that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry. As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.

By all that I can learn of your vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and indecency. An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He might even do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed. (20 July 1849.)—যোগীন্দ্রনাথ বসু : 'জীবন-চরিত,' ৪র্থ সং, পৃ. ১৫৯-৬০।

ইতিপূর্ব্বে গৌরদাস মাতৃভাষা চর্চ্চা করিবার জন্য মধুসূদনকে একাধিক বার পত্রে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন সে অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই। এক্ষণে বীটনকে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে দেখিয়া উল্লসিতমনে গৌরদাস মধুসূদনকে লিখিলেন :—

His advice is the best you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into your ears all my life. The taste and talents you have cultivated would rebound much to the honor and advantage of your country, if you will employ them in improving the standard and adding to the stock of your own language, if poetry at all events you must write. We do not want another Byron or another Shelley in English; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali literature.

বীটনের পত্রে মধুসূদনের মনের গতি ফিরিল। তিনি অতঃপর মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন। গৌরদাসকে লিখিত তাঁহার ১৮ আগস্ট ১৮৪৯ তারিখের একখানি পত্রে প্রকাশ :—

...Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?

পিতৃবিয়োগ

মধুসূদন যখন মাদ্রাজ-প্রবাসে, সেই সময় তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। মাদ্রাজ-গমনের তিন বৎসর পরে তিনি মাতাকে হারাইয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মধুসূদন যখন কার্য্যসূত্রে কয়েক দিনের জন্ত গোপনে কলিকাতায় আসেন, তাঁহার পিতা তখনও জীবিত; তিনি সে বার পিতা ছাড়া আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই মাদ্রাজ ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ১৬ জানুয়ারি ১৮৫৫ তারিখে রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যু হয়। এ সংবাদ কেহই মধুসূদনকে জানায় নাই; সকলেরই ধারণা ছিল, মধুসূদন আর ইহলোকে নাই; এমন কি, বন্ধু গৌরদাসও বহু দিন মধুসূদনের কোন সংবাদ পান নাই। মধুসূদনের আত্মীয়েরা তাঁহার পিতৃসম্পত্তি গ্রাস করিতে উদ্যত দেখিয়া গৌরদাস চিন্তিত হইলেন; কি করিয়া সকল কথা বন্ধুকে জ্ঞাপন করা যায়, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। শীঘ্রই সুযোগ মিলিয়া গেল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজ-ভ্রমণে যাইতেছিলেন। গৌরদাস তাঁহাকে সকল কথা জানাইয়া তাঁহার হাতে মধুসূদনের নামে একখানি পত্র দিলেন, এবং মাদ্রাজের যেখানেই থাকুন, সন্ধান করিয়া মধুসূদনকে সত্বর ফিরাইয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন। গৌরদাসের পত্রখানির তারিখ—১ ডিসেম্বর ১৮৫৫। এই পত্রে তিনি মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন :—

I regret I have little good news to give you of your family or rather your father's family. You must have heard ere long that both your parents are dead, and that your cousins are fighting over the property left intestate by them. Two widows survive your father, but they are very near being deprived of their late husband's effects by your greedy and selfish relatives. If you come in time you will yet save it

from a ruinous litigation and receive unreserved possession of your own Estate to the utter dismay and disappointment of all illegal claimants,...

পাদরি কৃষ্ণমোহনের হস্তে গৌরদাসের পত্র পাইয়া মধুসূদন পিতার মৃত্যুর কথা প্রথমে জানিতে পারিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া বন্ধুকে লিখিলেন :—

Madras, Spectator Press,
20th Decr. 1855.

My Dearest Friend,

Your welcome, though unexpected, letter was put into my hands by Mr. Banerjee, yesterday. It absolutely startled me. I knew that my poor mother was no more, but I never thought that I was an orphan in every sense of that word! My dearest Gour, what am I to do? You talk of my property—what has he left behind? Can you give me an idea of the estate? You know how expensive it is to go to Bengal—at least—for a poor devil like myself. But if you encourage me to hope that my father has left sufficient property to warrant my launching out a little cash for the recovery thereof, of course I am ready to weigh anchor, at once, for a voyage to old Calcutta.

Ah! those relatives of mine, Great God! But for you, my noble-hearted friend, I would not have heard a word, about my father's death, for months, perhaps, years. O dearest Gour, when and where did he die? I feel distracted. Give me all the particulars.

If I can so manage, I shall leave this by the next steamer (27th); but I am very poor just now, my Brother. I have not thriven so well in the world as I had expected. But of all that hereafter. Write to me by return of post.

Of course, I am aware that my late father had landed property in Jessore. That I am sure of getting out of the clutches of those biped vultures—what a stupid fellow I am! all vultures are bipeds! Well, but you know what I mean.

Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children. What do you mean by saying that your wife is in heaven? What—a widower a second time?

I conclude in haste, though not before I assure you that I am most affectionately your old friend.

Unchanged and unchangeable

M. S. Dutt.

P. S. I am at present Sub-editor of the "Spectator," the only daily in this town.

এই পত্র পাইয়া উত্তরে গৌরদাস ৫ জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে মধুসূদনকে লেখেন :—

I really wonder your friends and relatives did not keep you informed of the melancholy events that lately occurred in your family ;...

Your worthy father died on the 4th Magh 1261 B. S, (16 January 1855) nearly a twelve months ago. His last acts prove that he was not in his perfect senses towards the close of his life. He married two wives successively while your mother was alive, and thus plunged two young and innocent girls into miseries of widowhood and want. I cannot give you an accurate idea of his property. You know best what his estate in Jessore is valued at. His personal property cannot amount too much; but his Kidderpore house is said to be worth 4000 Rs. Sufficient no doubt has been left to enable you to defray the expenses of a voyage to and back from Calcutta, I am anxious to see you here because your presence will not only put an end to the litigation pending over the property but scare away the illegal claimants whose sole intention seems to be to profit by the unprotected effects of the intestate deceased. The widows will also benefit, for they will then be sure of a protector and provision....

P— and B— were at loggerheads about your house and fabricated a will which they dared not produce, before me....

গৌরদাসের পত্রে বাড়ীর সকল সংবাদ পাইয়া মধুসূদন কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা গমনের অয়োজন করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধু-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

> ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে—মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাসের শেষ বৎসরে, তাঁহার পারিবারিক অশান্তি ঘটিয়াছিল। পত্নী রেবেকা এবং দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যাকে লইয়া মধুসূদন এতদিন সুখে-দুঃখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কিন্তু এই বৎসরে রেবেকার সহিত তাঁহার পত্নীসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার অল্পদিন পরেই মধুসূদন এমিলিয়া হেন্‌রিএটা সোফিয়া নাম্নী কোন ফরাসী যুবতীকে পত্নীত্বে বরণ করেন। শুনা যায়, এই যুবতীর পিতা মাদ্রাজ মহা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বা অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। (পৃ. ৯১-৯২)

যাঁহাকে আমরা মধুসূদনের পত্নী বলিয়া জানি, তিনিই এই হেন্‌রিএটা। হেন্‌রিএটার সহিত মধুসূদনের বিবাহ যে ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখের পূর্ব্বে হয় নাই, তাহা নিশ্চিত; কারণ, ঐ তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে লিখিতেছেন,—"I have a fine English wife and four children." এখানে মধুসূদন রেবেকার কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং ২১ ডিসেম্বর ১৮৫৫ হইতে পরবর্ত্তী জানুয়ারি মাসের শেষ ভাগের মধ্যে কোন সময় মধুসূদন হেন্‌রিএটাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ও নূতন বিবাহ কেমন করিয়া সম্ভব হইল, ঠিক বুঝা যায় না।* জানুয়ারি মাসের শেষ

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত, গৌরদাস বসাককে লিখিত (২৪-১১-৮৯) রাজনারায়ণ বসুর একখানি পত্র এ-বিষয়ে আলোকপাত করে। রাজনারায়ণ লিখিতেছেন :—

"The Madras secret, I believe, is that Modhu eloped with the lady with whom he lived as wife but this myself and my son knew before I corresponded with you about Modhu's life, *You did not tell me anything about it.*"

এই সময়ে কুচবিহারে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে একজন উপযুক্ত লোকের জন্য সংবাদপত্রে

ভাগে হেনরিএটাকে সঙ্গে লইয়া মধুসূদন 'বেণ্টিক' নামক জাহাজে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা প্রত্যাগমন ও পুলিস কোর্টে চাকুরী

২রা ফেব্রুয়ারি (ইং ১৮৫৬) তারিখে প্রাতঃকালে মধুসূদন রিক্তহস্তে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। গৌরদাসকে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া তিনি সেই দিনই বিশপ্‌স কলেজ হইতে পত্র লিখিলেন। বহু দিন পরে প্রিয় বন্ধুকে ফিরিয়া পাইয়া গৌরদাসের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি একদিন বন্ধুর জন্য একটি সান্ধ্য ভোজের অনুষ্ঠান করিলেন। এই প্রীতিভোজে মধুসূদনের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কিশোরীচাঁদ মিত্র ও দিগম্বর মিত্র উপস্থিত ছিলেন। মধুসূদন যাহাতে কলিকাতায় স্থায়ী হন, তাহার জন্য তাঁহার হিতৈষিগণ বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। শীঘ্রই একটি সুযোগ মিলিয়া গেল। কিশোরীচাঁদ মিত্র তখন কলিকাতার জুনিয়র পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট; মধুসূদন তাঁহার অফিসের কেরাণীর

বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। মধুসূদন এই পদপ্রার্থী হইয়া কুচবিহারাধিপতি নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ:—

Calcutta Police. 27th January 1860,

My dear Raja Sahib,—I see an advertizement in the 'Englishman' in which your Highness wants a magistrate. Allow me to offer my services to you. Your Highness knows that I have been for several years connected with Calcutta Police and understand criminal matters pretty well...Your Highness must know that I shall have to sacrifice my prospects here if I go up to your country, and the offer must be tempting enough to induce me to do so, I shall undertake to give you such a Police-Establishment throughout your Principality in one year, that your Highness will win the praise of the British Government...('উৎসাহ' ৪র্থ বর্ষ, ১৩০৭-৮)

পদ লাভ করিলেন। ৪ আগস্ট ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুস্থদন দত্ত পুলিসের কনিষ্ঠ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায় কিশোরীচাঁদ মিত্রের জুডিসিয়ল ক্লার্কের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

কিশোরীচাঁদ আরও একটি বিষয়ে মধুস্থদনকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মধুস্থদন যাহাতে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

পুলিস কোর্টের কেরাণীর পদে মধুস্থদনকে বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। ভোলানাথ চন্দ্রের স্মৃতিকথায় প্রকাশ, পুলিস কোর্টের ইণ্টারপ্রিটার টাকার্ সাহেব ছোট আদালতে চাকরি লইলে কিশোরীচাঁদের চেষ্টায় সেই পদে মধুস্থদন নিযুক্ত হন; এই দোভাষীর পদের বেতন ছিল ১২০৲ টাকা। তাঁহার সমসাময়িক পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট—রে (Wray), ফেগান (Fagan) প্রভৃতি তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। কর্ম্মসূত্রে মধুস্থদনকে মধ্যে মধ্যে স্থপ্রীম কোর্টেও উপস্থিত হইতে হইত। এই সময়ে তাঁহার আইন-অধ্যয়নের স্পৃহা জাগরিত হয়। "তাঁহার সংস্কৃত-পণ্ডিত ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন বলিতেন যে, ফৌজদারী আইনে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। সাক্ষীদিগের জেরা করিবার সময়ে তিনি তাঁহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেন।" ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১০২)

পুলিস কোর্টে কার্য্যকালে মধুস্থদন সদর আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। গৌরদাসকে লিখিত দুইখানি এবং রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে আমরা দেখিতে পাই, মধুস্থদন লিখিতেছেন :—

> ...I am dreadfully busy, reading up for the Law Examination that is coming. (9 Jany. 1859)
>
> ...There is to be no Sudder Examination this year, and I am undecided as to what I should do. (19 March 1859)
>
> ...I am studying Law for the Sudder. (24 April 1860)

"পুলিশ কোর্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পরে, মধুসূদন, কিশোরীচাঁদের ১ নং দমদম রোডের উদ্যান-বাটিকায় তাঁহার সহিত কিছু দিন একত্র অবস্থান করেন। একত্রে অবস্থানকালে, অবকাশ পাইলেই উভয়ের মধ্যে নানাবিধ আলোচনা হইত।" কিশোরীচাঁদের রোজ-নাম্‌চায় একদিনের কথা এইরূপ লিখিত আছে :—

20th July, 1856—Mr. M. S. Dutt gave me the following song.—

When I was a young and gay recruit
Just landed at Madaras
I thought to lead a sober life
With a superfine black shining lass.

I roved about from place to place
Until I found my Mathonia
Oh! What a charming girl she was
With her "Thana-na-nia,"

"কিশোরীচাঁদের এই উদ্যান-বাটিকা সাহিত্য-চর্চ্চার এবং সুহৃৎ-সম্মিলনের প্রীতি-নিকুঞ্জ-স্বরূপ একটি কেন্দ্র ছিল। এই বিবিধ তরুলতারাজি-সুশোভিত উদ্যান-বাটিকায় বাঁধাঘাট-সুশোভিত একটি সরোবর ছিল। এই সুশীতল, বাপী-তটবর্ত্তী রমণীয় মণ্ডপে সায়াহ্নে সুহৃৎমণ্ডলী সমবেত হইয়া, সাহিত্য-চর্চ্চা, রহস্যালাপ, ও ভাব-বিনিময় করিতেন। একদিন এইরূপ এক বৈঠকে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র, ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের সহিত বাঙ্গালা-ভাষা-গঠন সম্বন্ধে মধুসূদনের মহাতর্ক উপস্থিত হয়। প্যারীচাঁদ তখন 'মাসিকপত্র' নামক একখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত; তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' সেই পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে সংস্কৃত রীত্যনুসারে বাঙ্গালা ভাষা-লিখনের যুগ প্রচলিত; প্যারীচাঁদ সেই 'পণ্ডিতী'-রীতির পরিবর্ত্তন এবং চলিত ভাষায় পুস্তক-লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে,

সহজ ভাষাতেই উক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতেছিলেন। মধুসূদন প্যারীচাঁদকে উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন?—লোকে ঘরে আট-পৌরে যাহা-হয় পরিয়া আত্মীয়জন সকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে সে-বেশে যাওয়া চলে না। 'পোষাকী' পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে। আপনি, দেখিতেছি, 'পোষাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে বাহিরে সভা-সমাজে সর্ব্বত্রই এই আট-পৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি কখন সম্ভব!" ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেও, মধুসূদন যে বাঙ্গালা-ভাষার কোনও ধার ধারেন, এরূপ ধারণা কাহারও ছিল না। তাঁহার মুখে এইরূপ শ্লেষোক্তি সম্পূর্ণ অনধিকার-চর্চ্চা মনে করিয়া, উত্তেজিত ভাবে প্যারীচাঁদ বলিলেন, 'তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্ত্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাঙ্গালা-ভাষায় নির্ব্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে!' মধুসূদন তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্য-সহকারে তদুত্তরে বলিলেন, 'It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit. উহা কি আবার একটা ভাষা! দেখিবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে।' এই কথা শুনিয়া এবং উহাকে সম্পূর্ণ রহস্য-বাক্য মনে করিয়া, সমবেত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন; কেহ কেহ বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, 'তুমি বাঙ্গালা লিখিবে, আর সেই রচনা চিরস্থায়ী হইবে! সে ত আর একালে নহে, (till the Greek Calends!)' এই উদ্যান-সম্মিলনে এবম্বিধ সাহিত্য-প্রসঙ্গেই বঙ্গ-ভাষার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বরাগ বিশেষভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছিল।"—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৯৭-৯৮।

নাটক-প্রহসন রচনা

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বাংলা দেশে বাংলা নাটকের অভিনয় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে নাট্যাভিনয় প্রায়ই কোন-না-কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতেই হইত। তাহাতেই উদ্যোগকর্ত্তার গণ্যমান্য আত্মীয়, বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জনেরা সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন—সাধারণের তাহাতে অবারিত প্রবেশ ছিল না। সে-যুগের সখের নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নাম হয়। এই নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং এই ব্যাপারে সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বহু নবীন বাঙালী তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। খ্যাতনামা নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন-রচিত 'রত্নাবলী' নাটক এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত হয়। নিমন্ত্রিত ইংরেজ দর্শকগণের অভিনয় উপভোগের সুবিধার জন্য উদ্যোক্তাগণ 'রত্নাবলী' নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। গৌরদাস বসাকের পরামর্শে রাজারা এই অনুবাদ-কার্য্যের ভার মধুসূদনের উপর অর্পণ করেন। মধুসূদনের অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহারা অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই ব্যয়ে 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হয় এবং মধুসূদন পারিশ্রমিক-স্বরূপ পাঁচ শত টাকা পাইয়াছিলেন।

৩১ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে 'রত্নাবলী' নাটক বিশেষ সমারোহের সহিত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। ছোট লাট

হ্যালিডে ও অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ অভিনয়-দর্শনে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মধুসূদন-কৃত ইংরেজী অনুবাদের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করিয়াছিলেন।

এই ভাবে মধুসূদনকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিবার উপলক্ষ্য হিসাবে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই রত্নাবলী নাটকের মহলা দেখিয়াই মধুসূদনের মনে নাটক লিখিবার সঙ্কল্প জাগে। তিনি অনতিবিলম্বে 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'র কিয়দংশ রচনা করিয়া গৌরদাসকে শুনাইলেন। গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> After his admission to the first rehearsal, and before he had entered upon his task of the English translation of the Ratnavali, Modhu, with his partiality for English taste exclaimed to me (aside), "What a pity the Rajas should have spent such a lot of money on such a miserable play. I wish I had known of it before, as I could have given you a piece worthy of your Theatre." I laughed at the idea of his offering to write a Bengali play, and chaffingly asked if it was his wish to see us introduce a wretched Vidya Sundar on our stage. Conscious of the dearth of really good plays in our language, he could not but feel the sting of my remark as a home-thrust and simply muttered, "We shall see, we shall see."
>
> The next morning he called on me at the rooms of the Asiatic Society for the loan of a few Vernacular and Sanskrit books, dramas specially, and in the course of a week or two read to me the first few scenes of his Sarmishtha which struck me as having the ring of true metal. I wished to take the MS. with me to Belgatchia, but he said I must wait till he had finished the First Act.

মধুসূদনের বাংলা রচনা গৌরদাসকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি অবিলম্বে এ সংবাদ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে জানাইলেন ও তাঁহাকে

এক খণ্ড *Captive Ladie* পাঠাইয়া দিলেন। মধুসূদনের সহিত তখনও যতীন্দ্রমোহনের পরিচয় হয় নাই; তিনি মধুসূদনের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ১৬ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে গৌরদাসকে লিখিলেন :—

> I am very anxious to have a perusal of your friend's manuscript drama, for I am pretty sure that he who wields his pen with such elegance and facility in a foreign language, may contribute something to the meagre literature of his own country, which cannot but be prized by all. I shall feel myself honoured by his visit to my humble garden, and shall wait there to receive him any evening that he may appoint.

মধুসূদন কোন কোন বন্ধুর পরামর্শে ব্যাকরণশুদ্ধি সংশোধনের জন্য 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র পাণ্ডুলিপি পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> You must excuse me for not complying with your request. The fact is, I do not like the idea of showing my plan to our friends, in so incomplete a state. However, as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.
>
> Ram Narayon's "version," as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayon to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self. However I shall adopt some of his corrections.
>
> If you should speak of the drama to your friends, when you meet them to-day, pray, don't say a word about Ram Narayon. I shan't have him. He has made my poor girls talk d—d cold prose.

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a forgien air about my drama: but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism; Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and *modes of thinking*; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the second Act, already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you, upon my word, that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincerity; and yet I have no reason to believe that those men would flatter me.

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old rascals in the shape of Pandits. When you see Jotindra and the Rajas, puff away—there's nothing like that to raise the price of an article in the market. I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil!! I would sooner burn the thing.

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'র পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া মুক্তকণ্ঠে রচনার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে লেখেন :—

"Sermista" has turned out to be a most delightful girl, if I am to believe those who have already inspected her. Jotindra says it is the *best* drama in the language, "chaste, classical and full of genuine poetry!" The Chota Raja writes in raptures about it and swears the 'Drama is a complete success!" But I dare say, you have heard their opinions before this, There is to be an English translation.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।* ইহার "প্রস্তাবনা" অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি; এটি পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে:—

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুম-ঘোর, হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।

* মধুসূদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রের "১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল" তারিখ হইতেই এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইয়াছিল। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের একখানি পত্রে আছে:—"I hope to send you copies, English and Bengali, when ready,...." ঐ বৎসরের ১৯ জানুয়ারি তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' উপহার পাইয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পুস্তকখানি যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই হইতে ১৯এ জানুয়ারির মধ্যে বাহির হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে, জাগ মা গো, বিভু স্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়॥

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনগণ এবং বহু ইংরেজ রাজপুরুষ অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপীয় দর্শকদের বুঝিবার সুবিধার জন্য, পাইকপাড়া-রাজাদের অনুরোধে, মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিরূপ সাফল্যের সহিত 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হয়, সে-সম্বন্ধে ১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন :—

> ...When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of not to tell." Poor old Ram Chandra Mitter was mad and grasped my hand, saying, "why my dear Madhu, my dear Madhu this does you great credit indeed! O, it is beautiful!"

পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থে 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল। 'রত্নাবলী'র ন্যায় 'শর্ম্মিষ্ঠা'র ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মধুসূদন রাজভ্রাতাদের নিকট হইতে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক ত পাইয়াছিলেনই, পরন্তু প্রচুর অর্থসাহায্যও লাভ করিয়াছিলেন।*

* ১০ মার্চ ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন :—"You will be glad to hear that, in a pecuniary point of view, my mind is quite at rest just now; our *noble* friends—noble in every sense of the word

কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি এই তিনখানি পুস্তক রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় যখন 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'র মহলা চলিতেছিল, সেই সময় অভিনয়োপযোগী প্রহসনের অভাব অনুভব করিয়া ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ৮ মে ১৮৫৯ তারিখে মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন :—

> ...I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the 'Shermistha' and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both the same time and with the same actors.

ইহারই ফলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় পাইকপাড়া-রাজাদের ব্যয়ে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই প্রহসন দুইখানির অভিনয়াভ্যাসও আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় শেষ পর্য্যন্ত অভিনীত হইতে পারে নাই। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> ...A few of the "Young Bengal" class, getting a scent of the farce "একেই কি বলে সভ্যতা?" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajahs deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their

---

—I mean the Rajas, having heard of my distress, have helped me to get out of most of my liabilities, by advancing me a considerable sum of money. They became aware of my unfortunate circumstances through my good friend, old Sreeram. The next time you write to the Chota Raja, pray, don't forget to thank him for having saved your poor old friend from much anxiety of mind by his princely munificence—"

Theatre. This gentleman (also a "Young Bengal") fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce. Rajah Issur Chander Sing was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at the Belgachia Theatre. ('জীবন-চরিত,' পৃ. ৩৭৭)

ইহার পর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মধুসূদনের 'পদ্মাবতী নাটক' প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে এই 'পদ্মাবতী'তেই মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী' বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য রচিত হয় নাই,—অন্য একটি নাট্য-সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। নাটকখানি মুদ্রণকালে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন :—

...There is another Drama of mine which will be soon acted by a company of amateurs. It is also written on the classical model. ('জীবন-চরিত,' পৃ. ৩১১)

'পদ্মাবতী' সম্বন্ধে রাজনারায়ণের অভিমত জানিতে চাহিয়া, ১৫ মে ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama ; I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre. But let me know what you think of Padmavati. I am sure I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple Indianised,

'পদ্মাবতী নাটকে'র পর মধুসূদনের বিয়োগান্ত নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয়। ইহা রচনাকালে মধুসূদন নটরাজ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নিম্নাংশ প্রণিধানযোগ্য :—

...In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the Sermista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry; if I find her before me I shall not drive her away; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to *create* characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. ('জীবন-চরিত,' পৃ. ৪৬১)

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যয়ে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন, বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন :—

...I am not at all dissatisfied with your criticism on Kissen Kumari, but I flatter myself you will think more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the master pieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But

hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will. ('জীবন-চরিত,' পৃ. ৪৯০-৯১)

যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত" (পৃ. ৪৪৩)। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম বলেন, মাত্র দুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচনা করিয়াছিলেন ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৩০২-৩)। নগেন্দ্রবাবুর উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে হয়; কারণ, 'কৃষ্ণকুমারী'র "মঙ্গলাচরণে" মধুসূদন লিখিয়াছেন :—

> এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পত্ত রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি।...

'কৃষ্ণকুমারী' রচিত হইবার অব্যবহিত পরে ২৯ মার্চ ১৮৬১ তারিখে ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালে মৃত্যু হওয়ায় বেলগাছিয়া নাট্যশালা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। একমাত্র 'শর্ম্মিষ্ঠা' ভিন্ন মধুসূদনের আর কোন নাটক বা প্রহসন এই নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। মধুসূদনও বহু দিন আর কোন নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

> You allude to the untimely death of poor Issur Chandra. When shall we look upon his like again? Alas! for the drama. But this is not the age for the drama to flourish. We want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse. ('জীবন-চরিত,' পৃ. ৪৮৩)

বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন : কাব্য রচনা

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন মধুসূদনের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। এই ছন্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করেন।

মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রত্যেক সর্গ রচনা করিয়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে পাঠাইতেন। যতীন্দ্রমোহনও সেগুলি সযত্নে পাঠ করিয়া কবিকে নিজের অভিমত জানাইতেন। ১ ডিসেম্বর ১৮৯২ তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একখানি পত্রে গৌরদাস বসাককে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgachia Villa where the stage had been set up for the performance of the "*Ratnavali*." Both the Brothers, Rajahs Protap Chunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and so was our favourite poet. It was a rehearsal night, and the amateurs were coming in one by one; the conversation gradually turned upon the subject of Drama in general and of Bengali Drama in particular. Michael said that "no real improvemet in the Bengali Drama could be expected until blank verse was introduced into it." I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengali language, was ill adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you," said he, "and I think it is well worth making an attempt." "You remember," I added, "how once the late Issur Chunder Gupta made a caricature of blank verse in Bengali, beginning with the lines "কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই"। "Oh!" said he, "it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do so." "But," I said, "if I am correctly informed the French, which is no doubt a more copious and elaborate language than our own, has not in it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali should be found unsuited to this kind of versification." "You forget, my dear fellow," he replied, "that the Bengali is born of the Sanskrit than which a more copicus and elaborate language does not exist." "True," said I, "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother."

"Write me down an ass," said he laughingly, "if I am not able to convince you of your error within a short time." Then looking sharply at me he added, "and what if I succeed in proving to you that the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry."

"Why then," I replied, "I shall willingly stand all the expenses of printing and publishing any poem which you may write in blank verse." * * * "Done," said he clapping his hands, "you shall get a few stanzas from me within two or three days" and as a matter of fact within three or four days the first canto of the তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য was sent to me. I was so agreeably surprised, and at the same time so charmed with the artistic manner in which the verses were written, not to speak of the sentiments and the rich imageries of the poetry, that I at once took the MS. to my friends the Rajas of Paikpara. It was then read by several or our friends who had some reputation for literary taste and I was glad to find that they all agreed with me in my opinion of the composition.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম দুই সর্গ রচনা করেন। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র সম্পাদক মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮১ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে (জুলাই-আগস্ট ১৮৫৯, ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮) এই কাব্যের প্রথম সর্গটি তাঁহার পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। রচনায় মধুসূদনের নাম ছিল না, রাজেন্দ্রলাল যে ভূমিকাটুকু করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :—

কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অন্ত্যযমকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য

পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্ত্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকাব্দা ১৭৮১ ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ. ১০৪-১১১) দ্বিতীয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও লেখকের নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র চারি সর্গ একেবারে পুস্তকাকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন। ১২৬৮ সালে প্রকাশিত এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে মধুসূদন বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহনকে উপহার দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন কবিকে লিখিয়াছিলেন :—

> I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own handwriting! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the loftly region of sublimity which is her genuine province. Time *will* come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants (should I have any) will then be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the first Blank Verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the Poet himself.

'তিলোত্তমাসম্ভব' উপহার পাইয়া রাজনারায়ণ বসু ১১ জুন ১৮৬০ তারিখে মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন :—

> **Your reward is very great indeed—*immortality*.**

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে' (৬ আগস্ট ১৮৬০) লিখিয়াছিলেন :—

> বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহা উপযোগী নহে।...এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'তিলোত্তমাসম্ভব' সমালোচনাকালে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (অগ্রহায়ণ, ১৭৮২ শক) লেখেন :—

> ...আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্ত্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই,...।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে যে মত পোষণ করিতেন, ক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের তিনখানি পত্র হইতে এ সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> **You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tilottama. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don't know if you read the Education Gazette. If**

you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on blank verse. I do not think B.—either reads or can appreciate Milton; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better. ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৪২-৪৩)

...You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection! He is not quite habituated to the new music yet—but of the genuine character of the poetry he does not appear to entertain any doubt. ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৪৪)

I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new Poetry are very flattering, tho' he cannot manage to read the verse, yet, with eloquence. His admiration is honest, for he is above flattering any man. ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৪৫)

'তিলোত্তমাসম্ভব' যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গকালে মধুসূদন লিখিয়াছেন :—

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেননা এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপ আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্‌দেবীর চরণহইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

মধুসূদনের ভবিষ্যবাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই

ছন্দ-প্রবর্তনে শুধু কাব্য নয়, বাংলা-গদ্যও সতেজ ও ওজস্বী হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

'মেঘনাদবধ কাব্য'

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম খণ্ড (১-৫ সর্গ) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, এবং দ্বিতীয় খণ্ড (৬-৯ সর্গ) ঐ বৎসরের প্রথমার্দ্ধে প্রকাশিত হয়।

রাজনারায়ণ বসু "মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচন" প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন :—

> ...স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে বঙ্গভূমিকে "শ্যামা জন্মদে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাঁহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্ব্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাঁহার "মেঘনাদবধ" বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।... তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্ম্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের রচনা প্রণালী তিলোত্তমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।...আমরা যখনি ইহা পাঠ করি, তখনি ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না।

বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে।—'বিবিধ প্রবন্ধ,' ১ম খণ্ড (১২৮৯ সাল), পৃ. ১৩, ২৩।

'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে বহু অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মধুসূদন আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় সম্বর্দ্ধনা

'মেঘনাদবধ', ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ* তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মধুসূদন দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার আয়োজন করেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয়, মধুসূদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখে কালীপ্রসন্ন নিজগৃহে এই সম্বর্দ্ধনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিতেছি:—

---

* যোগীন্দ্রনাথ বসু 'জীবন-চরিতে' (৪র্থ সং, পৃ. ৪২৩) লিখিয়াছেন:—"মধুসূদন যখন পুলিশ আদালতে কার্য্য করিতেন, কালীপ্রসন্ন বাবুকে তখন, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে, মধ্যে মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইত। সেই হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।" এই সংবাদ সত্য নহে; কারণ, মধুসূদন যখন বিলাতে, সেই সময় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন প্রথম অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ৪ মে ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ:—"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনরারী মেজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।"

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be p'eased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P. M.

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.

সম্বর্দ্ধনা-সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি অনেকের সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান্ সুদৃশ্য রজত-পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। মাইকেলের চরিতকারগণ বহু অনুসন্ধানেও এই মানপত্র এবং ইহার উত্তরে মধুসূদনের বাংলা বক্তৃতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, উহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মানপত্রখানি এইরূপ :—

এড্রেস।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য্য

হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয় ত সে দিন তাঁহারা আপনার অদর্শন জনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর

বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান্ হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা। } বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভ্যবর্গাণাম্*

এই মানপত্রের উত্তরে মধুসূদন বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এ দেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়। তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এত দূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

---

* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' মুদ্রিত।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এ দেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাক ইতি।—'সোমপ্রকাশ,' ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১।

এই প্রসঙ্গে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন :—

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prasanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy! I was expected to speechify in Bengali!

মধুসূদনের সম্বর্দ্ধনা করিয়াই কালীপ্রসন্ন নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীর নিকট তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

"—শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!"

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,' আষাঢ় ১৭৮৩ শক, পৃ. ৫৫-৫৬।

মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম কালীপ্রসন্ন সিংহই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুইটি কবিতা আছে।

'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা'

'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের অল্প দিন পরেই মধুসূদন গীতিকাব্য 'ব্রজাঙ্গনা' (জুলাই ১৮৬১) প্রকাশ করেন। ইহা সমালোচনাকালে 'সোমপ্রকাশ' (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬১) লিখিয়াছিলেন :—

ইহার রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি (?) মাসে মধুসূদন রোমক কবি ওভিদের Heroic Epistles-এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'বীরাঙ্গনা' প্রকাশ করেন। ১০ মার্চ ১৮৬২ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

আমরা তিলোত্তমা ও মেঘনাদ অপেক্ষা এতৎ পাঠে সমধিক প্রীতিলাভ করিলাম। ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত মধুর হইয়াছে।...

"আত্ম-বিলাপ"

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মধুসূদন "আত্ম-বিলাপ" রচনা করেন; উহা ১৭৮৩ শকের আশ্বিন-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। এই কবিতা রচনাকালে মধুসূদনের খ্যাতিপ্রতিপত্তি এবং অর্থের যে বিশেষ অসদ্ভাব ছিল, তাহা নয়। কিন্তু তাঁহার জীবনের উপর দিয়া যে বিপ্লব চলিয়া গিয়াছিল, তাহা ত ভুলিবার নয়; তাহার বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মধুসূদনের মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত। মান্দ্রাজ-প্রবাস ও কলিকাতা-প্রত্যাগমনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই মানসিক অশান্তি ও বেদনার প্রকাশ এই কবিতাটি :—

আত্ম-বিলাপ

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?

দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ? এ কি দায় ।

২

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে !
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার ।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে ;
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে।
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী।
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে!

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায়?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্, পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!

'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ

পুলিস কোর্টে কার্যকালে মধুসূদন প্রধানতঃ মাতৃভাষায় লেখা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইংরেজী রচনার চর্চা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। 'রত্নাবলী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের অনুবাদ তাঁহার ইংরেজী-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হইলে দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পাদরি লং বহু ইউরোপীয়ের দ্বারা ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু কৃষকের গ্রাম্যভাষাপূর্ণ নাটকের সুষ্ঠু অনুবাদ কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণে লং 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদের জন্য মধুসূদনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ—*Nil Durpan, or Indigo Planting Mirror* নামে পাদরি লঙের একটি ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকাশ ও প্রচার করার ফলে যে মকদ্দমা হয়, তাহাতে লঙের হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও এক মাস কারাবাসের আদেশ হয় (২৪ জুলাই ১৮৬১)। আদালতে তিনি অনুবাদকের নাম প্রকাশ করেন নাই; পুস্তকের আখ্যাপত্রে কেবল—"Translated from the Bengali by *A Native.*" মুদ্রিত ছিল। লং পুস্তকের "Introduction"এ লিখিয়াছিলেন :—

> The original Bengali of this Drama—the *Nil Durpan*, or *Indigo Planting Mirror*—having excited considerable interest, a wish was expressed by various Europeans to see a translation of it. This has been made by a Native; both the original and translation are *bona fide* Native productions and depict the Indigo Planting System as viewed by Natives at large.

এই "Native" আর কেহই নহেন—মধুসূদন দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

…ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি, শেষে তাঁহার জীবন-নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।—'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী,' "বিবিধ", পৃ. ৭৮।

দীনবন্ধু ও মধুসূদন উভয়েই রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই কারণে বোধ হয়, মূল নাটকে বা তাহার ইংরেজী অনুবাদে গ্রন্থকার বা অনুবাদক কেহই নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদন

মধুসূদন পুলিস কোর্টের চাকুরী করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার কুলাইত না। এই কারণে মাঝে মাঝে *Citizen* প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। তিনি কিছু দিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদনাও করিয়াছিলেন।

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে এই দেশহিতকর পত্রখানি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু দেশহিতৈষী কালীপ্রসন্ন সিংহের চেষ্টায় তাহা হইতে পারে নাই; তিনি হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া প্রেস ও পত্রের সর্ব্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের ইচ্ছায় তাঁহার বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ম্যানেজিং এডিটর নিযুক্ত হন; পত্রিকা পরিচালনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। এই ব্যবস্থা কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী

হয় নাই। কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই ব্যক্তিবিশেষের চক্রান্তে বিরক্ত হইয়া শম্ভুচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সংস্রব ত্যাগ করিলেন; গিরিশচন্দ্রও এই সময়ে (নবেম্বর ১৮৬১) তাঁহার অনুসরণ করেন। এই ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া হিতাকাঙ্ক্ষী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বিদ্যাসাগর প্রথমে কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা অল্প দিন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদকীয় কার্য্য চালাইয়াছিলেন; তার পর এই পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবার জন্য তিনি এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে অনুরোধ করিলেন। মধুসূদন এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। যে হরিশ্চন্দ্রের সহিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র নাম বিশেষভাবে জড়িত, সেই হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিরূপ উচ্চ ছিল, তাহা রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত তাঁহার দুইখানি পত্রের নিম্নাংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে :—

> ...They say poor Hurish of the Patriot is dying. This is very painful. Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our countrymen. I hope he will recover. His death would be a real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but to the progress of independence of mind and thought.—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৪৮৪।
>
> ...Harish is dead. They are kicking up a row on the subject and propose to establish a "Scholarship." Fie! why not a Statue? However, I shall subscribe. I loved and valued the man—'জীবন-চরিত,' পৃ. ৪৯০।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (?) মাসে (এই সময়ে 'বীরাঙ্গনা' ছাপা হইতেছিল) মধুসূদন *Hindoo Patriot* পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

By the bye—from the beginning of this month Jotindra and Vidyasagar have burdened me with the Patriot. I would recommend your reading next Monday's issue I am pretty certain you will recognise my fist....Perhaps I shall go to England next month.—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৭৫৫।

কিন্তু যথাসময়ে পারিশ্রমিক না পাওয়ায় মধুসূদন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সংস্রব ত্যাগ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; এই প্রসঙ্গে ২৭ মার্চ ১৮৬২ তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে লেখেন :—

I regret to hear that you have received no remuneration from the "Patriot" Fund up to this time; I have spoken strongly on the subject to Kristo Dass and I dare say a remittance of at least a portion of the amount due will soon be made to you.

I know you can much profitably employ your time by devoting it to the Muses, but I know also that with your facility of diction, a contribution of two or three articles to the "Patriot" during the whole course of a week cannot much interfere with your other literary occupations. Besides as you have consented at our solicitation to assist the editorial business of the Paper I would take leave to request you not to cut off your connection with it all in a hurry; for I know that some new arrangements are being made very shortly which, it is expected will place the "Patriot" finances in a much healthier condition; and if after the expiratton of another month or so you do not find the managers more regular in their dealings with you, I will not trouble you with this subject again.—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৩৪৪-৪৫।

পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার, বৈষয়িক ব্যবস্থা ও ইউরোপ যাত্রা

রাজনারায়ণ দত্ত মৃত্যুকালে কোন উইল করিয়া যান নাই। গৌরদাস বসাকের স্মৃতিকথায় প্রকাশ, তাঁহাকে উইল করিতে বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যার বিষয়, সে এসে নেবে।" মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতৃসম্পত্তি লইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন মামলায় ব্যস্ত; এমন কি, একখানা জাল উইলও আদালতে হাজির করা হইয়াছে। তাঁহার উপস্থিতিতে সে মকদ্দমা থামিল না।

মধুসূদন তখন রিক্তহস্ত। বন্ধু গৌরদাস বসাক ও কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সময় তাঁহাকে পিতৃসম্পত্তি লাভে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন; মকদ্দমার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতার কর্ম্মচারী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়। মকদ্দমা দীর্ঘকাল চলিয়াছিল।

বিদ্যাসাগরকে লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ :—

> The Moonkeah Case was dismissed by the P. S. A. of Jessora in February 1860. Within a few months of that we got possession of both the estates.—Letter dated 18 Sept., 1864.

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন :—

> As for my law-suits I have won one, and another is dragging its slow length along. I am at present master of an estate paying 2500 to 3000 Rs. a year. But the devil! a rupee of it I do not expect to see for months, probably for years yet. There is an appeal pending in the Sudder.

খিদিরপুরের বাটীর অধিকার পাইয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন :—

Have you heard that I have won the Kidderpur-house case. The whole claim has been decreed except in the matter of my mother's jewels. I could not exactly prove my claim in that matter, so the Judge had only decreed 1300 Rs. But then he has given me *Wasilot* from the date of my father's death which amounts to upwards of 2000 Rs. ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৪৭)

আশৈশব মধুসূদনের বিলাতগমনের বাসনা ছিল। কিন্তু নানা বাধাবিপত্তির ফলে এত দিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি এক্ষণে স্থির করিলেন, ব্যারিস্টারি ব্যবসায় শিক্ষার জন্য অবিলম্বে ইউরোপ যাত্রা করিবেন। তাঁহার বিলাত যাত্রার উদ্যোগের কথা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (?) মাসে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse !...He [Vidyasagar] has taken great interest in my proposed visit to England and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject. He has undertaken to raise a sufficient sum for me on easy terms on the mortgage of my property. The thing will cost me about 20,000 Rs. and I can spare that. No more Modhu the 'কবি,' old fellow, but Michael M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-law !! Ha !! Ha !! Isn't that grand ? But I hope I shan't be disappointed....And now God bless you, dearest friend ! Perhaps I shall go to England next month. If I live to come back, we shall meet ; if not, what will my countrymen say a hundred years hence !

Far away—Far away,
From the land he lov'd so well
Sleeps beneath the colder ray,

> And be hanged for it. I have no time to rhyme and just space enough to subscribe myself. ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৫৪-৫৫)

আত্মীয়স্বজনের সহিত মকদ্দমা-মামলার তখন অবধি অবসান না হওয়ায় তাঁহার বিলাত যাত্রায় বাধা পড়িতেছিল। তিনি এই সময় রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন :—

> I don't think I shall be able to go to England quite so soon as I had expected. I do not like to leave the country before extinguishing the flames of litigation with my relatives and *they*, I am sorry to say, are either the greatest rogue or fools under the sun! Though well-nigh ruined, they are yet backward to listen to terms. ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৫৫-৫৬)

মধুসূদন বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে বিষয়-সম্পত্তির যে বিলিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

৯ আশ্বিন ১২৬৮ তারিখে লিখিত (১ অক্টোবর ১৮৬১ তারিখে রেজেষ্ট্রীকৃত) একটি দলিল দ্বারা মধুসূদন পাইকপাড়া-নিবাসী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষদা দেবীকে সুন্দরবনের অন্তঃপাতী চক মুনকিয়া ও গদারডাঙ্গার পত্তনিদার নিযুক্ত করেন। দলিল-পাঠে জানা যায়, মধুসূদনের বৈষয়িক আয় সাত বৎসরের জন্য (১২৬৮-৭৪ সাল পর্য্যন্ত) ২৯৯৭৪০ ধার্য্য হয়। এই টাকা মোক্ষদা দেবী চারি কিস্তিতে মধুসূদনকে ইউরোপে পাঠাইবেন। যাহাতে তিনি নিয়মিতরূপে কার্য্য করেন, তাহার জন্য দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) ও মধুসূদনের পিসতুতো ভাই বৈদ্যনাথ মিত্র প্রতিভূ-স্বরূপ ছিলেন; দলিলে ইঁহাদিগকে বার্ষিক তিন শত টাকা দিবার কথা আছে। আমরা দলিলটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> আমার বিষয় উদ্ধার ও দেনা পরিশোধের জন্য আপনার স্বামি অনেক সাহায্য ও যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অদ্য পর্য্যন্ত

আমার মোকদ্দমা খরচ ও দেনা পরিশোধ জন্য ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে উক্ত দুই চক্ তাঁহাকে কায়েম বন্দবস্ত করিয়া দিবার অঙ্গীকার ছিল তদনুজাই তাহার প্রার্থনা মতে উপরের লিখিত ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পণে উক্ত চক মূনকিয়া ও গদারডাঙ্গা ১২৬৮ সনের প্রথমাবধি আপনাকে মফস্বলে তালুক ও গাঁতিদার করিয়া দেওয়া গেল… ।*

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মধুসূদন খিদিরপুরের বসতবাটী তাঁহার বাল্যবন্ধু ও কবি রঙ্গলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাত হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন।

অতঃপর মধুসূদন তাঁহার পিসতুতো ভাই বৈদ্যনাথ মিত্র ও দ্বারিকানাথ মিত্রকে পিতৃনির্দ্দেশ অনুসারে আনুমানিক দুই সহস্র টাকা মূল্যের চক মুনকিয়ার ।১০ অংশ এবং স্বয়ং তিন সহস্র টাকা মূল্যের সাগরদাঁড়ীর ভদ্রাসনের অংশ ও অন্যান্য জমি দান করেন। এই সম্পর্কে তিনি ৭ জুন ১৮৬২ তারিখে একটি দানপত্র লিখিয়া দেন।†

হেনরিএটাকে কলিকাতায় রাখিয়া মধুসূদন একাই ইউরোপ যাত্রা করিবেন মনস্থ করেন। এই কারণে ব্যবস্থা হয় যে, তাঁহার বৈষয়িক আয় হইতে পত্তনিদার মোক্ষদা দেবী কলিকাতায় তাঁহার স্ত্রী হেনরিএটাকে মাসে মাসে দেড় শত টাকা দিবেন। ইহা ছাড়া তিনি স্ত্রী, কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ও পুত্র মিল্টন দত্তের জন্য ব্যাঙ্কেও কিছু টাকা জমা রাখিয়াছিলেন।

---

* সমগ্র দলিলখানি ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র ৯৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

† 'ভারতবর্ষ,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, পৃ ৯৭৩-৭৪।

পরিবারবর্গ ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া মধুসূদন ৯ জুন ১৮৬২ তারিখে 'ক্যাণ্ডিয়া' নামক জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করিলেন। যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে—৪ঠা জুন তারিখে বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুকে তিনি যে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

You will be pleased to hear that I have completed my arrangements, and, God willing, purpose starting, on the morning of 9th instant, per the steamer "Candia." You must not fancy, old boy, that I am traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been for the extraordinary success, the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure, or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger hands, not ceasing to direct their movements from my distant retreat. Meghnad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.

Well—I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long separation:—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least *respectable*.

"My Native Land Good-Night!"

Byron.

অবস্থায় ভের্সাই হইতে ২রা জুন ও ৯ই জুন ১৮৬৪ তারিখে তিনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে উপর্য্যুপরি দুইখানি পত্র লিখিলেন। প্রথম পত্রখানি এইরূপ :—

My dear Sir, If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a well-worded apology for not having written to you so long. But you know well that we never fly to a man in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends.

You will be startled, I am sure, grieved to learn that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man who bade you adieu two years ago with a bounding heart and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men, one of whom at least, I felt strongly persuaded, was my friend and well-wisher, namely Baboo D—. The whole thing is a tale of cruel shame, but I must tell it to you in confidence, of course.

When I left Calcutta, my wife and two children remained behind, and it was arranged between Mohadeb Chatterjee, my Patneedar and myself that the former should give my family 150 Rs. a month, Baboo D—consented to see the things arranged were properly carried on and so I started. A part of the money was paid in advance and deposited in the Oriental Bank. This was in June 1862. How poor Mrs. Dutt was treated I have not the patience to describe. They troubled her to such an extent that she absolutely fled from Calcutta with our two infants. She reached England on the 2nd of May, 1863. From that day to the present, we have not received a pice from India, although there has been money due, some for the year 1862, and some since December last from the Talooks, and the only letter which Baboo D— wrote to us, was written just ten months ago. We have since written to him no less than 8 letters, but not a line have we received from him.

I am going to a French Jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution, tho' I have fairly

4000 Rs. due to me in India. The Benchers of Gray's Inn, from whom I was compelled to draw 400 Rs., have suspended me and this is the third term I am losing this year. I also owe 260 Rs. to Monou, who poor fellow, is no doubt quite inconvenienced by my failure to pay him.

You are the only friend who can rescue me from the painful position to which my cofidence in D—has placed me, and in this, you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost...

পাছে বিদ্যাসাগর তাঁহার পত্র না পান, এই জন্য তাঁহাকে পরবর্ত্তী ১৮ই জুন (১৮৬৪) তারিখে আর একখানি পত্র কলিকাতা পুলিস অফিসের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের মারফৎ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

...If we perish, I hope, our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If I had not little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded. God has given me a brave and proud heart, or it would have broken long ago.

I hope, I shall not have to cry out with Ram in my poem of Meghanad, 'বৃথা হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে।'...

I hope you will write to me in France and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara, but Karunasagara (করুণাসাগর) also.

প্রতিভূদিগের সহিত হিসাবনিকাশ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পাছে বিলম্ব হয়, এই জন্য মধুসূদনের পত্র পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর ২ আগস্ট তারিখে, বিপন্ন মধুসূদনকে দেড় হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এই টাকা পাইয়া কৃতজ্ঞ মধুসূদন ২ সেপ্টেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগরকে যে পত্র লেখেন, তাহার প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

On the morning of last Sunday, the 28th ultimo, as I was seated in my little study, my poor wife came to me with tears in her eyes and said "the children want to go to the Fare, and I have only 3 Francs. Why do these people in India treat us this way?" I said—"The mail will be in to-day and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed, has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother; I was right: an hour afterwards, I received your letters and the 1500 Rs. you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend? You have *saved* me...

মধুসূদনের এই ঘোর দুর্দ্দিনে একমাত্র বিদ্যাসাগরই তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ দায়িত্বে অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তিন হাজার ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া মধুসূদনকে পাঠাইয়াছিলেন। পরে ১৮ মে ১৮৬৫ তারিখে তাঁহাকে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া মধুসূদন ওকালতনামা পাঠাইলে, বিদ্যাসাগর মধুসূদনের বিষয় বন্ধক রাখিয়া অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বারো হাজার টাকা লইয়া ইউরোপে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে পত্তনিদার মহাদেব চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিভূ দিগম্বর মিত্র উভয়েই মধুসূদনের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। ইহারই ফলে তাঁহার ইউরোপ-প্রবাস দুঃখময় হইয়াছিল; ব্যারিস্টারি শিক্ষায় বিলম্ব ঘটিয়াছিল। মধুসূদন ভের্সাই হইতে ২৬ জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখে বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন:—

You ask me when I mean to return "homewards?" If I had not been cruelly neglected by Mahadeb Chatterjee and Digumber Mitter, I should have been called to the Bar in the course of the present month: but, as it is, I am afraid, I shall have to stop a year or more longer.

তাঁহার ফ্রান্সে অবস্থিতির কারণ সম্বন্ধে মধুসূদন ২৬ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখের একখানি পত্রে গৌরদাসকে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

You are, no doubt, anxious to know why I am here in France. I will tell you. London is not half so pleasant a place to live in as this country and its brutal climate does not agree with Mrs. Dutt's health, though I myself am strong enough for any country under the sun. Besides, here I have greater facilities for mastering French and Italian than there. To these two languages which I already read and write with great ease, I am going (in fact I have already begun) to add German. So that if you should ever see me again, you will find me a little more learned than I was when we last saw each other. I do not neglect the law altogether, but I have not yet commenced to work away *seriously* at it. I have neglected some terms, and will have to remain in Europe a little longer, but that is not to be regretted at all. I wish I could live here all the days of my life, with means to take occasional runs to India, to see my friends ; but I am too poor for that, though you needn't have very large fortune to do all that. This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Raja of Burdwan ever dreams of ! I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost him *hal*, his enormous wealth to command, no' even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty ! This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here, you are the master of your masters ! The man that stands behind my chair, when I dine, would look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest Rajah in India. Every one, whether high or low, will treat you as a man and not a "d—d nigger." But this is Europe, my Boy, and not India.

You date your letter from "Bagerhat." Is that বাগেরহাট on

the banks of the beautiful কবতক্ষ, my own dear native river? I was born, you know, at সাগরদাঁড়ী, scarcely a couple of miles from this বাগেরহাট...

I have had the honour of bowing to, and being bowed to by, the famous Emperor and Empress of the French and you will laugh to hear that I made myself almost hoarse by shouting "Vive l' Empereur, Vive l' Emperatrice..."

I have not been doing much in the poetical line of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away, and I do not know if it will ever come back again. You know I write by fits and starts.

দান্তে-শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য

ফ্রান্সে অবস্থানকালে, মধুসূদন দান্তে-ষষ্ঠ-শতবার্ষিক জন্মোৎসবের জন্য একটি কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধু-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

মধুসূদনের ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরে কবিগুরু দান্তের মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎসরিক মহোৎসব হইতেছিল। তদুপলক্ষে য়ুরোপের নানা প্রদেশের কবিগণ কবিগুরুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থে কবিতা রচনা করিয়া ইটালীতে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের মধুসূদনও ফ্রান্স হইতে দান্তের উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করিয়া, তাহা স্বয়ং ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় কবিতাকারে অনুবাদ করিয়া ইটালীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ইটালীরাজ, বিশ্ববিশ্রুত-কীর্ত্তি ভিক্টর ইমানিউএল (Victor Emmanuel) উক্ত কবিতা পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়া মধুসূদনকে স্বীয় স্বাক্ষর (Autograph) সংযুক্ত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই দুর্লভ পত্র ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের নিকটে ছিল। তাহাতে ভিক্টর ইমানিউএল লিখিয়াছিলেন ;—"It will be a ring which will connect the Orient with the Occident."

দান্তের জন্ম—মে ১২৬৫, এবং মৃত্যু—সেপ্টেম্বর ১৩২১। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত "মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎসরিক" উৎসব ঠিক নহে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায়, সনেটও মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম বাংলায় প্রবর্ত্তন করেন; "চতুর্দ্দশপদী" নামও তাঁহারই দেওয়া। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে লেখেন :—

...I want to introduce the sonnet into our longuage and, some morning ago. made the following ;—

কবি—মাতৃভাষা।

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে?"

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian...

I am just now reading Tasso in the original,—an Italian gentleman having presented me with a copy. Oh! what luscious poetry...

ইহার পর অনেক দিন সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা স্থগিত থাকে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভের্সাই অবস্থানকালে আবার তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ঐ বৎসরের ২৬ জানুয়ারি তারিখে তিনি ভের্সাই হইতে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে আছে—

...I have been for months like a ship becalmed in France, though, thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, viz., Italian, German and French languages,—which are well worth knowing for their literary wealth. You know, my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well cultivated state—intellectual of course. Should I live to return, I hope to familiarize my educated friends with these languages through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. Do you think England, or France, or Germany or Italy wants Poets and Essayists? I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us, If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good, in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe; but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue. Here is a bit

of "lecture" for you and the gents who fancy that they are swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays! I assure you, they are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be called "educated" who is not master of his own language.

... ...

You again date your letter from "Bagirhat." Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river? I have been lately reading Petraca, the Italian Poet, and scribbling some "sonnets", after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too, Pray, get these sonnets copied and sent to Jotindra and Raj Narain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চতুর্দ্দশ-পদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegent* compliment paid to him. There's variety for you, my Friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear Fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. There is no honour, to be got in our country without money. If you have money, you are বড়মানুষ; if not, nobody cares for you! We are still a degraded people. Who are the বড়মানুষ among us? The *nobodies* of Choiebagan and Barrabazar; Make money, my Boy, make money! If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to

their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done.

গৌরদাস বসাক মধুসূদন-প্রেরিত সনেটগুলি তাঁহার নির্দেশমত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন। ২১ মার্চ (১৮৬৫) তারিখে গৌরদাসবাবুকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্র হইতে জানা যায় যে, মধুসূদন তাঁহার পত্রে তিনটির উল্লেখ করিলেও মোট চারিটি সনেট পাঠাইয়াছিলেন। সনেট চারিটি যথাক্রমে এইরূপ—অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, জয়দেব, সায়ংকাল ও কবতক্ষ নদ। এই পত্র পাঠে জানা যায়, যতীন্দ্রমোহন কবিতা চারিটি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি মধুসূদনের পত্র সহ কবিতাগুলি যথাসময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভ'* পত্রিকায় (১৯২১ সংবৎ, ২ পর্ব্ব, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৬) তন্মধ্যে দুইটি সনেট মুদ্রিত করেন—"কবতক্ষ নদ" ও "সায়ঙ্কাল"। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

নিম্নস্থ চতুর্দ্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তকর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্ম্মিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহাকর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে

---

* নগেন্দ্রনাথ সোম ভ্রমক্রমে 'মধু-স্মৃতি'তে (পৃ. ৩৯৬) 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র নাম করিয়াছেন। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্ত্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশ নহে।

অতি অল্প কালের মধ্যে মধুসূদন ভের্সাই নগরে বাসয়াই শতাধিক সনেট রচনা করেন এবং তাঁহার প্রকাশক কলিকাতার স্ট্যানহোপ্ প্রেসের স্বত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানীকে সেগুলি পাঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে আরও কয়েকটি অসমাপ্ত কাব্য ছিল। প্রকাশক এগুলি সমস্তই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের তিনটি ভাগ ছিল—(১) উপক্রম, (২) চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, (৩) অসমাপ্ত কাব্যাবলি। "উপক্রম" ভাগে লিথোপ্রেসে ছাপা মধুসূদনের স্বহস্তাক্ষরে দুইটি সনেট; "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি" অংশে ১০০টি সনেট এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি"তে নিম্নলিখিত খণ্ডিত কবিতাগুলি ছিল :—

১। সুভদ্রা-হরণ। ২। তিলোত্তমা-সম্ভব*। ৩। নীতিগর্ভ কাব্য—(ক) ময়ূর ও গৌরী, (খ) কাক ও শৃগালী, (গ) রসাল ও স্বর্ণলতিকা। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে "উপক্রম" ও "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি" অংশ একত্র হইয়াছে এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকৃত পক্ষে মধুসূদনের শেষ কাব্য।

---

* মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র ইংরেজী অনুবাদও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধবলগিরির বর্ণনাটুকু অনূদিত হইয়াছিল। ইহা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট-সংখ্যা *Mookerjee's Magazine*-এ মুদ্রিত হয়।

ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় সাফল্য

ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার মানসে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মধুসূদন পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। লণ্ডনে অবস্থিতিকালে তাঁহার সহিত "পণ্ডিতচূড়ামণি" গোল্ডস্টুকরের পরিচয় হয়। গোল্ডস্টুকর তাঁহাকে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকের অবৈতনিক পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন এই পদ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কারণ, তাঁহার পক্ষে তখন অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে ১৭ জানুয়ারি ১৮৬৬ তারিখে তিনি লণ্ডন হইতে বিদ্যাসাগরকে লিখিয়াছিলেন :—

> I have even refused the offer of the Bengali Professorship at University College, London, a post of great honour and dignity though without a salary. *Dr. Goldstucker* (of whom you have no doubt heard) was very anxious to have me, but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary...The Doctor is a profound Sanskrit scholar and loves all Hindus.

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর মধুসূদন গ্রেজ্ ইন হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার পর তিনি ফ্রান্সে চলিয়া যান। সেখান হইতে পরীক্ষার ফল ও স্বদেশ প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ৯ই ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগরকে লেখেন :—

> I hope you have received my letter via Bombay announcing my call to the Bar on the 17th ultimo, I have allowed some mails to leave without writing, for I have been looking out for letters and money from you, I am now in France with my family, for we can live here for less money than in England. If the mail now approaching us fast bring money

I hope to leave Europe by the Bombay Steamer of the 5th January and reach Calcutta about the early part of February, just to see our Indian winter expire.

I think it would be better for me to leave my family here till I am well-settled in Calcutta. Living in France is cheap and I could not start in life as a Barrister in a becoming style for a time unless I had more money, than I am afraid, you could raise for me. As a single man, I could live anywhere and in any way I chose :—the case would be far different with a wife and children. I earnestly entreat you not to fancy that I am capable of treating your advice lightly ; but in this matter, I think you are misled by the idea that living in Europe is dear. However strange the assertion might appear to you, I assure you that Europe is the cheapest quarter of the globe in many respects. When, I reach Calcutta, I hope to hire the upper story of some house with an Attorney's or other office below, furnish a few rooms decently and live with a cook and *Khitmutgar* till "briefs" begin to come in. Mrs. Dutt could live here very comfortably for 250 or 300 Rs. a month. I would rather that things went on this way till next winter.

I must now proceed to draw your attention to a much serious subject. I need scarcely tell you that you are my only friend. I am about to undertake a long voyage by sea. Life is uncertain. "In the midst of life we are in death." Should anything happen to me, my wife and children will have no one to look to but yourself....

I cannot conceal it from myself, that in order to get into the profession, I have well-nigh beggared myself. It now remains to be seen এ বৃক্ষ কি ফল ফলিবে। But there is no use of despairing. If I had been a single man, I should have marched out fearlessly, for I am not naturally timid ; but it's a serious thing to have wife and little children, all unable to help themselves, in case of any emergency.

I must now trouble you my dear Friend, to send Mrs.

Dutt £50 on receipt of this, for the money I leave for her will not be sufficient till my arrival,...

প্রবাসে পাঁচ বৎসর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কাটাইয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ফ্রান্সে রাখিয়া, মধুসূদন ৫ জানুয়ারি ১৮৬৭ তারিখে মার্সেই বন্দর হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

স্বদেশ-প্রত্যাগমন

ব্যারিষ্টারি

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই মধুসূদন ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন। স্পেন্সেস হোটেলে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি ব্যারিষ্টার-রূপে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে দিগম্বর মিত্র ও আরও কয়েক জনের সুপারিশ-পত্র সহ প্রধান বিচারপতি সার্ বার্নেস পীককের নিকট যে আবেদন করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Having had the honour of being called to the Degree of a Barrister by the Hon'ble and Ancient Society of Gray's Inn, I humbly solicit the favour of being admitted as an advocate of the High Court.

I became a student in Michaelmas Term 1862 and was called to the Bar in Michaelmas Term 1866. May name stood on the roll for seventeen Terms as I was obliged to reside on the Continent for a time on account of ill health. The number of Terms which I formally kept was ten. I attended public lectures for a whole educational year and studied with a Barrister of our Inn.

মধুসূদনের হাইকোর্ট-প্রবেশে বিঘ্ন ঘটিল। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করা হউক—বিচারপতিদের কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ

করিলেন। এই কারণে "Character and good repute" সম্বন্ধে হাইকোর্ট তাঁহাকে আরও সুপারিশ-পত্র পাঠাইতে লিখিলেন।

এই প্রসঙ্গে ১১ এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে বিদ্যাসাগরকে লিখিত মধুসূদনের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ...This morning I called on the Punditjee who told me that my only chance was to get as many certificates as I could from the most known members of the native community.... Sumbhonauth says that our enemies seem to have won the ears of the Judges and that the antidote must be as strong as the poison. He wants you to come to Calcutta; I scarcely know what to say myself. I am sure I have given you too much troubles already. We must go up with our papers early next weak, for no time is to be lost. If you can't come. you had better send me a testimonial by return of post. I shall try to do what I can with Digumber, though (as you know) I don't like him much. I don't think he is very sincere. Sumbhonauth said "এ বিষয়ে না জিত্‌লে আর মান থাকবে না।" He has great hopes of success if he be properly backed.

রাজা কালীকৃষ্ণ, রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকের সুপারিশ-পত্র মধুসূদন ২৫এ এপ্রিল তারিখে হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিলেন। এবার হাইকোর্টের বিচারপতিরা সন্তুষ্ট হইলেন। ৩রা মে তারিখে হাইকোর্টের Full Bench নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন :—

> Resolved that Mr. Datta be admitted an advocate of the High Court on the strength of his certificate of call and the testimonials now submitted.

মধুসূদন ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আয়ের অধিক ব্যয় করিতেন। একা থাকিলেও তিনি স্পেন্‌সেস হোটেলে তিনখানি বড় বড় ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। এখানে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ ঘন ঘন পান-ভোজনে

পরিতৃপ্ত হইতেন; এই সকল ব্যাপারে প্রচুর মদ্যও ব্যয়িত হইত। মাসে তাঁহার হাজার টাকার কমে চলিত না। ইহার উপর তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য ইউরোপে মাসে মাসে তিন-চারি শত টাকা পাঠাইতে হইত। মধুসূদন কোনরূপেই ব্যয় সঙ্কোচ করিতে পারিলেন না। ইউরোপ-বাসে তাঁহার যে ঋণ হইয়াছিল, তাহা শোধ না হইয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এদিকে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যথাসময়ে টাকা না পাওয়ায় প্রবাসে বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। মধুসূদন আবার বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করিলেন; তিনি লিখিলেন :—

I am glad you are better, for I want you to get me a thousand Rs. from Onoocool for Europe. If you had been a vulgar or common man like most of those who surround you, I should hesitate ta ask you to involve yourself again on my account, especially as old Sirish is assuming war-like attitudes. But though a Bengali, you are a man, and I believe you would risk anything to help a friend in such distress as I am! My poor wife is almost as badly off as I was when I first wrote to you, and I am perfectly helpless. What money I am making this month, I am paying to my hotel people, for I do not like the idea of being indebted here. Something is due to my position and some sacrifices are necessary....I have been very thoughtless perhaps, and have not managed matters well; but don't punish innocent people for my folly. If you don't get me this money before the French mail of the 25th, they will nearly perish in Europe....

...You and I—my good Vid.—have often done desperate things, and looked to the chapter of accidents to neutralize the effects of our *benevolent* folly. What has been the result? You are the greatest Bengali that ever lived and people speak of you with glowing hearts and tearful eyes; and even my worst enemies dare not say that I am a *bad* fellow!—Be bold and help again one who loves you and has no friend who seems to care for him except yourself—('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৪৫৭-৫৮)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগর অপরের নিকট হইতে টাকা লইয়া মধুসূদনকে বিপদের সময় ঋণদান করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তমর্ণদিগের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। উত্তমর্ণদিগের তাগিদে উত্যক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে এই পত্রখানি লেখেন :—

সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্—অদ্য সাতদিন হইল বর্দ্ধমানে আসিয়াছি, এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উপকার বোধ হয় নাই। আসিবার পূর্ব্বে আপনাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, এ জন্য লিপি দ্বারা জানাইতেছি। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোন ক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না, সুতরাং তাঁহারা অসন্দিগ্ধ-চিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া যে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ ঘটিয়াছে।

যৎকালে আমি অনুকূল বাবুর নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব ; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানির কাগজ ধার করিয়া টাকা না পাঠাইয়া দি। তাঁহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এই অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূল বাবু সত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই।

এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্ব্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল

হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনাদের নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমায় পরিত্রাণ করেন। পীড়া শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া এবং অন্ততঃ ছয় মাস কাল তথায় থাকা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে যাইব স্থির করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিস্তার না করিলে কোন মতেই যাইতে পারিব না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যাহা বিহিত বোধ হয় করিবেন, অধিক আর কি লিখিব, আমি নিজে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কার্য্য শেষ করিয়া লইব, আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন না। অনেক লিখিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ পারিলাম না। 'কিমধিকমিতি—

ভবদীয়স্য—

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

এই পত্রে মধুসূদন মর্ম্মাহত হইলেন; তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখিলেন :—

Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in this world that I would hesitate to do for you, of course you have my full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden. Srish has written to me offering 21,000. But don't you think Onookool would advance fresh money enough to pay off that man and hold the property by way of mortgage—usufructuary mortgage—I paying him the difference in the interest? If we can in this way save the estate let us do so, if not let them go. I wish I could run over and see you. Perhaps I shall do next Saturday.

—('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৪৬২)

বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন যে, মধুসূদন

ঋণস্বরূপ বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে যে টাকা লইয়াছিলেন, তাহার সবটা শেষ-পর্য্যন্ত পরিশোধ করিতে পারেন নাই। অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতির নিকট ধার করিয়া বিদ্যাসাগর বিপন্ন মধুসূদনকে সাহায্য করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুসূদন আর যাহাই হউন, অকৃতজ্ঞ ছিলেন না; তিনি স্বীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন।

১৩ মাঘ ১২৭৪ তারিখে লিখিত একখানি কবালার দ্বারা মধুসূদন চক মুনকিয়া ও চক গদারডাঙ্গা—এই উভয় মহাল মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষদা দেবীকে কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রয় করিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ তারিখে এই দলিল রেজেস্ট্রীকৃত হয়। ইহার কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> …এইক্ষণ আমি শ্রীযুত বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রায় ১৯,০০০৲ উনিশ হাজার টাকার দাইক হইয়াছি—তাহা পরিশোধের জন্য আমি উক্ত উভয় মহাল সংক্রান্ত আমার দরহস্ত হকুক মবলগে ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা মূল্যে আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম।…*

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মধুসূদনের পত্নী হেনরিএটা পুত্রকন্যা সহ কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। নিয়মিতভাবে অর্থ না পাওয়ায় ইউরোপে তাঁহারা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই মধুসূদন হোটেল ত্যাগ করিয়া ৬নং লাউডন স্ট্রীটের উদ্যানবেষ্টিত দ্বিতল ভবন ভাড়া করেন। ব্যারিষ্টারিতে তখন তাঁহার মন্দ আয় হইতেছিল না। মকদ্দমা উপলক্ষে তিনি মধ্যে মধ্যে মফস্বলেও যাইতেন।

---

* সমগ্র দলিলখানি ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র ৯৭০-৭১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

কিন্তু শুধু গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি বা কল্পনা থাকিলেই আইন-ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায় না। বিচারপতিদের মন-রাখা কথা বলিয়া ব্যারিষ্টারি-সুলভ কার্য্যসিদ্ধির কৌশলগুলি মধুসূদন আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। বিকৃত কণ্ঠস্বরও তাঁহার ভাষণ হৃদয়গ্রাহী হইবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

হাইকোর্টে চাকুরী

এক কথায় ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে মধুসূদনের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিল আপীলের অনুবাদ-বিভাগে পরীক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে তাঁহার নিয়োগে 'ইংলিশম্যান' ১৩ জুন ১৮৭০ তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন :—

> The appointment of Mr. M. S. Datta, Barrister-at-law, to the post of Examiner of the Privy Council Records in the High Court, appears from every point of view quite unobjectionable. The duties pertaining to this office are of great importance, and can only adequately be discharged by an officer of approved ability and high professional character. A better choice therefore could hardly have been made, nor would it be easy to find another Native gentleman so thoroughly intimate with the English language.

এই পদের বেতন ছিল এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা। ইহাতেও মধুসূদনের আর্থিক অনটন ঘুচিল না। তিনি প্রায় দুই বৎসর পরে এই পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন।

'হেক্টর-বধ'

বিলাত-প্রত্যাগমনের পর মধুসূদনের অর্থচিন্তাই প্রবল হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করেন

নাই। লাউডন ষ্ট্রীটের বাটীতে অবস্থানকালে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াস' নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান-ভাগ অবলম্বন করিয়া মধুসূদন বাংলায় 'হেক্টর-বধ' প্রকাশ করেন। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি পীড়িতাবস্থায় ইহা রচনা করেন। পুস্তকখানি তিনি বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 'হেক্টর-বধ' উপহার পাইয়া, ২৮ মার্চ ১৮৭২ তারিখে চুঁচুড়া হইতে ভূদেব যে পত্রখানি মধুসূদনকে লেখেন, তাহা ২৬এ এপ্রিল তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রে ভূদেব লেখেন :—

> তুমি স্বপ্রণীত হেক্টরবধ কাব্যগ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্য প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কখনই সেই সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত হই নাই, হইতেও পারি না। যৌবনসুলভ প্রবলতর আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টান্তই বিশেষরূপে তৎসমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবন কালের ভাব আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদিগের পরস্পর কত কথাই হইত,—কত পরামর্শই হইত,—কত বিচার ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আহা! তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা সম্বর্দ্ধনপূর্ব্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ

করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, অথবা হেক্টরবধ হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ, তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। তাই তোমার এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এ বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।...

ঢাকায় সম্বর্দ্ধনা

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে একটি মকদ্দমা উপলক্ষে পীড়িত অবস্থায় মধুসূদনকে ঢাকায় প্রায় ১০ দিন অবস্থান করিতে হয়।* এই সময় ঢাকাবাসীরা পোগোজ স্কুলে তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। অভিনন্দন-পত্রের খসড়া না-কি কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সম্বর্দ্ধনা-প্রসঙ্গে যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা আমি ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। বিবরণটি এইরূপ :—

* ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী' হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

"গত শনিবার ঢাকার জ্ঞানকরী সভায় বহু-বিবাহ নিবারণ বিষয়ের আন্দোলন হয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মনুবচনে বহু বিবাহের ব্যবস্থার স্থূল উল্লেখ করিয়াছিলেন। তথায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, দত্তজ মহাশয় মন্বাদি শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া তাহা বুড়ীগঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাঁহাকে একখানি আড্রেস দেন। তখন একজন বক্তৃতা কালীন বলেন যে, "আপনার বিদ্যা বুদ্ধি, ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।" মাইকেল মধুসূদন ইহার উত্তরে বলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যে [মনি] বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটী যশোহর।"

মধুসূদনের চরিতকারেরা মধুসূদনের ঢাকা-গমনের তারিখ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; সালটি যে ভুল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

'ঢাকা প্রকাশে'র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক অনাথবন্ধু মৌলিক মধুসূদনের ঢাকা-গমনের একটি বিবরণী লিখিয়াছেন ; তিনি বলেন :—

ঢাকায় মাইকেল—মাইকেল একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়া আরমাণিটোলা পোগজ সাহেবের বাড়ীতে থাকেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ঢাকায় দুটি সভা হয়। একটি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলগৃহে এবং অপরটি ঢাকা পোগজ স্কুলে। সে সভায় ঢাকার যাবতীয় বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, গোবিন্দ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকও ছিলেন। অভ্যর্থনা পত্রও দেওয়া হইয়াছিল। 'ঢাকা-

প্রকাশ' কার্য্যালয়ে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি party (সম্মিলন) হইয়াছিল। কবি গোবিন্দ রায় সে সময়ে 'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদক ছিলেন। আমি তাঁহার সহকারী ছিলাম।

একদিন মাইকেল তাঁহার বাসায় হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক গল্প করিতে করিতে সেখানেই একটি কবিতা লেখেন এবং কবি হরিশ্চন্দ্রও তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে একটি কবিতা লিখিয়া মাইকেলকে দেন। কবিতা দুটি আমার মনে পড়িতেছে 'হিন্দু-হিতৈষিণী'তে ছাপা হইয়াছিল। সে সময় ঐ কাগজের সম্পাদক কবি হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার সহকারী ছিলেন রাধারমণ ঘোষ।—'মধু-স্মৃতি', পৃ. ৫৩৫।

মধুসূদন নিম্নলিখিত কবিতায় ঢাকাবাসীর সম্বর্দ্ধনার উত্তর দিয়াছিলেন :—

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য-অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

পুরুলিয়া গমন

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মধুসূদন কোন মকদ্দমা উপলক্ষে পুরুলিয়া গিয়াছিলেন। তথাকার খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী তাঁহাকে মিশন হাউসে অভিনন্দিত করেন। এই উপলক্ষে মধুসূদন একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করেন; উহা সে সময়ে মিশনরী-পরিচালিত 'জ্যোতিরিঙ্গণ' পত্রের এপ্রিল ১৮৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুরুলিয়ায় অবস্থানকালে মধুসূদন একটি বালকের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণে ধর্ম্মপিতার (god-father) কার্য্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন, তাহাও 'জ্যোতিরিঙ্গণে' (নবেম্বর ১৮৭২) প্রকাশিত হইয়াছিল।

পঞ্চকোটের আইন-উপদেষ্টা

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মধুসূদন পঞ্চকোট রাজ্যের আইন-উপদেষ্টা (Legal Adviser) নিযুক্ত হন। তিনি তখন ভগ্নস্বাস্থ্য; বোধ হয়, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই রম্য প্রদেশে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজার আচরণে বিরক্ত হইয়া মাসকয়েক পরেই তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাজা প্যারীমোহন তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> The one that I at present recollect was in connection with his appointment as legal adviser of the Raja of of Purulia. He said that after he was for a few days with the Raja, the idea struck him that he could be happily compared to a street-hydrant of the Calcutta Water Works. Anybody who chose had only to pull it by the ear and then drink his fill! Mr. Datta was obliged to give up the appointment after a few month's service. He found it intolerable and quite at the mercy of the Raja's barber and other menials, a whispered hint from whom was enough to mar the fortunes even of his high officials. Mr. Datta

began to grow worse after he left the Raja's service —যোগীন্দ্রনাথ বসু : 'জীবন-চরিত,' ৪র্থ সং, পৃ. ৬৬৬।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে মধুসূদন পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু তখন তাঁহার অনবদ্য স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তিনি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত।

'মায়া-কানন' ও 'বিষ না ধনুর্গুণ'

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কয়েক জন ধনী মিলিয়া কলিকাতায় একটি ইংরেজী ধরণের সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। ইহারই নাম বেঙ্গল থিয়েটার। ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ ইহার ম্যানেজার ছিলেন। থিয়েটারের উদ্যোক্তারা নানা বিষয়ে মধুসূদনের পরামর্শ লইতেন। অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটরে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটর খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হইবে না।' মাইকেল ও শরৎ বাবুর ভগ্নীপতি Mr. O. C. Dutt (৺উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন।…('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১৩১)

ইতিপূর্ব্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষ কর্ত্তৃকই অভিনীত হইত। মধুসূদনেরই পরামর্শে এই নূতন নাট্যশালায় সর্ব্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' লইয়াই বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম আসরে অবতীর্ণ হন, এবং তাঁহার রচিত এই নাটকেরই স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনেত্রীর দ্বারা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ অভিনয়োপযোগী দুইখানি নাটকের জন্য

মধুসূদনকে ধরিলেন। মধুসূদনের স্বাস্থ্য তখন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর অর্থাভাব। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অগ্রে "উপযুক্ত মূল্য দিয়া ও পীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া" তাঁহাকে সম্মান করিয়াছিলেন। মধুসূদন পীড়িত-শয্যায় 'মায়া-কানন' নামে একখানি সম্পূর্ণ নাটক এবং 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকের কতকাংশ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর পর, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'মায়া-কানন' বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—

> বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িত-শয্যায় শয়ন করিয়া "মায়া-কানন" নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরাই তাঁহাকে দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদনুসারে তিনি 'মায়া-কানন' নামে এই নাটক ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং পীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া আমরা উভয়েই ঐ দুই নাটকের অধিকারিত্ব স্বত্ব ও বঙ্গরঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি।
>
> ...গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ করিতে পারা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল।...সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। 'বিষ না ধনুর্গুণ' সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র প্রকাশ করা যাইবে। কলিকাতা। পৌষ,—১২৮০। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ। শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক।

নগেন্দ্রনাথ সোম ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ৫২৭) ও অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন

সেন, *Western Influence In Bengali Literature*, pp. 237-38) লিখিয়াছেন যে, মধুসূদন 'মায়া-কানন' সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা ঠিক নহে। সোম মহাশয় আরও একটু ভুল করিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন, "মধুসূদনের শেষ নাট্যস্মৃতি 'মায়া-কানন' লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট প্রথমে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হয়। মধুসূদন তখন ইহজগতে নাই।" ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ৫২৭) বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয়—১৬ আগস্ট ১৮৭৩ তারিখে, 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' লইয়া মধুসূদনের অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যার্থ। ইহার অনেক পরে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল 'মায়া-কানন' সর্ব্বপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। বেঙ্গল থিয়েটার ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই এ-বিষয়ে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। বিজ্ঞাপন দুইটি এইরূপ—

> The Bengal Theatre,—...Next Saturday, Maya Kanan, or the Enchanted Grove, the posthumous production of the late Michael Modusudan Dutta, be produced. (The *Englishman* for 17 April, 1874.)
>
> Bengal Theatre...This Evening Saturday. 25th April, 1874. For the Second time. Maya Kanan ; or The Enchanted Grove By the late Mr. Michael M. S. Datta...(The *Englishman* for 25th April, 1874.)

শেষ-জীবন

মধুসূদনের আয়ুঃসূর্য্য ঢলিয়া পড়িল। রোগের যন্ত্রণা, তদুপরি ঋণের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি কিছু দিনের জন্য অন্যত্র গমন করিতে মনস্থ করিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে একবার তিনি মাস-তিনেকের জন্য

গঙ্গাতীরবর্ত্তী উত্তরপাড়া-লাইব্রেরি-ভবনের দ্বিতলে বাস করিয়াছিলেন; এবারও তিনি জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সাদর আহ্বানে তথায় সপরিবারে গিয়া উঠিলেন (এপ্রিল ১৮৭৩)। মধুসূদনের এই পীড়িতাবস্থায় জয়কৃষ্ণের পৌত্র রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন; বন্ধুরাও মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন। তিনি ক্রমেই উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পত্নী হেনরিএটাও বিষম জ্বরে শয্যাশায়িনী হইলেন। এই সময়ের এক দিনের ঘটনা গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

> I shall never forget the heart-rending sight I witnessed on the last occasion on which I visited Modhu in the rooms of the Uttarparah Public Library, where he was staying for a change. He was in bed, gasping under the excruciating effects of his disease, blood oozing from his mouth, his wife lying in high fever on the floor. Seeing me enter the room, Modhu sat up a little and burst into tears. The pitiable condition of his wife had unmanned him, he heeded not his own pangs and suffering; "affliction in battalions" were the words he uttered. I knelt down to feel her pulse and temple; she pointed with her finger towards her husband, heaved a deep sigh and sobbed out in a low voice. "Look to him, tend him, leave me alone. I care not to die!"

রোগের প্রশমন হইল না দেখিয়া মধুসূদন ও তাঁহার পত্নী পীড়িতাবস্থায় ইটালি বেনিয়াপুকুর রোডের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তাঁহারা দুই তিন সপ্তাহ কাটাইয়াছিলেন মাত্র। অতঃপর মধুসূদনের শেষ কয়টি দিনের করুণ কাহিনী আমরা 'মধু-স্মৃতি'-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ সোমের ভাষায় বর্ণনা করিব।

"হেনরিয়েটা যদি সুস্থ থাকিতেন, তাহা হইলে মধুসূদন পত্নীর সেবা-শুশ্রূষা লাভ করিয়া, ইটালীর বাটীতেই তনুত্যাগ করিতে পারিতেন।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। বেনিয়াপুকুরের বাটীতে মধুসূদনের সুচিকিৎসা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে অন্তিম কালে মাইকেল মধুসূদনের চিকিৎসা ও সেবার ক্রটি না হয়, তজ্জন্য ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ও মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী পরামর্শ করিয়া, মধুসূদনকে জেনারেল হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার বাসনা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও এক অন্তরায় ছিল। জেনারেল হাসপাতালে ইংরেজ ও য়ুরোপীয়েরাই চিকিৎসিত হইতেন। সে সময়ে যুরেশীয়ান, য়িহুদী, পারশী এবং বিলাত-প্রত্যাগত দেশীয় খ্রীষ্টানদিগকে সেখানে লওয়ার রীতি ছিল না। কিন্তু ডাক্তার সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তীর এবং অন্যান্য দুই-একজন উচ্চ ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীর বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে Alipore General Hospital-এ Indoor patient করা হইয়াছিল। কাযেই পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় বিদূরিত হইয়াছিল। তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ-ভিষক্ ডাক্তার পামার (W. J. Palmer M. D.) জেনারেল হাসপাতালের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে মধুসূদনের পরিবারে চিকিৎসা করিতেন বলিয়া, ইঁহার সহিত মধুসূদনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুতরাং মধুসূদনের পক্ষে সে সময়ে যতদূর পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট চিকিৎসা সম্ভবপর হইতে পারে তাহার ক্রটি হয় নাই*।…

* যোগীন্দ্রনাথ বসু 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিতে' (৪র্থ সং, পৃ. ৬১৪) লিখিয়াছেন :—"তাঁহারা যদি, কোনরূপে মধুসূদনের দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গসমাজ একটি গুরুতর লজ্জা হইতে রক্ষা পাইত। বঙ্গদেশের আধুনিক সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি অনাথ ও ভিক্ষুকদিগের সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, পরে, কবির স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেও এ কলঙ্ক মোচন হইবে না।"

"১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষভাগে মুমূর্ষু মধুসূদনকে তাঁহার কুটুম্ব ও বন্ধুগণ জেনারেল হাসপাতালে লইয়া গেলেন।...

"মধুসূদন যে কয়দিন হাসপাতালে ছিলেন, সে কয়দিন, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ, এবং অনেক পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে প্রত্যহই দেখিতে যাইতেন। তিনি তাঁহাদের সহিত নিজের অতীত জীবনের আলোচনা করিতেন, এবং অনেককে সদুপদেশ দিতেন। যখন একটু ভাল থাকিতেন, তখন তাঁহার স্বভাব-জাত সরস কথাবার্ত্তায় সকলকে বিমোহিত করিতেন।...হাসপাতালে আসিয়া মধুসূদন প্রথমে দুই-চারি দিন একটু ভাল ছিলেন ;...

"এদিকে ত মধুসূদনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। ওদিকে বেণিয়া-পুকুরে তাঁহার পত্নীর রোগের অবস্থা চরম সীমায় উপনীত হইল। স্বামী-বিরহিতা অভাগিনী মৃত্যুশয্যায় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন, বৃহস্পতিবার, স্বামীর মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বেই মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া, এই অশান্ত সংসারে চির-অশান্ত মধুসূদনের নিমিত্ত শান্তির নীড় রচনা করিবার জন্য, অধীরা হইয়া পলায়ন করিলেন। মধুসূদন পত্নীর সহিত পৃথিবীতে শেষ সাক্ষাৎ করিতে পান নাই। তাঁহার সতীলক্ষ্মী পত্নীর শবদেহ সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত জে. লিউইস্ এণ্ড কোম্পানী তাঁহার শববাহী শকটে লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গেলেন।...

"হেন্‌রিএটার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মধুসূদনের এক পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয় প্রভুকে তাঁহার পত্নীবিয়োগ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। মুমূর্ষু, আর্ত্ত মধুসূদন শুষ্ককণ্ঠে,

---

[1] বসু-মহাশয়ের এই উক্তি মোটেই সমীচীন হয় নাই। কলিকাতায় যত দূর সুচিকিৎসা সম্ভব, মধুসূদনের বন্ধুরা তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—শ্রীব্র.

রুদ্ধস্বরে কেবল বলিলেন, 'জগদীশ! আমাদিগের দুই জনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্বরই হেন্‌রিএটার অনুবর্ত্তী হইব।' এই শোক-সংঘাতেই মধুসূদনের জীর্ণ বক্ষপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল!...

"সেই নিশীথের ঘন অন্ধকারে, বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে, ম্লান বদনে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, মধুসূদনের দুই জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আলিপুরের চিকিৎসালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।...তাঁহারা ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধুসূদনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মুমূর্ষু মধুসূদন মুদিত নেত্রে শয্যায় শায়িত হইয়া আছেন। জনৈক বালক-ভৃত্য তাঁহার শয্যাতলে বসিয়াছিল। তাঁহাদের পদশব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মধুসূদন চক্ষু চাহিয়াই অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি ত হয় নাই? কে কে, উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি?' মনোমোহন ঘোষ বলিলেন 'সকলই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে; কোন ত্রুটিই হয় নাই। বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে সংবাদ প্রেরণের সময় হয় নাই।' এই কথা শুনিয়া মধুসূদন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে মনোমোহনকে বলিলেন, 'তুমি ত শেক্সপিয়র পড়িয়াছ, সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?' মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, 'কোন কয়টি পংক্তি?' মধুসূদন,—'লেডী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যুতে ম্যাক্‌বেথ যাহা বলেন? আমার স্মৃতিলোপ হইয়া আসিতেছে, কোন কথাই আর আমার স্মরণ হয় না।' এই বলিয়াই তিনি ম্যাক্‌বেথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি সুস্পষ্টরূপে আবৃত্তি করিলেন;—

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,

To the last syllable of recorded time ;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out—brief candle,
Life's but a walking shadow ; a poor player.
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury.
Signifying nothing—

"মৃতকল্প মধুসূদনের মুখে উক্ত প্রাণময় আবৃত্তি শুনিয়া মনোমোহন ঘোষ বিচলিত হইয়া বলিলেন, 'এ সকল কথায় কায নাই। আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।' এই কথায় ঈষৎ হাসিয়া মধুসূদন বলিলেন, 'ডাক্তার পামার অত্য যখন আমার প্লীহা যকৃতের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন আমার নির্ব্বন্ধতাতিশয্যে নিতান্ত অনিচ্ছায় জানাইয়াছেন যে, আর দুই-তিন দিনের মধ্যেই আমাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব ভাবিয়া দেখ, আমার দিন, ঘণ্টা, মিনিট সীমাবদ্ধ। You see, Monu, my days are numbered, my hours are numbered, even my minutes are numbered. এক্ষণে আমার এই শেষ অনুরোধ যে, তোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্র দুটি তোমার পুত্রগণের সহিত অন্ন পায়। তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্তমনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি। 'If you have one bread, you must divide it between yourself and my children ; if you say, you will, I depart with consolation.' প্রত্যুত্তরে মনোমোহন ঘোষ বলিলেন ;—'আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আমার পুত্রগণ একমুষ্টি খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আপনার পুত্রদ্বয়কে না দিয়া কখনও খাইবে না।'...এই কথায় পুলকপূর্ণ হইয়া, মনোমোহনের হস্ত ধারণ করিয়া মধুসূদন আবেগে বলিয়া উঠিলেন, 'God bless

you, my boy.' তৎপরে মনোমোহন ও বন্ধুদ্বয় সাশ্রুনয়নে বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

"ক্রমেই মধুসূদনের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। পত্নীবিয়োগের পর হইতেই তাঁহার পীড়াসমূহের আর লাঘবের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল না।...

"তাঁহার ভবযন্ত্রণা সমাপ্তির পূর্ব্বদিনে তিনি তাঁহার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপথের প্রথম বন্ধু—দীর্ঘ মাদ্রাজ-প্রবাস সময়ে স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য প্রথম সংবাদদাতা—প্রত্যাগতের বঙ্গদেশে প্রথম অভ্যর্থনাকারী, রেভারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার নিকটে আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরণ করিলেন।...কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন; দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন, তিনি ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেন এবং তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিতেছেন। মধুসূদন বলিয়াছিলেন, 'আমি সেই দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি। তিনি যে পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য, খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।' রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জী সময়োচিত প্রার্থনা করিলেন এবং ধর্ম্মযাজকের প্রথানুযায়ী মধুসূদনকে ভগবানের আশীষ প্রদান করিলেন।

"মধুসূদনের আর বাঁচিবার আশা নাই, এব[ং] পূর্ব্ব হইতেই জনসমাজে প্রচারিত ও বিঘোষিত হইয়াছিল। মধুসূদন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বিষয় লইয়া খ্রীষ্ট-সমাজে মহা আন্দোলন চলিতেছে।...মধুসূদনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে, এই সকল কথা উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণমোহন মধুসূদনকে বলিলেন, 'তুমি জীবনে কোন গির্জ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তোমার অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া

যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি তোমার অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি লইয়া আসি।' ইহা শুনিয়া তেজস্বী মধুসূদন বলিলেন, 'আমি মনুষ্য-নির্ম্মিত গির্জ্জার সংস্রব গ্রাহ্য করি না; আমার কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই; আমি ঈশ্বরে বিশ্রাম করিতে যাইতেছি, তিনি আমাকে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামাগারে লুকাইয়া রাখিবেন! ("I am going to rest in my Lord! He will hide me in His best resting-place!") আমাকে তোমরা যে কোন স্থানে প্রোথিত করিও—সে স্থান তোমার গৃহদ্বারের নিকটেই হউক, কোন তরুতলেই হউক, কিম্বা কোন নিভৃত-নির্জ্জন স্থলেই হউক না কেন? কেবল আমার এই মাত্র শেষ অনুরোধ যেন আমার দেহাস্থি বিড়ম্বিত না হয়। পৃথিবীতলে শ্যামশষ্পই যেন আমার সমাধি আচ্ছাদন করিয়া রাখে।'...

"১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, প্রাতঃকাল হইতেই মধুসূদনের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। প্রাবৃটের নিবিড় মেঘচ্ছায়ার ন্যায় অকরুণ মৃত্যুর ভীষণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল! সেই দিনই—সেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন, রবিবার, বেলা দুইটার সময় জামাতা, পুত্র-কন্যা-শুশ্রূষাকারিণী পরিবেষ্টিত শ্রীমধুসূদনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল!...

বঙ্গের পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।

Bengala! thou proudest lotus in th' Eastern main,
Thy Sun of glory has set, ne'er to rise again!!!

অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও সমাধি

"মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদ বিদ্যুৎগতিকে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ...মধুসূদন রবিবার অপরাহ্নে মানবলীলা সম্বরণ করেন। অবিরাম জন-সমাগমে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের মতভেদ ও বাদানুবাদে, বন্ধুগণের পরামর্শ প্রভৃতি নানা কারণে সেই দিন তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার মৃতদেহ পুষ্পাচ্ছন্ন করিয়া ২৪ ঘণ্টারও অধিককাল মৃতাগারে সুরক্ষিত হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবির শ্মশান-যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

"পরদিন ৩০ জুন সোমবার (খ্রীঃ ১৮৭৩) অপরাহ্নে মধুসূদনের মৃতদেহ টমাস এণ্ড কোম্পানী লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া গেলেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মধুসূদনের ব্যারিষ্টার বন্ধুগণ তাঁহার কন্যা-পুত্র জামাতা ও অন্যান্য কুটুম্বগণ, বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এবং তাঁহার স্বদেশবাসী প্রায় সহস্র ব্যক্তি ধীরে—নীরবে—সাশ্রুনয়নে তাঁহার শবাধারবাহী মন্থরগতি শকটের অনুগমন করিয়াছিলেন।...

"যখন মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া খ্রীষ্টান-সমাজে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, যখন মতভেদ-নিবন্ধন পাদরিগণ লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য যুক্তি ও পরামর্শ করিতেছিলেন,—তৎপূর্ব্বেই সেণ্ট জেমস্ গির্জ্জার ধর্ম্মাচার্য্য (Chaplain) রেভারেণ্ড ডাক্তার পিটার জন জার্বো স্ব-ইচ্ছায় মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-নির্ব্বাহের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্য করেন নাই। এমন কি, তিনি মধুসূদনের পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত লর্ড বিশপের অনুমতির অপেক্ষা রাখেন নাই। মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-সমস্যার সময় মহামতি জার্বো নির্ভীক চিত্তে মতবিরোধী পাদরিদিগকে বলেন

যে, 'যখন তিনি খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হইয়া মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন, তখন কেন আমরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিব না? তাঁহার যে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ছিল না, এ কথা কে বলিতে পারেন?'…

"কবির শবাধার সমাধি-বিবরের উপরিভাগে নীত ও সুরক্ষিত হইলে রেভারেণ্ড জার্‌বো মহোদয় Anglican Church এর ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিধি-অনুষ্ঠানানুযায়ী মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ডাক্তার জার্‌বো এবং কবির আত্মীয়-স্বজন সকলে এক-এক মুষ্টি মৃত্তিকা শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিলে, শেষ-ক্রিয়া সমাধার পর বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত জনমণ্ডলী শবাধার পুষ্পে পুষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে শববাহকেরা উন্মুক্ত ধরিত্রীগর্ভে কফিনে-সমন্বিত শবাধার ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। তৎপরে মৃত্তিকারাশির দ্বারা সমাধি-বিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল! কবি উল্‌ফের কথায়:—

Slowly and sadly we laid him down,
From the field of his fame, fresh and gory;
We carved not a line, and we raised not a stone—
But we left him alone with his glory.

সমাধি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা

"১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার একেশ্বরবাদী পাদরি ডল (Rev. C. H. A. Dall) সাহেবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার সমাধি উপলক্ষে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভদ্র ব্যক্তিগণ সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হন। সেই সময়ে তাঁহারা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, মাইকেলের সমাধিস্থানের উপর কোন স্মৃতি-চিহ্ন নাই; তদুপরি কোন স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তদানুসারে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমাধি-নির্মাণ ফণ্ড' (Michael Madhusudan Datta Tombstone

Erection Fund) নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া, স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, মহারাজা স্তর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ ধনকুবের রাজা-মহারাজা হইতে পল্লীনিবাসী সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত মধুসূদনের সমাধি নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন।

"এই স্থানে সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ-কমিটি সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। মধ্যবঙ্গ সম্মিলনীর (Central Bengal Union) সভ্যগণ প্রথমে কমিটি গঠন করিয়া স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনকে তাঁহাদের অবৈতনিক সম্পাদক এবং ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু মধুসূদন যশোহরের অধিবাসী বলিয়া যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য স্বীকৃত হইলে, পূর্ব্বোক্ত সম্মিলনী পরমাহ্লাদে তাঁহাদের সহিত একত্রীভূত হইয়া কার্য্য করিতে সম্মত হন। দেশের আপামরসাধারণ এ কার্য্যে সোৎসাহে অর্থ প্রদান করাতে অচিরে তাঁহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির উপায় হইল। ··

"কমিটির সংগৃহীত অর্থে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ও স্তম্ভ-নির্ম্মাণকারী Messrs. Llewelyn and Co. কবির সমাধিস্থলে সুন্দর মর্ম্মর নির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিলেন; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাসমারোহে সাধারণের সম্মুখে মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেন। এই দিন বঙ্গদেশের একটি স্মরণীয় দিন।···

"উপস্থিত নর-নারীগণ সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ কবির স্বরচিত সমাধি-লিপি (Epitaph) পাঠ করিতে লাগিলেন। কবির আত্মা সমাধির অলক্ষ্যে থাকিয়া বাঙ্গালার পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

"সমাধি-স্তম্ভের অপর পার্শ্বে (পশ্চিম মুখে) ইংরেজী ভাষায় নিম্নলিখিত সমাধিলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে :—

IN MEMORY OF
MICHAEL MADHU SUDAN DATTA
One of the greatest poets of Bengal,
especially distinguished
AS AN EPIC POET
and as the first Bengali writer of blank verse.
BORN AT SAGARDARI IN THE DISTRICT OF JESSORE
in 1828 A. D.
DIED ON THE 29th JUNE, 1873, A. D.
This tomb is erected in the year 1888
by his grateful and admiring
COUNTRYMEN.

LLEWELYN & CO."

গ্রন্থাবলী

মধুসূদন যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটি কালানুক্রমিক পঞ্জী দেওয়া হইল :—

বাংলা

১। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। জানুয়ারি ১৮৫৯। পৃ. ৮৪।

২। একেই কি বলে সভ্যতা? ইং ১৮৬০। পৃ. ৩৮।

৩। বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। ইং ১৮৬০। পৃ. ৩২।

৪। পদ্মাবতী নাটক। এপ্রিল (?), ১৮৬০। পৃ. ৭৮।

৫। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। মে, ১৮৬০। পৃ. ১০৪।

৬। মেঘনাদবধ কাব্য, ১ম খণ্ড। জানুয়ারি, ১৮৬১। পৃ. ১৩১।
„ ২য় খণ্ড। ইং ১৮৬১। পৃ. ১০৭।

৭। ব্রজাঙ্গনা কাব্য। জুলাই, ১৮৬১। পৃ. ৪৬।

৮। কৃষ্ণকুমারী নাটক। ইং ১৮৬১। পৃ. ১১৫।

৯। বীরাঙ্গনা কাব্য। ইং ১৮৬২। পৃ. ৭০।

১০। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। আগস্ট, ১৮৬৬। পৃ. ১২২।

১১। হেক্‌টর-বধ। সেপ্টেম্বর, ১৮৭১। পৃ. ১০৫।

১২। মায়া-কানন। ইং ১৮৭৪। পৃ. ১১৭।

অল্প দিন হইল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মধুসূদনের সমগ্র বাংলা রচনাবলী 'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী' নামে এক খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ। সম্পাদকীয় ভূমিকায় প্রত্যেক গ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

ইংরেজী

1. *The Captive Ladie.* Madras, 1849. pp. 65.
2. *The Anglo Saxon and the Hindu* (Lecture—1). Madras, 1854.
3. *Ratnavali.* A Drama in four acts, Translated from the Bengali. 1858. pp. 57.
4. *Sermista.* A Drama in Five Acts, Trans. from the Bengali by the Author. 1859. pp. 72.
5. *Nil Durpun*, or The Indigo Planting Mirror, A Drama trans. from the Bengali by A Native. With an Introduction by the Rev. J. Long. 1861. pp. 102.

মধুসূদন ও বাংলা-সাহিত্য

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষের পর বাংলা দেশের সাহিত্যে যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে তাহা হইতেই বাংলা-সাহিত্যের ভাবরাজ্যে নবজাগরণ হয়; এই নবজাগরণ-যুগের প্রথম এবং প্রধান ফল মধুসূদন। পুরাতন যুগের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পূর্ণপ্রভাবকালেই মধুসূদনের প্রতিভা কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন :—

> বঙ্গসাহিত্য আকাশে মধুসূদন যখন উদিত হইলেন, তখনও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা গুপ্ত কবির রসিকতা ও চিত্তরঞ্জক ভাব সকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে

ধক্ ধক্ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল। বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব্ব প্রদোষকালের কথা আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না। সংস্কৃত কবি এক স্থানে বলিয়াছেন—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন। অপর দিকে অরুণকে অগ্রসর করিয়া দিবাকর দেখা দিতেছেন।

বঙ্গসাহিত্যজগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল! ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে মধুসূদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়া পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন।—২য় সংস্করণ, পৃ. ২২৭-৮।

এই নূতন জগৎ নানা দিক্ দিয়া বিচিত্র। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা যদি প্রতিভার বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্যে মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শুধু ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বা অমিত্রাক্ষর ছন্দই নয়, বাংলা কাব্যে "চতুর্দ্দশপদী" নামীয় সনেট মধুসূদনের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার। আধুনিক রীতিসম্মত লিরিক বা গীতি-কবিতার প্রবর্ত্তক তিনি; ইতালীয় কবি ওভিদের "Heroic Epistles"-এর ধরণে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' পত্রচ্ছলে কাব্যরচনার যে রীতি তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষায় তাহাও নূতন। ফরাসী কবি La Fontaine-এর ধরণে "নীতিগর্ভ" কবিতারও তিনি প্রবর্ত্তক। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার মহাকাব্যের তিনি একমাত্র জনয়িতা—'মেঘনাদবধ' বাংলা ভাষায় একমাত্র মহাকাব্য।

কাব্য ও কবিতায় নূতনত্ব সম্পাদন ছাড়াও বাংলা-সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও মধুসূদনের কীর্ত্তি অতুলনীয়। বাংলা ভাষায় প্রহসন

তিনিই সর্ব্বপ্রথম রচনা করেন এবং তাঁহার রচিত প্রহসন দুইটি আজিও প্রহসনের আদর্শ হইয়া আছে; ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংলা ভাষায় নাটক-রচনায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন এবং সাফল্য লাভ করেন। তাঁহার অসম্পূর্ণ 'হেক্টর-বধ' বাংলা গদ্যের একটি নূতন বিশিষ্ট রূপ।

উচ্চ প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সৃষ্টি বাতিল বা out of fashion হইয়া যায় না। ভাষার এবং ভাবের এমন একটি শাশ্বত মহিমা ইহাদের সৃষ্টির মধ্যে বজায় থাকে, যাহাতে যুগে যুগে তাঁহারা স্বীকৃত ও গ্রাহ্য হন। এই শাশ্বত মহিমা মধুসূদনের রচনায় এত অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান যে, তাঁহার মহাকাব্যকে, তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাকে এবং তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যকে আজিও নবতন কোনও কবি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কাব্যের দিক্ দিয়া এই বিচার বাংলা দেশে বারংবার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রহসন দুইটিতে তিনি কথোপকথনের যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার শক্তি যে এ যুগের পক্ষেও অনবদ্য আছে, এই সত্যের উল্লেখ আমরা সচরাচর করি না। মধুসূদনকে আমরা কবি হিসাবে দেখিতেই অভ্যস্ত; তাঁহার অন্যান্য শিল্পসৃষ্টি অনেক সময়েই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। মধুসূদনকে সমগ্রভাবে বিচার করিতে হইলে এগুলি লইয়াও আলোচনা আবশ্যক। এই আলোচনা সুষ্ঠুভাবে হইলে আমরা দেখিব, বাংলা-সাহিত্যকে একা মধুসূদন একাধিক শতাব্দীর উন্নতিমহিমামণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রারম্ভে দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন—

কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি

সে দম্ভ দিষ্ফল হয় নাই, অন্ততঃ আজ অবধি তাহা সত্য আছে।

মধুসূদন-চরিত্রের আর একটি দিক্ সম্বন্ধে উল্লেখ না করিলে তাঁহার

পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না; সে তাঁহার স্বজাতিপ্রেম ও দেশীয় সংস্কারপ্রীতি। এই প্রেম ও প্রীতি ছিল বলিয়াই তাঁহার দ্বারা বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচনা সম্ভব হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'আত্ম-চরিতে' এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

তিনি [মধুসূদন] আমাকে বলিলেন যে "ভবিষ্যৎ বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।" তাহার পর অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় বলিলাম যে "আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতন হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু; কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না এই জন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁসিয়া আছি।" (পৃ. ১০৯)

কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে আচার্য্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মধুসূদন সম্পর্কে কোনও সমালোচকের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"Michael Madhusudan Datta was wayward as a son, wayward as a husband, wayward as a father, wayward as a student, but his waywardness in poetry alone payed."—(মানসী, বৈশাখ ১৩২১)

সমালোচকের এই মন্তব্য সর্ব্বৈব সত্য।

প্রাচীন ভারতের এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সর্ব্ববিধ পুরাতন সংস্কার তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুরাতন ভিত্তির উপরেই নূতন সৌধ গড়িতে পারিয়াছিলেন, সর্ব্বসংস্কারমুক্ত বিদ্রোহী হইলে তাঁহার কীর্ত্তি স্থায়ী রূপ লইত না। মধুসূদন-সম্পর্কে আজ সেই কথাটাই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৪

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
হরিশ্চন্দ্র মিত্র

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
হরিশ্চন্দ্র মিত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫৯...

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

১৮৩৪—১৯০৭

যে-সকল কাব্যগ্রন্থ বাংলা-সাহিত্যের সম্পদস্বরূপ, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক' তাহাদের অন্যতম। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া এই গ্রন্থখানি খাঁটি সোনা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং ইহার রচয়িতা অমর কবিকীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের প্রথম ভাগে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। অফুরন্ত শাশ্বত কাব্যসম্পদ বইখানিকে নব্বই বৎসর পরেও কাব্যরসিকদের নিকট সমান আদরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র-রচিত অন্যান্য গদ্য-পদ্য রচনার কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু 'সদ্ভাবশতকে'র কবি হিসাবে তিনি আজও বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের নিকট স্মরণীয় এবং বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

কিন্তু শুধু কবি-কৃতির জন্য নয়, আর একটি কারণেও কৃষ্ণচন্দ্র বাঙালী জাতি—বিশেষভাবে পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের সংস্কৃতি-কেন্দ্র ঢাকার প্রথম মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনার গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য। বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া একজন কৃতী সংবাদপত্রসেবীরূপে জীবদ্দশায় তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশবাসী তাঁহার সে কৃতিত্বের কথা আজ ভুলিতে বসিয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনও বৈচিত্র্যময়; শৈশবকাল হইতেই দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনের যাত্রা সুরু হয়। যৌবনে অভাব-অনটন ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জীবন কাটিলেও কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন আশৈশব খেয়ালী প্রকৃতির; নিজের প্রবৃত্তির বশেই বরাবর চালিত হইতেন, কখনও আত্মসংযম অভ্যাস করেন নাই। সেই জন্য কুসঙ্গে পড়িয়া তিনি সুরাপানে পর্য্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। অব্যবস্থিতচিত্ততাবশতঃ যৌবনে তিনি স্বধর্ম্মের উপরও বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত সুরাপানের কুফল মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া এই কদভ্যাস পরিত্যাগ করেন এবং অন্তিমকালে হিন্দুধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলেই শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের উপর দিয়া অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা তাঁহাকে সাহিত্য-সাধনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এই দারিদ্র্যপীড়িত নিষ্ঠাবান্ সাহিত্য-সাধকের জীবনকথা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

জন্ম ঃ বাল্যজীবন ও বিবাহ

১৮৩৪ সনের ১০ই জুন (২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১) ভৈরবনদতটবর্ত্তী সেনহাটি গ্রামে এক বৈদ্য-পরিবারে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্ম হয়। সেনহাটি বর্ত্তমানে খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও তৎকালে জেলা যশোহরের অধীন ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার নাম—মাণিক্যচন্দ্র মজুমদার। তিনি লিখিয়াছেন :—"ছেলেবেলায় আমার গুপ্তনাম রামচন্দ্র দাস ছিল। দাস গুপ্ত আমাদের বংশোপাধি।"

'অনুসন্ধান' পত্রিকায় প্রকাশিত কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মস্মৃতি হইতে যে-সকল বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার শৈশব এবং কৈশোরের দিনগুলি অতিবাহিত হয় তাহা জানিতে পারা যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের বাল্যজীবন বড়ই দুঃখময়। শৈশবে পিতৃহীন এই বালককে পরানুগ্রহে, পরাশ্রিত অবস্থায় থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন :

> "খুলনা জেলায় সেনহাটী গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমরা জাতিতে বৈদ্য। আমার পিতার নাম ৺মাণিক্যচন্দ্র মজুমদার।...সন ১২৪১ কি ৪২ সালে* আমার জন্ম হয়। আমার বয়স যখন ৬ মাস মাত্র, সেই সময়ই আমার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন আমরা দুই ভাই ছিলাম। আমার যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহার বয়স তখন ১০।১১ বৎসর মাত্র ছিল। কিন্তু, পিতার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই, আমার জ্যেষ্ঠেরও কাল হয়। পিতা সম্পত্তি কিছুই রাখিয়া যাইতে

---

* কৃষ্ণচন্দ্র অন্যত্র আবার নিজ জন্ম-সন "১২৪৪।৪৫ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস" বলিয়াছেন (দ্র° 'জীবন-চরিত' : ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৭)। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জন্ম-সন হিসাবে ১২৪১, ১২৪২ ও ১২৪৪ এই তিন বৎসরের উল্লেখই পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার জন্ম-তারিখ—২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১ গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ করিয়াছি। এই তারিখ অশ্বিনীকুমার সেন-লিখিত 'সম্ভাব-শতকের কবি' পুস্তিকা হইতে গৃহীত। অশ্বিনীকুমারের নিবাসও সেনহাটি; তিনি কবির সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তৎপুত্র উমেশচন্দ্রের সাহায্যে কবির জীবনীর বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার লিখিয়াছেন :—"বঙ্গীয় ১২৪১ সালের ২৯এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার [?] শিলাবৃষ্টির ঘোর দুর্য্যোগের রাত্রিতে আমাদের কবি ভূমিষ্ঠ হন।" ১২৯৭ সালে 'অনুসন্ধান' পত্রের প্রতিনিধি কালিদাস লাহিড়ীর নিকট বিবৃত স্মৃতিকথায় কবি বলেন, "আমার বয়ঃক্রম এখন ৫৫।৫৬ বৎসরের অধিক নয়"; ইহা হইতেও তাঁহার জন্ম-সন ১২৪১ পাওয়া যায়।

পারেন নাই ; জীবিতকালে তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তিনি ব্যয় করিয়া যান। কাজেই, পিতার মৃত্যুর পর হইতেই আমরা বিষম সাংসারিক কষ্টে পতিত হই। কি করিয়া আমাদের মানুষ করিবেন, আমার মাতা ঠাকুরাণী এই ভাবনাতেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। কিন্তু আমার পিতার মাতামহ বরিশাল—কীর্ত্তিপাশার জমীদার ৺রাজারাম সেন মহোদয়, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক, এই সময়, তাঁহাদের জমীদারী হইতে আমাদের কিছু কিছু বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। তাহাতেই একরূপ কষ্টেস্ষ্টে আমাদের জীবন ধারণ চলিত। এইরূপে পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ই আমার যথারীতি হাতেখড়ি দেওয়া হইয়াছিল ; এবং আমি গ্রাম্য পাঠশালে গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িতাম ও লিখিতাম। মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তি-পাশার জমীদার মহাশয়দের বাড়ীতে থাকিয়াও তত্রত্য পাঠশালায় পড়িয়াছিলাম। ইহার পর, ১০।১২ বৎসর বয়সের সময়, আমাদের পুরোহিত ৺পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমি 'কলাপ ব্যাকরণ' পড়িতে আরম্ভ করি। তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে অপর কোন কোন পণ্ডিতের নিকটও ব্যাকরণের পাঠ বলিয়া লইতাম।

ইহার পূর্ব্বেই রাজারাম সেনের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। অধিকন্তু, প্রবাদ আছে, এই সময়ে বিষপ্রয়োগে, রাজারামের পৌত্র রাজকুমার সেনের মৃত্যু হয়। তাই, তৎপুত্র (রাজকুমার সেনের পুত্র) প্রসন্ন-কুমার সেন নাবালক অবস্থায় 'কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের' অধীন বরিশালে পড়িবার জন্য গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে অবসর বুঝিয়া, আমিও তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিলাম ; এবং তাঁহারই বাসায় আহারাদি করিয়া, তাঁহারই ব্যয়ে, পারশী ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। এ সময় আমার বয়স ১৪।১৫ বৎসর। ৺বরদাচরণ সেন, ৺চন্দ্রকান্ত সেন,

৺কৃষ্ণকুমার গুহ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, তৎকালে আমাকে পারস্ত ভাষা শিক্ষা দিতেন।

অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্ত কৃষ্ণচন্দ্রের বিদ্যাচর্চা যে অব্যাহতভাবে চলিতে পারে নাই তাহা তাঁহার নিজের উক্তিতেই পরিস্ফুট :—

কিন্তু এই সময়, অপর কতকগুলি সহপাঠীর কুপরামর্শে পড়িয়া, আমি একটা বড় কুকাজ করিয়া ফেলি। তাহাদের সহিত যোগ করিয়া, লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, আমরা কলিকাতায় পলাইয়া যাই। ইহাই আমার লেখা-পড়ার প্রথম অন্তরায়।...

যাহাই হউক, অবশেষে, কলিকাতায় কালীঘাটে গিয়া আমরা ধরা পড়ি। কীর্ত্তিপাশারই একজন আত্মীয় ধরিয়া আমাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দেন। কিন্তু লজ্জায় আর আমি এ সময় বরিশালে যাইতে পারিলাম না। কাজেই, পড়াশুনার একরূপ বাধা পড়িল। তবে বাড়ী বসিয়া, ৺দুর্গাশঙ্কর দাস নামক আমার এক জ্ঞাতির নিকট, যা কিছু মধ্যে মধ্যে, আবার পার্শিই পড়িতে লাগি[illegible]ম। এ সময় আমার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইবে।

এই সময় প্রসন্ন বাবু বরিশাল হইতে ঢাকায় গমন করেন—অবশ্য 'কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের' তত্ত্বাবধানে থাকিয়াই। কি জানি কি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব লজ্জাসরম ভুলিয়া গিয়া, আমিও আবার তথায় উপস্থিত হই। ('অনুসন্ধান,' ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮, পৃ. ৩৫৮-৫৯)

কৃষ্ণচন্দ্র 'রা, সের ইতিবৃত্ত' নামে যে আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে এক দিকে যেমন এই সময় তাঁহার মনোজগতে নানা পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্ত দিকে তেমনি ধর্ম্মজীবনের অস্ক-

তাঁহার অন্তরে কি প্রগাঢ় ব্যাকুলতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও উপলব্ধ হয়। 'সদ্ভাবশতকের' ছত্রে ছত্রে যে অনাবিল অধ্যাত্মরস ওতপ্রোত তাহার মূল উৎসটির সন্ধান এই রচনার মধ্যে পাওয়া যায় বলিয়া ইহা বিশেষ মূল্যবান। কবি প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন :

আশ্রয়দাতা তাঁহাকে পুর্ব্বের মত স্নেহে আশ্রয় দিলেন। রা, স বাসায় একজনের নিকটে পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে অন্য একজনের নিকটে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে উৎসাহ অনেক হ্রাস হইল।... অধ্যয়মান বিষয়ে স্থির ভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেন না। মুখে শব্দোচ্চারণ করিতেন, মন নানাপ্রকার উৎপথে ধাবিত হইত। কখন সুখের ভাবনা করিতেন, কখন গৃহ চিন্তায় সন্তপ্ত হইতেন, কখন নিকটবর্ত্তি লোকে তাঁহার পরিশ্রম দেখিয়া প্রশংসা করিতেছেন কি না তাহার প্রতি উৎকর্ণে থাকিতেন।...২।৪ খানি পুস্তকের কিয়ৎ২ অংশ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্বদভিমানী হইলেন। লোক প্রশংসায় লজ্জিত না হইয়া পুলকিত ও গৌরবী হইতেন।...

রা, স কুৎসিত ছিলেন, অথচ সৌন্দর্য্যের অভিমানী হইলেন। অনেক সময় রূপচিন্তায় সুখে অতীত করিতেন।...যখন রা, স বাসা হইতে বহির্গত হইতেন, তখন কিরূপে পাদচারণা করিলে সুন্দর দেখাইবে, পুষ্পিকাটি কিরূপে ধরিবেন, উত্তরীয়খান কিরূপে লইবেন, তাহার প্রতি অভিনিবেশ রাখিতেন।...

শৈশবকালেই রা, সের অন্তঃকরণে ধর্ম্মভাবের একরূপ উদ্রেক হয়। শিশুবোধের দাতাকর্ণ ও গুরু দক্ষিণায় প্রভাবে তাহার কিঞ্চিৎ পোষণ হইয়াছিল। তাঁহার বংশ শাক্তোপাসক। কিন্তু তিনি এক সময়ে কোন অল্প বয়স্ক সহচরের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে বৈষ্ণব ধর্ম্মের

আচারী হইয়া মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।...এখানে আসিয়া কালীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। কালীর স্তুতি সঙ্গীতের দ্বারা শ্রদ্ধার উদ্দীপন হয়। কোনং দিন নিতান্ত ভয়াকুল হইয়া তাঁহার ধ্যান করিতেন। "কালী অকূল সাগরে কূল আর দেখি নে" এই সঙ্গীতটী উপাসনার প্রধান অবলম্বন ছিল।...কিন্তু অল্প দিন পরে বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বাসক গ্রন্থ ও তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা পাঠে তাঁহার যথাক্রমোপযুক্ত ধর্মসংস্কারের পরিবর্ত্ত হইল। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার স্তুতি পঠনা শ্রবণ করিতেন। দুই এক দিন স্তুতি সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়ের ভাব এরূপ হইত যে লুণ্ঠিত হইয়া ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হইত। সর্ব্বদা ঈশ্বর প্রসঙ্গ লইয়া কথোপকথন করিতে অত্যন্ত আমোদ প্রাপ্ত হইতেন।

এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকা হইতে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। ১২৬৩ সালের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৮৫৭) তাঁহার বিবাহ হয়। পাত্রী—ঢাকা মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সুয়াপুর গ্রামের ৺উমাশঙ্কর সেনের দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা অমৃতময়ী। বিবাহের পর কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় ঢাকা নগরীতে গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন :

> অনুপযুক্ত অবস্থায় জীবনকে অধিকতর ভয়াবহ করিয়া নগরে গমন করিলেন। কিন্তু জ্ঞান শিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে যত্নবান হইলেন না। ('ইতিবৃত্ত,' পৃ. ২৬)

ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন; ইনি তাঁহার সমবয়সী কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র। কৃষ্ণচন্দ্র কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার মিলন যেন মণিকাঞ্চন সংযোগের ন্যায় হইল। এই সময়ে তাঁহারা দুই বন্ধুতে

মিলিয়া রীতিমত কাব্যচর্চা সুরু করেন। কাব্যচর্চা সম্বন্ধে কৃষ্ণচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :

> বালককালে কয়েকখানি পদ্য পুস্তক পাঠ করিয়া ম্রা, সের কবিকীর্ত্তি লাভে ইচ্ছা হয়। এক সময়ে কবি রামপ্রসাদের স্বর ও ভাবের অনুকরণে কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়া সহোদরাকে খানমাগায় গাইতে দিলেম।...এবার এখানে আসিয়া রসরাজ ও প্রভাকর পাঠ করিতে করিতে কবিকীর্ত্তি লাভের উৎসাহ পুনরুদ্দীপ্ত হইল। কিন্তু মনোযোগ প্রশস্ত রূপে ব্যবহৃত হইত না।...যাহা হউক এই উৎসাহ ও চেষ্টায় তাঁহার বাঙ্গলা ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার হইল। ('ইতিবৃত্ত,' পৃ. ২৬-২৭)

কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকা হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' প্রকাশার্থ রচনা ও স্থানীয় সংবাদ লিখিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে সংবাদপত্র-সেবায় তাঁহার হাতেখড়ি হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' স্বগ্রাম সেনহাটিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ঢাকা হইতে লিখিত তাঁহার একখানি পত্র, ও ৩ জুলাই ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঢাকা হইতে ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ তারিখে লিখিত "দেওয়ান হাফেজের কতিপয় কবিতার মর্ম্মানুবাদ" প্রকাশিত হইয়াছে। গুপ্ত-কবি কৃষ্ণচন্দ্রকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

ঢাকার কর্ম্মক্ষেত্রে

একে কৃষ্ণচন্দ্রের পারিবারিক অবস্থা ছিল নিতান্ত অসচ্ছল, তদুপরি বেকার অবস্থায় বিবাহের দরুন তাঁহার জীবন অধিকতর "ভয়াবহ"

হইয়া উঠিল, আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। তিনি কর্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বল্প বেতনে ঢাকায় বাংলা স্কুলে পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন। এই সময়ে নবীন আশায় উদ্দীপ্ত তরুণ কবির হৃদয়ে যে কাব্যপ্রেরণার সঞ্চার হয়, তাহারই অমৃতোপম ফল—অমর কাব্য 'সদ্ভাবশতক'। কবির নিজের কথায়

> এই সময়, গভর্ণমেণ্ট হইতে, বাঙ্গালা শিক্ষা প্রদানের বিশেষ চেষ্টা হইতে থাকে। উড্রো সাহেব ইন্স্পেক্টার নিযুক্ত হইয়া আসেন; এবং তাঁহার অধীনে দুই জন 'ডেপুটি ইন্স্পেক্টার' নিযুক্ত হয়েন। বাঙ্গালা স্কুলের উন্নতিকল্পে উদ্যোগী হইয়া তাঁহারা এই সময় পণ্ডিত নিয়োগের এক পরীক্ষা লইতে থাকেন; এবং কৃষ্ণধন গুহ নামক এক ব্যক্তির আগ্রহে, আমিও এই সময় ঐ পণ্ডিতের পরীক্ষা প্রদান করি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হইয়াছিলাম অবশ্য; কিন্তু তৃতীয় বিভাগে। যাহা হউক, তাহাতে ১৫৲ টাকা বেতনের একটি 'সার্কেল পণ্ডিতের' পদ প্রাপ্ত হই; এবং মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়; আর, সেই আশা-স্ফূর্তির সহযোগেই, এই সময় হইতেই 'সদ্ভাবশতক' লিখিতে আরম্ভ করি। তখন আমার বয়স আন্দাজ ২১।২২ বৎসর।

অতঃপর কবি কিঞ্চিৎ সুখের মুখ দেখিলেন, তাঁহার বেতন বৃদ্ধিও হইল :—

> ইহার পরই, ঢাকা নর্ম্মাল-স্কুলের অন্তর্গত মডেল স্কুলের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলাম। বেতন কিন্তু ১৫৲ টাকাই ছিল।* তবে এখন

* ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল সংলগ্ন মডেল স্কুলটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে "কৃষ্ণচন্দ্র দাস" ১৫৲ বেতনে ঢাকা মডেল স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন—General Report—for 1859-60. App. C. Alphabetical List of Officers in the Education Department receiving salaries of Rupees 15 p. m. and upwards *on the 31st Dec. 1860.*

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে পর্য্যন্ত পড়াইতাম; এবং অবশেষে, এমন কি, এই সময়, নর্ম্মাল-স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ৺অভয়াচরণ রায় মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হেতু, আমিই কিছুদিন যাবৎ তাঁহারও কার্য্য করিয়াছিলাম। কিন্তু, পরে, কলিকাতা হইতে নকুলেশ্বর রায় নামক অন্য এক ব্যক্তি আনীত হওয়ায়, আমার সে কার্য্য ছাড়িয়া পূর্ব্ব-কার্য্যেই নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময় মধ্যে মধ্যে ঢাকা-কলেজের জুনিয়ার পণ্ডিতের 'একটিনি' কার্য্যও করিতাম। ফলতঃ এ সময় কোন কোন মাসে আমার ৩০৲।৪০৲ টাকাও প্রাপ্য হইয়াছিল।

এই সময় সর্ব্বমান্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় নর্ম্মাল-স্কুলে পণ্ডিত নিযুক্ত করিবার জন্য এক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। আমিও সে পরীক্ষা দিই। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি ছাত্রই সে পরীক্ষায় আমার উপরে উত্তীর্ণ হন ও তন্নিয়ে আমি প্রতিষ্ঠিত হই। সুতরাং প্রথম যে পদ খালি হয়, তিনিই তাহা প্রাপ্ত হন। এবং পরে যশোহর নর্ম্মাল স্কুলের জন্য আমি এক নিয়োগ-পত্র প্রাপ্ত হই।

কিন্তু, এই সময়ই আমার আর একটি কর্ম্ম জুটিয়া যায়। ('অনুসন্ধান,' ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮, পৃ. ৩৫৯-৬০)।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকায় স্থাপিত একটি "এডাল্ট" স্কুলে অল্প দিনের জন্য শিক্ষকতা করিয়াছিলেন; ইহার উল্লেখ তাঁহার স্মৃতিকথায় নাই। ১০ জুন ১৮৫৯ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' মুদ্রিত ঢাকাস্থ সংবাদ-দাতার পত্রে প্রকাশ:

৫ পাঁচ দিবস গত হইল শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মৌলিক ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয় অতীব যত্ন সহকারে একটি "এডল্ট" বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ স্কুল বৈকালিক ৬ষ্ঠ ঘটিকার পর অবধি ৯ম, ঘটিকা পর্য্যন্ত খোলা থাকে তাহাতে নগরস্থ কর্ম্মাধিকরণের সকল

> নবিশ মহাশয়েরা শিক্ষা পাইতেছেন। সুচতুর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শিক্ষকতাপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

শিক্ষক-জীবনের স্বল্প অবসরটুকু কৃষ্ণচন্দ্র বৃথা নষ্ট করেন নাই, নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি আকৈশোর সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-সাধনা শুধু কবিতা-রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, তাহা তাঁহাকে পত্র-পত্রিকা সম্পাদনের ক্ষেত্রেও টানিয়া আনিয়াছিল এবং একজন শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র-সেবী-রূপে পূর্ব্ববঙ্গের বিদগ্ধ সমাজে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পত্রিকা-সম্পাদন কার্য্যে তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতি ও অনুরাগ ছিল। ঢাকায় অবস্থানকালে শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া তিনি সংবাদপত্র-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যকীর্ত্তির আড়ালে সম্পাদক-রূপে তাঁহার কৃতিত্বের কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আমরা এখানে তাঁহার পরিচালিত সাময়িকপত্রগুলির পরিচয় দিতেছি।

'কবিতাকুসুমাবলী': ইহা একখানি পদ্যবহুল মাসিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—মে, ১৮৬০ (জ্যৈষ্ঠ ১৭৮২ শক)। কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম বৎসরের 'কবিতাকুসুমাবলী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

> 'সদ্ভাবশতক' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, 'কবিতাকুসুমাবলী' নামক একখানি পদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম ; 'সদ্ভাবশতকে'র অধিকাংশ কবিতাই উহাতে বাহির হইয়াছিল। আমি, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, এবং প্রসন্নকুমার সেন—এই তিন জনে ক্রমে 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। বৎসরখানেক উহা আমি চালাইয়াছিলাম। ('অনুসন্ধান,' ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮, পৃ. ৩৬০)

'মনোরঞ্জিকা' : 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশের অব্যবহিত পরে ঢাকা মনোরঞ্জিকা সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'মনোরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ মজুমদার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে' লিখিয়াছেন :

> ১৮৫৭ অব্দে (১২৬৩ সালে) ঢাকায় কতিপয় উৎসাহী যুবক 'মনোরঞ্জিকা' সভা নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভায় তাঁহারা রচনাদি পাঠ ও বক্তৃতাদি দ্বারা সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন।… মনোরঞ্জিকা সভার পরিচালকগণ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকে সম্পাদক করিয়া এই বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে ঐ সালেই [১২৬৬ সালে] "মনোরঞ্জিকা" নামে এই পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। মনোরঞ্জিকা মাসিক পত্রিকা ছিল। বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক এবং হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার মুদ্রাকর ছিলেন। (পৃ. ৩৪১)

মজুমদার মহাশয়ের মতে 'মনোরঞ্জিকা'ই "ঢাকার প্রথম পত্রিকা"। ইহা ঠিক নহে। ১২৬৭ সালের আষাঢ় (জুন ১৮৬০) মাস হইতে 'মনোরঞ্জিকা' প্রকাশিত হয় ; ইহার এক মাস পূর্ব্বে—জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রচারিত হইয়াছিল। 'মনোরঞ্জিকা' প্রকাশিত হইলে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :

> মনোরঞ্জিকা।—বর্ত্তমান আষাঢ় মাস অবধি ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রালয় হইতে মনোরঞ্জিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রাযন্ত্র, আধুনিক যুবক সম্প্রদায় ও তাড়িত বার্ত্তাবহ এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকেরা উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা ভূমিকা মধ্যে লিখিয়াছেন "পরাপবাদ ও পরদোষ কীর্ত্তন করিয়া পত্রিকা খানি কলঙ্কিত ও

অপবিত্র করিবেন না।—'সোমপ্রকাশ,' ২০ আষাঢ় ১২৬৭ (২ জুলাই ১৮৬০)।

'ঢাকাপ্রকাশ': ঢাকাবাসীরা অনেক দিন হইতে স্থানীয় একখানি বাংলা সংবাদপত্রের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্গের দ্বারা সে অভাব পূরণ হয়। তাঁহারা ১৮৬১, ৭ই মার্চ হইতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রের আদর্শে 'ঢাকাপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারই সম্পাদকের গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:

> ঢাকা হইতে 'ঢাকা প্রকাশ' নামক যে পত্রিকাখানি বাহির হইয়া থাকে, এই সময়ই সেই পত্রখানির প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমিই তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হই—প্রথম 'ঢাকা প্রকাশ' আমার হাত হইতে বাহির হইতে থাকে। 'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদন-কালে প্রথম বেতন ২৫৲ টাকা পাইতাম; কিন্তু, যশোহর নর্ম্মাল স্কুলের নিয়োগপত্রে ৩০৲ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, উক্ত পত্রের অধিকারীগণ এই সময় আমার ৩৫৲ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দেন। কাজেই আমি আর নর্ম্মাল-স্কুলের কার্য্য গ্রহণ না করিয়া, ঐ 'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদন-কার্য্যেই ব্রতী থাকি। তখনকার 'ঢাকা প্রকাশে'র পরিচালকগণের মধ্যে ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, এবং চন্দ্রকান্ত বসু প্রভৃতিই প্রধান ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। কাজেই, গভর্ণমেণ্টের কার্য্য ত্যাগ করিয়াও আমি তখন ঐ কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকি। বিশেষ আমি যেন ভালও বাসিতাম—ঐ কাজ। ('অনুসন্ধান,' ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮, পৃ. ৩৬০)

কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক রচনা 'ঢাকাপ্রকাশে' স্থান লাভ করিয়াছিল। এই সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালেই তাঁহার 'সদ্ভাবশতক' প্রকাশিত হয় ও তাঁহার কবি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থ বৎসরের ২২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত "প্রকাশক"-রূপে পত্রিকায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ইহার পর তিনি 'ঢাকাপ্রকাশ' ত্যাগ করেন।

'বিজ্ঞাপনী': এই সময়ে বালিয়াটী-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় বিজ্ঞাপনী যন্ত্র নামে একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে 'বিজ্ঞাপনী' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের সঙ্কল্প করিয়া, তিনি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকে ৫০৲ বেতনে ঐ কাগজ ও প্রেস চালাইবার জন্য নিযুক্ত করেন।

বিজ্ঞাপনী যন্ত্র স্থাপন ও 'বিজ্ঞাপনী' পত্র প্রচারের সঙ্কল্পের কথা কৃষ্ণচন্দ্র সংবাদপত্রে ঘোষণা করিলেন। ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়:—

> এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশীবাজারস্থিত নদীর পারের একতালা হাবেলিতে বালিয়াটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক "ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র" নামে একটী মুদ্রা যন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে,…
>
> এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে, উক্ত যন্ত্র হইতে 'বিজ্ঞাপনী' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্রিকা শীঘ্রই প্রচারিত হইবে,… পত্রিকার আয়তন ৪ পেজি ফর্ম্মার ৩ ফর্ম্মা করা হইবে…। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ১২৭১। ৭ই ভাদ্র।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'বিজ্ঞাপনী' প্রকাশিত হয়। ২৭ মার্চ ১৮৬৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশ :—

> We have received the first number of a new vernacular paper started in Dacca called the Begaponi or the *advertiser*.

ঢাকায় অবস্থানকালে কৃষ্ণচন্দ্র যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বলিখিত 'ইতিবৃত্ত' হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। ১১ই কার্ত্তিকের 'বিজ্ঞাপনী'তে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সপক্ষে কিছু লেখেন। হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার জনৈক সভ্যের অনুযোগে 'বিজ্ঞাপনী' পত্রের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র রায় কৃষ্ণচন্দ্রকে ভবিষ্যতে এরূপ লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, যে সামান্য বেতন তিনি পাইতেন তাহাতে কায়ক্লেশে তাঁহার পরিবারের লোকেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় আদেশ মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না, নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি যে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিলেন, তাহা আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। ১৭ নবেম্বর ১৮৬৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন :

> অবগতি হইল ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপনীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাপক্ষে কিছু লিখিত হওয়াতে, ঢাকাস্থ প্রাচীন সম্প্রদায় তৎ অধ্যক্ষ গিরিশ বাবুকে অনুযোগ করেন, গিরিশ বাবু সম্পাদককে ভবিষ্যতে উক্ত রূপ লিখিতে নিষেধ করিবাতে স্বাধীনচিত্ত সম্পাদক কার্য্য পরিত্যাগ করেন। সেই কারণে বিজ্ঞাপনী পত্র এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে। পুনর্ব্বার উক্ত সম্পাদক পূর্ব্বমত স্বাধীনচিত্ততা লাভ করাতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এ-পর্য্যন্ত 'বিজ্ঞাপনী' পত্র ঢাকায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র এপ্রিল মাসে ঢাকা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঢাকায় কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। সেখানে তিনি শুধু যে কবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, যোগ্যতার সহিত সাড়ে তিন বৎসর 'ঢাকাপ্রকাশ' ও দেড় বৎসর 'বিজ্ঞাপনী' পরিচালন করিয়া বিশেষ খ্যাতিরও অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনা ও পরিচালন-নৈপুণ্যে 'ঢাকাপ্রকাশ' ও 'বিজ্ঞাপনী' একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ঢাকার সংবাদপত্র প্রসঙ্গে কলিকাতার 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১৯ এপ্রিল ১৮৬৫) লিখিয়াছিলেন :—

> কলিকাতায় যে যে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে।

ঢাকায় কবি এবং সম্পাদক-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনযাত্রা স্বল্প আয় সত্ত্বেও সহজ এবং স্বচ্ছন্দভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গদোষে সুরাপানে আসক্ত হইয়া তিনি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিলেন, কর্ম্মচ্যুত হইয়া সপরিবারে মহা বিপত্তিতে পড়িলেন। তাঁহার নিজের উক্তিতে তাঁহার অনুতাপদগ্ধ অন্তরের বেদনা বড় মর্ম্মস্পর্শী ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

> দেশেও তখন সুরার বড়ই প্রকোপ; বড়-লোকের চিহ্ন ছিল তখন—সুরাপান! ভাগ্য-দোষে, মতিহীন আমি, আমিও তাহাতে মজিয়াছিলাম!...আর, তাহাতেই আমার সর্ব্বনাশ! শেষ, ইহাতেই, ঝগড়া করিয়া আমার কাজ যায়; আমি পরিবারাদি লইয়া বাড়ী চলিয়া আসি।...কর্ম্ম ছাড়িয়া, এইরূপে, আমি কেবলই

দুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইতে থাকি। এমন কি, ক্রমে যতই সাংসারিক কষ্ট বাড়িয়াছে, আমিও ততই পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে, আমায় পাগলের মত হইতে দেখিয়া, আমার কোন আত্মীয় আমায় কীর্ত্তিপাশায় লইয়া যান। এবং তাঁহারা নানারূপে আমার চিত্ত-সংস্কারেরও চেষ্টা পাইতে থাকেন। এই সময় মদটাও আমার আর তত জুটিত না; ক্রমে আমিও একটু স্থির হইতে থাকি। অধিকন্তু, 'শিববিবাহ' নামক একখানি গানের পুস্তক এবং পারসী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই ভাষা চতুষ্টয়ে আমার পূর্ব্বতন শিক্ষকগণের গুণবর্ণনা নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া, আমার মতি অনেকটা ফিরিয়া যায়। এই সময়ই আমার মাতা ঠাকুরাণী আমায় কীর্ত্তিপাশা হইতে বাড়ী আনিতে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞা করি—'আর কখনও এমন কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না।' বেশীর ভাগ, বাড়ীর তাৎকালিক দুর্দ্দশা দেখিয়াও আমার মনে বড়ই ঘৃণা জন্মে।...বাড়ী আসিয়া, ২।৩ বৎসর কাজকর্ম্ম আর কিছুই যোটে না। বড়ই কষ্টে দিনপাত হইতে থাকে।

কিন্তু বেকার অবস্থায় ঘরে বসিয়া থাকিলে দরিদ্রের সংসার চলে না, কাজেই দেহ রোগজীর্ণ হইলেও কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় জীবিকার সংস্থানে ঢাকায় আসিয়া উপনীত হইলেন। পুরাতন বন্ধুরা তাঁহাকে ভুলিয়া যান নাই, তাঁহারা বন্ধুকৃত্য সম্পাদনে তৎপর হইলেন। ব্রাহ্মস্কুলে নূতন একটি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। এতৎসম্পর্কে 'ঢাকাপ্রকাশে' (৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭০) পার্ব্বতীচরণ রায়ের স্বাক্ষরিত যে আবেদনপত্র প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বোধ করি ঢাকায় ছোট বড় সকলের নিকটই পরিচিত। তাঁহাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে তাঁহার বর্ত্তমান পীড়ার উপশম হইবে, এই বিবেচনায় ঢাকা ব্রাহ্মস্কুলে আর শিক্ষকের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে ব্রাহ্ম-স্কুলে অল্প বেতনে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা গিয়াছিল। কৃষ্ণবাবুর সাহায্যার্থ অতি সহজে মাসিক এই ক্ষুদ্র চাঁদা সংগ্রহ হইতে পারিবে, কেবল এইমাত্র ভরসাতে আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রায় ৪ মাস অতীত হইল, ইহার মধ্যে ২।১ জন ব্যতীত আর কেহই কৃষ্ণবাবুর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন না। এ যাবৎ তাঁহার বেতনের কতক অংশ হাওলাত করিয়া দেওয়া গিয়াছে। এবং কতক তাঁহার প্রাপ্য রহিয়া গিয়াছে। সাধারণে এই অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত নহেন, এই হেতু তাহাদিগকে দোষ দেওয়া অবিধি বিবেচনায় আমি এই বিজ্ঞাপন প্রচারে বাধ্য হইলাম।

এতৎপাঠে কেহ দয়াপূর্ব্বক কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মৌলিক মহাশয়ের নিকট দিবেন। শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়। ঢাকা ১৮ই ভাদ্র।

যশোহরের কর্ম্মক্ষেত্রে

ঢাকায় কৃষ্ণচন্দ্রের এই নূতন চাকুরী বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। নানা ঘাটের জল খাইয়া অবশেষে যশোহর জেলা-স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হওয়াতে (সেপ্টেম্বর ১৮৭৪) কতকটা সুরাহা হয়। এই সম্পর্কে তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :

> কয়েক মাস দৌলতপুরের স্কুলের পণ্ডিতের একটিনি কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এই সময় ঢাকার রামশঙ্কর সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় আমাদের বাড়ীতে সম্ভবতঃ আমার পুস্তকাদি পড়িয়াই, আগমন করেন। এবং আমার এই শোচনীয় অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া আমার একটী চাকরির জন্ত সুপারিশ করেন। এখন জগৎবাবু ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন—তিনি পিলজঙ্গ—র পাড়ার এন্‌ট্রেন্স-স্কুলে আমায় একটী কর্ম্ম প্রদান করেন। সেখানে এক বৎসর কার্য্য করার পর, যশোহর জেলা-স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ খালি হয় ও আমি সেই পদ প্রাপ্ত হই। এই কার্য্য পাইয়া ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট কি সেপ্টেম্বর মাসে, আমি যশোহরে আসি। প্রথমে ২৫৲ টাকা বেতনে এখানে আসি, একণে ৪০৲ টাকা পাইতেছি। মধ্যে এক বৎসর ১৩০৲ টাকা, কি জানি কোন গুণে আমি পারিতোষিকও পাইয়াছিলাম। ('অনুসন্ধান,' ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮, পৃ. ৩৬২)

কৃষ্ণচন্দ্র একজন কৃতী শিক্ষক ছিলেন—শিক্ষাদানকার্য্যে তাঁহার বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, গণিতজ্ঞ কালীপদ বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণচন্দ্র যশোহরে অবস্থানকালে নিষ্ঠাবান্ সাত্ত্বিক হিন্দুর স্থায় জীবন যাপন করিতেন। যৌবনের সে উচ্ছৃঙ্খলতা আর নাই, সুরাপানের কদভ্যাস বহু দিন পরিত্যক্ত হইয়াছে। একদা সঙ্গদোষে উন্মার্গগামী কবি আত্মস্থ হইয়া এবার অধ্যাত্ম-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 'অনুসন্ধান' পত্রের প্রতিনিধি কালিদাস লাহিড়ীর নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় এই আচারনিষ্ঠ সাধক-কবির ধর্ম্মজীবনের মূল সূত্রটির সন্ধান পাওয়া যাইবে :—

আমি তাঁহার ধর্ম্মমতটি একবার জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন,—'এখন তো বুঝিতেছেনই! তবে ঢাকায় যখন ছিলাম, সেখানে তখন বড়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন; আমারও তখন যৌবনোচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি। কাজেই, তখন সেইরূপ ভাবেই ছিলাম। পরেই এই ভাব।' বলা বাহুল্য, দেখিয়া বুঝিলাম, এখন তাঁহার সম্পূর্ণই সাত্ত্বিক হিন্দুর ভাব। অধিকন্তু, প্রাতেই দেখিলাম,—ঘরে ফুল-বিল্বপত্র ও গঙ্গাজলের আয়োজন। কাজেই আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলাম না। ('অনুসন্ধান,' ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮)

যশোহরে কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। এক বাঙালী ব্রাহ্মণের হোটেলের অন্তর্গত একটি পর্ণকুটীরে অত্যন্ত দীনভাবে সুদীর্ঘ উনিশটি বৎসর কাটাইয়া, দৃষ্টিশক্তির হ্রাসহেতু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে বাধ্য হন।

ঢাকার কর্ম্মক্ষেত্রে সাময়িক-পত্র সম্পাদনে তিনি যে স্থায়ী কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যশোহরেও তাহার জের আমরা দেখিতে পাই। যশোহরে অবস্থানকালে কৃষ্ণচন্দ্র 'দ্বৈভাষিকী' নামে একখানি সংস্কৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকা এক বৎসর পরিচালন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ—১৮ই ফাল্গুন ১২৯৩। "ইহাতে রাজনীতি, উপাখ্যান ও সংবাদ বিনা গদ্যপদ্যে বিবিধ হিতকর বিষয় লিখিত" হইত। পত্রিকার শিরোভাগে এই শ্লোকটি স্থান পাইত :—

জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচ-মূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ম্ময়া॥

সেনহাটিতে শেষ-জীবন

কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র জন্মপল্লী সেনহাটিতে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে নানা বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। ধীরে ধীরে জরা ব্যাধি আসিয়া দীর্ঘ জীবনসংগ্রামে শ্রান্তক্লান্ত তাঁহার দেহে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল, সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান কবে হইবে এই সাধক-কবি তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

> ক্রমে বিশ্বাসী ও সাধক কৃষ্ণচন্দ্রের মর্ত্ত্যলীলা শেষ হইয়া আসিল। লোকচক্ষুর অগোচরে প্রস্ফুটিত বনকুসুমের মত সমগ্র দেশকে অজ্ঞাতসারে সৌরভে আমোদিত করিয়া তাঁহার জীবন-পুষ্প ঝরিয়া পড়িবার দিন আসিল। কিছু দিন হইতে তিনি রোগে অত্যধিক ক্লেশ পাইতেছিলেন। এইরূপে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ [১৩ জানুয়ারি ১৯০৭] প্রত্যূষে জন্মভূমি সেনহাটির ক্রোড়ে তিনি সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিলেন। ('জীবনচরিত,' পৃ. ১১৭)

গ্রন্থাবলী

বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের দানের পরিমাণ বিপুল নহে। তিনি জীবদ্দশায় চারিখানি মাত্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন; এগুলির কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। সদ্ভাবশতক। ১৭৮২ শক, ইং ১৮৬১। পৃ. ৵০+।৵০+৯৮

সদ্ভাবশতক। অর্থাৎ সদ্ভাবপূর্ণ কবিতাকলাপ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।

না করিলে রসনার রস আস্বাদন।
মধুর কষায় জানা না যায় যেমন॥
কাব্যকলা পাঠ না করিলে সেইমত।
কে বুঝিতে পারে তাতে আছে রস কত?
শুক্তির কুরূপ দৃষ্টে তুচ্ছ জ্ঞান হয়।
কিন্তু তাতে মুক্তা মেলা অসম্ভব নয়॥

১৭৮২ শক। ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥৴০

"বোধ করি মহাকবি হাফেজের নাম অনেকেই শ্রবণ করিয়া থাকিবেন।...আমি এই প্রসিদ্ধ পারস্তকবির প্রণীত গ্রন্থের অত্যুৎকৃষ্ট কবিতাকলাপের মর্ম্মমাত্র গ্রহণ করিয়া 'সদ্ভাবশতক' নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ন করিলাম; কিন্তু সমুদয় কবিতাই হাফেজকৃত গ্রন্থের মর্ম্মাকর্ষণ করিয়া রচনা করা যায় নাই, স্থানে২ অন্যান্য কবির এবং স্বকল্পিত ভাবাদিরও সন্নিবেশ করিয়াছি। ইহার অনেকগুলি কবিতা 'কবিতাকুসুমাবলী' পত্রিকায় এবং দুই একটী কবিতা সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছে।...

এইক্ষণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, আমার পরমমিত্র শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং কোন কোন কবিতা তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সরস লেখনী সংস্পৃষ্ট না হইলে আমি এতদ্গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে এতদূর সাহসী হইতে পারিতাম না।...

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। নিবাস সেনহাটি। ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্র ১লা ফাল্গুন ১৭৮২ শক।"—বিজ্ঞাপন

'সদ্ভাবশতকে'র পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে "বিজ্ঞাপন" ও "কবিতা পাঠের উপকার" সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বক্তব্য বর্জ্জিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের 'সদ্ভাবশতক' পরিবর্দ্ধিত।

২। রা, সের ইতিবৃত্ত (আত্মকাহিনী)। (৩০ এপ্রিল ১৮৬৮)। পৃ. ১৪৭।

কৃষ্ণচন্দ্রের গুপ্ত নাম—রামচন্দ্র দাস। ইহার আগু ও শেষ অক্ষর লইয়া "রা স" হইয়াছে। 'ইতিবৃত্ত' দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মচরিত; ইহাতে তিনি শৈশব হইতে 'বিজ্ঞাপনী'র সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া স্বদেশ-প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত জীবনের বহু ঘটনা অকপটে বর্ণনা করিয়াছেন। 'রা, সের ইতিবৃত্ত' ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ১৮৭০, ১১ই মার্চ তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশে' এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছিল:—

> "ইতিবৃত্ত। মূল্য ৷৷৹ বার আনা।…এই পুস্তকে একটী লোকের পূর্ব্ব চরিত বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। ইহার পাঠে অনেকরূপ প্রকৃতি পরিজ্ঞান ও স্পষ্টরূপে কেবল প্রত্যক্ষ বিষয় না দেখিয়া তাহার স্থলে অপ্রত্যক্ষ অথবা গূঢ় প্রত্যক্ষ বিষয় দর্শনের ফল পরিজ্ঞান হইতে পারে। ইহাঁর সকল বৃত্তান্তই সত্য। ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রে আমার নিকটে পুস্তক পাওয়া যায়।—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্র।"

৩। মোহভোগ (কাব্য)। ৫ মাঘ ১২৭৭ (১৭-১-১৮৭১)। পৃ. ।৶০ + ৫১।

"মহাভারতের 'বাসব নহুষ' সংবাদ অবলম্বন করিয়া এই কাব্য লিখিত হইল।"—ভূমিকা

৪। কৈবল্য-তত্ত্ব। ১২৮৯ সাল (জানুয়ারি ১৮৮৩)। পৃ. ।।০ + ১২৩

"এই পুস্তকে কৈবল্য ও কৈবল্য লাভের উপায় বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।"

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৫। রাবণ বধ (নাটক)। ? (ইং ১৮৫১)। পৃ. ৫৪।

খণ্ডিত নাটক, শ্রীকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা ও সংস্কৃতে রচিত কৃষ্ণচন্দ্রের আরও কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কবির বহু রচনা সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

> 'প্রভাকরে' আমার 'কবিতা' প্রথম প্রকাশিত হয়। ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় সে বিষয়ে আমায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন।...যশোহরে আসিয়া কুমারখালির 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য়, মড়াইলের 'আচার্য্য' নামক পত্রে, এবং 'সংস্কৃত চন্দ্রিকা'য় প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলাম।

আমরা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত তাঁহার কয়েকটি রচনার সন্ধান পাইয়াছি ; সেগুলি—

সুরা (কবিতা)	...'মাসিক সমালোচক' ...	শ্রাবণ ১২৮৬
সুরার প্রাচীনত্ব ও আধুনিক ব্যবহার...ঐ	...	ভাদ্র ১২৮৬
পুরাতন ও নূতন বর্ষ...'অনুসন্ধান' (পাক্ষিক)	...	১৫ বৈশাখ ১২৯৯
নীতি-কবিতা ("কবিতা ও গান")...ঐ	...	১৫ ও ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৫ আষাঢ় ১২৯৯
পরকাল (কবিতা) ...	ঐ ...	৩২ শ্রাবণ ১২৯৯

আশা (কবিতা)	... 'অনুসন্ধান'	...	১৫ আশ্বিন ১২৯৯
মানুষের গর্ব্ব (কবিতা)	... ঐ	...	১৫ বৈশাখ ১৩০০
শিবপঞ্চাশৎ (সানুবাদ)	... ঐ	...	১৫ ও ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ ও ৩১ আষাঢ়, ৩১ শ্রাবণ ১৩০০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রহ্ম-সঙ্গীতে' কৃষ্ণচন্দ্রের "তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় হে" ও "কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়া" প্রভৃতি কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা দেশের ছাত্র-সমাজে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক' বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইতে লব্ধ এই খ্যাতি ছাত্র-সমাজকে অতিক্রম করিয়া অভিভাবক-সমাজকেও অভিভূত করিতে বিলম্ব হয় নাই। "কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশে নি যারে"র কবিকে বাংলা দেশের রসিকমাত্রেই সহজে চিনিয়া লইয়াছিলেন।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সর্ব্বদা পারসিক কবি হাফেজ ও সাদীর কাব্যরসে নিমগ্ন থাকিতেন। 'সদ্ভাবশতক' প্রধানতঃ হাফেজের কাব্য অনুসরণেই রচিত। পারসিক কবিদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবোধ ও এই বিশ্বপ্রকৃতির যিনি স্রষ্টা, তাঁহার প্রতি সহজ আত্মনিবেদন কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সৌন্দর্য্য ও ভগবৎ-প্রীতিই বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ দান। তাঁহার কবিতাগুলি এমনই প্রসাদগুণবিশিষ্ট যে, অনেক কবিতার অনেক পংক্তিই প্রবাদবাক্যস্বরূপ আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া

থাকি। ব্যবহার করি বটে, কিন্তু এগুলির রচয়িতা যে কৃষ্ণচন্দ্রই তাহা অনেক ক্ষেত্রে বিস্মৃত হইয়াছি। এই বহু-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি হইতেই বাংলা দেশে কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতার প্রভাব অনুমান করা যাইবে।

কৃষ্ণচন্দ্র ফার্সী ভাষায় রচিত হাফেজের কবিতাগুলির একেবারে মর্ম্মমূলে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার ভাবানুবাদ এমন সার্থক হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজী ওমর খৈয়ামের স্রষ্টা কবি ফিট্‌জেরাল্ডের সমকক্ষ। 'সদ্ভাবশতকে'র কবিতাগুলিও হাফেজের একান্ত অনুকরণ ও অনুসরণ নয়। ইহা একরূপ নিজস্ব সৃষ্টি। ইহাতে অন্যান্য কবিদের ভাবাবলম্বনে রচিত কবিতাও স্থান পাইয়াছে। কতকগুলি কবিতা আবার কৃষ্ণচন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি। সেগুলির মধ্যেও ভাগবৎ সত্তার নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণের সুর অনুরণিত।

কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত আরও কিছু গদ্য-পদ্য রচনা আছে, কিন্তু সেগুলি ব্যর্থ ও অক্ষম রচনার নিদর্শন মাত্র—সাহিত্যের আসরে তাহা স্থায়ী মর্য্যাদার আসন লাভ করিতে পারে নাই।

'সদ্ভাবশতকে'র দ্বারাই কবি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এবং ইহা যে আরও বহুকাল বাংলার সাহিত্যাকাশে ভাস্বর দ্যুতি বিকীর্ণ করিয়া স্ব-মহিমায় বিরাজমান থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যরসিক বাঙালী পাঠক মাত্রেরই সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কবি ইহাতে কিরূপ নির্ম্মল কাব্যরস পরিবেশন করিয়াছেন, নিম্নের উদ্ধৃতাংশ-সমূহ হইতে তাহার আভাসটুকু মাত্র পাওয়া যাইবে :—

অপব্যয়ের ফল

যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জালায় মোমের বাতি ;
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর,
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।

সুখী দুঃখীর দুঃখ বুঝে না

চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশে নি যারে ?
যত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম ;
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।

ধার্ম্মিকের মৃত্যুর প্রতি উক্তি

অহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন,
অনিত্য-সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ ;
যারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে,
চিরবাসস্থান বলে ভাবে মনে মনে ;

পাপরূপ পিশাচ যাদের হৃদাসন,
করি আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ;
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়,
প্রাণ-প্রিয়তম-প্রেমে মুগ্ধ যারা নয়;
হেরিলে নয়নে এই ভ্রূকুটি তোমার,
তাদেরই হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রূভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন।
যে অম্লান কুসুমের মধু-পান-তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মন-মধুকরে;
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত;
কোন রূপে তোমায় করিলে অতিক্রম,
যাইব আনন্দে যথা সেই প্রিয়তম।

দুরাশা

নেত্র নাই, বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন।
কর্ণ নাই, চাই শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন।
নাসা নাই, আশা করি সুবাস গ্রহণে।
রসনা-বিহীন, সুধা বাসনা রসনে।
কর নাই, করীর বন্ধনে আকিঞ্চন।
অচল-লঙ্ঘনোৎসুক বিকল চরণ।

পারানি সম্বল নাই না জানি সাঁতার।
তথাচ বাসনা যেতে পয়োনিধি পার॥
চরিত্র পবিত্র নয় পাপে রত মন,
বাসনা সকলে বলে ধার্ম্মিক সুজন।
অমূল্য কবিত্বরত্ন-বিহীন মানস,
অভিলাষ করিবারে ক্রয় কবিযশঃ।
প্রীতি নাই প্রিয়লাভ আশা করি মনে।
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভবভবনে?

অনুতাপ

শ্বেত হল শ্যাম কেশ, নিশ্বাস হতেছে শেষ,
সুচির-মানস-সাধ, অদ্যাপি না পূরিল;
যতনে দুরাশাভরে, ডুবিলাম রত্নাকরে,
যাতনা হইল সার, রতন না মিলিল।
সুবিমল হব বলে, পশিলাম যেই জলে,
অনিত্য প্রণয়পঙ্কে, গায় মলা পড়িল।
কলুষের হ্রদে পড়ি, প্রাণভয়ে কেঁপে মরি,
সে সময়ে কৃপা করি কেহ নাহি ধরিল।
আয়ুদিবা হল গত, কালনিশি সমাগত,
হৃদাকাশে বোধ-বিধু, সমুদিত নহিল।
প্রিয় প্রাণ যায় যায়, বুঝিতে না পারি হায়,
কি ছিলেম কি হলেম, মনে খেদ রহিল।

উষা

(সঙ্গীত)

অয়ি সুখময়ি উষে ! কে তোমারে নিরমিল ?
বালার্ক-সিন্দূরফোঁটা, কে তোমার ভালে দিল ?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এত হাসি, কেবা সে যে হাসাইল ?
জগত মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে ;
বল সে যে পুষ্পাঞ্জলি, অর্পণ করিছ যারে ?
কমল-নয়ন খুলে, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম-অশ্রু নিরমল ?
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব পরশন মাত্র, পাইল নব জীবন !
বারেক তুমি আমারে, দেখাও দেখাও দেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি, যে তোমারে প্রদানিল।

কবির 'মোহভোগ' কাব্য বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই 'সদ্ভাবশতকে'র ন্যায় ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি নয় ;—এক সম্পূর্ণ কাব্য, "মহাভারতের বাসব নহুষ সংবাদ অবলম্বনে নাটকাকা লিখিত"। কাব্যটি অধুনা একান্ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়া ইহা হইতে সামা সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

অয়ি নিদ্রে ! ভবজন তাপনিবারিণী
চৈতন্যহারিণি ! দেবি বিরামদায়িনি,
হৃদিতাপ নিবারিণী তোমার মতন,
মৃত্যু বিনা এ জগতে আর কোন্ জন ?

অতুল অতুল দেবি! করুণা তোমার
কেমন হৃদয় তব কোমল উদার।
তপ জপ ধ্যান তব কেহ নাহি করে,
অথচ তোমার কৃপা সকলের পরে।
যেমন নিশিতে হয় জগৎ আঁধার
অমনি চঞ্চল হয় হৃদয় তোমার
অংশে অংশে গেহে২ বেড়াও ঘুরিয়া
হৃদিজ্বালা জগতের স্মরণ করিয়া
নয়নে নয়নে দেবি! বসিয়া সবার,
কর মা কেমন চর্য্যা হৃদয়মাঝার। (পৃ. ২-৩)

নিশি শশী মলিন হইলা।
স্বভাব রচিত ভূষা, নির্ম্মল বরণী উষা,
সুসম্পদে আসি সমুদিলা।
তিল ফুল কোশা করে, তর্পণ স্নানের তরে
ধেয়ে গেলা ব্রতাচারী সব।
উলি অপগার জলে, ডুব দিয়া গঙ্গা বলে
ভক্তিতে পড়েন গঙ্গাস্তব।
উষা ভূষা কত বালা, লইয়া ফুলের ডালা
উদ্যানে তুলিতে গেলা ফুল।
বাম হস্তে লতা অগ্র পুষ্প তুলিবারে ব্যগ্র
শিশিরেতে ভিজিল দুকুল।
ক্রমেতে উদিলা রবি, হিঙ্গুল রঞ্জিত ছবি
উজলিলা সকল সংসার।

জলে রুচি ঝকমক, রেণু তট চক মক
ধক ধক প্রমদার হার। (পৃ. ১)

মূষিক মার্জার হয় মার্জার কেশরী!
সরস মৃণাল হয় তীব্র বিষধরী
যোগ্য নহে যেই দাস চরণ পরশে
করে সেই পদাঘাত এ হেন শিরসে!
গরজে মক্ষিকাকীট জলদ গর্জনে,
খদ্যোতের আক্রমণ লজ্মিতে তপনে! (পৃ. ২৫)

সংসারের মহিমা কেমন,
যতনে তল্লাসি যাহা, লভিতে পারি না তাহা,
আচম্বিতে লভে অলক্ষণ।
এই হেরি কোন জনে, হারা রত্ন সযতনে
ঢুঁরি ঢুঁরি নিরাশ হইলা,
এই মনে লয় হেন, আপনি বিধাতা যেন
করতলে মিলাইয়া দিলা।
এই পান্থ ধেয়ে ধেয়ে, কোথাও না জল পেয়ে
মরুভূমে গতাসুর প্রায়,
এই বিধি যেন তাঁরে, দেখান চোখের ধারে
ফল ভরা সলিল সুধায়।
এই নাথ বিরহিণী, বিষাদিনী কপোতিনী
কোন বনে নাথে না পাইলা;
বিধির দয়ায় এই, আপনি কপোত সেই,
কাছে তার উড়িয়া আইলা। (পৃ. ৪৯-৫০)

হরিশ্চন্দ্র মিত্র

১৮৩৮—১৮৭২

'সদ্ভাবশতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের আর একজন বিখ্যাত কবির নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং অনেকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মিত্র। ইঁহারা উভয়ে ছিলেন অন্তরঙ্গ সুহৃৎ, একই সঙ্গে ইঁহাদের কাব্যালোচনার সূত্রপাত হয়। 'সদ্ভাবশতক'-রচনায় হরিশ্চন্দ্র বন্ধুকে সবিশেষ সাহায্য করেন, এমন কি 'সদ্ভাবশতকে'র কোন কোন কবিতা যে হরিশ্চন্দ্রের রচিত, কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা উঁচু দরের ছিল না; এমন কোন গ্রন্থ তিনি রচনা করেন নাই যাহা কালজয়ী হইয়া তাঁহার স্মৃতিকে জিয়াইয়া রাখিবে। কিন্তু সাহিত্য-সাধনায় যে অতুলনীয় পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহা বিরল।

হরিশ্চন্দ্র অকালে পরলোকগমন করেন। কিন্তু মাত্র ৩৩-৩৪ বৎসরের স্বল্প-পরিসর জীবনে তিনি যে বিপুল পরিমাণ সাহিত্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কবিতা, প্রহসন, নাটক, বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশখানিরও অধিক।

একজন কৃতী সংবাদপত্রসেবী হিসাবে হরিশ্চন্দ্রের নাম বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। ঢাকায়

প্রথম বাংলা মাসিকপত্র 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশের কৃতিত্ব তাঁহারই, তিনিই বন্ধু কৃষ্ণচন্দ্রের উপর ইহার সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন।

প্রকৃত সাধকের মত নিষ্ঠা লইয়া সারা জীবন তিনি মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ, অভাবের তীব্র জ্বালা তাঁহাকে তাঁহার জীবনের ব্রত হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। এই কৌমার্য্যব্রতাবলম্বী, সাহিত্যসাধনায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কর্ম্মী পুরুষের জীবন ও সাহিত্য-কৃতির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বাল্যজীবন

আনুমানিক ১৮৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় হরিশ্চন্দ্র মিত্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—অভয়াচরণ মিত্র। অভয়াচরণের বাসস্থান হাওড়ার অন্তর্গত সালিখায়। তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা-প্রবাসী ছিলেন। অভয়াচরণ শোভাবাজার-রাজপরিবারের ঢাকাস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং ঢাকা বাবুরবাজার অঞ্চলে বাস করিতেন। ঢাকাতেই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অভয়াচরণের তিন পুত্র—কালিদাস, মধুসূদন ও হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, সামান্য আয়ে একটি নাতিবৃহৎ সংসারের ভরণপোষণ কষ্টেসৃষ্টে নির্ব্বাহ হইত। এই কারণে হরিশ্চন্দ্র শৈশবে যথোচিত শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। তিনি অল্প বয়সে রামায়ণ মহাভারত সযত্নে পাঠ করিয়াছিলেন; উত্তরকালে ইহা ফলপ্রদ হইয়াছিল।

হরিশ্চন্দ্র কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি ঢাকায় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সহিত পরিচিত হন; কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রায়

সমবয়সী ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা পরস্পর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং একত্র কাব্যচর্চা সুরু করেন। ঈশ্বরচন্দ্র (পরে রামচন্দ্র) গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' হরিশ্চন্দ্র কবিতাদি লিখিতেন। ১৮৫৮ সনের ১৯এ মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' "ঢাকা বাবুর বাজার" হইতে প্রেরিত "মনের প্রতি উপদেশ" নামে তাঁহার একটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি ২৩ নবেম্বর ১৮৫৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' কেদারনাথ দত্ত-লিখিত 'নলিনীকান্ত' পুস্তকের সমালোচনা করেন। ২৯ ও ৩০ মার্চ ১৮৬০ তারিখের পত্রে "স্বভাবের সৌন্দর্য্য" ও "তত্ত্বোপদেশ" নামে তাঁহার দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

শিক্ষকতা

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে হরিশ্চন্দ্র ঢাকার একটি বঙ্গবিদ্যালয়ে কিছু দিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন; ১৪ অক্টোবর ১৮৫৯ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' মুদ্রিত একখানি পত্রে প্রকাশ :—

> সম্পাদক মহাশয়, আমি অত্যন্ত প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি যে এই সহরে কতিপয় স্বদেশহিতৈষী মহানুভব ব্যক্তি বংশীবাজারে একটী বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত করিয়াছেন, এই পাঠশালার শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র, সম্প্রতি উহাতে প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, এবং দিন দিন ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।...শ্রীরাখালচন্দ্র শিল, সাং বংশীবাজার। ঢাকা ২২ আশ্বিন।

সাময়িক-পত্র পরিচালন

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায়ের যত্নে কলিকাতায় বাঙালী-পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের উদয় হয়। রাজধানীর দৃষ্টান্তে ক্রমে মফস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতেও বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। ঢাকায় এই দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল; ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঢাকায় কোন বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্ম হয় নাই। ১২৬৬ সালে ব্রজসুন্দর মিত্র, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্য বাঙালীর চেষ্টায় ঢাকায় প্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্র—বাঙ্গলাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্রেই ১৮৬০ সনের শেষার্দ্ধে রামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক মুদ্রিত হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র মিত্র এই মুদ্রাযন্ত্রের একজন কম্পোজিটরের পদে নিযুক্ত হন। এই মুদ্রাযন্ত্রের সংস্পর্শে আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের মনে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশের ইচ্ছা জাগরিত হয়। শেষে এই দরিদ্র যুবকের উদ্যোগেই ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রথম বাংলা মাসিকপত্র—'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশিত হয়। ইহার দুই-এক বৎসর পরে ঢাকায় নূতন যন্ত্র নামে আরও একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। উদ্যোগী হরিশ্চন্দ্রও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ইস্লামগঞ্জে সুলভযন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তকের দোকানের প্রতিষ্ঠা করেন। ৭ মার্চ ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপনে পাইতেছি—"শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র এণ্ড কোম্পানির ঢাকাস্থ সুলভযন্ত্রে বিক্রীত হয়।"

হরিশ্চন্দ্র মিত্র একাধিক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন করিয়া বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সম্পাদক হিসাবে তিনি

বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন। তৎসম্পাদিত পত্রিকা-সমূহ 'সোমপ্রকাশে'র ন্যায় সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সাময়িক-পত্রিকা কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। আমরা হরিশ্চন্দ্রের পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রিকাদি সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

'কবিতাকুসুমাবলী' ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১৭৮২ শক) ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে 'কবিতাকুসুমাবলী' নামে একখানি পদ্যবহুল মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকা হইতে প্রকাশিত ইহাই প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র। "বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।" 'কবিতাকুসুমাবলী'র শীর্ষদেশে এই শ্লোকটি থাকিত :—

সন্তোষয়তু সর্ব্বেষাং সতাং চিত্তমধুব্রতান্
নানারসসমাকীর্ণা কবিতাকুসুমাবলী।

'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশে হরিশ্চন্দ্রই অগ্রণী ছিলেন। বন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের উপর তিনি পত্রিকা সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। এক বৎসর চলিবার পর হরিশ্চন্দ্র নিজেই বৎসর-দুই 'কবিতাকুসুমাবলী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিকথায় প্রকাশ :

> ...'সদ্ভাবশতক' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, 'কবিতাকুসুমাবলী' নামক একখানি পদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম ; 'সদ্ভাবশতকে'র অধিকাংশ কবিতাই উহাতে বাহির হইয়াছিল। আমি, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, এবং প্রসন্নকুমার সেন—এই তিনজনে ক্রমে 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। বৎসর-খানেক উহা আমি চালাইয়াছিলাম ; তৎপরে হরিশবাবু বৎসর দুই চালান ; তৎপরে প্রসন্নবাবুও কিছু দিন উহা রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহার পর হইতেই ঐ পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে।" ('অনুসন্ধান,' ৩০ ফাল্গুন ১২৯৮, পৃ. ৩৬০-৬১)

'কবিতাকুসুমাবলী' প্রথম বর্ষে "কিছু কাল নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়া পশ্চাৎ নানা কারণ বশতঃ কিয়ৎকাল অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়।" ইহার ২য় ভাগ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—"২০ ভাদ্র বুধবার ১৭৮৩ শক।" এই সংখ্যায় প্রকাশিত "মঙ্গলাচরণ"-এর শেষ কয় পংক্তি এইরূপ :

বল গো সারদে! আমি কিরূপে এখন,
কবিতাকুসুমাবলী করিব গ্রন্থন?
নাই সে কবিত্বশক্তি—যার বলে কবি,
বচনে চিত্রিত করে প্রকৃতির ছবি।
নাই তব কৃপাবল যে বলের বলে,
কবিকুল অনশ্বর অবনীমণ্ডলে।
কল্পনার সুত্র নহে সুদীর্ঘ আমার
কবিতাকুসুমাবলী গাঁথি কি প্রকার?
এ দাসে কর গো গুণী আপনার গুণে,
কবিতাকুসুমাবলী গাঁথি বিনা গুণে।

'চিত্তরঞ্জিকা' :—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯) ঢাকা কলেজের ছাত্র সারদাকান্ত সেন 'চিত্তরঞ্জিকা' নামে "সদ্ভাব ও রসপূর্ণ পদ্যময়ী" মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন, কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রই ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহাও স্বল্প কাল জীবিত ছিল।

'অবকাশরঞ্জিকা' : ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার নূতন যন্ত্র হইতে হরিশ্চন্দ্রের সম্পাদকত্বে 'অবকাশরঞ্জিকা' নামে মাসিক

পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশ' (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৬২) এই পত্রখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :

> অবকাশরঞ্জিকা। এ খানি মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক।...উক্ত পত্রিকার ভূমিকার একস্থলে লিখিত হইয়াছে "নানা রসাত্মক পদ্যময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতা মালা, তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশ রঞ্জিকার এক মাত্র উদ্দেশ্য।" ... সম্পাদক যদি শিথিলপ্রযত্ন ও উপেক্ষমাণ না হন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন অবকাশ রঞ্জিকা কেবল নামতঃ নয় অর্থতও লোকের অবকাশরঞ্জিকা হইবে সন্দেহ নাই।

'ঢাকাদর্পণ' : ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকা হইতে প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র—'ঢাকাপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। ইহার এক বৎসর পরে—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রামচন্দ্র ভৌমিক 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা' এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহার অভাব পূরণ করিবার জন্য হরিশ্চন্দ্র 'ঢাকাদর্পণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারে ব্রতী হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার সম্পাদকত্বে ঢাকা সুলভ যন্ত্র (ইমামগঞ্জ) হইতে 'ঢাকাদর্পণ' প্রকাশিত হয়। ৩ আগষ্ট ১৮৬৩ (১৯ শ্রাবণ ১২৭০) তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :

> বিবিধ সংবাদ। ১৫ই শ্রাবণ।—...ঢাকা দর্পণ নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পত্র খানি পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।

'কাব্যপ্রকাশ' : 'ঢাকাদর্পণ' পরিচালন করিতে করিতে হরিশ্চন্দ্র ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (মাঘ ১২৭০) মাসে ঢাকা মোগলটুলি

সুলভ যন্ত্র হইতে 'কাব্যপ্রকাশ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার শীর্ষে এই শ্লোকটি থাকিত :—

সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

ইহার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক ভূমিকা-স্বরূপ যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

আমরা শিল্প, বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলনার্থ এতৎপত্র প্রচারণে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল বাঙ্গালীসাহিত্যসংসারে অপেক্ষাকৃত সুশ্রীকতা সম্পাদন করাই আমাদিগের অভিপ্রেত, সুতরাং নীচে লিখিত বিষয়গুলি কাব্যপ্রকাশের অবশ্য প্রকাশ্য বলিয়া অবধারিত হইল।

প্রথম কাব্য* (*খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, প্রভৃতি)। দ্বিতীয় নাটক। তৃতীয় আখ্যায়িকা। চতুর্থ প্রহসন। পঞ্চম সাহিত্যের অঙ্গীভূত কৌতুকগর্ভ-গল্পাবলী।…শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র। সম্পাদক। ঢাকা বাবুরবাজার। ১৭৮৫ শক। ১লা মাঘ।

'কাব্যপ্রকাশে'র প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :

কাব্যপ্রকাশ। এখানি মাসিক পত্রিকা। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে কৌরবদিগের দ্যূতক্রীড়া, বীরবাক্যাবলী, জয়দ্রথ নাটক প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। লেখা মন্দ নহে। পত্রিকামধ্যে পদ্যের ভাগই অধিক। রহস্য ও উপকথাও ইহার অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহাতে সম্বাদ বা কোন নূতন প্রস্তাব নাই। ঢাকাদর্পণ সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা ঢাকার

সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। হরিশ বাবু অনেকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি।

'হিন্দু হিতৈষিণী': ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ (চৈত্র ১২৭১) মাসে ঢাকা সুলভ যন্ত্র হইতে 'হিন্দু হিতৈষিণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—হরিশ্চন্দ্র মিত্র। 'হিন্দু হিতৈষিণী' প্রকাশিত হইলে, কলিকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন:

> THE WEEK. *Wednesday, 12th April.* We have received the first number of a Bengali periodical, entitled the *Hindoo Hetoisheenee*, and published in Dacca. The avowed object to this paper is to defend the Hindoo religion and ceremonies. (17 April 1865.)

'হিন্দু হিতৈষিণী' ঢাকার হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র ছিল। ইহার কণ্ঠে নিম্নলিখিত পংক্তিটি মুদ্রিত হইত,—

"—কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।"

'হিন্দু হিতৈষিণী'তে ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে রচনাদি প্রকাশিত হইত। ১১ জুলাই ১৮৬৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:

> ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী সভা। অল্প দিন হইল ঢাকায় হিন্দু-হিতৈষিণী নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বসু এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা। তত্রত্য সুশিক্ষিত ব্রাহ্মদিগের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ প্রাচীন সম্প্রদায়িরা এই সভা করিয়াছেন। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকা খানি এই সভার মুখস্বরূপ; বিদ্যাবন্দাকমার লেখক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয়

উক্ত পত্রিকাখানি লিখিতেছেন। হরিশবাবু এতকাল চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবাদিগের সাপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণ তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ পরিবর্ত্তন অসম্ভবনীয়।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু হিতৈষিণী'র সংস্রব ত্যাগ করেন। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ তারিখের 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' পত্রে প্রকাশ :

> এখানকার হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকার জন্মদাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় উক্ত পত্রিকার সম্পাদকতা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং গিরীশ যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন।

'হিন্দুরঞ্জিকা' : ১২৭৫ (ইং ১৮৬৮) সালে বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার মুখপত্র 'হিন্দুরঞ্জিকা' মাসিক হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইলে, হরিশ্চন্দ্র কিছু দিন ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' (আশ্বিন ১২৭৫) লেখেন :

> 'বঙ্গবালা'...পুস্তকখানি এক্ষণে হিন্দুরঞ্জিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের যত্নে বোয়ালিয়া তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

'মিত্র-প্রকাশ' : কয়েক বৎসর 'হিন্দু হিতৈষিণী' পরিচালন করিবার পর হরিশ্চন্দ্র ঢাকা গিরিশযন্ত্র হইতে 'মিত্র-প্রকাশ' নামে একখানি "সাহিত্যবিষয়ক" মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল —"১২৭৭, ৩০ বৈশাখ" (মে ১৮৭০)। পত্রিকার শীর্ষে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :

> মিত্রপ্রিয়ামন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাশ-শূরঃ।
> নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মুদেত্যুদারঃ॥

পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছিলেন :

> আমরা বরাবর বঙ্গসাহিত্যের পক্ষপাতী, তদালোচনা ও তদ্রচনায় আমাদিগের সবিশেষ যত্ন আছে, সুতরাং এবার আমরা এই চিরপ্রিয় বাঞ্ছনীয় বিষয়ের সুবিধার নিমিত্ত এই পত্রখানির প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।...এখানিতে বাংলাভাষার এবং বঙ্গ-সাহিত্য-সংক্রান্ত বিষয় সকলই বিন্যস্ত হইবে। যাহাতে বঙ্গভাষার উন্নতি, বঙ্গীয়-কবিদিগের কাব্য-কলাপের উন্নতি এবং পরিচয় সাধারণ্যে বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয়, 'মিত্র-প্রকাশ' সর্ব্বথা তৎপ্রতি অবহিত থাকিবে। শুদ্ধ সম্পাদকীয় রচনামালায় ইহা পরিপূরিত হইবে না।

দ্বিতীয় বর্ষে অল্প দিনের জন্য 'মিত্র-প্রকাশ' পাক্ষিক আকার ধারণ করিয়াছিল। ২য় পর্ব্ব, ৩য় সংখ্যায় (আষাঢ় ১২৭৮) "মিত্র-প্রকাশের আকার পরিবর্ত্তন" প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হয় :

> এক্ষণ অবধি আমরা মিত্র-প্রকাশকে ৪ কর্ম্মা আকারে মাসে দুইবার প্রচার করিতে প্রয়াসবান হইলাম।

ইহার পর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা পাক্ষিক আকারে যথাক্রমে ১৫ জানুয়ারি, ১ ফেব্রুয়ারি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখে প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ সংখ্যায় কালিদাস মিত্র অগ্রজ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। অতঃপর কালিদাস মিত্র সম্পাদক হইয়া মাসিক আকারে ২য় পর্ব্বের ৬ষ্ঠ সংখ্যা (ভাদ্র ১২৭৯) হইতে 'মিত্র-প্রকাশ' প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু নিয়মিতভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় ২য় বর্ষের ১২শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে। 'মিত্র-প্রকাশে'র তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১২৮০ সালের বৈশাখ হইতে।

গ্রন্থাবলী

পূর্ব্ববঙ্গের কবি-সমাজে হরিশ্চন্দ্রের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকের অধিকাংশই কাব্য, নাটক বা প্রহসন। তিনি অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কয়েকটি রচনাও [illegible]ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সকল পুস্তকের অধিকাংশই বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আমরা যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দিলাম; বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :—

১। শুভস্য শীঘ্রং (প্রহসন)। ইং ১৮৬১।

২। হাস্যরসতরঙ্গিণী (কবিতা)। ইং ১৮৬২। পৃ. ২৪।

১৮৬২, ১লা সেপ্টেম্বরের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত।

৩। ম্যাও ধর্‌বে কে? (প্রহসন)। ইং ১৮৬২। পৃ. ৬০।

১ সেপ্টেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত।

৪ ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে (প্রহসন)। ঢাকা ১৭৮৫, ইং ১৮৬৩। পৃ. ২৬।

ইহা "ব্যোমচাঁদ বাঙ্গাল" রচিত।

৫। কৌতুক শতক। অর্থাৎ কৌতুকপূর্ণ গল্পাবলী। ১২৬৯ সাল, ইং ১৮৬৩। পৃ. ৩৬।

৮ জুন ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত।

৬। বিধবাবঙ্গাঙ্গনা (কাব্য)। ৩০ বৈশাখ ১২৭০। ইং ১৮৬৩, মে। পৃ. ৮২।

"ইহা বিধবাদিগের দুঃখ বর্ণনপূর্ণ পদ্যময় গ্রন্থ। পদ্যের মধ্যে অমিত্রাক্ষরও আছে। প্রাচীন রীত্যনুসারে ইহাতে বিরহাদি বর্ণিত হইয়াছে।" ('সোমপ্রকাশ,' ৮ জুন ১৮৬৩)

৭। সরল পাঠ (গদ্য-পদ্য)। ইং ১৮৬৩। পৃ. ১৪।

৮ জুন ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ:—"ইহাতে অল্প বয়স্ক বালক ও বালিকাদিগের পাঠোপযোগী সহজ সহজ পদ্য ও গদ্য অসংযুক্ত বর্ণে লিখিত হইয়াছে। লেখা মন্দ হয় নাই।"

৮। আদর্শ শ্রেণী। ইং ১৮৬৩।

"বালকেরা ইহার আদর্শ গ্রহণ করিলে হস্তাক্ষর উত্তম হইতে পারে।" ('গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা,' নবেম্বর ১৮৬৩)

৯। কবিতা কৌমুদী:

১ম ভাগ। ইং ১৮৬৩। পৃ. ৫৪।

২য় ভাগ। (২০ নবেম্বর ১৮৬৭)। পৃ. ৭০।

৩য় ভাগ। (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০)। পৃ. ৩২।

৩১ আগষ্ট ১৮৬৩ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' ১ম ভাগ 'কবিতা কৌমুদী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন: "ইহাতে কতকগুলি মিত্রাক্ষর ও কতকগুলি অমিত্রাক্ষর নীতিপূর্ণ পদ্য আছে। ইহা বালকদিগের অনুপযোগী হয় নাই।

১০। জানকী নাটক। ১ পৌষ ১২৭০, ইং ১৮৬৩। পৃ. ১৬৩।

"...মহাকবি ভবভূতিপ্রণীত সংস্কৃত উত্তররামচরিত অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিয়াছেন। সমুদায় বাঙ্গালা নাটক অশ্লীল বলিয়া

হরিশ বাবু স্ত্রীলোকদিগের পাঠার্থ এইখানি প্রণয়ন করিয়াছেন; অনেকাংশে অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। লেখা মন্দ হয় নাই।" ('সোমপ্রকাশ,' ১৮ জানুয়ারি ১৮৬৪)

১১। **বীর বাক্যাবলি** (কাব্য)। ইং ১৮৬৪। পৃ. ৫৬।

২৫ এপ্রিল ১৮৬৪ তারিখে 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত।

১২। **জয়দ্রথ বধ বৃত্তান্ত।** (নাটক)। ইং ১৮৬৪।

২৯ মে ১৮৬৪ তারিখে 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত।

১৩। **কীচকবধ কাব্য।** ইং ১৮৬৬।

এই পুস্তকে "গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্য" অংশে ১১ পৌষ ১২৭২—এই তারিখ পাওয়া যায়। ১৮৬৬ সনের ফেব্রুয়ারি-সংখ্যা 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা'য় সমালোচিত।

১৪। **কবিকলাপ,** ১ম খণ্ড। আশ্বিন ১২৭৩ (ইং ১৮৬৬)। পৃ. ৭৯।

ইহাতে "আদিকবি কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, মদনকুমার চক্রবর্ত্তী, কাশীরাম দাস এবং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উত্তম প্রণালীতে লিপিবদ্ধ" হইয়াছে।

১৫। **বঙ্গ-বালা** (দশপদী কবিতাবলী)। ১০ শ্রাবণ ১২৭৫ (২৯ জুলাই ১৮৬৮)। পৃ. ৩০।

"কোন বঙ্গবালা কর্ত্তৃক বিরচিত" এবং শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্রের যত্নে প্রচারিত।" প্রকৃতপক্ষে হরিশ্চন্দ্রই ইহার রচয়িতা। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীর বিজ্ঞাপনের মধ্যে ইহার নাম পাওয়া যাইতেছে। 'বঙ্গ-বালা'র মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পাঠেও জানা যায়,

পুস্তিকাখানির লেখক তিনিই। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—"এই পুস্তক এবং মৎরচিত অন্যান্য পুস্তক ঢাকা—সুলভযন্ত্রালয়ে,...এবং বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভায় অন্যন্নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।"

১৬। রামায়ণ (আদিকাণ্ড)। (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯)। পৃ. ৬১।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্যময় আদিকাণ্ড রামায়ণ' প্রথমে দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে "পূর্ব্বের প্রকাশিত দুই সংখ্যায় যে সকল কবিতা গ্রথিত হইয়াছিল, এবারে তত্তাবতের অধিকাংশ নূতন রচিত হইয়াছে।"

১৭। ছাত্রসখা (কবিতা)। (২৬ নবেম্বর ১৮৬৯)। পৃ. ২৪।

১৮। বোধোদয়ের অর্থ (৬ জানুয়ারি ১৮৭০)। পৃ. ৭।

১৯। চরিতাবলীর অর্থ। ইং ১৮৭০ (?)।

২০। কবি-রহস্য, ১ম ভাগ (কবিতা)। (১ মে ১৮৭০)। পৃ. ৫২।

২১। কীর্ত্তিবাসের পরিচয়। (১৪ মে ১৮৭০)। পৃ. ৮।

২২। কবিকৌতুক (কবিতা)। (২৪ মে ১৮৭০)। পৃ. ২৪।

২৩। আগমনী (গীতাভিনয়)। (২২ জুন ১৮৭০)। পৃ. ৩০।

২৪। নির্ব্বাসিতা সীতা (কবিতা)। (৯ আগষ্ট ১৮৭১)। পৃ. ৮২।

২৫। প্রহ্লাদ নাটক। (২২ জানুয়ারি ১৮৭২)। পৃ. ১৮৮।

২৬। হতভাগ্য শিক্ষক!! (নাটক)। (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২)। পৃ. ৬২।

২৭। কবিতাবলী, ১ম ভাগ। (১৬ নবেম্বর ১৮৭২)। পৃ. ১৭।
ইহার আরও দুই ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত হরিশ্চন্দ্রের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নামও জানা যায়:

প্রমদা পাঠ, ১ম ভাগ; পেটুক পঞ্চানন (কবিতা); কুসুমলতা; পদ্যকৌমুদী; বর্ণমালা; রাম-বনবাস (নাটক); সপত্নী কলহ নাটক; আত্মছিদ্রং ন জানামি পরছিদ্রং অনুসরামি; চারু-কবিতা, ১ম-৩য় ভাগ; রাক্ষসের উপর খোক্কস।

মৃত্যু

দারিদ্র্যের সহিত আজীবন সংগ্রাম করিয়া বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক, চিরকুমার হরিশ্চন্দ্র ১ এপ্রিল ১৮৭২ তারিখে অকালে* পরলোক

* হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ বা মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সঠিক জানা না থাকায় কেদারনাথ মজুমদার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে' (পৃ. ৩৬৩, ৩৬৫) লিখিয়াছেন:— "তিনি বৃদ্ধ বয়সে হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া মরিলেন!...১৮৭৫।৭৬ সালে কবি এ মর্ত্ত জগতের নিকট চির বিদায় লইয়াছিলেন।" প্রকৃত পক্ষে হরিশ্চন্দ্র যে ৩৩।৩৪ বৎসর বয়সে অকালে দেহত্যাগ করেন, ১১ এপ্রিল ১৮৭২ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিম্নাংশ পাঠ করিলেই তাহা জানা যাইবে:—"আমরা হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকায় ঢাকার বাবু হরিশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু সংবাদ পাঠে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। হরিশ বাবু ঢাকা প্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।...হরিশ বাবুর বয়ঃক্রম ৩৩।৩৪ বৎসর হইয়াছিল।"

গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য ও সাময়িক-পত্রের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

'মিত্র-প্রকাশে' (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) কালিদাস মিত্র ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করেন; উহা এইরূপ :—

অত্যন্ত শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, মদনুজ হরিশ্চন্দ্র মিত্র এই "মিত্র-প্রকাশ" পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া এক বৎসর কাল যথা নিয়মে প্রচার করিয়াছিল, পরে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ইহা রীতিমত প্রচার করিতে অসমর্থ হইয়া, বিগত ২০ শে চৈত্র [১২৭৮] সোমবার দিবা দ্বিতীয় প্রহরের পর আমাকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া আমার একমাত্র অবলম্বন প্রাণাধিক হরিশ সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' (১২ এপ্রিল ১৮৭২) লিখিয়াছিলেন :

আমরা মিত্রপ্রকাশের প্রচারক ও নানা গ্রন্থের গ্রন্থকার বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্রের পরলোক গমনের সংবাদ সমাচারপত্রে পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। হরিশ্চন্দ্র বাবু বিশেষ ক্ষমতাবান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রথমে কম্পোজিটরের কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ আপনার ক্ষমতাবলে পূর্ব্ববাঙ্গালা প্রদেশের একজন সর্ব্বাগ্রগণ্য লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যরচনাতে কবিশক্তির নিঃসন্দেহ পরিচয় আছে। অবস্থা অনুকূল হইলে তাঁহার কবিশক্তি উৎকৃষ্টতর ফলপ্রসবিনী হইত। আমরা তাঁহাকে কখন দেখি নাই, কিন্তু আমরা সমাদরপূর্ব্বক তাঁহার রচিত গ্রন্থ ও তাঁহার প্রচারিত পত্রিকা পাঠ করিতাম। গত রবিবারে আমরা তাঁহার রচিত প্রহ্লাদ নাটক দৈবযোগে পড়িতে পাইয়া সমালোচন করিব বলিয়া মনে মনে

সাধ করিয়াছিলাম। সোমবারে হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা উপস্থিত হইয়া আমাদের সে সাধ চূর্ণ করিয়া দিল। আমরা এই সমাচারে ভ্রাতৃবিয়োগের ক্লেশ অনুভব করিয়াছি। হরিশ্চন্দ্র বাবুর নামে কীৰ্ত্তিবিশেষ সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি, এবং এ বিষয়ে আমাদের সহায়তার প্রয়োজন হইলে, আমরা আনন্দ সহকারে সে সহায়তা করিতে প্রস্তুত থাকিব।

মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং অফুরন্ত উৎসাহের দ্বারা কি অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়, হরিশ্চন্দ্রের জীবন তাহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার জীবনাদর্শ সাহিত্যক্ষেত্রের নবীন কর্ম্মীদের মনে প্রেরণার সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সম্বন্ধে অভিমত

ডক্টর সুশীলকুমার দে : "এই গ্রন্থমালায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও পরিচিত লেখকদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় নূতন করিয়া পাওয়া যাইবে।...

প্রত্যেক পুস্তিকায় যে-পরিমাণ দুষ্প্রাপ্য ও প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই বহুপ্রযত্নসাধ্য রচনাগুলির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, গত শতাব্দীর প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য লেখকদের সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।...বর্ত্তমান গ্রন্থমালা আড়ম্বরবর্জ্জিত, মিতভাষী ও কঠোর তথ্যনিষ্ঠার সহিত লিখিত।...এই গ্রন্থমালা ব্রজেন্দ্রনাথেরই অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। তাঁহার অন্যান্য সুপরিচিত গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমান গ্রন্থমালার সঙ্কল্প ও সিদ্ধি বহু কালের জন্য তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, সন্দেহ নাই।

('প্রবাসী,' শ্রাবণ ১৩৫৩)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৫

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত



বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

১৮৩৫—১৮৯৪

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী একটি নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। মহাকাব্যের বিচিত্র পাঞ্চজন্য-রবে যখন বাংলার সাহিত্য-জগৎ মুখরিত, সেই সময়ে বিহারিলাল নিভৃতে নির্জ্জনে তাঁর একতারায় মানব-হৃদয়ের অন্তর্লোকের কথা অতি সহজ সুরে নিবেদন করিলেন। বাংলার যে প্রাণধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট দিক্ গীতিকবিতাকে আশ্রয় করিয়া সুদূর অতীত কাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছিল, আধুনিক কালে তাহা প্রথম বিহারিলালের 'সারদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যেই নব নব রূপে ছন্দে ও সুরে অভিব্যক্ত হইল। বিহারিলাল যে সুললিত সঙ্গীত শুনাইলেন তাহা এক দিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্বকীয়, অন্য দিকে তেমনি তাহাতে বাংলার চিরন্তন প্রাণধর্ম্মের নিজস্ব খাঁটি সুরটুকুও অনুরণিত হইয়া উঠিল। ভোরের অস্ফুট আলোয় ললিত রাগিণীতে যখন তিনি তান ধরিলেন, তখন বেশী লোক তাহাতে কর্ণপাত করে নাই, তখন "ঘুমঘোরে প্রাণী ভাবি স্বপ্নবাণী ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে"; কিন্তু সে গান যে-কয় জন ভাগ্যবানের কানের ভিতর দিয়া একেবারে মরমে পশিয়া তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথ সেন এই দুই জনের কবিকৃতিও অবিস্মরণীয়। বিহারিলালের কাব্য হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া

রবীন্দ্রনাথ নিজ সাধনাবলে বাংলা গীতিকাব্যের অফুরন্ত ও সম্পূর্ণ অভিনব রসমাধুর্য্যের উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছেন।

বাল্য-জীবন

২১ মে ১৮৩৫ (৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২) তারিখে বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্ত্তী; তিনি যাজ্যক্রিয়া করিতেন। বিহারিলাল পিতার একমাত্র আদরের সন্তান ছিলেন। চারি বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।

বিদ্যালয়ে বিহারিলালের শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে নবকৃষ্ণ ঘোষের প্রদত্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ছেলেবেলা হইতেই কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল :

> জন্ম হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে বিহারিলাল কয়েক মাসের জন্ত জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশনে গমনাগমন করিয়াছিলেন এবং অনুমান তিন বর্ষ কাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।...
>
> বিহারিলালের বিদ্যালয়ে শিক্ষা এই পর্য্যন্ত। কিন্তু বিদ্যাগারের বাহিরে কিছু কিছু শিক্ষা হইতেছিল। মাতৃভাষা আলোচনার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহা অধিকতর আগ্রহের সহিত এবং অবাধে চলিতেছিল। আর একটি শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল, যদিও সেটিকে বিহারিলালের অত্যন্ত উচ্ছৃখলতার অন্যতম বলিয়া সে সময়ে জনসাধারণের নিকট পরিগণিত হইয়াছিল। এটি ভাবী কবির গান শিক্ষা; অবশ্য এ শিক্ষাটিও কোনরূপ নিয়মাধীন

> ছিল না। বিহারিলাল বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, এবং যাত্রা পাঁচালী বা কবির গানের কথা শুনিলেই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীত-শ্রবণসাধ পরিতৃপ্ত করিতেন।...
>
> ভাবী কবি কেবল গীত শ্রবণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, বাটীতে আসিয়া সেগুলিকে সুরলয়ে পুনরাবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতেন এবং গীতের কোন অংশ বিস্মৃত হইলে তাহা নিজেই পূরণ করিয়া লইতেন। এইরূপ পর-রচিত গীতের অংশ পূরণ করিতে করিতে ক্রমে তিনি আপনি গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই বিহারিলালের কবিতা রচনার প্রথম উদ্যম। ('প্রয়াস,' ফেব্রুয়ারি ১৯০০, পৃ. ৭২-৭৩)

বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসে আসক্তি না থাকিলেও বিহারিলাল সংস্কৃত-সাহিত্য সযত্নে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। গৃহে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যও তিনি রীতিমত পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:

> বিহারীর লেখাপড়া সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, দিনকতক সে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া মুগ্ধবোধ পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু ইস্কুল কলেজে বাঁধাবাঁধি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা তাহার স্বভাবের সহিত মিলিল না। তাহার individuality (ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য) এতই তীব্র ছিল। অল্পকালমধ্যেই সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধ কিছু দিন পড়িয়াছিল; সাঙ্গ করা হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। তাহার বাড়ীর শিক্ষকও বড় 'কেও কেটা' ছিলেন না। তিনি আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাইস-চেয়ারম্যান নীলাম্বর বাবুর পিতা। তিনি ঐ পাড়ায় অনেক

বালককে মুগ্ধবোধ পড়াইয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ সাঙ্গ হউক আর না-ই হউক, বিহারীর সংস্কৃত ব্যাকরণে এতটুকু অধিকার জন্মিয়াছিল যে, তিনি সাহিত্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাহিত্য-শাস্ত্রের কয়েকখানি গ্রন্থ যথা,—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, আর বোধ হয় ভারবি, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত এবং শকুন্তলা আমি তাঁহাকে পড়াইয়াছিলাম। তিনি আমার কাছে সকালে বৈকালে পড়িতে আসিতেন। এই সময়ে Monier Williams শকুন্তলার এক অপূর্ব্ব সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন; ...পিতা ১৯৲ দিয়া পুত্রকে 'শকুন্তলা' কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমিও বড়ই আনন্দের সহিত বিহারীর সঙ্গে সেই শকুন্তলা একত্রে পড়িলাম। বোধ হয় বিহারীর তখন ইংরাজী ব্যাখ্যা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই, কিন্তু পরে হইয়াছিল। ইংরাজীও তিনি কতক দূর আমার কাছেই পড়িয়াছিলেন। আমার মনে আছে, বায়রণের Childe Harold এবং সেক্সপীয়রের ওথেলো, ম্যাকবেথ, লীয়র প্রভৃতি দু'পাঁচ খানি নাটক একত্রে পাঠ করা হইয়াছিল। বিহারীর ধীশক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল, বিশেষতঃ কাব্যশাস্ত্র পর্য্যালোচনাতে এরূপ একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল যে অতি সামান্য সাহায্যেই তিনি ভালরূপ ভাবগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহার আরও এক কারণ ছিল; বাংলা সাহিত্যটা তিনি অতি উত্তমরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ঈশ্বরগুপ্ত, দাশুরায় ইত্যাদি তৎকাল-প্রচলিত অনেক বাংলা গ্রন্থ তাঁহার ভালরূপ পড়া ছিল। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৬৪-৬৬)

এমনিভাবে বিস্তৃত অধ্যয়নের দ্বারা বিহারিলাল যে ভাবসম্পদ আহরণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কাব্যসৃষ্টির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল।

বিহারিলালের আকৃতি যেমন বিশাল, তাঁহার হৃদয়ও ছিল তেমনি প্রশস্ত এবং তিনি নানা সদ্‌গুণভূষিত ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমলের স্মৃতিচিত্রে তাঁহার ব্যক্তিত্ব যেন জলন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে :

> তিনি দীর্ঘাকৃতি, সবলকায় তেজীয়ান্ ও অকুতোভয় ছিলেন।… বিহারী বাল্যকালে একটু দাদাবাজ গোছ ছিলেন।…তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বাল্যকালে তিনি কতকটা ছিপছিপে ও কাহিল ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার একবার শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে তৎকালপ্রচলিত নিয়মানুসারে হাঁটাপথে যাওয়া হইয়াছিল। প্রত্যহ ১০।১২ ক্রোশ হাঁটিয়া এবং চিড়া, মুড়কি, দুগ্ধ, দধি, মৎস্ত ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য ক্ষুধার উপর প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া তাঁহার শরীর গঠিত হইয়া গেল। সেই অবধি তিনি বরাবর হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন এবং বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন। সাহস ও অকুতোভয়তা তাঁহার যে প্রকার ছিল, বাঙ্গালী-জাতির সেরূপ খুব কমই আছে। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৬৩, ১৭০)

বিবাহ

বিহারিলাল দ্বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী অকালে লোকান্তরিতা হন। পত্নীবিয়োগবিধুর বিহারিলাল কবিতায় হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাসকে মুক্তি দিয়া সান্ত্বনালাভের প্রয়াস পান। তাঁহার বিবাহ প্রসঙ্গে নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখিয়াছেন :—

> উনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বিহারিলালের ৺কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের কন্যা অভয়া দেবীর সহিত প্রথম বিবাহ হয়। বিহারিলালদের আবাস-ভবনের সংলগ্ন বাটীতেই পাত্রীদের বাসস্থান

ছিল, এবং উভয় পরিবার পূর্ব্ব হইতেই নিকট সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ; সুতরাং নববধূ অপরিচিতার ন্যায় পতিগৃহে আসেন নাই।... পরিণয়কালে বালিকা দশমবর্ষীয়া বালিকা মাত্র।...নবযৌবন বিকাশে পতিসোহাগিনীর অন্তর স্বামী প্রেমানুরাগে ভরিয়া আসিল, বালিকা চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে সন্তান-সম্ভবা হইলেন।...বিহারিলালের বালিকা পত্নী একটি মৃত সন্তান প্রসবের পর সূতিকাগৃহে বিকারগ্রস্ত হইয়া সতী স্ত্রীর পুণ্যলোকে গমন করিলেন। বিহারিলালের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস তিনি তাঁহার 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যে, "সরলা" নামক সর্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।...

বিহারিলালের প্রথমা পত্নী বিয়োগ জনিত মনঃক্লেশ স্থায়ী হইতে পায় নাই। এই শোক ঘটনার অল্প দিন পরেই পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়, দীননাথ ঠাকুর তাঁহার পত্নীহারা পুত্রকে পুনরায় পরিণয়-বন্ধনে গ্রথিত করিলেন। এ বিবাহও এই রাজধানীতেই হইল,—বহুবাজার নিবাসী ৺নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কাদম্বরী দেবীর সহিত। ('প্রয়াস,' মার্চ ১৯০০, পৃ. ১৪৩-৪৪)

মাসিকপত্র পরিচালন

বিহারিলাল একাধিক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। অল্প বয়সেই সম্পাদকতা-কার্য্যে তাঁহার হাতেখড়ি হয় এবং এই সকল পত্রিকা মারফত তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়া পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার 'অবোধ-বন্ধু' বাংলা মাসিকপত্রের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রথম যে মাসিক পত্রিকার সহিত বিহারিলাল সংশ্লিষ্ট হন তাহার নাম

পূর্ণিমা: ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ (৬ ফাল্গুন ১২৬৫)। 'পূর্ণিমা' প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> বিচারক [ইং ১৮৫৮] বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে সুহৃদবর কবি বিহারিলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম।

'রত্নসার' নামে পাঠ্য পুস্তক-প্রণেতা কামাখ্যাচরণ ঘোষ 'পূর্ণিমা'র পরিচালক ছিলেন। 'পূর্ণিমা'য় বিহারিলাল ও তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণকমলের অনেকগুলি গদ্য পদ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'পূর্ণিমা' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই; পর-বৎসরের শারদীয়া পৌর্ণমাসী সংখ্যা অবধি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম ছয় সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 'পূর্ণিমা'র সূচনা-স্বরূপ প্রথম সংখ্যায় বিহারিলাল যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। এই উদ্ধৃতাংশ হইতে বিহারিলালের গদ্যরচনা-রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

> অয়ি সুষমাময়ি পূর্ণিমে! অদ্য তোমার প্রসাদে পরমানন্দ লাভ করিলাম। অদ্য বলিয়া কেন, আমার চিত্ত অনেকবার মহা মহা দুঃখে এরূপ দুঃখিত ও নানাবিধ কুচিন্তা দ্বারা এরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে কদাচ সুখের মুখাবলোকনের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু নির্জ্জনে আসিয়া একবার তোমার প্রফুল্ল বদন দর্শন করিতে পারিলেই সকল উদ্বেগ দূর হইয়া যাইত, ও সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম! এবং এইরূপ সন্তোষ সলিলে নিমগ্ন হইয়া মহা মহা সুখানুভব করিতাম। এই নিমিত্ত আমি চিরকালই তোমার রূপের পক্ষপাতী ও বসম্বদ; কিন্তু এত দিন প্রীতি প্রকাশের অবসর পাই নাই। অদ্য সানন্দচিত্তে এই পত্রিকা খানির তোমার নামে নাম রাখিয়া তোমাকে উপহার

> স্মরণ প্রদান করিলাম। এ তোমার প্রতি অধিবেশন তিথিতে বহির্গত হইবে।

'সাহিত্য সংক্রান্তি'ঃ 'পূর্ণিমা' বন্ধ হইয়া যাইবার পর বিহারিলাল তদীয় বন্ধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষের সহযোগে 'সাহিত্য সংক্রান্তি' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রতি সংক্রান্তিতে প্রচারিত হইত; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৩ মে ১৮৬৩ (৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭০)। 'সাহিত্য সংক্রান্তি'তে বিহারিলালের অনেকগুলি কবিতা—"নভোমণ্ডল," "বীর্য্যবতী হিন্দুনারী," "প্রেম-প্রবাহিণী কাব্য—পল্লীগ্রাম ভ্রমণ" প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সাহিত্য সংক্রান্তি'ও বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। আমরা ইহার দুইটি মাত্র সংখ্যা দেখিয়াছি।

'অবোধ-বন্ধু'ঃ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিহারিলালের বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ 'অবোধ-বন্ধু' নামে একখানি মাসিকপত্র চোরবাগান স্কুল বুক যন্ত্র হইতে প্রকাশ করেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ইহার প্রচার বন্ধ থাকে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে 'অবোধ-বন্ধু' পুনঃপ্রকাশিত হয়। বিহারিলাল 'অবোধ-বন্ধু'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহার প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ফাল্গুনে আরম্ভ হইয়া ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে শেষ হয়। দ্বিতীয় ভাগ নূতন আকারে ১২৭৫ সালের বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়; এই সংখ্যায় "নব-বর্ষ" প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হয়, তাহাতে বিশেষভাবে বিহারিলালের নামের উল্লেখ আছে :—

> ...আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি

অবোধবন্ধুর জন্ত এরূপ শারীরিক ও মানসিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যে অবোধবন্ধু চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিল।

দ্বিতীয় বর্ষের ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৫) হইতে বিহারিলাল 'অবোধ-বন্ধু'র স্বত্বাধিকারী হন। এই সময় বিহারিলালের বহু রচনা—"নিসর্গসন্দর্শন," "বঙ্গসুন্দরী," "সুরবালা কাব্য" প্রভৃতি 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্পাদনকালেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইন্দ্রের সুধাপান" (শ্রাবণ ১২৭৬), এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের "পৌলভর্জ্জীনী," "নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত" ও অন্যান্য প্রবন্ধ 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য; তিনি লিখিয়াছেন :—

> বাঙ্গলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে। ('সাধনা,' আষাঢ় ১৩০১, পৃ. ১২১)

এই 'অবোধ-বন্ধু' পত্রিকাতেই প্রথম বিহারিলালের কবিতা পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব রূপলোকের সন্ধান পান। এ সম্বন্ধে তিনি 'জীবন-স্মৃতি'তে যাহা বলিয়াছেন তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> এই কাগজেই বিহারিলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মন

স্মরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।...

মৃত্যু ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বিহারিলাল শেষ জীবনে বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার জীবনী-শক্তি তিল তিল করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল। অবশেষে ২৪ মে ১৮৯৪ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) তারিখে বঙ্গভারতীর এই ভক্ত সাধকের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের যে কি অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহা উপলব্ধি করিবার মত মনোবৃত্তি সেদিন অধিকাংশ সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত বাঙালীর ছিল না। বিহারিলাল ধনী ছিলেন না, জীবিতকালে আশানুরূপ প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু বাংলা-সাহিত্য তাঁহার নিকট কি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ, সে-কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার সাহিত্য-শিষ্য অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহাকে স্বরচিত কাব্য 'কনকাঞ্জলি' উৎসর্গ করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ,—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

বিহারিলাল শুধু প্রশস্ত-অন্তঃকরণ সরল পুরুষই ছিলেন না, তাঁহার মত সচ্চরিত্র, সংযমী, বিশুদ্ধাত্মাও বিরল। তাঁহার নির্মল স্বভাব সম্বন্ধে কৃষ্ণকমলের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা আমাদের হৃদয়কে শ্রদ্ধায় অভিভূত করে। কৃষ্ণকমল বলেন :—

> বিহারীর স্বভাবচরিত্র অতি নির্মল ছিল। নিতান্ত শৈশবে কিম্বা প্রথম উঠ্‌তি বয়সে যৎসামান্য কিঞ্চিৎ চরিত্রস্খলন হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যত দিন দেখিয়াছি, এরূপ সচ্চরিত্র, সদাশয়, নির্মল-স্বভাব ব্যক্তি আমি দেখি নাই। তজ্জন্য আমি যে তাঁহাকে কত দূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম, তাহা বাক্‌-পথাতীত। আমার নিজের চেয়ে এ বিষয়ে তাঁহাকে যে কত দূর শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতাম তাহা বলিয়া কি জানাইব।

রচনাবলী

বিহারিলালের জীবিতকালে যে-সকল পুস্তক বা মৃত্যুর পর যে-সকল রচনা প্রকাশিত হয়, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত তাঁহার প্রায় সকল রচনাই সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে তৎকালীন কোন-না-কোন মাসিক পত্রে স্থান পাইয়াছিল।

১। স্বপ্নদর্শন (গদ্য রূপক কাব্য)। সম্বৎ ১৯১৫ (ইং ১৮৫৮)। পৃ. ৩৮।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশায় বিহারিলাল 'স্বপ্নদর্শন' রচনা ও প্রকাশ করেন। ইহাই তাঁহার একমাত্র গদ্য পুস্তক,—প্রথম গদ্য-

রচনাও বটে। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' ৩ আগষ্ট ১৮৫৮ তারিখে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

আমরা 'স্বপ্নদর্শন' ইত্যভিধেয় একখানি অভিনব পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আনুপূর্ব্বিক পাঠ করত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, শ্রীযুত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন,...গ্রন্থকর্ত্তা সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্র, অদ্যাপি পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, এই অল্প বয়সেই যে প্রকার লিপিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, এই সুপাত্র ছাত্র মহোদয় একজন প্রধান লেখকরূপে পরিগণিত হইবেন।

২। সঙ্গীত-শতক। ১২৬৯ সাল (ইং ১৮৬২)। পৃ. ১৮৫।

১৩ অক্টোবর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত। ১২৯৬ সালে অনাথবন্ধু রায়কে লিখিত বিহারিলালের একখানি পত্রে প্রকাশ :—"১৫ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত আমার মনে যে যে ভাবোচ্ছাস হইয়াছিল এবং জীবনে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ 'সঙ্গীত-শতকে' বর্ণিত আছে।" ('প্রয়াস,' অক্টোবর ১৯০০, পৃ. ৫৮১।

'সঙ্গীত-শতকে'র কোন কোন চরণ সাধারণের নিকট সুপরিচিত, যেমন—

যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়ে দেখ তাই।
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।

৩। বঙ্গসুন্দরী (কাব্য)। ১২৭৬ সাল (১ জানুয়ারি ১৮৭০)। পৃ. ১১৩।

"বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে সকল বিষয় আছে, অষ্টম সর্গের প্রথম গীতটি ব্যতীত, তৎসমস্তই আদৌ ১২৭৪ এবং ৭৬ সালের অবোধ-বন্ধু নামক অতীত মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "দ্বিতীয় সংস্করণে সুরবালা নামে একটি সর্গ নূতন সন্নিবেশ, পরাধীনী নাম সর্গের একটি কবিতা ত্যাগ,* এবং অন্যান্য সর্গের কোন কোন কবিতার কোন কোন পদ পরীবর্ত্ত করা হইল।"

'বঙ্গসুন্দরী'র উপহার নামক সর্গে কবি তাঁহার প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছেন; ইহার প্রথম পংক্তিটি এইরূপ :—

প্রিয়তম সখা সহৃদয়। প্রভাতের অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে, তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।

কৃষ্ণকমল তাঁহার নিজের পুস্তকখানিতে কবিতাটির নীচে বড় বড় অক্ষরে এই টিপ্পনীটুকু স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,—

"এই সখা তাঁহার বাল্যকালের বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। এই কএকটি পদ্যপঙ্ক্তি কৃষ্ণকমল নিজের certificateএর মত জ্ঞান করেন এবং value করেন। বেহারীর পদ্য যদি স্থায়ী হয়, কৃষ্ণকমলের নামটাও টেঁকে যাবে, এই লোভে কৃষ্ণকমল এই টিপ্পনীটি সংযোজন করিয়া রাখিলেন।"†

---

* পরিত্যক্ত কবিতাটি এই :—

২৭

বেড়ি খুলে নাও, প্রাণে যাই মারা;
তোমাদের মন সুখেতে থাক্;
আমাদের পাপে ম্লেচ্ছ দুরাত্মারা,
উড়ে পুড়ে দেশে চলিয়া যাক্।

† "পিতৃতর্পণ" : ভারতবর্ষ,' পৌষ ১৩২০, পৃ. ৭২।

৪। নিসর্গসন্দর্শন (কাব্য)। ১২৭৬ সাল (১০ মার্চ ১৮৭০)। পৃ. ৬৮।

"এ কাব্যের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ ১২৭০ সালে, প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ ১২৭২ সালে, এবং পঞ্চম সর্গ ১২৭৪ সালে রচিত হয়। ইহার অধিকাংশ অবোধবন্ধুর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল।" তৎপরে 'অবোধ-বন্ধু'র ৩য় ভাগে সমগ্র কাব্যখানি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; ১ম-২য় সর্গ ১২৭৬ সালের মাঘ সংখ্যায় এবং ৩য়-৫ম সর্গ ফাল্গুন সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল; ৪র্থ সর্গটি বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত অসম্পূর্ণ "সুরবালা কাব্যে"র প্রথমাংশ (১-২১ শ্লোক)।

৫। বন্ধুবিয়োগ (খণ্ডকাব্য)। ১২৭৭ সাল (১৫ জুন ১৮৭০)। পৃ. ৫৫।

"১২৬৬ সালে রচিত।" এই খণ্ডকাব্যের চারিটি সর্গই প্রথমে 'অবোধ-বন্ধু' পত্রে (অগ্রহায়ণ-মাঘ ১২৭৫) প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয় ও রামচন্দ্র নামে চারি জন বন্ধুর এবং প্রথমা পত্নীর বিয়োগ-ব্যথা 'বন্ধুবিয়োগে' আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

১৩২৮ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে "পাগলিনী" নামে বিহারিলালের একখানি অপ্রকাশিত খণ্ডকাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"'পাগলিনী' হারাইয়া যাওয়ায় তজ্জন্যে তৎকালে বন্ধুবিয়োগ কাব্যের যথাস্থানে ছাপাইতে পারি নাই। পরবর্তী সংস্করণে উহা উক্ত কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইবে।"

৬। **প্রেমপ্রবাহিনী (কাব্য)।** জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ (১৫ মে ১৮৭০)। পৃ. ৬৪।

"১২৬৭ সালের প্রারম্ভে রচিত।" সমগ্র কাব্যখানি প্রথমে 'অবোধ-বন্ধু' পত্রের ১ম ও ২য় ভাগে (আষাঢ় ১২৭৪, জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র ১২৭৫) প্রকাশিত হয়।

৭। **সারদামঙ্গল (কাব্য)।** সন ১২৮৬ (২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ৬৮।

"১২৭৭ সালে 'সারদামঙ্গলের' রচনা আরম্ভ হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ১২৮১ সালে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে তদবস্থাতেই প্রকাশিত হয়; এক্ষণে সম্পূর্ণ হইল।"

গ্রন্থাবলী : বিহারিলালের একাধিক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য; ইহার প্রথম খণ্ড ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২০ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহাতে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কবির কতকগুলি রচনাও স্থান পাইয়াছে। এগুলি সর্ব্বপ্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়, প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। আমরা সে অভাব যথাসম্ভব পূরণ করিবার চেষ্টা করিলাম।—

মায়াদেবী : 'ভারতী,' শ্রাবণ ১২৮৯।

শরৎকাল : প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা সঙ্গীত।—'ভারতী,' কার্ত্তিক ১২৮৯। নিশীথ সঙ্গীত ও নিশান্ত সঙ্গীত।—'প্রয়াস,' মে-জুন ১৮৯৯।

ধূমকেতু : 'প্রয়াস,' সেপ্টেম্বর ১৮৯৯।

দেবরাণী : 'ভারতী,' ভাদ্র ১২৮৯।

বাউল বিংশতি : ১২৯৪ সালের 'কল্পনা'য় কিয়দংশ প্রকাশিত।

সাধের আসন :

প্রথম সর্গ (১৭-২৮ শ্লোক বাদে)—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মালঞ্চ,' ফাল্গুন ১২৯৫

দ্বিতীয় সর্গ	— ঐ	চৈত্র	১২৯৫
তৃতীয় সর্গ	— ঐ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১২৯৬
চতুর্থ সর্গ	— ঐ	পৌষ-মাঘ	১২৯৬

'প্রদীপ,' ৩য় ভাগ (১৩০৬), পৃ. ৭৮।

"সাধের আসন" রচনার একটি ইতিহাস আছে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—"যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন ; দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবৎ ভাব ছিল। সে পরিবারের মহিলারাও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী তাঁহাকে স্বহস্ত-রচিত একখানি আসন উপহার দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে বিহারী 'সাধের আসন' লিখেন।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৭২)

কবিতা ও সঙ্গীত :

"নিসর্গ সঙ্গীত"—'বান্ধব,' ১২৮৮, ১০ম সংখ্যা

"গোধূলি"—'প্রয়াস,' জুলাই ১৮৯৯।

গান : প্রভাত হয়েছে নিশি,—'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ,' ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।*

---

* বিহারিলালের কোন কোন কবিতা এখনও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৩১০ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা 'পুণ্যে' "প্রণয়" শীর্ষক কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবিতাটি ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭১ সালে লিখিত।

পত্রাবলী

বিহারিলালের অনেকগুলি পত্র মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কয়েকখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১

'সঙ্গীত-শতক' পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে বিহারিলালের সহিত আলাপ করিবার বাসনা জাগে। উভয়ের মধ্যে কিরূপ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, ১৮ মে ১৮৬৪ তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথকে লিখিত বিহারিলালের নিম্নোদ্ধৃত পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সরলতা, অকপটতা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা এই সকল দিক্ দিয়া উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল বলিয়াই বোধ করি এই দুই সুহৃদের মধ্যে এরূপ মনের মিল হইয়াছিল। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে যাহাকে মধুর রস বলা হইয়াছে কবিতাকারে লিখিত এই পত্রে যেন তাহারই অভিব্যক্তি, ইহার ছত্রে ছত্রে কবির অন্তরের মধু যেন ঝরিয়া পড়িতেছে :

১২৭১ সাল। ৬ জ্যৈষ্ঠ।

রাত্রী ১০ ঘন্টার সময়

প্রিয় সখা

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"প্রযুক্ত সৎকার বিশেষমাত্মনা
ন মাং পরং সম্প্রতিপত্তুমর্হসি।
যতঃ সতাং * * * সঙ্গতং
মনীষিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে॥"

একি এ নূতন আলো অন্তরে উজলে।

অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে।
বহু দিন যে রস করি নি আস্বাদন,
আজি সে মধুর রসে রসিয়াছে মন।
মৈত্রী কিম্বা প্রেম ইহা ঠিক নাহি পাই ;
যারে ভালবাসা বলে বুঝি হবে তাই।
ছেলেবেলা ছেলেখেলা ফুরায়ে গিয়েছে,
মানুষের মনে মন পশিতে শিখেছে ;
তা না হোলে একটুও ছাড়াছাড়ি নাই।
আজি কেন পশিতে প্রবৃত্তি নাহি হয় ?
ছেঁড়া খোঁড়া ভাবিতেও জন্মে যেন ভয় ?
যেন ইহা প্রভাতের পবিত্র কুষম, (কুসুম)
ছেঁড়ে কোন্ সহৃদয়, অহৃদয় সম ?
নির্ম্মল বাতাশে বেস হেলিবে ছুলিবে,
মধুর আমোদে আত্মা উথলে উঠিবে।
হায় কেন মন ফের দোলে গো দোলায় !
ঢাকে বা উষার ছটা মেঘের ছায়ায়।
বটে এই মনোহর কুসুম রতন
সৌরভে গৌরবে মোরে করে আকর্ষণ ;
কে জানে ইহার নাই কেহ অধিকারি ?
কে জানে যে নহে ইহা নিজস্ব তাহারি ?
পাছে আমি নাহি পাই সম্ভোগের পথ,
হই পাছে মাঝ পথে ভগ্নমনোরথ,
অথবা চরমে মম মরমের মাঝে
আচম্বিতে চোরা বাণ বেগে এসে বাজে ?

কি আছে অদৃষ্টে, তাহা বলা নাহি যায়,
"সুখেতে থাকিতে পাছে ভূতেতে কিলায় ?"
দূর হোক্ এ দোলায় কেন ছলি আর,
সন্দেহে প্রণয় সুখ হয় ছারখার্ !
উদার অন্তরে দিয়ে হৃদয় ঢালিয়ে
চুপ্ কোরে বসে থাকি নিশ্চিন্ত হইয়ে।
হয়তো আমার মন মজেছে যেমন,
সে তাহার বিন্দুমাত্র করে নি গ্রহণ।
আপনার তেজঃগর্ভ নম্র ব্যবহার,
কত দূর শক্তি ধরে মন মোহিবার;
সরল মধুর ভাব, খোলা আলাপন,
কত দূর কোরেছে আমারে আকর্ষণ,
হয়তো সে নিজে তাহা জ্ঞাত মাত্র নয়,
চন্দ্রমা জানে না তার করে কত হয়!
শশি হে চকোর করে তোমার ধেয়ান্,
থেকো না মেঘের আড়ে, বোধো না পরাণ্।
গায়েপড়া হোলে তার গুমোর থাকে না,
জেনেও আমার মন প্রবোধ মানে না।
মানিনী ভামিনী নই, গুমোর জানি নে,
তা বোলে কি প্রেমপাত্র হইতে পারি নে?
প্রিয় হে আমার মনে অন্য কিছু নাই,
হেরিয়ে তোমায় শুধু হৃদয় জুড়াই।

কে জানে ভাই! কি ছেলেমানুষী কোরে বোস্‌লেম্, কিছুই বোল্‌তে পারি নে। কাল্‌কের কথায় বার্ত্তায় আর আজকের লেখায়

যদি চাপল্য প্রকাশ হয়ে থাকে, বোধ কয়, তা ভাই! বড় ভ বেসি অভিমান কোর না। আমার এই পত্রীখানি কাহাকেও দেখিও না।

তোমার অনুরক্ত

শ্রীবেহারিলাল চক্রবর্ত্তী

'পুণ্য,' অগ্রহায়ণ ১৩০৭]

২

বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথ যাহাতে রচনা-প্রতিযোগিতায় (দ্র° 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১৭৮৬ শক বৈশাখ, পৃ. ১৬ "বিজ্ঞাপন") পুরস্কার লাভ করিতে সক্ষম হন সেজন্য বিহারিলালের যে ঐকান্তিক আগ্রহ নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। যেভাবে বন্ধুকে তিনি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তাহা তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তারও দ্যোতক :

১২৭১ সাল ১৫ই জ্যৈষ্ঠ

প্রিয় সখা সমীপেষু

... ...

ইহার মধ্যে একদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় উৎসুক হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনারূপ গুরুতর ভার গ্রহণ করাতে তোমার সময় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাদৃশ সময়ের অল্পতা করিয়া দেওয়া একপ্রকার অকর্ত্তব্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং আর যাইতে পারিলাম না। আমার নিশ্চয় ভরসা আছে তুমি সমীচীনরূপে অর্থযুক্ত তেজাল ললিত সহজ পদ পরম্পরা দ্বারা পুরস্কার দাতার প্রগাঢ় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। কিন্তু আজিকালি সাধারণে অহৃদয়ের সংখ্যাই অধিক, তাহারা তোমার কৃতার্থতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া, যিনি তোমার দ্বিতীয় হইবেন, তাঁহার লেখাকে প্রথম ও উৎকৃষ্ট বলিয়া

ব্যাখ্যা করিবে; এবং অম্লান বদনে কহিবে যে, "ঘরে ঘরে বাটিয়া লইবার জন্যই পুরস্কার প্রদানের সংকল্প হইয়াছিল।" তবে কি তাহাদের ভয়ে উক্ত সুমহৎ কার্য্য হইতে অবসৃত হইতে হইবে? না, কখনই নয়; তৃণেরাই দুষ্ট ঝটিকায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; আমি যখন সরল প্রাণে উদার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন ধরাতল রসাতলে প্রবেশ করিলেও প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তবে যাহাতে কেহ উচ্চবাচ্য না করিতে পারে, প্রবন্ধটিকে সেইরূপ অদ্বিতীয় উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাতে যত সময়, যত পরিশ্রম, যত মনোযোগ আবশ্যক, প্রাণপণে তাহার কুলান করা চাই। অতএব শীঘ্র শীঘ্র বেদান্তখানি সমাপ্ত করিয়া চিত্তপটে আঁকিয়া লও, নিস্তব্ধ নিশীথে যাহাদের উপর উপবিষ্ট হইয়া প্রশান্তভাবে তোমার পূর্ব্বারাধিত তত্ত্ব ও সাহিত্য বিদ্যার আরাধনা কর, এবং একান্ত মনে তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে থাক পরে অবসর বুঝিয়া নিমগ্ন হইয়া কলম হাতে বসিয়া যাও।

তোমার গাথাটি আমার অতি মধুর লাগিয়াছে। আজি চারি পাঁচ দিন হইল, পরিষ্কার প্রাতঃকালে আমার গৃহের সম্মুখস্থ ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলাম, আপনাপনিই ওই গাথার প্রথম দুই চরণ ললিতস্বরসম্মিলিত হইয়া পুনঃপুনঃ আমার মুখ দিয়ে নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই দুই চরণের দ্বিতীয় চরণ গাহিবার সময় এক একবার নেত্রযুগল ছলছল করিয়া আসিয়াছিল। কবিরা আপনার মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া,—তাঁহারা যে শক্তির অনুরোধে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন, যাহার সম্ভোগে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও তুচ্ছ বোধ হয়, সহসা দীপ্তিমতী শক্তির অন্তর্দ্ধান দেখিলে কি যে এক ভয়ানক নিরাশা প্রাপ্ত হন, তাহা কেবল কবিভ্রাতারাই যথার্থ অনুভব করিতে পারেন। "শুকিয়েছে যেই ফুল, প্রফুল্ল হবে কেমনে।" হায় আমি যাহার বিরহে

ক্ষণমাত্রও প্রাণ ধরিতে পারি না, সে আমারে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে! এ কথা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

বাস্তবিক তোমার নির্ঝর শুষ্ক হইয়া যায় নাই। তাহা হইলে কখনই এরূপ যথার্থ ভাবপ্রকাশক কবিতা বাহির হইত না। অথবা কবিদের কবিত্ব শক্তি কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে। তবে যখন তাঁহারা প্রকোপিত নিয়তির দুর্জয় তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকেন, তখন আপনার শক্তিকে স্পষ্ট দেখিতে পান না, এই মাত্র। কিন্তু তথাপি বিদ্যুৎ যেমন প্রগাঢ় মেঘে বারম্বার বিলাস করিতে থাকে, তেমনি সেই মহীয়সী শক্তি কবির বিষাদ হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া আলো করিয়া দেয়।

কবির অন্তর সুধার নির্ঝর
অবিরল ঝরঝরে,
চাঁদের কিরণ উজলে যেমন,
তেমন সুষমা ধরে।

জ্যোতি নিরমল, গতি ঢল ঢল,
রসের লহরী খেলা,
যেথা দিয়ে ধায়, আলো কোরে যায়,
রসায় রসিক মেলা।

কভু খেলা করে শেখরী শেখরে
পারিজাত মালা মত,
কভু মেখলায় গড়িয়ে বেড়ায়
সমীরণ বহে যত।

কভু কুঞ্জে গিয়ে বিরলে লুকিয়ে
লতা পাতা ঢাকা রহে,
সুখ কলকলে যেন গান ছলে
গুন মন কথা কহে।

অসীম অম্বর, অগাধ সাগর,
আঁধার পাতালতল,
প্রমোদ কানন, নাটনিকেতন,
ভয়ানক রণস্থল।

নাহি হেন ঠাঁই, যথা গতি নাই,
সকল স্থানেতে থাকি ;
যখন যথায়, সাজায় তাহায়,
তুলি দিয়ে যেন আঁকি।

যদিও অবাধে আপনার সাধে
কবির অন্তর ধায়,
তবু বাধা আছে আপনারি কাছে,
আপনি ঠেকিয়ে যায়।

এই ধরাতলে এক ভাবে চলে
হেন দশা কোন নাই,
বুঝি এ মেলায় সকল দশায়
নবতা বিধান চাই।

এক এক বার   পর্ব্বত প্রকার
মনরোগ গাদগাদা
সহসা সমুখে   বেগে আসে ঝুঁকে
প্রবাহের দেয় বাধা।

বেধে তার মূলে   আকুলে ব্যাকুলে
রেগে যেন ওঠে ফুলে;
কবির নয়ন   তাহারে তখন
দেখিতে না পায় মূলে।

কিন্তু এ শকতি   সতী স্ত্রী যেমতি
ত্যেজিবার কভু নয়,
বদ্ধ থেকে থেকে   লঙ্ঘে ও গিরিকে
শত গুণ বেগে বয়।

আমার মুদ্রিত পদ্যগুলিন্‌ এবং কয়েকটি শেযাক্তি গদ্য প্রবন্ধ একত্র করিয়া আজি তোমারে উপহার দিলাম। আমার সে সময়ের কাঁচা গদ্য এ সময়ে পাঠ করিতে তোমার অবশ্যই অরুচি জন্মিবে। ইহার শেষ প্রস্তাবের মধ্যস্থল অতিশয় অসংলগ্ন; স্বপ্নদর্শনের স্থানে স্থানে নিতান্ত অহৃদয়তা ও বালকতা প্রকাশ হইয়াছে। তথাপি যদি তুমি বন্ধুর বস্তু বলিয়া আদর কর, চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার ধর্ম্মের ভাব যেরূপ ছিল, অনেক বুঝিতে পারিবে, এবং তাহা হইলেই আমার গদ্য-প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। পূর্ণিমার ভিতরে যে কটী আমার রচনা, তাহার নীচে নামের আদ্যক্ষর লিখিয়া দিলাম। তোমার সেই গানটি ভাই আমাকে পাঠাইয়া দিও।

তোমার অনুরক্ত
শ্রীবেহারিলাল চক্রবর্ত্তী

ও হো হো! এ কোন্ পাতে লিখিতে কোন্ পাতে লিখে ফেল্লেম্!
('পুণ্য,' ১৩১২ সাল, পৃ. ৪২৮-২৯)

৩

১৯ অক্টোবর ১৮৮১ তারিখে বিহারিলাল 'সারদামঙ্গল' রচনা সম্পর্কে রংপুর-নিবাসী অনাথবন্ধু রায়কে একখানি পত্র লেখেন; পত্রখানি গ্রন্থাবলীতে 'সারদামঙ্গল' পুস্তকের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। অন্তর্লোকের কোন্ ঘটনা, কোন্ ভাববিপর্যায় বিহারিলালের মনে 'সারদামঙ্গল' রচনার প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশকরূপে পত্রখানির মূল্য অপরিসীম:

কলিকাতা, ৪ঠা কার্ত্তিক ১২৮৮।

ভ্রাতঃ!

মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি।

সর্ব্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্য্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম; সময় শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর। গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ব্ববর্ত্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্ত্তি রচনানন্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে এই বিষাদময়ী মূর্ত্তির সহিত বিরহিতমৈত্রপ্রীতির ম্লান করুণামূর্ত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।

মৈত্রী ও প্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হইলে আমার সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক করে, এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ব্ববাদিসম্মত কথা কহিতে হয়, কি করি বলুন, আমাকে কুরুচে ভাবিবেন না। একান্ত শুশ্রূষা বুঝিলে সারদা-প্রেমের অসর্ব্ববাদিসম্মত কথা পত্রান্তরে লিখিব, কেবল জীবন বৃত্তান্ত এখন লিখিতে পারিব না।

অনুরক্ত

শ্রীবেহারিলাল চক্রবর্ত্তী

৪

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় অনাথবন্ধু রায়ের সহিতও বিহারিলালের গভীর হৃদ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্তরঙ্গ সুহৃদের বিরহ তাঁহাকে কিরূপ আকুল করিয়া তুলিত, নীচের পত্রখানির ছত্রে ছত্রে তাহা মর্ম্মস্পর্শীভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে :

কলিকাতা

৬ই মাঘ, ১২৮৮।

ভাই অনাথ,

তুমি কোথায়, তুমি কোথায় এখন! তোমাকে এখন আর দেখিতে পাইতেছি না কেন? আমি কি করিয়াছি? আমি যখন তোমার প্রথম পত্র পাই, তখন আমার শোবার ঘরের সমুখের ছাদের আলসের উপর, টবে, দাড়িম গাছে, একটি দাড়িম ধরিয়াছিল। তোমার দ্বিতীয়

পত্র পাইবার সময়, সেটি পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে, তৃতীয় পত্র পাওয়ার পর অবধি সে রক্তবর্ণ, ক্রমে আপেলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল। আমি প্রতি দিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিবামাত্র দাড়িমটি আমার চোখে পড়িত, অমনি তুমি আমার সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে; আমোদে আহ্লাদে, পীড়ায়, চিন্তায়, রচনায়, সর্ব্বদাই তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে—সর্ব্বদাই তোমার হাসি হাসি মুখশশী চেহারায় খুসি ফুটিয়া উঠিত। তোমার মত খোলা প্রাণের মানুষকে পাইয়া আমি অহোরাত্র স্বর্গসুখে ছিলাম। দুই চারি দিন হইল টুকটুকে চুকচুকে দাড়িমটি ঝরিয়া পড়িয়াছে। ছাতটা যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তোমাকেও আর তেমন সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। প্রাণ কাতর মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। পত্রপাঠ পত্র লিখিয়া সুস্থ কর। আমি শরীরগতিক ভাল আছি, তুমি সারিয়াছ কি না?

তোমার বেহারী।

৫

২৭ এপ্রিল ১৮৮২ তারিখে বিহারিলাল অনাথবন্ধু রায়কে আর একখানি পত্র লেখেন; ইহা পাঠে বিহারিলালের ধর্ম্মমতের আভাস পাওয়া যায়। এ কথা বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেম ভক্তি ও ভালবাসাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁহার ভক্তিপ্রবণ কবি-চিত্ত দেববিগ্রহকে আশ্রয় করিয়াই শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস পাইয়াছিল:

১৫ বৈশাখ ১২৮৯।

ভালবাসার সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর ভালই করিয়াছেন।...ভালবাসার চরম চরিতার্থতার স্থান এই বিশ্ব।...নরনারীতে ভালবাসা প্রথম

প্রস্ফুটিত হয়। তাহার স্বর্গীয় সৌরভ চিরদিন জীবনকে পরমানন্দময় করিয়া রাখে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্ব আপনার হইয়া যায়। এই অমায়িক আত্মভাব দেবদুর্লভ। ইহারই নাম পরমার্থ, স্বার্থ নহে।

আমি হিন্দু, যেহেতু হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতি সৌভাগ্যক্রমে অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, করিবও না। আমার বাটীতে বিগ্রহ আছেন। নিত্য তাঁহার পূজা-ভোগ হইয়া থাকে। তাঁহাকে লইয়া আমরা সপরিবারে সুখে আছি। বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি সকলের মনে একটি নিঃস্বার্থ ভক্তিভাব বিরাজ করিতেছে। ('সাহিত্য-সংহিতা,' কার্ত্তিক ১৩২১, পৃ. ৩৫৯-৬০)

বিহারিলাল ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, তাঁহার নিজস্ব কবিত্ব-প্রতিভা ও কাব্য-সম্পদ্ দিয়া এখনও কবি বিহারিলালের সমুচিত প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বাংলা দেশের আধুনিক পাঠক-সমাজ রবীন্দ্রনাথ মারফত তাঁহার সামান্য পরিচয় পাইয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের গুরু হিসাবেই বর্ত্তমানে তাঁহার খ্যাতি, কবি হিসাবে নয়। অথচ এই বিহারিলালই এক দিন মহাকাব্য-মুখরিত বাংলা-সাহিত্যে গীতিকাব্যের নবতন সম্ভাবনার সূচনা করিয়াছিলেন; বাঙালী কবি-সমাজের বহির্মুখী (objective) দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী (subjective) করিয়াছিলেন; এই নূতন পরীক্ষায় নূতন ভাষা ও ছন্দের প্রবর্ত্তনও তিনি করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য স্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি বলিয়াছেন,—

> বিহারিলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর

সঙ্গীত নির্জ্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক সমাজের দ্বারবর্ত্তী হইত না।

কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সঙ্গীত-কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।...

সে-প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই ঊষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।

রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে তখন যেমন জগতের মূর্ত্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া ওঠে, সেইরূপ...প্রতিভার প্রত্যুষকিরণে মূর্ত্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়া গেল।

"সর্ব্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন;
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন!"

আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। ('আধুনিক সাহিত্য')

'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ কবির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও স্মরণীয়:

> তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত—তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল—তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল।

ছন্দে, ভাষায় ও ভাবে এই আনন্দ তিনি বাংলা-সাহিত্যে সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই পথ ধরিয়া নিজের অন্তরের গহনলোকে অবগাহন করিতে শিখিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলার কাব্য-সাহিত্য মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বিচিত্র মত্ত দশার কথা কবি বিহারিলাল তাঁহার 'সারদামঙ্গলে' বলিয়াছেন—

হৃদয়-প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি সুখী হয়ে,
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান ;
ভক্তিভাবে সদা স্মরি,
মনে মনে পূজা করি,
জীবন-কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান।

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করে রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমির রাশি
ভুবন ভরেছে আসি
অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার।

বিচিত্র এ মত্তদশা,
ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!
কি বিচিত্র সুরতান
ভরপূর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশমণ্ডলে!

এবং যে মত্ত দশা বাংলা দেশে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া বিচিত্র সুরতানে বাঙালীর প্রাণ ভরপূর করিয়াছে, কবি বিহারিলালই সর্ব্বপ্রথম সেই মত্ত দশায় পড়িয়াছিলেন, এ কথা ভুলিলে আমরা অকৃতজ্ঞ হইব।

'সারদামঙ্গল' বিহারিলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কবির নিজের কথায় "মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ ও সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ" হইয়া তিনি এই কাব্য রচনা করেন। দেবী সরস্বতীর সহিত প্রেম মিলন ও বিরহের ভাবদ্যোতক কবিতানিচয়ে কাব্যখানি অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত। যেমন ভাবের গভীরতায়, তেমনি প্রকাশের স্বচ্ছতায় কাব্যগ্রন্থখানি অনবদ্য। সর্ব্বোপরি ইহার মধ্যে যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত সুরের লীলা আছে তাহা পাঠকের কান ও প্রাণকে যুগপৎ মুগ্ধ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু কিছু কবিতাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। গোড়ায় "উপহার" নামক গীতিটি এইরূপ :—

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার!
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার!

কি জাগি কি ঘুমঘোরে,
কি চোকে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।

তবুও ভুলিতে হবে,
কি লয়ে পরাণ রবে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারেবার।

বিহারিলালের শব্দচয়ননৈপুণ্য এবং অপরূপ রূপ-সৃষ্টির পরিচায়ক নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি :—

নাহি চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অনল-হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র-বিদ্যুত-দাম-দ্যুতি ঝলমল;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।

হিমাদ্রিশিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবনে।
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী-তরুণ-উষা কুমারীরতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে।

হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস সরে কমল-কানন।

প্রকৃতি-বর্ণনায় বিহারিলালের একটা স্বকীয়তা ছিল। নিম্নের পংক্তিগুলি তাহারই দ্যোতক :—

কায়াহীন মহাছায়া
বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া
মেঘে শশী ঢাকা রাকা-রজনীরূপিণী,
অসীম কানন-তল
ব্যেপে আছে অবিরল ;
উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী।

ঘোর্ ঘোর্ সমুদয়,
কি এক রহস্যময়,
শান্তিময়, তৃপ্তিময়, ভুলায় নয়ন ;
অনন্ত বরষাকালে
অনন্ত জলদজালে
লুকায়ে রেখেছে যেন জলন্ত তপন।

পত্র-রন্ধ্র ধরি ধরি
কিরণের ঝারা ঝরি
মাণিক ছড়িয়ে যেন পড়েছে কাননে,
চিকন শাদ্বল দলে
দীপ্ দীপ্ কোরে জ্বলে
তারকা ছড়ান যেন বিমল গগনে॥

উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং কবি বিহারিলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৮৩৮—১৮৭৮

পৃথিবীতে খুব কম কবির জীবনই কাব্যের বিষয় হইতে পারিয়াছে। বাংলা দেশে মধুসূদনের জীবনে মহাকাব্যের উপাদান ছিল। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের জীবনও অনুরূপ। উভয়েই যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল ও অতিচারী হইয়াছিলেন। উভয়ের পার্থক্য এইখানে যে, মধুসূদনের ইন্দ্রিয়াশক্তি বৈরাগ্যে রূপান্তরিত হইয়া তাঁহাকে ধার্ম্মিকতার স্থৈর্য্য ও শান্তি দিতে পারে নাই, সুরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে পারিয়াছিল—কামই তাঁহাকে দিয়াছিল মোক্ষ বা মুক্তি। কবির অন্তর্জীবনের এই ঘাত-প্রতিঘাত অতি বিচিত্র। এই বিচিত্র কাহিনী তাঁহার রচনাবলীতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাঁহার সাহিত্য-জীবনের এক দিকে তাঁহার কাম-জীবন, অন্য দিকে তাঁহার ধর্ম্মজীবন। তাঁহার জীবন দ্বি-শিখা বর্ত্তিকার মত দুই দিকে প্রজ্বলিত হইয়াছিল বলিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কিন্তু এই স্বল্পস্থায়ী জীবনে মহাকাব্যিক মহিমা ছিল। তাঁহার কাব্যধারা ও জীবনধারা একত্র অনুধাবন করিলে সেই মহিমা প্রত্যক্ষ হইবে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ সরকার কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের "শৈশব-সঙ্গী" এবং "ছায়ার ন্যায় চিরজীবন কবির অনুগমন ও অনুকরণ করিয়াছিলেন।" সুরেন্দ্রনাথের জীবনী-সঙ্কলনে ইহাই আমাদের প্রধান

উপজীব্য। যোগেন্দ্রনাথের রচনা হইতে যেমন কবির পতন-উত্থান এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি মনশ্চক্ষে সুপরিস্ফুট হয়, তেমনি তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাটিও অনুসরণ করিতে পারা যায়।

জন্ম : বংশ-পরিচয়

সুরেন্দ্রনাথ ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ২৫এ ফাল্গুন বুধবারে ভূমিষ্ঠ হয়েন। ইঁহার পিতার নাম প্রসন্ননাথ মজুমদার ;—যশোহর-বিভাগে ভৈরব-নদের তটবর্ত্তী জগন্নাথপুর, জন্মভূমি। ইনি ভট্টনারায়ণসম্ভূত, রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব, ও পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিকটে বিদ্যালয় ছিল না, এ জন্য বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষা লাভ হয় নাই। পরন্ত, গৃহ-শিক্ষার কুশলতা হেতু, জন্মান্তরীণ স্মৃতির ন্যায় সত্বর ইঁহার বুদ্ধিবৃত্তি জাগরূক হইয়াছিল। আট নয় বৎসর বয়সে সুরেন্ পরিষ্কার অক্ষরে চিঠীপত্র লিখিতেন ও জনৈক প্রতিবেশী আত্মীয়ের নিকট পার্সি পড়িতেন। তিনি মুগ্ধবোধসূত্র ও হিতোপদেশ প্রভৃতি কতিপয় নীতিগ্রন্থও কিছু কিছু অভ্যাস করেন। ১২৫৩ সালে তাঁহার গৃহাচার্য্য পিতামহ পরলোক-যাত্রা করেন ও কবি কর্ত্তৃপক্ষ-বিরহিত হয়েন ;—যেহেতু ইতিপূর্ব্বে জীবনের সপ্তম বর্ষে (১২৫১ সালে) তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। এই সময়, সুদূর-প্রস্থিত এক মাত্র জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাদের জন্য অর্থচিন্তা করিতেন। সুতরাং সুরেন্দ্র অগত্যা সংসার বহনার্থ শির নত করিতে বাধ্য হয়েন। অন্যত্র ইহাতে অপকার হইতে পারে, কিন্তু কবি বিষয়-বিজ্ঞানের সঙ্গে লোক-চিত্ত-চর্চ্চার সুযোগ পান। তিনি সদ্ভাব ও সদাচার-রত এবং বিনয়-নম্রতায় বিভূষিত ছিলেন। রহস্য ও সঙ্গীত-প্রিয়তাও তাঁর কৈশোর-চরিতের কোমল ক্রিয়া। বিশেষ, কার্য্য-কুশলতার সহিত বৈষয়িক-বুদ্ধিমত্তার সম্মিলন ছিল, তজ্জন্য কিশোর বয়সে এরূপ লোকানুরাগ বা যশোলাভ করিয়াছিলেন, যাহা অন্যত্র অমূলক বলিয়া বোধ হইতে পারে।

বিদ্যাশিক্ষা

একাদশ বর্ষে (১২৫৪ সালে) সুরেন্দ্রনাথের বিধিবৎ উপনয়ন হয়। ১২৫৫ সালে কলিকাতায় আসিয়া "ফ্রি চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসনে" তিনি প্রথম ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হয়েন;—কিন্তু কয়েক মাস পরেই "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী" স্কুলে নিয়োজিত হইয়া অখণ্ড তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন।...যে উন্নত কবি-কীর্ত্তি তাঁহার উত্তর জীবনের উচ্চ গৌরব ও পরম সৌন্দর্য্য সাধন করে, এই সময়ে তাহার অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইল। তাঁহার সুধাসিক্ত লেখনী শুভক্ষণে ঈশ্বরের মহিমা-গীত গাইয়া প্রকৃতির ঋতুপর্য্যায়* চুম্বন করিল।...

আমাদের স্মরণ আছে, যখন কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, কবি তখন দেশীয় বিদ্যা-বন্ধু হেয়ার সাহেবের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত ছাত্র। দুই জন প্রধান শিক্ষক তাঁহার শুভানুধ্যায়ী। কিন্তু অনেকে জ্ঞাত আছেন, বিদ্যালয়ের পরকীয় ও সীমাবদ্ধ শিক্ষা লাভে ইঁহার স্ফুর্ত্তিবৃত্তি হইত না;—গৃহে নিয়ত স্বাধীন চর্চ্চা দ্বারা গভীর জ্ঞান আত্মসাৎ করিতেন। এই জ্ঞান কেবল পুস্তক-গত নহে, তিনি অনুসন্ধান-শক্তি স্ফূর্ত্ত করিয়া অন্ধ বিশ্বাসকে সংস্কারস্থ করিতেন না। তাঁহার নিকট পুনঃপুন শুনিতে পাওয়া যাইত, "শুধু গ্রন্থ দেখিয়া লাভ কি? সংসার দর্শন কর, অন্তর্বিধ সংস্কার উদয় হইবে।"... সুরেন্ প্রথম তিন ও সম্প্রতি দুই, এই পাঁচ বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন;—আর না।...

বিবাহ: সাময়িক-পত্রের সহিত সম্পর্ক

১২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে আত্মীয়গণ ও পাত্রীপক্ষের উদ্‌যোগে সুরেন্দ্রনাথ দারপরিগ্রহ করেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ পূর্ণ

* "ষড়্‌ঋতু-বর্ণন" কোন বন্ধু কর্ত্তৃক মৃজাপুর বিশ্বাস কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এখন উহা আর পাওয়া যায় না।

হইয়াছিল। ১২৬৬ সালের প্রথমে তিনি অপস্মার-রোগাক্রান্ত হয়েন;—বারংবার ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় চিকিৎসা অবলম্বিত হয়, কিন্তু পীড়ার যাপ্যভাব বিদূরিত হইল না। বৎসরের শেষভাগে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হয়, কবি তাহার "মঙ্গল ঊষা" নাম ও প্রচার-কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া লেখক হয়েন। কলিকাতাবাসী কোন সাহিত্য-বান্ধব উহার ব্যয়বাহী ও প্রকাশক ছিলেন। ইহার অষ্টখণ্ডে পোপের "টেম্পল অব ফেম্" "যশোমন্দির" নাম প্রাপ্ত হয়। তাহার শিরোভাগে এই মহার্থ পদদ্বয় সন্নিবেশিত ছিল। যথা—

"যামিনী প্রলয়রূপা সুষুপ্তি মরণ,
স্বপ্ন মাত্র জীবনের সুরম্য স্মরণ।"

অনন্তর "প্রতিভা" ও "কবি-প্রশংসা"* প্রভৃতি প্রবন্ধ সকলও কবির প্রকৃত প্রতিভার ঘোষণা-পত্র। এই সকল উপকরণ-সহ তিনি কলিকাতায়

---

* "কবি-প্রশংসা" অতি সুন্দর কবিতা। দুঃখের বিষয়, আমরা কবির রচনা-ভাণ্ডারে এ রত্নটি এখন দেখিতে পাই না। আমাদের স্মৃতি-সংগৃহীত তাহার দুই এক স্থল এখানে প্রকটিত হইল মাত্র।

"সুন্দর এ সৃষ্টি, বিধি করি সম্পাদন,
ভাবিলেন শোভা বোধ করে কোন্ জন।

* * *

যেমন এ চিন্তা তাঁর মানসে উঠিল,
মানস হইতে এক কুমার জন্মিল।
বাগ্‌-বাণী সযতনে অঙ্কেতে লইয়া,
পালিলেন সে নন্দনে স্তন-সুধা দিয়া।
কল্পনা-দর্পণ দেবী দান দেন তায়,—
সমুদয় প্রকৃতির প্রতিবিম্ব যায়।

স্থাপিলেন আনি পুত্রে সংসার ভিতর,
নর-কুল-গুরু যিনি, কবি নাম ধর।
যাঁহার কোমল গীত লোল স্বর ভরে,
বাণী-স্তন-পীত সুধা, বাক্য সহ ঝরে।

* * *

আসিয়া দেখিলেন, "মঙ্গল উষা" সম্বন্ধে সম্পাদক, তাঁহার মতের বিপরীত বিপর্য্যয় করিয়াছেন, কার্য্য চালনায়ও সুপ্রণালী নাই ;—তিনি বিরক্তির সহিত "মঙ্গল উষার" মঙ্গলাশা পরিত্যাগ করিলেন, আর উৎসাহ দান করিলেন না। কিন্তু লেখক নিরাশ না হয়েন, এ জন্য দৈব-প্রদত্ত আনুকূল্যের ন্যায় একখানি সাপ্তাহিক-পত্রের সম্পাদক-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। পক্ষান্তরে, এই উপলক্ষে বিখ্যাতনামা ভূম্যধিকারী প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার বিদ্যাবত্তা দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া স্বকীয় বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।...লোকস্মৃতি পরিশীলনেও তাঁহার উন্নত অধিকার জন্মিয়াছিল,—সুচতুর বুদ্ধিশক্তি কার্য্যক্ষেত্রে আশু কৃতকার্য্যতা প্রদান করিত, অতএব অবলম্বিত পদে

লেখনী লিখন-পত্র কিম্বা মস্যাধার,
হয় নাই অবনীতে যখন প্রচার,
দর্শনের জনক জননী দুই জন
জন্মে নাই,—তর্কশক্তি, বিবেক, যখন,
যে কালেতে কাল পতি, ঘটনা—রমণী
শিশু ছিল,—ইতিবৃত্ত জনক জননী,
জন্মে নাই বিজ্ঞান যখন অবনীতে,
কবির প্রভুত্ব পদ তখন হইতে।

কে করিত মানবের মহত্ত্ব স্থাপন,
কাব্য-কল্পতরু কেবা করিত রোপণ ;—
ঐশিক যাহার বীজ, জন্মে দৈববলে,
সত্য মূল, শোভা যার অলঙ্কার দলে।

* * *

সামান্য কমল ফুল্ল সরসীর জলে,
"পদ্মফুল" নাম যার সাধারণে বলে,
"মধুময়ী রূপসী নলিনী রসবতী,"
কবি বিনা কে ভাবে এ মধুর ভারতী।
দেব-দিব্য-চক্ষে হেরি মূর্ত্তি প্রকৃতির,
প্রেম-মোহে মুগ্ধমতি কবি প্রণয়ীর।
শশী মুখ-শশী যার অম্বর—অম্বর,
প্রদোষ-প্রভাত-তারা আঁখি শোভাকর।
নিশ্বাস সমীর বহে, তারা হীরা-হার,
মেদিনী-নিতম্বে শুভ্র-সিন্ধু-কাঞ্চী যার।

রাশিচক্রে দ্বাদশাঙ্কে ব্যোম-ঘটিকায়
যাবৎ ঘুরিবে রবি শশী কাঁটা তায়,—
যাবৎ গরজি ঘোর প্রলয় ঝঞ্ঝায়,
আছাড়িয়া আকাশে না ভাঙ্গিবে ধরায়,—
গ্রহরাশি নাদিয়া বিলাপি ঘোর স্বরে,
যাবৎ না হবে পাত উন্মাদ-সাগরে,—
যাবৎ প্রকৃতি নাড়ী কিঞ্চিৎ নড়িবে,
কবি-যশো-রবি দীপ্ত তাবৎ রহিবে।"

অবিলম্বে যশোলাভ করেন। এই নিয়োগ পোষ্টার চরমকাল (১২৭৫ সাল) পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল।...

পত্নী-বিয়োগ

পর বৎসর (১২৬৭। বৈশাখ) সুরেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিতা হয়েন। ইহাতে তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই সত্য, কিন্তু অতীব ব্যথিত হইয়াছিলেন। দৈবের আকস্মিক অব্যর্থ লক্ষ্য প্রসারিত বক্ষে ধরিলেন, কিন্তু আঘাতে ভগ্নহৃদয় হইবেন বিচিত্র কি ? কোন মিত্র এই অপূর্ণ-মনোরথ-বিগতার কতিপয় অন্তিম স্মৃতির আলোচনায় আক্ষেপ করিতেছিলেন, কবি "শ্মশান"* শীর্ষক নিজ রচনার একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। যথা—

"ওখানে গগনে কা'ল ছিল এক তারা,
কে জানে কেমনে আ'জ কোথা হ'ল হারা ?
বারিধি-বিপুল-কূলে বালুকা বিস্তার,
কে জানে কোথায় গেল এক কণা তার ?"...

পত্নী-বিয়োগে সুরেন্দ্রনাথ নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই শোক তাঁহার অন্তরকে পরিশুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে নৈতিক অধঃপতনের পথে লইয়া গিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ বলেন—

পত্নী-নিধনে কবির সাংসারিকতা ও প্রেম যুগপৎ নিরাশ্রয় হইয়াছিল বলিতে হইবে। তিনি চির-অভ্যস্ত সুহৃৎ-সহবাসের স্বল্পতা সাধন করিলেন, —আদরের বিষয় কর্ম্মেও আর আস্থা রহিল না। ফলতঃ, এই দৈব-

---

* এই প্রবন্ধে নবরসের সুন্দর সমাবেশ হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় "হাস্যরস" তত উজ্জ্বল নহে।

বিড়ম্বনার ব্যবধান হইতে অল্পে অল্পে যখন তাঁহার মনের ভাবান্তর হইতেছিল, তৎকালে পোষ্টার প্রাঙ্গারে দুইটি নূতন লক্ষলাভ হয়। প্রথম পরমহংস, দ্বিতীয় মৌলবি সাহেব; উভয়েই অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। কবির সঙ্গীত-অভিজ্ঞতা অল্প নাই,—যাহার আতিশয্যে সেতার অভ্যাস এবং উন্নতি-কাম হইয়া মৌলবির বাসায় যাতায়াত করিতেছিলেন;—যে স্থল সুরা ও বারাঙ্গনার রঙ্গ-ভূমি বলা যাইতে পারে। স্বরূপতঃ ঘনিষ্ঠতা বদ্ধ হইলে, বান্ধবের গুণের সহিত কতিপয় দোষও তাঁহাতে সংক্রমিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম স্থলে জয়দেবের ন্যায়, আমাদের দুর্ব্বল-লেখনী বিরাম লাভ করিল। কবির নিরপেক্ষ লেখনী অবতারিত হইয়া সত্যের অনুসরণ করিবে,...কবি এই সময়ে রঙ্গপুরস্থ তাঁহার বন্ধুকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহার দুই এক স্থল এখানে গৃহীত হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

ব্যভিচার এবং পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেও সুরেন্দ্রনাথের অন্তরাত্মা যে ভিতরে ভিতরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল, এই পত্রগুলিতে তাহা সুপরিস্ফুট। পত্রগুলিতে তাঁহার দার্শনিকতাপূর্ণ মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মাপরাধের যে অকপট স্বীকৃতি পত্রগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিকই তাহা বিরল। তৃতীয় পত্রখানিতে যে সুগভীর বিষাদের সুর অনুস্যুত তাহা অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে।

কিন্তু এই অধঃপতনের পঙ্ক হইতে নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার অন্তরে যে একটা প্রগাঢ় ব্যাকুলতার সঞ্চার হইয়াছিল, শেষ পত্রখানির ছত্রে ছত্রে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে:

১

কলিকাতা।

১২৬৮। ১০ই আশ্বিন।

দেশ-হিতৈষিতা ন্যায়পরতা ও করুণা এ সমস্তই গুণাভিধেয়;—পরস্পরকে পরস্পরের অভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়। কিন্তু পানানুরাগ, কাম-মত্ততা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি দোষাভিধানগুলির পরস্পর কি প্রণয়! একের অবস্থান স্থানে একে একে প্রায় সকলগুলিই সমবেত হয়। মাতাল, মিথ্যুক, লম্পট ও চোর বলিয়া প্রায় এক ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা যায়। তুমি জ্ঞাত আছ, এক কাম ভিন্ন অন্য স্বভাব-দোষ আমার ছিল না। কিন্তু সেই এক দোষের প্রভাবে ক্রমে সমুদয় দোষের আধার হইয়া, এখন প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বভাবকে নিহত করিয়াছি। বিধাতা যেরূপ মানুষ আমাকে করিয়াছিলেন, আমি আর সেরূপ নাই;—আপনি আপনাকে পুনঃ সৃষ্টি করিয়াছি। জগদীশ! আমার এই সকল পাপের দণ্ড জন্য তোমাকে তীক্ষ্ণতর যন্ত্রণাময় নব নরক সৃষ্টি করিতে হইবে।

২

কলিকাতা।

১২৬৮। ১এ ফাল্গুন।

আমার মতে দুঃসময়ের অর্থ একটি অজ্ঞাত-পূর্ব্ব সুদীর্ঘ সময়। যাহার পল—প্রহর, দণ্ড—দিবা, ও মাস—মন্বন্তর বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রধান গুণ এই যে, অতি অল্প পরমায়ু অধিক জ্ঞান হয়; দশ বৎসর বাঁচিলে বোধ হয় দশ সহস্র বৎসর জীবিত আছি। * * * * * * ইয়ুরোপীয় অনেক কোমল-প্রকৃতি কবি, নির্ধন কৃষি-জীবিগণের

প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 'যাহারা সুললিত গাথা গানে মানব মন মোহিত করিত, যাহারা সুকোমল-ভাব-সম্পন্ন কবিতা-কলাপ প্রণয়নে পারগ ছিল,—যাহারা সাম্রাজ্যের সিংহাসন-শোভা সম্পাদন করিতে পারিত;—প্রকৃতি দেবী যাহাদিগকে এই সকল গুণভাজন করিয়াছিলেন, এমত কত ব্যক্তি দৈন্যতা বশতঃ অযন্তভাবে জীবন যাপন করিয়া, পরিশেষে অননুশোচিত মৃত্যু-মুখে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। দৈন্য-দশারূপ তুষার-প্রপাতে তাহাদের অন্তর্নদীগতি চিরদিনের জন্য নিরোধ হইয়াছিল।'

হায়! কীর্ত্তি দেবীর অঙ্ক-পালিত সে ভুবন-বিখ্যাত অবতার-গণই বা কোথায়? আর মাদৃশ হতভাগ্যই বা কোথায়! দুরবস্থা, কঠোর করে সে কুসুম-চয়কে যতই বিদ্রাবণ করিয়াছে, ততই তাহা হইতে সৌরভ বিস্তার হইয়া জগৎ আমোদিত করিয়াছে। দুর্ঘটনা-ঘনঘটা সে রবিচয়কে সমাচ্ছন্ন না করিয়া, কেবল সান্নিধ্য দ্বারা তাহার গৌরবাধিক্যের কারণ হইয়াছিল।

৩

কলিকাতা।

১২৬৯। ১লা ভাদ্র।

—সুজন বা সুজনানুরাগ সন্ধ্যারাগের ন্যায় ক্রমে বিলীন হইয়াছে;—অন্তরাকাশ নিষ্প্রভ, আর তাহাতে সন্তোষ-সুধাংশুর উদয় হইবে না। হায়! কঠোরতা কি আমার স্বভাব? যে আমি একটি সহৃদয় ব্যক্তির সমাগমে অবনীকে স্বর্গনির্ব্বিশেষ জ্ঞান করিতাম,—যে আমি সংসারে আজীবন ক্ষিপ্তভাবে "প্রণয়, প্রণয়" প্রলাপ বাক্য অবিরাম উচ্চারণ করিয়াছি,—কবিতা, বনিতা, মিত্রতা প্রভৃতিকে স্বর্গের

প্রতিনাম জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি,—কত কল্পিত প্রণয় আখ্যায়িকা পাঠে, প্রণয়ি-দম্পতীর সারল্য-পূর্ণ ললিত মুখমণ্ডলের ধ্যান করিতে করিতে রাগভরে অবসন্ন হইয়াছি,—তাহাদের বিচ্ছেদ বিড়ম্বনা পাঠের ধার, অশ্রুধারে পরিশোধ করিয়াছি,—(হায়! কত পুস্তকের কত স্থানে এখনো লবণাক্ত-অশ্রু-কলঙ্ক সন্নিবেশিত রহিয়াছে।) সে আমি কি জন্য এরূপ হইলাম! * * * * * আমি দুর্ব্বল দরিদ্রকে ঘৃণা করি,—সবল ধনীকে ভয় করি,—যাহাদিগকে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বলে, তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি। * * *

৪

কলিকাতা।

১২৬৯। ২৫এ পৌষ।

যদিও এ জন্মে আর সুখী হইব না, তথাচ দুঃখের লাঘব হওয়া সম্ভব। আর কিছু না হয়, বিরল-প্রদেশে নির্ঝর-জল-পানান্তে উপবিষ্ট হইয়া, আপনার আদ্যোপান্ত (সেই আশা-চপল সুখময় শৈশব কাল হইতে, বর্ত্তমান দীন হীন দশা পর্য্যন্ত) ধ্যান করিয়াও একপ্রকার বিষাদময় সুখাস্বাদন করিতে পারিব।

যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি তোমাকে আমার জীবন ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করে, তুমি বিশেষ কহিবে না। বলিবে, তাহার জীবন-পত্র এত অপরিষ্কার—স্থানে স্থানে মসী-মণ্ডিত—অশ্রুজলে কলঙ্কিত—যে তাহা পাঠ করা যায় না। সম্প্রতি তাহা শতধা খণ্ড খণ্ড ও ঘটনা-পবনে চালিত হইয়া গিয়াছে;—কোথায় পতিত হইল কে জানে? হয় জলস্রোতে পতিত হইয়া ইতস্তত: ভাসমান হইতেছে,—অথবা কোন অন্ধতম-গিরি-গহ্বরে সন্নিবেশিত আছে। তাহার দুই এক বর্ণ যাহা আমার মনে আছে, তাহা শুনিয়া তুমি কিছুই বুঝিবে না।

দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ

…মিত্র ১৩ই মাঘ [১২৬৯] দিবসে আর এক পত্রী পান, তাহাতে ছিল :—"প্রিয় ! আমি কা'ল থেকে কলাতলায় কুলকামিনী-কুলের কমনীয় করকলাপ কর্ত্তৃক কনক-নিভ হরিদ্রাক্ত হ'তে হ'তে কঙ্কণ-নিকরের ঝঙ্কারনাদ কর্ণস্থ কচ্ছি" ।। প্রিয় আশ্বস্ত হইয়া রহিলেন ।

১২৬৯ সালে কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত-গৃহ-সংস্থ পাত্রীর সহিত এই বিবাহ নির্ব্বাহ হয় ।* কবির বয়ঃক্রম তৎকালে ২৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। সময়টি, তাঁহার বিগত-পতন ও ভাবী-উত্থানের সন্ধিস্থল বলিয়া চিহ্নিত হইতে পারে ।…

১২৭১ সাল পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ বিষয়ব্যাপার, ঘর-বাহির ও বন্ধুদল, সকল দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া যশোহর যান ও মাতাকে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বতন্ত্র সংসার সংস্থাপন করেন। পবিত্র-উপস্থিতি, অতর্কিতরূপে তাঁহার কলুষক্ষালন করিয়া আত্মায় শান্তি সেচন করিল ।…

সুরা ও নারী সাময়িকভাবে সুরেন্দ্রনাথকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে এই মহা আকর্ষণের অসারতা বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এই মোহপাশ হইতে মুক্ত করিলেন। তাঁহার শুচিশুদ্ধ অন্তরে সত্যের ছায়া প্রতিফলিত হইল। নারীর প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার হৃদয়ে অস্ফুট রেখাপাত করিল।

---

* পাত্রী—পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের সহিত সম্পৃক্ত শ্যামাচরণ মুস্তফীর কন্যা (নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখরের ভগিনী) বীরেন্দ্রবন্দিনী দেবী ।—দ্র° নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী-সঙ্কলিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,' পীরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬১, ৩৬৯ ।—ব্র. না. ব.

১২৭৪ সালে তিনি দ্বিতীয় বার অশমারি পীড়াক্রান্ত হয়েন। এই অবকাশে বিষয়-ব্যাপারে অলিপ্ততা ও প্রতিভার পরিশীলনে যত্ন দৃষ্ট হইয়াছিল। সুরাপানের অশুভকারিতা হৃদয়ঙ্গম ছিল, তৎসম্বন্ধে "সবোন্নতি ‼" নামে আখ্যায়িকা ও "মাদকমঙ্গল" সৃষ্টি করেন। কবিবর গ্রে'র "এলিজি" বঙ্গ-অঙ্গে পরিণত হয়। এবং পর বৎসর (১২৭৫ সালে) "সবিতা-সুদর্শন" ও "ফুলরা" যমজ জন্ম গ্রহণ করে।…

১২৭৬ সালের শেষে "চৈত্র মেলার" জন্য "ভারতের বৃটিশ-শাসন-পরিদর্শন" প্রণীত হয়। ইহাতে প্রচলিত-রাজ্য-তন্ত্রের পূর্ণ-মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছিল। রাজনীতি-ঘটিত এত গভীর রচনা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এই মহাপ্রবন্ধ সরলতা, সহৃদয়তা ও মিতভাষিতার মিলনস্থল। সুরেন্দ্রনাথের "শাসন-প্রথাও" সুন্দর প্রবন্ধ।…

মুঙ্গের যাত্রা ও 'মহিলা' রচনা

১২৭৮ সালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কবি মুঙ্গের যাত্রা করেন। পূর্ব্বে বৈষয়িক প্রয়োজন জন্য বারম্বার তথায় যাতায়াত ছিল। "পীরপাহাড়ের" গিরি-গৃহ ইঁহার বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বিজন পার্ব্বত্য-প্রদেশ "মহিলার" জন্মভূমি। আগন্তুক এখানে অখণ্ড অবকাশ ও বিরল অবস্থান পান; লেখনী লইয়া ধ্যানস্থ হইলে, প্রকৃতি তটস্থ হইয়া অন্তর্জগতের দ্বার মুক্ত করিয়া দিতেন। সত্য, সুরেন্দ্রনাথের সকল কবিতাই প্রেমময়;—তাঁহার প্রেমকেই কবিতা, কি কবিতাকেই প্রেম বলি, সহসা অবধারণ হয় না। তথাপি "মহিলায়" তাহার পূর্ণ-বিকাশ প্রতীয়মান হয়। কিম্বা কবির হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেম ও কাব্য-শক্তি পার্শ্ববর্ত্তী থাকিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতায় এ যাবৎ বর্দ্ধিত হইতেছিল, "মহিলায়" উহাদের চরম ও একতা সম্পাদিত হইয়াছে। এবং এই সমবেত-বলনিষ্পন্ন বলিয়া ইহার রচনা এত সতেজ বোধ হয়।…

মহিলার মহিমা উপলব্ধিজনিত যে সত্যকে তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ অন্তরের অন্তরতম স্থলে লালন করিতেছিলেন, পীরপাহাড়ের নিভৃত নির্জ্জনতায় তাহাকে তিনি কাব্যে রূপদান করিলেন তাঁহার অর্গলমুক্ত অন্তর হইতে উদাত্ত স্বরে মহিলার মাহাত্ম্যগীতি উদ্গীরিত হইল।

বর্ষারম্ভে কবি মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় হয়েন।…অনন্তর ৭৮ বঙ্গাব্দের বিদায় দানে "বর্ষবর্ত্তন" বিবৃত হয়।…

১২৮০ সালে সুরেন্দ্র, বিপুল-ব্যয়-সাধ্য এক ব্যাপক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ইহা কর্ণেল টড্ কৃত রাজস্থান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। সাধনার অত্যাজ্য ফলে, রচনা-কার্য্যে তাঁহার যে নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহাতে তিনিই এই মহাটীকার যোগ্য পাত্র সন্দেহ নাই। যন্ত্রাধ্যক্ষকে অংশী করিয়া পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রচারিত হয়। ইহাতেও প্রণেতার নাম গোপন ছিল;…

…কাব্যদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ;—ঈদৃশ সময়ে জনৈক পরমাত্মীয় অভিনেতার অনুরোধে কবি "হামির" নাটক গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নাটক রচনায় রুচিরও ভিন্নতা ছিল। অতএব কবির অন্যান্য লেখার তুলনায় "হামির" অনেক ন্যূন হইয়াছে বলিতে পারা যায়। পরন্তু এরূপ হইলেও ইহা অভিনয়ে উত্তম হইয়াছিল; এবং ইহার "পদ্মিনীর" গীতের তুলনা নাই।…

মৃত্যু

সুরেন্দ্র ৮৪ সনের শেষ ভাগে সহসা প্রবোধিত হয়েন; ইচ্ছা, পূর্ব্ববৎ কার্য্যবিশেষে ব্যাপৃত থাকিবেন। পদ্য মহাভারতের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-মর্ম্ম সাধারণ সুলভ করিবার জন্য ভগবদ্বন্দনা করিতেছিলেন;* কিন্তু অনেকে

---

* "নমঃ শেষ শয্যা-শায়ী ক্ষীর-সিন্ধু-জলে। ফণায় ফণার মণি প্রদীপ্ত মিহির।
ফণামালা-বিস্তৃত বিচিত্র ছায়াতলে॥ পদতলে কমলা চপলা বসি স্থির॥

তাঁহাকে "রাজস্থান ইতিবৃত্ত" অনুবাদে বাধ্য করেন, কারণ তাঁহারা উহার পুনর্মিলন প্রত্যাশা করিতেন। ৮৫ সালের ২রা বৈশাখ অপরাহ্নে এই অনুবাদ কার্য্যে বিরাম লইয়া, কবি মাতৃ ও সন্ধ্যাবন্দনা জন্ত যাইতেছিলেন, কিন্তু কোন প্রিয় ছাত্রের কুশলার্থ ফিরিয়া বাহিরে যাইতে হইল। অনন্তর অর্দ্ধ রাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি অর্দ্ধাবশিষ্ট; ...৩রা বৈশাখ প্রাতে সকলকে শোকাকুল করিয়া ৪০ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ পরলোক যাত্রা করিলেন।

রচনাবলী

জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথের রচিত পুস্তকগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। ষড়্‌ঋতু বর্ণন (কবিতা)। ইং ১৮৫৬।

পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হইলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (২৫ এপ্রিল ১৮৫৬) লিখিয়াছিলেন :—

আয়ত শরীর কণে লহরী দোলায়।
অঙ্গ যেন একত্রিত কোটি ভানু প্রায়।
তিমি তিমিঙ্গিল নক্র মকর ঘেরিয়া।
যাদোগণ নতি করে সভয় হইয়া।
রাজীব লোচন মুদে যোগের নিদ্রায়।
সমস্ত বিশ্বের ক্রিয়া স্বপ্ন বোধপ্রায়।
নমো গোলোকের নাথ গোপিকা-রমণ।
সুঠাম চিকণ কালা মদনমোহন।
শিখি-পুচ্ছ চূড়া শিরে হেলাইয়া বামে।
দাঁড়ায়ে গোপীর মাঝে ত্রিভঙ্গিম ঠামে।
বনমালা গলে দোলে আজানু লম্বিত।
কটিতটে পীতধটি বিজুলি বেষ্টিত।
চরণে মঞ্জীর ভাবে মুখে বাজে বাঁশী।
প্রেমে বাঁকা নয়ন অধরে মৃদু হাসি।
চারি পাশে রাস-রসে মত্ত গোপাঙ্গনা।
অনঙ্গ-প্রমত্ত অঙ্গ অঞ্জন-নয়না।
মৃদঙ্গ মুরলী বীণা মুরজ মিলিত।
করতালি কঙ্কণ বলয় ঝঙ্কারিত।"

ষড়ঋতু বর্ণন ইত্যভিধেয় এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইয়াছি, বিদ্যাভিলাষিণী সভার এক জন সভ্য শ্রীযুত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার পয়ারাদিচ্ছন্দে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে নিদাঘ বর্ণনা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম এতৎপাঠে পাঠক মহাশয়গণ এই নূতন কবির কবিত্ব ও রচনাশক্তি বিবেচনা করিবেন।

নিদাঘ বর্ণন।

আহা মরি কিবা চমৎকার ভবভাব।
অবনীতে নিদাঘ হলেন আবির্ভাব॥
রাজকর দেয় সবে গ্রীষ্মরাজ করে।
ভাস্কর প্রখর কর প্রকাশিত করে॥
মুখ্য শত্রু ক্রোধ সম দিবস প্রবল।
কমলা কটাক্ষ ন্যায় যামিনী চঞ্চল॥
বিষধর শ্বাস হলো স্পর্শন স্পর্শন।
ধক্ ধক্ দশ দিক জলে অনুক্ষণ॥
মহীর তাপেতে মহীরুহ পত্রগণ।
বিবর্ণ হইয়া হয় মহীতে পতন॥
তাপিত আতপ তাপে যত জলাশয়।
অতিমাত্র প্রাণমাত্র ব্যস্ত জলাশয়॥
যে সব লতার ছিল সুবর্ণের বর্ণ।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করে করিল বিবর্ণ॥
নিরাধার চাতক বসিয়া করে আশা।
নীরধর নিরাশায় না হবে নিরাশা॥
আশায় আশ্রিত হয়ে বাঁচাও জীবন।
ভরসা কেবল মাত্র বরষা জীবন॥

মৃগগণ ব্যাকুলিত হয়ে জলাশায়।
মরীচিকা স্থানে যায় ভাবি জলাশয়॥
জলাঞ্জলি দেয় জলাশায় জলাশয়।
মূর্খতা দোষেতে হয় জীবন সংশয়॥
আহা মরি স্বভাবের অপরূপ ভাব।
হেরিলে প্রকৃতি মুখ নাই সুখাভাব॥
বিকশিত সুকুসুমে মধুলোভীগণ।
মধুপান মত্ততায় সতত মগন॥
বিমল কমল শোভা নির্ম্মল বারিতে।
মধুব্রত মধুলোভ নারে নিবারিতে॥
পাইয়া মধুর গন্ধ হইয়া আকুল।
গুঞ্জে২ পুঞ্জে২ বৈসে অলিকুল॥
হংস হংসী চক্রী চক্র সারসী সারস।
সরসী কূলেতে খেলা করয়ে সরস॥
মধুর রসাল আম্র অতি সুধাময়।
কাঞ্চন লাঞ্ছন বর্ণ প্রাপ্ত এ সময়॥
কত শত ঝুলিতেছে শাখায় শাখায়।
সতত সুখেতে বসি বিহাঙ্গে খায়॥

অতি অপরূপ জগদীশ তব ভাব। জগতেতে তত্ত্ব পায় কিবা নাহি পায়॥
স্বভাব ভাণ্ডারে নাই কিছুই অভাব॥ যথাস্থানে যথাকালে অনায়াসে খায়।
বুদ্ধিহীন পশুপক্ষী তোমার কৃপায়। মুক্তকণ্ঠে দয়াসিন্ধু তব গুণ গায়॥

২। **সবিতাসুদর্শন** (কাব্য)। ১২৭৭ সাল (ইং ১৮৭০)। পৃ. ৩৮।

যোগেন্দ্রনাথ সরকার 'কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী'তে (পৃ. ১৯) লিখিয়াছেন:—"কাব্যশক্তি তাঁহার ইহ-পারমার্থিক ভাব, কিম্বা প্রেম-পরিচালনার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত;—যশের জন্য নয়। ১২৭৭ সালে জনেক আত্মীয় চুরী করিয়া তাঁহার "সবিতা-সুদর্শন" ছাপাইয়া দেন। ইহাতে কবির নাম ছিল বলিয়া বিশেষ বিরক্তির হেতু হয়; মুদ্রাঙ্কনে ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি তাবৎ পুস্তক আবদ্ধ করেন; কালে কেহ এক আধ খানি দেখিতে পাইয়াছিলেন।" 'সাহিত্যসুদর্শনে'র "প্রচারক" ছিলেন—গোপালচন্দ্র দাস দে। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে।

৩। **বর্ষ বর্ত্তন** (কবিতা)। সম্বৎ ১৯২৮ (২৮ এপ্রিল ১৮৭২)। পৃ. ২৪।

"পুরাতন বর্ষের গমন ও নব বর্ষের আগমন বিষয়ক পদ্য প্রবন্ধ।" পুস্তিকার আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নাই।

৪। **রাজস্থানের ইতিবৃত্ত**। মিবার। ইং ১৮৭২-৭৩।

"মহাত্মা লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল টড্ প্রণীত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলিত।" যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন:—"পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রচারিত হয়। ইহাতেও প্রণেতার নাম গোপন ছিল।"

১ম খণ্ড: ২৬ আগষ্ট ১৮৭২, পৃ. ৬৪।
২য় খণ্ড: ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২, পৃ. ৪৮।
৩য় খণ্ড: ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, পৃ. ৪৮।

৪র্থ খণ্ড : ১ এপ্রিল ১৮৭৩, পৃ. ৪০।
৫ম খণ্ড : ১৬ জুন ১৮৭৩, পৃ. ৪৮।

৫। **বিশ্ব-রহস্য**! অর্থাৎ অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ও লৌকিক রহস্য সন্দর্ভ। সম্বৎ ১৯৩৪ (২৬ অক্টোবর ১৮৭৭)। পৃ. ৮০।

পুস্তকের আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নাই।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৬। **মহিলা** (কাব্য) :

প্রথম অংশ—মাতা। সন ১২৮৭ (২৮ মে ১৮৮০)। পৃ. ৯১ + টিপ্পনী ৪

দ্বিতীয় অংশ—জায়া। সন ১২৮৯ (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩)। পৃ. ১০৭ + ৩১ কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী : শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার।

৭। **হামির** (ঐতিহাসিক নাটক)। ফাল্গুন ১২৮৭ (২৮-৩-১৮৮১)। পৃ. ৯৩।

খণ্ড-রচনাবলী : সুরেন্দ্রনাথের বহু গদ্য পদ্য রচনা তাঁহার মৃত্যুর পরে বিভিন্ন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে ; ইহার অনেকগুলি আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। জীবিতকালে তিনি যে-সকল রচনা সাময়িক-পত্রে মুদ্রিত করেন, তাহার মাত্র একটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সকল রচনার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। "প্রতিভা" (প্রবন্ধ) : 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' (৭ম কল্প), ভাদ্র ১৭৮৩ শক।

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কবির চরিতকার লিখিয়াছেন :—"প্রতিভা" (Genius) গদ্য প্রবন্ধ। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকার শেষবর্ত্তী কোন এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম নাই। (পৃ. ৫)

২। "সন্ধ্যার প্রদীপ" (কবিতা): 'নলিনী,' ১ম পল্লব, ১২৮১ সাল, ৮ম সংখ্যা। ১৩০১ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'প্রদীপে'ও ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩। "পদ্মিনী"* (কবিতা): 'নলিনী,' ১ম পল্লব, ১২৮১ সাল, ৮ম সংখ্যা।

৪। "খদ্যোতিকা" (কবিতা): 'নলিনী,' ১ম পল্লব, ১২৮১ সাল, ১২শ সংখ্যা।

৫। "চিন্তা" (কবিতা): 'নলিনী,' ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, ৩য় সংখ্যা।

৬। "পরিশ্রম ও তাহার উপকারিতা" (প্রবন্ধ): 'নলিনী,' ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, ৪র্থ-৫ম ও ৭ম সংখ্যা।

৭। "আলস্য ও তাহার অপকারিতা" (প্রবন্ধ): 'নলিনী,' ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

৮। "কি করি অধম আমি স্রোতে তৃণ প্রায়" (কবিতা): 'নলিনী,' ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, ১০ম সংখ্যা।

কবিতাটিতে লেখকের নাম না থাকিলেও ইহা যে সুরেন্দ্রনাথের রচনা, এ কথা তাঁহার চরিতকার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১৫)।

৯। "মিলায়ে সারিঙ্গী সুরে" (কবিতা): 'নলিনী,' ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, ১২শ সংখ্যা, পৃ. ২৭৬।

১০। "সুখ" (প্রবন্ধ): 'নলিনী,' তৃতীয় পল্লব, ১২৮৯ সাল, ১ম সংখ্যা।

১১। "উষা" (কবিতা) " " " ১ম সংখ্যা।

১২। "মৃত্যু চিন্তা" (কবিতা) " " " ২য় সংখ্যা।

১৩। "শাসন প্রথা" (প্রবন্ধ) " " " ২য় সংখ্যা।

---

* "এই পদ্যটী...'হামির' নাটকান্তর্গত। এই কবিতাটী দৃশ্যলীলা স্বরূপ ন্যাসনাল থিয়েটরে অভিনীত হইবে। অভিনয়ের জন্য অনেক স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের পাঠার্থ আমরা ইহা সমগ্র প্রকাশ করিলাম।..." (পৃ. ৩৪১)

১৪। "বাদক মঙ্গল" (কাব্য): 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ,' ১ম খণ্ড, ১৩০০ সাল, ১ম-২য় ও ৩য় সংখ্যা।

১৫। "ফুলরা" (কাব্য): 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ,' ১ম খণ্ড, ১৩০০ সাল—৪র্থ ও ৫ম, এবং ১৩০১ সাল—৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

১৬। "সুষমা" (কাব্য): 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ,' ১ম খণ্ড, ১৩০১ সাল, ৮ম ও ৯ম-১০ম সংখ্যা।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলার কবি-সমাজে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্থান স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট; ইংলণ্ডের কবি-সমাজে পণ্ডিত ম্যাথু আর্নল্ডের কবি হিসাবে যে স্থান, বাংলা দেশে সুরেন্দ্রনাথের স্থান অনুরূপ; পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার সহিত কবিত্বশক্তি সম্মিলিত হইয়া উভয় ক্ষেত্রেই অপূর্ব্ব কাব্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলা দেশে একমাত্র অক্ষয়কুমার বড়ালই সুরেন্দ্রনাথের পন্থা অনুসরণ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সুরেন্দ্রনাথ সমসাময়িক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন্ নাই।

ইহার প্রধান কারণ, সুরেন্দ্রনাথের যুগে ভাব ও ভাষার যে উচ্ছ্বাস বাঙালী পাঠক-সমাজকে বিচলিত করিত, সুরেন্দ্রনাথ তাহার অধিকারী ছিলেন না; বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, তাহার বিরোধীই ছিলেন; তাঁহার বাণীমূর্ত্তি শান্ত ও সংহত, ভাষা গাঢ়বদ্ধ। হেম-নবীনের ভক্ত বাঙালী পাঠক সুতরাং সুরেন্দ্রনাথকে স্বভাবতই আমল দেয় নাই। যাঁহারা হেম-নবীনের কাব্যের সহিত পরিচিত, সুরেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য তাঁহারা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি হইতেই বুঝিতে পারিবেন;—

> তরুপত্রপ্রান্তভাগে লম্বিত নীহার,
>
> কামিনীর কটাক্ষ ইঙ্গিত,

সুচিত্রিত, চারু ইন্দ্রচাপ বরিষায়,
উড্ডীন পাখীর কলগীত,
সন্ধ্যার রক্তিম ছটা, পতিত তারার ছটা,
সরোজের হিল্লোল নর্তন,
এ হতে ভঙ্গুর, রম্য, মানব-জীবন !!!—'বর্ষ বর্জন'

সংসার পেষণি, নর অধঃশিলা তার,
রেখে মাত্র আলম্বন যার,
নারী ঊর্দ্ধখণ্ড, কার্য্য করিছে লীলায়,
কীলে রন্ধ্রে মিলন দোঁহার ;—'মহিলা'

দূর হ'তে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে,
আন্ধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন,—
জবা যেন যমুনার নীরে !—"সন্ধ্যার প্রদীপ"

সুরেন্দ্রনাথের কবিত্ব-প্রতিভার পরাকাষ্ঠা তাঁহার 'মহিলা' কাব্য। এই কাব্যগ্রন্থখানি বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ-স্বরূপ—ইহা সুরেন্দ্রনাথকে অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জননী, জায়া, ভগিনী, দুহিতা ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে নারীর যে মহীয়সী মহিমাকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাকে রূপদানের প্রয়াসেই 'মহিলা' কাব্যের জন্ম। এই কাব্যে জননী এবং জায়ার মহিমাই অনবদ্যভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগিনী এবং দুহিতার সত্য চিত্র আঁকিবার সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল। "ভগ্নী" শীর্ষক কবিতাটি তাহার প্রমাণ। কিন্তু অকালে লোকান্তরিত হওয়াতে তিনি তাঁহার পরিকল্পনাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

'মহিলা' কাব্যের "অবতরণিকা" অংশে কবি নারীর যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অনবদ্য :—

বিকচপঙ্কজ মুখে ভ্রান্তি পরশিত
সলাজ লোচন ঢলঢল,
চাঁচর চিকুর চারু চরণ চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল ?
কাতর হৃদয় তরে,
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে,
ঢলঢল লাবণ্যের জল।
পাটল কপোল কর চরণের তল ?

পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধ মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে।
পর্শে পদ রাগ-ভরা,
অশোক লভিল ধরা ;
এলো কেশে কে এল রূপসী !—
কোন্ বনফুল কোন গগনের শশী !

মাতৃমহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া কবি প্রথমেই বলিয়াছেন :—

সুকোমল অঙ্কে নিয়া,
অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পীযূষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া,
স্নেহবাক্যে ভুলাইয়া,
হে জননি কর পুনঃ বালক আমায়।

তব অঙ্ক পরিহরি,
সংসারে প্রবেশ করি,
সদা মত্ত থেকে মা গো বিষয়ের রণে ;—
তুমি গড়েছিলে যাহা,
আর আমি নাই তাহা,
তব প্রেম স্বর্গকথা কিছু নাই মনে ;—
কেমনে বর্ণিব তায় স্মৃতির বিহনে।

দার্শনিকতা এবং কবিত্বের সংমিশ্রণে নিম্নের পংক্তিগুলি অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ :—

নিজ অঙ্গ অংশ দিয়া,
এই তনু নিরমিয়া,
চিত হ'তে দিয়া চিত, দীপে দীপপ্রায়,
আমায় সৃজেন যিনি,
ধাতার স্বরূপ তিনি ;—
জীব-দেহ, ব্রহ্মাণ্ড সমান তুলনায়।—
পরদেশ এ ধরায়,
অসম্বল অসহায়,
আসি আত্মা, পেয়ে যাঁর আতিথ্য কৃপায়,
পথ-ক্লান্তি পাসরিয়া,
নব-সঙ্গি-সঙ্গ নিয়া,
রঙ্গরসে পাসরে আলয় আপনার ;
মহতী মহিমা, বাক্যে কে বর্ণিবে তাঁর।

মাতৃঋণ যে অপরিশোধ্য তাহা স্মরণ করিয়া কবি বলিতেছেন :—

ধরা হীরা হয় হায়।
সিংহাসন রচি তায়,
বসাইতে পারি যদি জননী তোমায় ;—

ফুল হয় তারাদল,
চন্দন সাগর-জল,
শত কল্প বসি যদি পূজি তব পায় ।—
সুধাকর সুধাগারে,
পারি যদি আনিবারে,
নিত্য যদি সেই সুধা করাই ভোজন ।—
পারিজাত-দল দিয়া,
নিত্য শয্যা বিরচিয়া,
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন ।—
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন ॥

"জায়া" শীর্ষক কাব্যাংশে প্রথমেই কবি মাতার সঙ্গে জায়ার পার্থক্য দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন :—

মাতা মৃদু তটভাগ ভয়হীন তায়,
না পাই সে শান্তভাব মাঝারে জায়ার,—
বিষম আবর্ত্ত তুঙ্গ তরঙ্গ খেলায় ;
রসিক ভাবুক জনে
বুঝ বিচারিয়া মনে,
শত দোষ পাইলে না প্রকোপ মাতায় ;
অল্পে অভিমানী প্রিয়া ভয় বাসি তায় ।

বিবাহ-বাসরে প্রথম প্রিয়া-করস্পর্শের আনন্দময় অনুভূতির কথা স্মরণ করিয়া কবি বলিতেছেন :—

সে সময় প্রিয়া তব আছে কি স্মরণ ?
পরশিত মম করে প্রথম যখন
তব কর-কিসলয় অরুণসঙ্কাশ ।—

হৃদয় আবেগভরে
ঈষৎ কম্পন করে
মমিত অঙ্গুলি-শিখ—অলক্ত-নিবাস,
কি ক্ষুদ্র মুকুর-ভাতি নখরে প্রকাশ।

সঞ্চিত-সুকৃত-রাশি-ভোগ-নিকেতন
বাসরের ঘর—দৃশ্য অমরভবন।—
অপ্সরা প্রবরা তব সখীদল তায়,
প্রাণের প্রবল ক্ষুধা
পানে তব বাক্যসুধা;
কি বিষম অরি লাজ বসিল তোমায়,
নীরব নিশ্চল স্থির আবরিত কায়।

সুরেন্দ্রনাথ 'মহিলা'র তৃতীয় অংশ—ভগ্নী রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই অসম্পূর্ণ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

হে কবি-কল্পনা মায়া, সত্যের সোণালা ছায়া,
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভানুমতি।
সুখে তুমি যথা ইচ্ছা থাক লীলাবতী;
চড়িয়া পুষ্পক-রথে,
ভ্রম গিয়া ছায়া-পথে,
কর ইন্দ্র-চাপ বিরচন,
কিম্বা কর পরী সনে চন্দ্রিকা ভোজন,
আমি না করিব দেবি! তব আবাহন।

বিধাতার এ সংসারে, যারে না তুষিতে পারে,
যে কবির মহতী কামনা,
সে কবি করিবে দেবি! তব উপাসনা।

তোমার বুকের পরে,
সে হেরে হরষভরে
ছায়া তার,—কায়া নাই যার ;
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার ;
লক্ষ্য মম সামান্ত এ সত্যের সংসার।

হে সরলা স্মারকতা! (সঞ্চিত পূর্ব্বের কথা
অঞ্চল-সম্পুটে বাঁধা যার)
কৃপা করি উর দেবি! অন্তরে আমার ;
এ সংসারে হয় যাহা,
কাল সব গ্রাসে তাহা,
তুমি রাখ ছবি তুলে তার ;
দেখাও সে ছায়া-সিদ্ধি-নিকর ভাণ্ডার,
হবে তায় প্রয়োজন পূরণ আমার।
তোমার পরশ পায়, উলটি উজান বায়
কাল-নদী, কৌতুক এমন!
বাসে বৃদ্ধ পুন নিজ সরাগ যৌবন,
প্রবাসীর হয় সুখ,
দেখাও প্রিয়ার মুখ,
কি সুখের স্বপন তোমার!
কৃপা করি হৃদে দেবি! জাগাও আমার
সহোদরা প্রণয়ের সরল ব্যভার।

'মহিলা' কাব্যের সর্ব্বত্র এমনি অজস্র মণিমুক্তা ছড়াইয়া রহিয়াছে। ভাবের গভীরতায় এই কাব্যগ্রন্থখানি সাগরের মত অতলস্পর্শ। যিনি ইহার অগাধ সলিলে অবগাহন করিবেন, তিনি যে অজস্র মণিমাণিক্য আহরণ করিয়া লাভবান হইবেন তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

বলদেব পালিত

১৮৩৫—১৯০০

বলদেব পালিত উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের একজন যশস্বী কবি। অর্দ্ধ শতাব্দীর ঊর্দ্ধকাল হইল তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-কর্ম্ম পরিমাণে স্বল্প হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা-সাহিত্যে বলদেবের দানের কথা দেশবাসী ইহারই মধ্যে ভুলিতে বসিয়াছে।

বলদেব পালিত শুধু যে কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন তাহা নহে, তিনি ছিলেন সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য দর্শন নাটকাদির একজন অক্লান্ত পাঠক। তাঁহার মধ্যে প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্যের দুর্লভ সংমিশ্রণ হইয়াছিল। বাংলা কবিতায় বিবিধ সংস্কৃত ছন্দের প্রবর্ত্তন সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব। মালিনী, উপজাতি, বসন্ততিলক প্রভৃতি দুরূহ সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করিয়া তিনি বাংলা-কাব্যের রূপের বহুধা বিচিত্র বিকাশের পথ সুগম করিয়া দেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও বাঙালী কবি, এমন কি ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত এত বিভিন্ন এবং বিচিত্র ছন্দে কবিতা রচনা করেন নাই। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে অগ্রণী বলিলে অতিশয়োক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। সংস্কৃত ছন্দকে বাংলা কবিতায় স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহার করিয়া বলদেব যে শক্তির পরিচয় প্রদান করেন তাহাতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

আজ বাংলা-কাব্য ভাবসম্পদ এবং ছন্দোবৈচিত্র্য—উভয় দিক দিয়াই বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বহু কবি অবলীলাক্রমে সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করিয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন। কাজেই, এ ক্ষেত্রে যিনি পথিকৃৎ, যিনি সংস্কৃত-সাহিত্যের অগাধ রত্নাকর হইতে মণিমুক্তা সঞ্চয়ন করিয়া বঙ্গবাণীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন, সেই বলদেবের নিকট বাংলা-সাহিত্য যে কতটা ঋণী সে-কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

বাঁকীপুরের প্রবাসী বাঙালী সমাজে বলদেব পালিতের নাম অপরিচিত নহে। ইঁহারা তিন পুরুষ যাবৎ বিহার-প্রবাসী। লোক-হিতৈষণামূলক বিবিধ কৃতির জন্ম সেখানে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠা আছে।

"১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বলদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ হালিশহরের নিকটবর্ত্তী কোণাগ্রামের পালিতবংশোদ্ভূত। অনুমান ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরবয়স্ক বিশ্বনাথ তাঁহার মাতুলালয় চন্দননগর হইতে দানাপুরে পলাইয়া আসেন। তখন দানাপুরে বহু বাঙ্গালী ক্যান্টনমেণ্ট ও কমিশেরিয়েটে কার্য্য করিতেন এবং বিশ্বনাথও কমিশেরিয়েটে একটি সামান্য কার্য্য পাইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ কলিকাতার দক্ষিণস্থ রাজপুরের জমিদার রাজচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অন্যতম প্রদৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। দানাপুরে বিশ্বনাথের চেষ্টায় একটি কালীবাড়ী ও তৎসংলগ্ন অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত হ[য়] এবং তিনি সকলেরই প্রীতি আকৃষ্ট করেন। ১৮৪১-২ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনা[থ] কমিশেরিয়েটের গোমস্তা হইয়া কাবুল অভিযানে গমন করেন। ১৮৪[...]

খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সৈন্য কাবুল পরিত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়। সৈন্যদলের সহিত বিশ্বনাথও নিহত হন।...

বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সন্তানগণের ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বলদেব তাঁহার ভগিনীপতি রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাঁকীপুর সজীবাগ পল্লীর বাসায় অবস্থান করিয়া গুলজারবাগের কোন বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। বলদেব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির জন্য তিনি শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

বলদেব ছাপরার মধুসূদন মিত্রের ভ্রাতা মহেশচন্দ্র মিত্রের কন্যা ভগবতীকে বিবাহ করেন এবং কিছু দিন মধুসূদনের সাহায্যে ছাপরায় একটি কার্য্য পাইয়া তথায় নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর তিনি দানাপুরে মিলিটারী পেন্সন পে অফিসে তৃতীয় কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতাগুণে তিনি শীঘ্রই প্রধান কেরাণীর (হেড-ক্লার্ক) পদে উন্নীত হন। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বেই তিনি হেড-ক্লার্কের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।"

বিশ্বনাথের লোকহিতৈষণা-প্রবৃত্তি পুত্র বলদেবের অন্তরেও সঞ্চারিত হইয়াছিল, তদুপরি তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী :

"বলদেব অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন। তিনি লোকহিতকর নানা সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিতেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দানাপুরে তিনি একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় পরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। উহার বর্ত্তমান নাম—দানাপুর বলদেব একাডেমী। তাঁহারই অর্থে তাঁহার পুত্র যদুনাথ ও জামাতা তিনকড়ি ঘোষ বাঁকীপুরে 'টি-কে ঘোষের একাডেমী' নামে এক স্কুল এবং গয়া ও আরায় আর তিনটি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি বহু ছাত্রের

আশ্রয়দাতা ছিলেন। অতিথি অভ্যাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কখনও তিনি বিমুখ করিতেন না।...

বলদেব বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ না পাইলেও গৃহে নিজ চেষ্টায় আজীবন নানা শাস্ত্রে জ্ঞানার্জ্জন করেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও ব্যবস্থাশাস্ত্র উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হন। তিনি বেদ উপনিষদ, রামায়ণ এবং কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিগণের প্রায় সমুদায় গ্রন্থই যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন।...

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বলদেব ৭৫৲ টাকা মাসিক পেন্সনে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।...

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারি (২৩ শে পৌষ ১৩০৬)...বলদেব ওটরণ রোগে পরলোক গমন করেন।"*

সাহিত্য-সাধনা

বলদেবের জীবন ঘটনাবহুল নহে। একঘেয়ে কেরাণীগিরি করিয়াই তিনি সুদীর্ঘ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, সময় সময় কিছু কিছু জনহিতকর কার্য্যেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এগুলি তাঁহার জীবনের বহিরঙ্গ মাত্র, তাঁহার আসল পরিচয় নিহিত রহিয়াছে তাঁহার কাব্যগ্রন্থসমূহে। সরকারী চাকরির আবর্ত্তে পড়িয়াও তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা এবং কাব্য-প্রেরণা বিলুপ্ত হয় নাই—অধ্যয়ন এবং কাব্যসৃষ্টি এই দুটি নেশা লইয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

* ১৩৪৩ সালের পৌষ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের "বলদেব পালিত" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা সবশুদ্ধ পাঁচখানি। বঙ্কিমচন্দ্র "শারীরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক" বলিয়া তাঁহার একখানি কাব্যের উপর তীব্র কষাঘাত করেন, কিন্তু বাকী সবগুলিই তৎকর্তৃক প্রশংসিত হয়।

বলদেব যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবি ছিলেন 'কর্ণার্জ্জুন-কাব্য' তাহার প্রমাণ। মহর্ষি দ্বৈপায়ন যে মহানুভব কর্ণের প্রতি সুবিচার করেন নাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া স্বরচিত কাব্যে কর্ণের চরিত্র-মাহাত্ম্যকে তিনি ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পান। পরবর্ত্তী কালে কর্ণের জীবনের ট্র্যাজেডি লইয়া বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়াছেন, একাধিক নাটকও রচিত হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলদেব পালিত।

নিম্নে আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **কাব্যমঞ্জরী**। ১২৭৫ সাল (১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮)। পৃ. ১২৪ + ||৶•।

ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১২৭৯, পৃ. ৪২৮) লিখিয়াছিলেন :—

> এই কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি উত্তম। স্থানেং কবিত্বের পরিচয় আছে। গ্রন্থকার যে এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি, অনেক স্থানে তাহারও পরিচয় আছে। অনেক স্থানে নবীনত্বের অভাব লক্ষিত হয়।
>
> এই কবি কিছু রূপকপ্রিয়। অনেকগুলি কবিতাই এই অলঙ্কার বিশিষ্ট। এইরূপ কাব্য, এপর্য্যন্ত কখন অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণিত হয় নাই, হইতে পারেও না। তথাপি সেগুলি সুমধুর এবং সুপাঠ্য হয়। "কবিতার জন্ম" ইত্যভিধেয় কাব্যখানি আমাদিগের বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছে।

কাব্যগুলি সকলই প্রায় নীতি-গর্ভ। আদিরসের সংস্রব মাত্র নাই। এ সকল বিষয়ে কাব্যমঞ্জরী কাব্যমালার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাব্যমালা কে লিখিয়াছে? কবিদিগের হৃদ... ক, গ্রহণের মত, এক পিঠ আঁধার এক পিঠ আলো।

২। কাব্যমালা। ইং ১৮৭০। পৃ. ১৪৪।

আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃ. ৩৮৫-৮৬) ইহার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

কাব্য মিঠায়ের স্তায় অতি মধুর। এ মিঠাইয়ের ময়রা কে, তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। আমরা জানিও না। জানিতে পারিলে তাঁহার দোকানে কখন যাইব না। তাঁহার দ্রব্যগুলিন একে তেলে ভাজা, তায় বাসী। তিনি নামপত্রে বররুচি হ... কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

——————চতুরাননম্।

অরসিকেষু রসস্ত নিবেদনং

শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

কিন্তু যখন আমাদিগের হাতে তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া...ছে, তখন তাঁহার কপালে বিধাতা তাহাই লিখিয়াছেন। আম... নিতান্ত অরসিক। তাঁহার কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সমর্থ...লাম না। কবিতাগুলিন সকলই আদিরস ঘটিত। ......আদিরস যদি কেবল বিশুদ্ধ প্রেমাত্মক এবং ধর্ম্মের সহায় হয়, তবে তাহাতে আমরা সমাদর করি, ইহা বলিতে আমাদিগের লজ্জা নাই। কিন্তু কেবল শারীরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক রসে যে সমাদর করে, তাহাকে পশুমধ্যে গণনা করি। যে কাব্য সে রসাত্মক, তাহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী।

> এই কাব্যমালা গ্রন্থখানি সেই মহাদোষে দূষিত। "কোন প্রৌঢ়া নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি।" "পয়োধর।" ইত্যাদি কবিতাগুলি এই কথার প্রতিপোষক।
>
> একে ত রস এই, তাহাতে আবার পুরাতন। কাব্যমধ্যে এ রসেরও নূতন কথা কিছু দেখিলাম না।......

৩। **ললিত কবিতাবলী।** ১২৭৭ সাল (৩০ ডিসেম্বর ১৮৭০)। পৃ. ৩৯।

"কাব্য-মালা-রচয়িতৃপ্রণীত ও প্রকাশিত"। 'কাব্যমালা' ও 'ললিত কবিতাবলী' পুস্তক দুইখানি আদিরস-ঘটিত, এই কারণে বোধ হয়, গ্রন্থকার স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় 'ললিত কবিতাবলী'র প্রকাশক-রূপে "Buldeb Palit of Bankipoor"-এর উল্লেখ আছে।

'ললিত কবিতাবলী' সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১২৭৯, পৃ. ৪২৮-২৯) লিখিয়াছিলেন :—

> এ গ্রন্থখানি এবং কাব্যমালা একই রচয়িতৃ প্রণীত বলিয়া সহসা বিশ্বাস হয় না। এ কবিতাগুলি ভাল। কাব্যমালা যে ঘোরতর দোষে দূষিত, এ গ্রন্থে সে দোষ নাই; কদাচিৎ বিন্দুপাত হইয়াছে মাত্র। কবিতাগুলিও মধুর। সংস্কৃত ছন্দোবন্ধে সকল কবিতাগুলিই লিখিত। উপজাতি, মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা রচনা কত কঠিন, তাহা অনেকেই জানেন। লেখক সে দুরূহ ব্যাপারে যে অনেক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা ক্ষমতার মন্দ পরিচয় নহে। অথচ কবিতা মধুর এবং সরস হইয়াছে। তবে পুরাতন কথাই অনেক।

দেখা যাইতেছে যে, লেখকের কবিত্ব শক্তি এবং শিক্ষা, দু-ই আছে। তবে কেন তিনি কাব্যমালা লিখিয়াছেন?

৩। ভর্তৃহরি কাব্য। ১২৭৯ সাল (৮ অক্টোবর ১৮৭২)। পৃ. ৮০+৬২।

"এই খণ্ড-কাব্যখানিতে ভু-বিখ্যাত রাজা ভর্তৃহরির বৈরাগ্য-সূচনা এবং বন-গমন বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আদ্যোপান্ত সংস্কৃতচ্ছন্দে বিরচিত। মালিনী, উপজাতি, বংশস্থবিল, বসন্ততিলক প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধচ্ছন্দ "কবি-কুল-গুরু কালিদাস" যাথাদি মহাকবিরা আদরপূর্ব্বক স্ব স্ব কাব্যে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি ছন্দঃ ইহাতে বাহুল্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতৎপাঠে সকলেরই মনে প্রতীতি হইবে যে প্রায় সমুদায় সংস্কৃতচ্ছন্দে বঙ্গভাষায় অনতিযত্নে লেখা যাইতে পারে। এই সকল ছন্দ যে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বঙ্গভাষা-প্রচলিত যাবতীয় ছন্দের অপেক্ষা মধুর এবং ওজোগুণসম্পন্ন তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন। পরন্তু মৎকর্তৃক বঙ্গ-ভাষায় প্রয়োপিত হওয়াতে ইহাদের সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে কি না, সে বিচারের ভার তাঁহাদেরই উপরে অর্পিত রহিল। এই সকল ছন্দ যে একেবারেই সর্ব্ব সাধারণের মনোনীত হইবে এরূপ কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; কিন্তু যে পরিমাণে এদেশে সংস্কৃত-ভাষানুশীলন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে ইহাদেরও আদর বৃদ্ধি হইবে, এ আশা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যাঁহার অদ্ভুত রচনা শক্তি 'যৌবনোদ্যান' প্রভৃতি কাব্যত্রয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, আমার অনুরোধে উপজাতিচ্ছন্দে (বৃত্রাসুর-বধ) নামক একখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিয়দ্দিবস হইল উক্ত

মহাকাব্যের প্রথম সর্গ এডুকেশন গেজেটে প্রকটিত হওয়াতে সমুদায় কৃতবিদ্য পাঠকগণ তৎপ্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ভরসা করা যাইতে পারে যে, বঙ্গভাষায় সংস্কৃতছন্দ অবিলম্বে বদ্ধমূল হইবে।

হিন্দী ভাষায় সংস্কৃতের ন্যায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ বর্ণের মাত্রা পৃথক্‌, এই কারণ বশতঃ তুলসীদাস ও সুরদাসের কবিতা, কীর্ত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের রচনাপেক্ষা অধিক মধুর এবং মনোহর। রায় গুণাকরের বিখ্যাত কাব্যত্রয়ের মধ্যে যে যে স্থানে সংস্কৃতছন্দ সন্নিবেশিত আছে, সেই সেই স্থান পাঠকেরা অপরাপর স্থান অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতচন্দ্র অসাধারণ রচনাশক্তি-সত্ত্বেও কেবল 'ভুজঙ্গ-প্রয়াত,' 'তূণক,' 'তোটক,' 'পজ্ঝটিকা,' 'গীতিকা,' 'পঞ্চচামর' প্রভৃতি, কতিপয় সামান্য অনুৎকৃষ্ট ছন্দ লিখিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন; এবং "সুকবি-জন-মনোজ্ঞা মালিনী," উপজাতি প্রভৃতি, প্রধান প্রধান ছন্দের মধ্যে একটীরও উদাহরণ বঙ্গভাষায় দিয়া গেলেন না। তিনি যদি এই সকল ছন্দে স্বীয় কাব্যগুলিকে অলঙ্কৃত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে এত দিনে অস্মদ্দেশীয় কবিতার যে কত উন্নতি হইত, তাহা বলা যায় না। কবি-তিলক শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদনকে ইংরাজীমতে অমিত্রাক্ষর পয়ার লিখিতে হইত না, এবং ইদানীন্তন অসংখ্য নব্য কবিরা না গদ্য না পদ্য—পরন্তু উভয়েরই অতিরিক্ত এক অদ্ভুত রচনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া পাঠকদিগের সময় নষ্ট করিতেন না।…

এ স্থলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে এই কাব্যের স্থানে স্থানে আমি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকবিদিগের রচনার অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়াছি। এতাদৃশ অনুকরণ অধুনাতন কোন্ কবি না করিয়া

থাকেন ? দ্বিতীয় সর্গে "কাদম্বরীর" এবং তৃতীয় সর্গে "উত্তরচরিতের" অনুকরণ সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।"—ভূমিকা

'ভর্তৃহরি কাব্য' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তিনি ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১২৭৯, পৃ. ৪৩০) লিখিয়াছিলেন :—

> এই কাব্য গ্রন্থখানি, আদ্যোপান্ত অপূর্ব্ব ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দে রচিত। পূর্ব্ব কবিগণ, দুই একটী সামান্য ছন্দ ভিন্ন সংস্কৃতছন্দ বাঙ্গালায় প্রায় ব্যবহার করেন নাই। সম্প্রতি, "ললিত কবিতাবলী" প্রণেতা, এবং বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এবং অন্যান্য নব্য কবিগণ উহা ব্যবহার করিয়াছেন। বলদেব বাবু ইহাতে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ গঠন, তাহাতে সংস্কৃতছন্দ ভাল বসে না। লেখকের বিশেষ শক্তি ভিন্ন ইহা শ্রুতিসুখদ হয় না। বলদেব বাবু সেই শক্তি দেখাইয়াছেন। ইহাতে ইনি যে বাঙ্গালা কবিতার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।...

৫। কর্ণার্জ্জুন কাব্য। ১২৮২ সাল (৪ অক্টোবর ১৮৭৫)। পৃ. ।/০ + ১৬০।

> "যে কৌরব-পাণ্ডবের আখ্যান কবি-কুল-গুরু বেদব্যাস তাঁহার ভুবন-বিখ্যাত মহাভারতে লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মাদৃশ জনের হস্ত-ক্ষেপ করা যে নিতান্ত ধৃষ্টতা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী হইয়া মহর্ষি দ্বৈপায়ন মহানুভাব কর্ণের প্রতিকৃতি তদনুরূপ বর্ণে চিত্রিত না করাতে আমি এই কাব্য-খানি লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।
>
> ... ...

কেহ কেহ কহেন "এই কাব্যের ২।৩ সর্গ অমিত্রাক্ষর পদ্যে লিখিলে ভাল হইত।" কিন্তু এই প্রণালী কোন ভাষায় কোন প্রসিদ্ধ কাব্যেই লক্ষিত হয় না; সেই জন্য আমি উক্ত মতের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কিন্তু ৪র্থ এবং ৫ম সর্গে দুয়ে মিল রাখিয়া অমিত্রাক্ষরপ্রিয় পাঠকবর্গকে কথঞ্চিৎ তুষ্ট রাখিতে যত্ন করিয়াছি।

সংস্কৃত কাব্যে যে সমস্ত সুললিত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বাঙ্গালা পদ্যে সেই সমস্ত ছন্দ প্রয়োগ করিতে পারিলে অবশ্যই তাহার কিছু না কিছু সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু এতদ্দেশে স্বরবর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিবার প্রথা না থাকাতে, ঐ সকল ছন্দ সর্ব্ব সাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার "ভর্তৃহরি কাব্যই" ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই কারণ-বশতঃ আমি ঐ প্রকার রচনায় আর প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না। কেবল পঞ্চম সর্গে সূর্য্যের স্তোত্র এবং প্রতি সর্গের শেষে ২।৩টী কবিতামাত্র সংস্কৃতচ্ছন্দে লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম।" (ভূমিকা)

রচনার নিদর্শন: বলদেবের অধিকাংশ কবিতাই সংস্কৃত ছন্দে রচিত। ছন্দের সাবলীলতা ও সংস্কৃত শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগের দরুন তাঁহার কবিতা কিরূপ উপভোগ্য, নিম্নের উদ্ধৃতাংশগুলি হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে:—

বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত "কবিতার জন্ম" শীর্ষক কবিতাটির উপমা-প্রয়োগ সুন্দর:

কবিতার অধিষ্ঠান,　　　　হয় দেখ যে যে স্থান,
ত্রিদিব তথায় আবির্ভাব;
পদ-ন্যাসে সুকোমল,　　　　ফুটে শত শতদল,
শোভা ধরে সমস্ত স্বভাব।

মিলিয়া তরুণ-রবি, তব নন্দিনীর ছবি,
শিকবর জিনিয়া সুস্বর ;
রূপে আর সুধা-ভাষে, ভুলে লোকের অনায়াসে,
হইবে উহার অনুচর।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা নিম্নে 'কাব্যমালা'র একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, বিষয়বস্তুনিরপেক্ষ আধুনিক পাঠক ইহা হইতেই বলদেব পালিতের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইবেন :

নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি

দেখ প্রিয়ে, দিবালোক হয়েছে বিদায়,
সন্ধ্যার তিমির-জালে আবৃত ভুবন,
এস এই বাপী-তটে বকুল-তলায়,
দুজনে বিরলে বসি যুড়াই জীবন।
প্রখর নিদাঘ-তাপে সমস্ত দিবস,
হইয়াছে অতিশয় শরীর অবশ,
শীকর সহিত ধীর শীতল সমীর,
এখনি করিবে স্নিগ্ধ অন্তর বাহির।

মণি-মুক্তা-প্রবাল-খচিত সিংহাসনে,
একাকী বসিয়া ভূপ হয় যত সুখী,
তব সনে বসি আমি এই তৃণাসনে,
শতগুণে তায় চেয়ে সুখী বিধু-মুখি।
লোক-মুখে শুনি এক কথা পুরাতন,
একটী মাণিক্য সাত নৃপতির ধন ;

যুগল মাণিক্য, ধনি, নয়ন তোমার
শুভাদৃষ্ট ফলে আজি ঘটেছে আমার।

যেন এক চন্দ্রাতপ অসিত বরণ,
আমাদের উপরেতে অসীম আকাশ ;
আহা! কিবা ওখানে অগণ্য তারাগণ
জ্বলিছে হীরক-খণ্ড জিনিয়া প্রকাশ!
যদি আমি হইতাম উহার মতন,
প্রত্যেক তারক যদি হইত নয়ন!
লাবণ্য-তরঙ্গ তব মানস-মোহন
অনিমিষে করিতাম এখন দর্শন!

আকাশে আবার আলো দেখলো রূপসি!
অগ্নিময়, গোলাকার, বিস্তৃত বদন,
পূর্ব্বাচলে রক্তবর্ণে সমুদিত শশী
রাগে ফুলে তব রূপ করি নিরীক্ষণ।
বৃথা কেন সিন্ধু-সুত ক্রোধেতে মগন ?
তোমা চেয়ে শোভা ধরে প্রিয়ার চরণ।
দেখ, ধনি, নিশানাথ হারি তব স্থানে,
খর্ব্ব হইতেছে, পুনঃ পাণ্ডু অভিমানে।

নাচাইয়া লতা পাতা, দক্ষিণ বাতাস,
সরোবরে কুমুদীরে করি আলিঙ্গন,
বলেতে খুলিয়া তব অবগুণ্ঠ-বাস,
উড়ায়ে অলকাবলি করিছে চুম্বন।

তোমার নিকটে যদি প্রকাশিয়া বল,
পবন চুম্বিতে পারে বদন-মণ্ডল,
তবে কেন আমি এত তোষামোদ করি,
বঞ্চিত ও কোমলাঙ্গ-পরশে সুন্দরি ?

নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি সংস্কৃত উপজাতি ছন্দে রচিত :

লোধ্র-প্রসূনে[১] বন-রাজি শোভে ;
প্রফুল্ল কুন্দে জন-চিত্ত লোভে ;
ক্রৌঞ্চ[২]-স্বনে প্রান্তর শব্দ-যুক্ত ;
প্রনষ্ট অম্ভোজ হিম-প্রযুক্ত ॥

চণ্ডাংশুমালে,[৩] উদয়ের কালে,
সমাবরে কুজ্‌ঝটিকার জালে ;
কিঞ্চিৎ পরে ভাস্কর উগ্র-ভাবে
হরে কুয়াসা স্বকর প্রভাবে ॥

মন্দ-প্রভা-যুক্ত বিলোকি চাঁদে,
হিমাশ্রু-পাতে নিশি নিত্য কাঁদে ;
তারা সমূহে গগনে বিলুপ্ত ;
হ্রদে যথা কৈরব-জাল গুপ্ত ॥

শয্যা-গৃহে নাগর নাগরীরে
নিশামুখে[৪] যায় লয়ে অধীরে ;
অর্দ্ধ-স্ফুট প্রেক্ষণ[৫] মদ্য-পানে ;
মনঃ সমুৎকণ্ঠিত কাম-বাণে ॥

---

১ পুষ্প। ২ কোঁচবক। ৩ সূর্য্য। ৪ সন্ধ্যাকালে। ৫ চক্ষুঃ

শীতোৎপলক্ষ্যে, মদন-প্রসঙ্গে,
পরস্পরাঙ্গে পরিরম্ভ রঙ্গে ;
গ্রীবা সমালিঙ্গিত বাহু-পাশে।
কবি প্রমোদে "উপজাতি" ভাষে ॥

'ভর্তৃহরি কাব্যে' মালিনী ছন্দে রচিত রাজমহিষী অনঙ্গার রূপ বর্ণনা এইরূপ :

ফুল সম সুকুমারী, দীর্ঘ-কেশা, কৃশাঙ্গী,[১]
অচপল-তড়িতাভা সুন্দরী, গৌরকান্তি,
মধুর নব-বয়স্কা, পদ্মিনী-অগ্রগণ্যা,
যুবক-নয়ন-লোভা "কামিনী কামশোভা।" ৩।

বিকচ জলজ তুল্য স্মের উৎফুল্ল আস্য ;
ভ্রমরক[২]-চয় তাহে ভৃঙ্গ-শোভা প্রকাশে।
স্খলিত চিকুর-বন্ধ ব্যাপিয়া পৃষ্ঠদেশে,[৩]
পতিত বিমল তল্পে নিন্দিয়া মেঘমালা। ৪।

সুতনু অনতি-বক্রা ভ্রূলতা দীর্ঘ-রেখা ;
প্রণয়-সলিল-পূর্ণ স্নিগ্ধ নীলাব্জ[৪] নেত্র ;
জিনি মধুকর-পালী[৫] পক্ষ্ম-রাজী বিশালা ;
নয়ন-তট অপাঙ্গে, কজ্জলে উজ্জ্বলাভা। ৫।

---

১ কিংবা— কুসুম-মৃদু কৃশাঙ্গী, নাতিদীর্ঘা, ন খর্ব্বা,
অচপল তড়িতাভা মোহিনী গৌরকান্তি,
যুবক-জন-মনোজ্ঞা যৌবনালঙ্কৃত-শ্রী,
স্মর-শর অনুরূপা, পদ্মিনী অগ্রগণ্যা।

২ ভ্রমরক—ললাটস্থিত চূর্ণ কুন্তল।

৩ অথবা—পৃষ্ঠ-বাসঃ। ৪ কিম্বা—সারঙ্গ নেত্র। ৫ শ্রেণী।

চরণ-অরুণ বর্ণে লজ্জিছে রক্ত-পদ্মে ;
ক্বণিত কখন তাহে স্বর্ণ মঞ্জীর মঞ্জু ;
মধুর মধুর ধারা যায় সিঞ্জার শব্দে,
মদকল অলিবৃন্দে আসিয়া হারি মানে। ১৫।

'কর্ণার্জ্জুনে'র ছন্দ, ভাষা এবং ভাবের বৈশিষ্ট্য নীচের উদ্ধৃতাংশ হইতে বোধগম্য হইবে :

নিঃশব্দে নিশীথ আসি' গাঢ়-নীল-বেশে
সুষুপ্তির ইন্দ্রজালে মোহে চরাচর ;
গভীর-প্রশান্ত-মূর্ত্তি অবনি-মণ্ডল।

নীরবে নক্ষত্র-কুল জাগে নভোদেশে,
পাণ্ডব-শিবিরে যথা প্রহরি-নিকর,
অথবা সমর-ক্ষেত্রে উল্কামুখী-দল।
নিশি-যোগে রণ-ভূমি কীদৃশ দর্শন,
তাহারাই জানে যারা দেখেছে নয়নে ;
হত-অশ্ব-গজ-মুণ্ড-কবন্ধ-সঙ্কুল।
মৃত-প্রায় নিদ্রা যায় শ্রান্ত যোধগণ ;
শব-গুলা সুপ্ত বলি' ভ্রান্তি হয় মনে ;
আহতের আর্ত্ত-নাদে কর্ণে হানে শূল।

নিদ্রাবেশে কোন যোদ্ধা দেখিছে স্বপন,
বহু-দিন পরে সেই প্রত্যাগত বাসে।
সাধের রমণী তার তাহারে পাইয়া,
অশ্রু-জলে করিতেছে পদ-প্রক্ষালন ;
এলাইয়া বেণী পুনঃ মনের উল্লাসে
মুছিতেছে সেই জল কেশ-পাশ দিয়া।

পিতারে চিনিতে নারি', অবাক হইয়া,
ধূলা-মাখা কোমলাঙ্গে শিশু সুতগণ,
মায়ের অঞ্চল ধরি, পিতৃমুখ-পানে,
সবিস্ময়ে এক-দৃষ্টে রয়েছে চাহিয়া;
তখন তাদিগে সতী করিয়া চুম্বন
'বাবা' বলি' ডাকিবারে কহে কাণে কাণে।

আহ্লাদে সৈনিক-বর কোলেতে যেমন
লইবে সর্ব্বস্ব-ধন সন্তান সকলে,
শিবার চীৎকারে তার স্বপ্ন পায় লয়।

কোথা বা সে প্রিয়া! কোথা প্রিয় পুত্রগণ!
ভাসিল বদন তার নয়নের জলে;
দীর্ঘ শ্বাসে তরঙ্গিত হইল হৃদয়।

বলদেব পালিত ও বাংলা-সাহিত্য

কালের প্রবাহে যাহা বিলীন হইয়াছে, তাহাকে টানিয়া তুলিবার প্রয়াসকে অনেকে বাতুলতা মনে করিবেন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই জানেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সমসাময়িক বিচারে অনেক সময় ভুল হইয়াছে—মৃত ও বিস্মৃত অনেক বস্তুই আবার স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলদেব পালিতের কাব্যসৃষ্টি সেই জাতীয় বস্তু কি না, তাহার বিচার না করিয়া, আমরা তাঁহার পরিচয় আধুনিক যুগের সহৃদয় ও চিন্তাশীল পাঠকের দরবারে উপস্থিত করিলাম; তাঁহারাই বিচার করিয়া দেখিবেন, কবি বলদেব পালিতকে বিস্মৃত হইয়া আমরা

ভুল করিয়াছি কি না। সংস্কৃত-সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া বলদেব মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ; বাংলা ছন্দ বিষয়েও তাঁহার দান সামান্য নহে। তিনি যে কালে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছিলেন, সেই কালেই প্রবলতর প্রতিভার আবির্ভাবে স্থানচ্যুত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, এই ঘটনাই তাঁহাকে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিলুপ্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে অনাধুনিকতাদোষে দুষ্ট করিয়াছেন। দীর্ঘ কালের অবকাশে আজ বলদেব পালিতকে স্মরণ করিতে গিয়া আমরা দেখিতেছি, তিনি স্বয়ং বিলুপ্ত হইলেও তাঁহার অনুসৃত পথ ধরিয়া অনেকে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বলদেব পালিত প্রাচীনপন্থী হইলেও তাঁহার কাব্যে অনেক নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। বাঙালী রসিক সমাজ যে তাঁহার কাব্যামৃত-রসাস্বাদে পরিতৃপ্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার
রামচন্দ্র মিত্র

শ্যামাচরণ শর্ম্মা সরকার
রামচন্দ্র মিত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৫০
দ্বিতীয় সংস্করণ—মাঘ ১৩৫০
তৃতীয় মুদ্রণ—চৈত্র ১৩৫২
মূল্য ছয় আনা

মুদ্রাকর—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দীপালী প্রেস, ১২৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার

১৮১৪—১৮৮২

বাল্য-জীবন

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ মার্চ (৮ চৈত্র ১২২০) এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে শ্যামাচরণ সরকারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরনারায়ণ সরকার। হরনারায়ণের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত চূর্ণী-তীরবর্ত্তী মামজোয়ানি গ্রাম। তিনি পূর্ণিয়ায় রাণী ইন্দ্রাবতীর দেওয়ান ছিলেন; এই পূর্ণিয়াতেই শ্যামাচরণের জন্ম হয়।

পাঁচ বৎসর বয়সে শ্যামাচরণের পিতৃবিয়োগ হয়। হরনারায়ণ স্ত্রীপুত্রের জন্য বিশেষ কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই; তিনি উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই দানাদি সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতেন। এই দুঃসময়ে রাণী ইন্দ্রাবতীর উত্তরাধিকারী বিজয়গোবিন্দ সিংহ পরলোকগত দেওয়ানের পরিবারকে মাসিক ১০৲ বৃত্তি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ প্রথমে গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যথারীতি পড়াশুনা করেন। তাঁহার বয়স যখন প্রায় ১৪, সেই সময় তাঁহার খুল্লতাত হরচন্দ্র তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে নিজের নিকট রাখিয়া ফার্সী পড়াইতে অভিলাষ করেন। কৃষ্ণনগরে শ্যামাচরণ যাঁহার নিকট ফার্সী পড়েন, তিনি ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীনাথ লাহিড়ী,—স্বনামধন্য রামতনু লাহিড়ীর

ভ্রান্তি-খুল্লতাত। ইনি কৃপাপরবশ হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে শ্যামাচরণকে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শ্যামাচরণ প্রায় ছয় বৎসর মনোযোগ সহকারে ফার্সী অধ্যয়ন করেন। শ্যামাচরণ এই সময়ে রামতনু লাহিড়ীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। রামতনু মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে পিত্রালয় কৃষ্ণনগরে যাইতেন।

কর্ম্ম-জীবন

সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য শ্যামাচরণকে জীবিকা-অন্বেষণে কলিকাতা ছুটিতে হইল। তিনি তথায় পিতৃবন্ধু রীড সাহেবের শরণাপন্ন হন। রীড তাঁহাকে মাসিক ১০৲ বেতনে নিজ মুন্শীর পদে নিযুক্ত করেন। কিছু দিন পরে, রীড সাহেবের একটি মকদ্দমায় পাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে শ্যামাচরণ এই চাকুরিটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এদিকে পূর্ণিয়ার মাসিক ১০৲ বৃত্তিও কোন কারণে কিছু দিন পূর্ব্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শ্যামাচরণ বিষম সঙ্কটে পড়িয়া পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু রামতনুর পটলডাঙ্গার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া সহৃদয় রামতনু বন্ধুকে বিপদে আশ্রয় দিলেন।

রামতনুবাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া শ্যামাচরণ দুই বৎসর কাল জীবিকা অর্জনের জন্য কিরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিতকারের ভাষায় বর্ণনা করিতেছি:—

> যখন তিনি রামতনু বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সময়েই ভারত-প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। রামগোপাল বাবু যত্ন চেষ্টা করিয়া জোজেফ কোম্পানির আপিষের অধ্যক্ষ জোজেফ সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জন্য শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক ২০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন।

তৎপরে ক্যাম্বেল সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জন্যও নিযুক্ত হন। সাহেবদিগকে হিন্দি পড়াইবার সময়েই তাঁহার বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইল যে, কিছু ইংরাজি না জানিলে বিষয়-কার্য্য লাভ করা দুষ্কর, তজ্জন্য যখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ২২ বৎসর, তখন তিনি রামতনু বাবুর নিকটে ইংরাজি ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে পটলডাঙ্গাস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব সঞ্চার হওয়াতে শ্যামাচরণ বাবু তাঁহার নিকটে ইংরাজি ভাষায় গ্রীষ দেশের ইতিহাস ও ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার ইংরাজি ভাষায় অল্প অল্প কথোপকথন করিবার সামর্থ্য জন্মিল। তখন প্রতিদিন সায়ংকালে গড়ের মাঠে যে সকল ইংরাজ বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ করিতে আসিতেন, তিনি তাঁহারদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন যে "আপনারদের মধ্যে কাহারও কি পণ্ডিত বা মুন্সীর প্রয়োজন আছে?" এইরূপে চাকরী সংগ্রহ করিয়া লইতেন। তৎপরে একদিন ঈদৃশ উপায়ে ডাক্তার ম্যাক্‌ডলেও সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে ইংরাজি ভাষাজ্ঞ মুন্সী দেখিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক হিন্দি-শিক্ষা জন্য নিযুক্ত করিলেন। ম্যাক্‌ডলেও সাহেব অত্যল্প কাল মধ্যেই শ্যামাচরণবাবুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সার চার্লস্ ট্রিবিলিয়ান সাহেব কৌন্সিলের মেম্বর হইয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ডি রোজারিও সাহেবকে ইংরাজি, হিন্দি ও বাঙ্গালা অর্থ-যুক্ত রোমান অক্ষরে একখানি অভিধান প্রস্তুত করিতে ভার অর্পণ করেন। তৎকার্য্য-সাধনে সাহায্য করিবার জন্য শ্যামাচরণ বাবুকে অনুরোধ পত্র সহ পাঠাইয়া দেন। শ্যামাচরণ বাবুর সম্পূর্ণ সাহায্যে যখন প্রাগুক্ত অভিধানখানি প্রস্তুত হইয়া মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন ট্রিবিলিয়ান সাহেব তাহার এক একটী প্রুফ

দেখিতেন। শ্যামাচরণ বাবু যখন প্রুফ লইয়া সাহেবের নিকট যাইতেন, তখন তাঁহার মুন্সী দিল্লীনিবাসী ইয়াকুব খাঁ তাঁহার মুখে সময়ে সময়ে কতিপয় অপরিশুদ্ধ উর্দ্দু-বাক্য শুনিয়া উপহাস করিতেন। শ্যামাচরণ বাবু তাহাতে লজ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ উর্দ্দু শিক্ষার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজে দিল্লী-নিবাসী হাফেজ গোলাম নবীস নামক জনৈক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু তাঁহার নিকটে উর্দ্দু শিক্ষা জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি শিক্ষার্থীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ বাবু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া অত্যল্প কাল মধ্যে উল্লিখিত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য সেক্‌সপিয়ারের উর্দ্দু অভিধানের শব্দ ও লিঙ্গ-ভেদ এবং ডাক্তার গিলক্রাইষ্ট সাহেবকৃত উর্দ্দু-ব্যাকরণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্বয় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই উল্লিখিত ইংরাজি হিন্দি ও বাঙ্গালা অর্থযুক্ত অভিধানখানি অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। ট্রিবিলিয়ান সাহেব তৎকালে উর্দ্দু-ভাষায় রোমান অক্ষরে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত করেন, শ্যামাচরণ বাবু দ্বারা তৎসমূহ শোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তদ্দ্বারা তিনি ট্রিবিলিয়ান সাহেবের বিশেষ স্নেহ-ভাজন হইয়া উঠেন। তাহার কিছুদিন পরেই ট্রিবিলিয়ান সাহেব বিলাত গমন সময়ে অস্‌টেল লিপেজ কোম্পানির উপর এই অনুজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিয়া যান যে, তাঁহারা তাঁহার হিসাবে শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তি দিবেন। তদ্‌ভিন্ন তখন শ্যামাচরণ বাবু চর্চ্চমিশন সোসাইটির পুস্তকাদির প্রুফ শোধন কার্য্যাদি করাতে তাঁহার আরো মাসিক দশ টাকা আয় ছিল। তিনি সেই ত্রিশ টাকা

আয় হইতে মাসিক আট টাকা বেতন দিয়া সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজে লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এবং তত্রত্য জনৈক অধ্যাপকের নিকট ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।...ট্রিবিলিয়ান সাহেবের বৃত্তি দুই বৎসর পরেই স্থগিত হইয়া গেল,...।—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ঃ 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', (ইং ১৮৮২), পৃ. ১৩-১৫।

কলিকাতা মাদ্রাসার বাংলা-শিক্ষক

কলিকাতা মাদ্রাসার সহিত একটি ইংরেজী-বিভাগ যুক্ত ছিল। অধিকাংশ ছাত্র উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে বাংলা শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ইংরেজী-বিভাগের সংলগ্ন একটি বাংলা-শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ১ জুলাই ১৮৩৭ তারিখে শ্যামাচরণ মাসিক ২৫ বেতনে এই বাংলা-শ্রেণীর পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ হইয়াছিল। ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে (পৃ. ১১৫) কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপকগণের নামের তালিকামধ্যে শ্যামাচরণের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; ইহাতে প্রকাশ :—

ENGLISH DEPARTMENT

Names	Designation	Salary	Date of Appointment
...	...	...	
Pundit Shamachurn Sirkar*	Bengalee Master	40	July 1, 1837

এই পদে নিযুক্ত থাকা-কালে শ্যামাচরণ কলেজের মৌলবী আবদার রহীম ও গয়াসুদ্দীনের নিকট আর্বী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ প্রাতে ৬-১০টা পর্য্যন্ত মাদ্রাসায় বাংলার অধ্যাপনা করিতেন। তার পর নিজে ছাত্ররূপে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়িতে যাইতেন।

---

* Private Tutor to many European gentlemen.

মেদিনীপুরে বেলীর বাংলা-শিক্ষক

মাদ্রাসা কলেজ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরে শ্যামাচরণ মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ. ভি. বেলীর বাংলা-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামতনু লাহিড়ী ২৫ মে ১৮৪২ তারিখে তদীয় বন্ধু মেদিনীপুরের ডেপুটী কলেক্টর গোবিন্দচন্দ্র বসাককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

My dear Gobind,

This is favoured by a particular friend of mine, Babu Shyama Churn Sirkar who has proceeded to Midnapore as Bengalee Instructor to Mr. Bayley. As he has no friend or acquaintance there, I have been requested to give him an introductory note to you, and I do so with great pleasure. I can say without breach of truth that he is not an ordinary person in the country. He has a knowledge of Greek, Latin, Arabic, Persian, Hindustanee and of course of English and Bengalee, and I have reason to think that his acquaintance with these languages is not merely superficial. You may have read in the *Englishman* somo time ago, remarks highly commendatory of his Latin composition, in the notice that that journal took of the Examination of St. Xavier's College. His Latin Essay was the best of those produced. He had no friends or parent's care to superintend over his education. When he came to town he brought with him some knowledge of Persian and knew almost nobody. He had since acquired all that I have above stated and the admiration and regard of not a few among those whose good opinion it is worth having. His perseverance and thirst after knowledge are truly wonderful, and such as is very rare among the new class.

Yours affectionately,
RAM TONOO LAHIRY

---

* Ram Gopal Sanyal : *A General Biography of Bengal Celebrities*,...(1889), p. 112-18.

সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-শিক্ষক

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখ হইতে একটি ইংরেজী-শ্রেণী স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংরেজী-শ্রেণীটি উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার সাত বৎসর পরে, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সংস্কৃত কলেজে পুনরায় ইংরেজী-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রেণীর হেড মাস্টার নিযুক্ত হন—রসিকলাল সেন। ১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখে শ্যামাচরণ সরকার মাসিক ৭০৲ বেতনে ইংরেজীর দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণ এই পদে ছয় বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসর কলেজের অবসরকালে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলেন।* কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনাকালে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ শ্যামাচরণ বহু-ভাষাবিৎ ছিলেন। "পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন; সংস্কৃত 'সাহিত্যদর্পণ'কারের ভাষায় ভরত শিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গঃ (the fancymen of eighteen courtezans of languages)।" †

---

* হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন পিতা ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন:—"শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পিতৃদেবকে ইংরাজি পড়াইতেন এবং স্বয়ংও পিতৃদেবের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। এই অন্যোন্যাশ্রিত গুরুশিষ্যভাবে সম্বন্ধ হওয়াতে উভয়ে উভয়ের পরম বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।" (পৃ. ৩৫)

† আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিকথা—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫১।

সদর দেওয়ানী আদালতের পেশকার ও প্রধান অনুবাদক

সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্যামাচরণ সদর দেওয়ানী আদালতে চার্লস টাকার্ সাহেবের এজলাসে পেশকার নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণের জীবনীতে প্রকাশ :—

"...টকর সাহেব পীড়িত হইয়া অবকাশ গ্রহণ করেন ; তাঁহার স্থানে ডনবর সাহেব আসিয়া নিযুক্ত হইলেন।...

এই সময়েই একদিন ডনবর সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে কি উপায় অবলম্বন করিলে অল্পকালমধ্যে অধিক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইতে পারে? এখন যেরূপ পদ্ধতিতে আরজি, জবাব প্রভৃতি পড়া হয়, তাহাতে অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রতি মাসে ৩।৪টী, না হয় পাঁচটী মোকর্দ্দমাই নিষ্পত্তি করা যায়। তাহাতে শ্যামাচরণবাবু বলিলেন, যে বিবেচনা করিয়া কল্য আপনাকে ইহার উত্তর দিব। এই বলিয়া তিনি যথাসময়ে কয়েকটী মোকর্দ্দমার নথী ঘরে লইয়া গেলেন। বাটীতে যথোচিত পরিশ্রম করিয়া সেই সমস্ত ইংরাজীতে অনুবাদ করিলেন এবং তাহার বিচার্য্য বিষয় কি, তাহাও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া পরদিন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত হওত তাহা সাহেবকে দেখাইলেন। অনুবাদ সকলের যাথার্থ্য সপ্রমাণ জন্য সাহেবের হস্তে ইংরাজি অনুবাদ দিয়া আপনি নথীটি পড়িতে লাগিলেন। ডনবর সাহেব তৎশ্রবণে এবং অনুবাদ পাঠে সবিশেষ আহ্লাদিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে অল্প কাল-মধ্যে ইংরাজিতে মোকর্দ্দমার ভাব ও অবস্থা অবগত হইয়া উভয় পক্ষীয় উকীলদিগকে আহ্বান করত তাহা অবগত করিয়া অনধিক কাল-মধ্যে তাঁহারদের বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক ডনবর সাহেব প্রতিমাসে অধিক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সদর দেওয়ানিতে যে সকল জজ ছিলেন, তন্মধ্যে জে, আর, কলবিন সাহেবই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহার এজলাসেই প্রতি মাসে অধিক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইত। তিনি ডনবর সাহেবকে কোন কোন মাসে তদপেক্ষা বহুসংখ্যক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। একদিন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্ত ডনবর সাহেবের চেম্বারে উপস্থিত হইলেন। শ্যামাচরণবাবুও তখন তথায় বর্ত্তমান ছিলেন। ডনবর সাহেব মোকর্দ্দমা শীঘ্র নিষ্পত্তির নিদর্শনস্বরূপ শ্যামাচরণ বাবুর কৃত নথীর তরজমা সকল কলবিন সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামাচরণবাবুর যোগ্যতা ও কার্য্যদক্ষতারও সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। তদবধি সার রবার্ট বার্লো এবং কলবিন সাহেবও কোন কোন মকর্দ্দমা শ্যামাচরণ বাবুর দ্বারা অনুবাদ করাইয়া লইতেন। ইহাতে কলবিন সাহেব বিশেষ কার্য্য-সুবিধা দেখিয়া তৎকালীন গবর্ণর জেনরল বাহাদুর লর্ড ডেলহউসী সাহেবের নিকট যাইয়া এই সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করিলেন এবং শ্যামাচরণ বাবুর বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বলিলেন, যে প্রস্তাবিত নিয়মে কার্য্য হইলে বিচারক-সংখ্যা অনায়াসেই কমাইতে পারা যাইবেক। কার্য্যকুশল গবর্ণর জেনরল বাহাদুর, কলবিন সাহেবের প্রস্তাবে আগ্রহের সহিত অনুমোদন করত তাঁহাকে এই আদেশ দিলেন, যে শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক ৪০০ চারি শত টাকা বেতনে প্রধান অনুবাদক-পদে নিযুক্ত করিবেন।...এই অবধি প্রত্যেক জেলা জজের আপিষে সেরেস্তাদার এবং পেশকারের মধ্যে এক জনের পদ রহিত করিয়া, তৎপদে এক একজন অনুবাদক নিযুক্ত করিবার আদেশ হইল।"—বেচারাম চট্টোপাধ্যায় : 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', (ইং ১৮৮২), পৃ. ১৯-২১।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ মাসিক ৪০০৲ বেতনে সদর দেওয়ানী আদালতের ইংরেজী-বিভাগে প্রধান অনুবাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

সুপ্রীম কোর্টের চীফ্ ইণ্টারপ্রিটর

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান ইণ্টারপ্রিটর এভিয়ট সাহেব অবসর গ্রহণ করেন। শ্যামাচরণ এই পদের প্রার্থী হন। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিরা এবং রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি একবাক্যে শ্যামাচরণের বিদ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতা বিষয়ে সুপারিশ করায়, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে শ্যামাচরণ মাসিক ৬০০৲ বেতনে চীফ ইণ্টারপ্রিটরের পদ লাভ করেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই পদ অলঙ্কৃত করেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা তাঁহার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন; তাঁহাদের আদেশে, শ্যামাচরণ কলিকাতার মধ্যে কাহারও জবানবন্দী লইবার জন্য যাইতে হইলে প্রত্যেক বারে দুই মোহর করিয়া কমিশন পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এই কর্ম্ম যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া, মাসিক তিন শত টাকা পেন্‌শনে শ্যামাচরণ অবসর গ্রহণ করেন।

ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ সরকার ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক (Tagore Law Lecturer) পদে মনোনীত হন। এই পদের দক্ষিণা ছিল দশ সহস্র টাকা। দেশীয় যোগ্য লোকের অভাবে এই উচ্চ পদ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই অধিকার করিতেন। বাঙালীদের মধ্যে শ্যামাচরণই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানিত পদ লাভ করেন। এই সংবাদে ১৮ জুলাই ১৮৭২ তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন :—

"বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি অধ্যাপকের পদে বাবু শ্যামাচরণ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। উক্ত পদের নিমিত্ত ব্যারিষ্টার গুডিফ্ সাহেব ও পিফার্ড সাহেব প্রার্থিত ছিলেন। বাবু শ্যামাচরণকে মনোনীত করিয়া সেনেট সমস্ত বাঙ্গালীকে সম্মান দান করিলেন।"

পর-বৎসরও বিশ্ববিদ্যালয় এই পদে শ্যামাচরণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ২ আগষ্ট ১৮৭৩ তারিখের 'ভারত-সংস্কারক' পত্রে প্রকাশ :—

"সংবাদাবলী।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় বাবু শ্যামাচরণ সরকারকে আর এক বৎসরের জন্য ঠাকু ল লেকৃচররের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে সেনেটে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্যামাচরণ বাবু একজন বিশিষ্ট যোগ্য লোক, বিশেষতঃ তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখনও তাহা শেষ হয় নাই।"

এই পদে নিযুক্ত হইয়া শ্যামাচরণ মুসলমান-আইন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁহার বক্তৃতাগুলি ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। এই প্রসঙ্গে ৬ মার্চ ১৮৭৪ তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' লেখেন :—

"সংবাদাবলী।—...আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম,...ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আইন অধ্যাপক বাবু শ্যামাচরণ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হইয়াছেন।

'ভারত-সভা'র সভাপতি

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ দেশপ্রাণ ব্যক্তিগণের উদ্যোগে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জুলাই কলিকাতায় ভারত-সভা (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামাচরণ এই রাজনৈতিক সমাজের প্রথম সভাপতি ছিলেন।

'বিদ্যাভূষণ' উপাধিলাভ

"শ্যামাচরণবাবু…ধর্ম্ম-শাস্ত্র চর্চ্চা দ্বারা কাল-সহকারে একজন অসাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ মহামান্য পণ্ডিত-অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। 'সনাতন-ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা'র কলিকাতার ও নবদ্বীপ প্রভৃতির সদ্বিদ্যাশালী সুবিখ্যাত সুপণ্ডিত সভা-মহোদয়গণ তাঁহার প্রকৃত গুণগ্রাহী হইয়া, তাঁহাকে যে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রদান করেন, তাহা যথার্থই তাঁহার গুণানুরূপ হইয়াছিল।"*

জনহিতকর অনুষ্ঠান

শ্যামাচরণ বহু জনহিতকর কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এখানে একটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ স্বগ্রাম—মামজোয়ানিতে একটি ইংরেজী-বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি একাই স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে এই স্কুলটির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

* বেচারাম চট্টোপাধ্যায় : 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত,' পৃ. ৩৪।

Manjooan School.—This School was established in 1858 by Babu Shama Churn Sircar, interpreter of the Supreme Court, Calcutta. The whole expense of the School was borne by that gentleman till the 1st of September, 1860, when a Government grant of Rupees 60 a month was sanctioned. Babu Shama Churn besides contributing the total amount of subscriptions himself, pays the tuition fee of every boy at the rate of four annas a month. He has to give in all upwards of Rupees 85 a month, towards the support of the School. Such liberality as his is rarely to be met with in this country. The institution labours under the usual difficulties of a free School. The people have to pay nothing for the education of their children and consequently care very little for the School—Report, dated 25 June 1862, of H. Woodrow, Inspector of Schools, Central Division. (*General Report on Public Instruction...for* 1861-62. App. A., p. 26.)

"এতদ্ভিন্ন সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে নিজ-গ্রাম মামজোয়ানি হইতে হাজরাপুর অবধি একটি এবং মামজোয়ানি হইতে বাদকুল্যার সন্নিহিত সুপ্রসিদ্ধ রাজ-পথ পর্য্যন্ত অপর একটি বর্ত্ম বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তৎপ্রদেশস্থ লোকের বিপুল মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন।... তদ্ব্যতিরেকে প্রতি-বর্ষে দলুই গ্রাম ও হলুদপাড়া নামক গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তৃত প্রান্তরমধ্যে—সেই জল-শূন্য প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির জন্য দুইটি স্বতন্ত্র কূপ খনন করিয়া একটি হিন্দু, একটি মুসলমান ভৃত্য নিযুক্ত রাখিয়া জলছত্র প্রদানপূর্ব্বক উভয়-জাতির তুল্য-রূপে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সেই প্রান্তরবাহী পথিকগণ ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর লোকসকল এবং কৃষক ও গোপাল প্রভৃতি তাঁহার প্রদত্ত জলছত্রে জলপান ও বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর ও ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিত।"*

* বেচারাম চট্টোপাধ্যায়: 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত,' পৃ. ৩৮।

শ্যামাচরণ দানবীর ছিলেন। দীন দরিদ্র অনাথ আতুরকে অন্নবস্ত্র দান, অসহায় বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান, নিরুপায় বিধবাকে মাসিক সাহায্য দান প্রভৃতি সৎকর্ম্মে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া তিনি জীবনে বহু পুণ্য অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মমত

এই প্রসঙ্গে তাঁহার চরিতকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শ্যামাচরণ বাবুর বাল্য-জীবন হইতেই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং পরকালের প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই যে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা, এ বিশ্বাস আমৃত্যু তাঁহার হৃদয়ে দীপ্তি পাইয়াছে। পারসী ও আরবী ভাষায় ঈশ্বর-বিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ-পাঠে এবং সংস্কৃত ভাষায় শ্রুতি-উপনিষদাদি অধ্যয়নে তাঁহার ধর্ম্মভাব আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। যখন তিনি পঁচিশ টাকা বেতনে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন, তখন হইতেই তাঁহার আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ হইয়াছিল।...

পরম পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের সহিত তাঁহার যোগ হওয়াতে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি নিয়মিতরূপে আদি ব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিত হইয়া, অরূপী অশরীরী পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং ১৭৬৭ শকের ১৩ কার্ত্তিক [২৮ অক্টোবর ১৮৪৫] দিবসে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার সেই অবলম্বিত ধর্ম্ম-মত প্রচারের জন্য—

সাধক-মণ্ডলীর ঈশ্বরপ্রেম উদ্দীপ্ত করণার্থ আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কালে কয়েক বার বক্তৃতা করিয়াছিলেন।...পরে বিদ্যা-শিক্ষা ও বিষয়-কার্য্যের ব্যস্ততা প্রযুক্ত অনবকাশ নিবন্ধন শ্যামাচরণবাবু আর নিয়মিতরূপে আদি-ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি আদি-সমাজের মত ও বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন।...

তাঁহার 'ওঁকার' ও 'গায়ত্রীর' উপরে বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। তিনি বলিতেন 'এক গায়ত্রীতেই সাধকের আত্মোন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় নিহিত আছে।' 'অর্থ-সহ ত্রিপাদ-গায়ত্রী উচ্চারণেই সাধকের উপাসনার গূঢ় তাৎপর্য্য সংসাধিত হইতে পারে।' তিনি স্বয়ংও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই ওঁকার ও গায়ত্রীবাক্য অবলম্বন করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যানধারণা করিতে করিতেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।"—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়: 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', পৃ. ৩৫-৩৭।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত শ্যামাচরণের যোগের কথা 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিতে' এইরূপ উল্লেখ আছে:—

"...প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি,...ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্র বাবুকে এক পত্র লিখি।...দেবেন্দ্র বাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য লইতে প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন। আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তখন তাঁহার প্রধান সঙ্গী। দুর্গাচরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ্ তরজমা করেন এবং শ্যামাচরণ বাবু বক্তৃতা করেন। শ্যামাচরণ বাবু যে দিন সমাজে বক্তৃতা

করিতেন, সে দিন লোকে লোকারণ্য হইত। অসংখ্য যুবকের আগমন হইত। তাঁহার বক্তৃতার কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। "ধর্ম্মযুদ্ধে অধর্ম্ম-বিরুদ্ধে সাজ রে সাজ, কি ভয়, কি সংশয়, যতো ধর্ম্মস্ততো জয়, সাজ রে সাজ।" তিনি অবশ্য গদ্যে বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত তাঁহার বক্তৃতার অংশ দিব্য ছন্দের আকারে নেওয়া যাইতে পারে।

"ধর্ম্মযুদ্ধে অধর্ম্মবিরুদ্ধে সাজ রে সাজ।
কি ভয়, কি সংশয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়।
সাজ রে সাজ।"

তিনি একবার কোথায় বলিবেন, সংসারকে অসার জ্ঞান কর, "ওঁকারকে গলার হার কর," তাহা না বলিয়া বলিয়াছিলেন,"সংসারকে সার কর, ওঁকারকে গলার হার কর।" তিনি গ্রীক জানিতেন। এমন খ্যাত ভাষা নাই, যাহা তিনি জানিতেন না। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রীক বক্তা ডিমস্‌থিনিস্‌কে অনুকরণ করিতে ভালবাসিতেন। এথেনস্‌-নগরবাসী লোকেরা পূর্ব্ব গৌরব এতদূর হারাইয়াছিল যে,মেসিডনের রাজা ফিলিপ সৈন্য লইয়া ঐ নগর আক্রমণার্থ প্রায় সহরের ফটকের নিকট আসিয়াছিলেন, এমন সময়ে ডিমস্‌থিনিস্‌, দেশ শাসনার্থ সাধারণতন্ত্রের যে সভা হইত, তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার বক্তৃতা এই বাক্য দ্বারা আরম্ভ করিয়াছিলেন,"Ye Athenian women! no longer Athenian men!" "হে এথেনস্‌বাসী স্ত্রীগণ, আর তোমরা পুরুষ নহ।" শ্যামাচরণ বাবুও একদিন কোন সভাতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "হে বঙ্গবাসী স্ত্রীগণ! আর তোমরা পুরুষ নহ।"—পৃ. ৪৬-৪৮।

মৃত্যু

১৪ জুলাই ১৮৮২ (৩০ ভাদ্র ১২৮৯) প্রত্যুষে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র দীননাথকে রাখিয়া ৬৭ বৎসর ৫ মাস ২২ দিন

বয়সে শ্যামাচরণ পরলোক গমন করেন। তাঁহার চরিতকার সত্যই লিখিয়াছেন :—

"দীন-হীন বঙ্গবাসীর মধ্যে যদি কেহ একাধারে প্রধানতম মৌলবী, মুফ্‌তি, কাজী প্রভৃতির অসদৃশ গুণ, বিষয়ীর বিষয়-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা, কর্ম্মিষ্ঠের অসামান্য কার্য্য-নিপুণতা, দেশীয় বিদেশীয় বহুবিধ ভাষায় অভিজ্ঞতা, হিন্দু মুসলমান জাতির প্রাচীন ও নব্য স্মৃতিশাস্ত্র সকলে অনুপম দক্ষতা, এতদ্দেশীয় রাজ-বিধি সমূহে সমধিক পারদর্শিতা এবং নিষ্কাম দান-ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে সবিশেষ পটুতা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি একবার শ্যামাচরণ বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তিনি যেমন স্বীয় যত্ন চেষ্টার বলে—আপনার শিক্ষা-প্রভাবে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বিদ্যা ও বহুজ্ঞতার দ্বারা পণ্ডিত-সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"—বেচারাম চট্টোপাধ্যায় : 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', পৃ. ৪৪-৪৫।

গ্রন্থাবলী

শ্যামাচরণ যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। *Introduction to the Bengalee Language*, adapted to Students who know English. In two Parts. By a Native. 1850. P. 409

ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই ব্যাকরণখানির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

The work contains a Grammar not only of the Bengallee but of those words of the Sanskrit and other languages already in use, and capable of being used in Bengallee, with copious Notes explanatory of idiomatic niceties and the proper application of words. And this I have attempted to make as useful as possible to the Europeans as well as to the Native student who knows English. After completing the Grammar I found, by the experience I had had in teaching the language to foreigners, that there were some other important matters, which, if written, would be of very great use to such learners; and I therefore wrote an additional work, which together with the Grammar forms an introduction to the Bengallee language. The foreign student will derive from the perusal of the additional work much useful information regarding the peculiar significations of verbs, when used in certain idiomatic forms: he will find in it the terms used to express the different degrees of consanguinity and affinity; rules for contractions, and directions for familiar idiomatic conversations; easy and familiar sentences; a day's routine conversations; dialogue on various useful subjects; details of castes, orders, and titles of the Hindoos; some notice of their manners and customs; some select sentences and anecdotes; directions for epistolary composition, with examples; tables of Native coins, weights, measures, &c.; abbreviations of certain words used in writing; and directions for reading handwriting of different kinds.

এই ব্যাকরণখানি বিশেষ উপযোগী হওয়ায় গবর্মেণ্ট ইহার ১০০ খণ্ড লইয়া শ্যামাচরণকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন।

২। বাঙ্গলা ব্যাকরণ। ১২৫৯ সাল। পৃ. ২৬৯।

শিক্ষা-সংসদের অধ্যক্ষ ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের অনুরোধে, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ তাঁহার ইংরেজী ব্যাকরণখানি পরিবর্ত্তিত আকারে বাংলায় প্রকাশ করেন। 'বাঙ্গলা ব্যাকরণে'র ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"অনেকে বিবেচনা করেন বাঙ্গলা ভাষা এমত সমৃদ্ধা নয় যে তাহাতে নানা দেশীয় শাস্ত্রসমূহ অনুবাদ করা যাইতে পারে। এ তাঁহাদের ভ্রম। কিন্তু যদ্যপি বঙ্গভাষাকে ক্ষুদ্র বলিয়াই মানা যায়, তথাপি কি ইহা প্রবৃদ্ধা হইতে পারে না?—যৎকালে ইংরাজদের ভাষা অতি ক্ষুদ্র ও অনেক বিষয়ে অকর্ম্মণ্য ছিল, তখন যদি তাঁহারা এইরূপ বিবেচনায় ভরসাহীন হইতেন, তবে কি তাঁহাদের ভাষা এমত প্রবৃদ্ধা ও তাহাতে লক্ষাতীত গ্রন্থ লিখিত হইতে পারিত? না তাহাতে নানা দেশীয় এত শাস্ত্রের অনুবাদ ও প্রচার হইয়া তদ্দেশে এত বিদ্যাবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইত? কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাকে তাঁহারা যেমত অকর্ম্মণ্য বোধ করেন তাহা তেমত নয়, এবং ইংরাজদের আদি ভাষাবৎ ক্ষুদ্রও নয়? ইহাতে যে কোন অভিপ্রায় যথাযোগ্য-রূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; দুই বা অধিক পদ যেমত সংস্কৃতে তেমনি বাঙ্গলাতে সন্ধি সমাসদ্বারা সংযুক্ত করা যাইতে পারে, এবং যে কোন শাস্ত্রীয় পদ-বিশেষ যথার্থতঃ অনুবাদ করা যাইতে পারে*। বাঙ্গলার ন্যায় রচনাসুগমতা ইউরোপীয় অতি অল্প ভাষায় আছে। অধিকন্তু, সংস্কৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক, ও সমুচ্চয়ার্থকাদি শব্দ বাঙ্গলায় বিস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং প্রায় তাবতই চলিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন বহুকাল পর্য্যন্ত এদেশ মুসলমানদের অধীন থাকাতে, আর অধুনা ইহা ইংরাজ-রাজ্য ও ইহাতে নানা দেশীয় লোকের আগমন হওয়াতে তত্তদ্ভাষার অনেক কথা বাঙ্গলায়

* ইহা পাদরি কেরি সাহেব প্রভৃতি মহাশয়গণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

চলিত হইয়া বঙ্গভাষা আরো অধিক সমৃদ্ধিমতী হইয়াছে ও হইতেছে। এতাবতা, আমাদের ভাষা ক্ষুদ্র নয়, কেবল ইহাতে পুস্তক অল্প, বিশেষতঃ শাস্ত্রবোধক হিতোপদেশক গ্রন্থ অতি অল্প, কিন্তু সে দোষ আমাদের, আমাদের ভাষার নয়। অতএব এক্ষণে আমাদের যে অবস্থা তাহাতে পূর্ব্বাবস্থ ইংরাজদের মত বিবিধ উপকারক শাস্ত্রবোধক ও বুদ্ধিবর্দ্ধক গ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রস্তুত করিয়া তদুপদেশদ্বারা সাধারণের মনকে বিজ্ঞানরূপ কিরণে প্রদীপ্ত ও অবিদ্যাজন্য দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ কর্ম্ম। কিন্তু বাঙ্গলা উত্তমরূপে ও শুদ্ধরূপে না জানিলে কিরূপে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে? এবং বাঙ্গলা ব্যাকরণ না জানিলেই বা কিরূপে শুদ্ধরূপে বাঙ্গলা জানা যাইতে পারে। এতাবতা, অগ্রে একখান ব্যাকরণ রচনা অত্যাবশ্যক। কারণ ব্যাকরণ সকলের মূল, ব্যাকরণ জ্ঞান বিনা যিনি যাহা লিখুন, সে অশুদ্ধ ও অসিদ্ধ। পরন্তু ঐ ব্যাকরণ শুদ্ধবাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত কএকটি কথার হইলে মহামহোপাধ্যায় ৺রাজা রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই এক প্রকার কর্ম্ম চলিতে পারিত; কিন্তু যেহেতু বাঙ্গলার অধিকাংশ সংস্কৃত, এবং হিন্দী, পারসী, ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দ ইহাতে এমত চলিত যে এক্ষণে তত্তৎপদবোধ্য অভিপ্রায় বাঙ্গলাপদদ্বারা প্রকাশ করিতে গেলে সে একরূপ অদ্ভুত বাঙ্গলা শুনায়, সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যও হয় না; অপিচ সকল শব্দের প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না, তবে অন্য ভাষা হইতে গৃহীত ও ব্যবহৃত শব্দসকল কিরূপে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ বাঙ্গলা হইতে সংস্কৃত শব্দসমূহ তুলিয়া লইলে, লাতিন ও গ্রীক শব্দহীন হইলে ইংরাজীর যে দশা, বাঙ্গলার ততোধিক দুর্দ্দশা হইবে। কিন্তু ঐ সকল শব্দ ত্যাগ করার আবশ্যকতাই বা কি? যেহেতু ভাষা কেবল অভিপ্রায় প্রকাশের

নিমিত্তে বই নয় ; অতএব যে শব্দ ব্যবহারে ঐ অভিপ্রায় উত্তমরূপ প্রকাশ পায় তাহাই ব্যবহার্য্য। এবং যে কালে যে ভাষা যদবস্থ তৎকালে তদবস্থ সেই ভাষা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম প্রদর্শন ব্যাকরণের অভিধেয়। ঐ ভাষার সাধু অসাধু* শব্দ বিবেচনা পূর্ব্বক অসাধুত্যাগে সাধু শব্দ কএকটীমাত্র বিষয়ক সূত্র রচনা ব্যাকরণের কার্য্য নয়, এবং তেমত ব্যাকরণে অতি অল্প কার্য্য হয়। এতাবতা, অধুনা বাঙ্গলায় যত ভাষার যত কথা প্রচলিত আছে, বাঙ্গলা সম্বলিত তৎসমুদয় কথা শুদ্ধরূপে ব্যবহার নিমিত্ত একখানি ব্যাকরণ অত্যাবশ্যক। অপর যে কএক খানি ব্যাকরণ এক্ষণে বর্ত্তমান, তাহাতে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত সমুদয় কথা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম অপ্রাপ্য ; এবং মধ্যে ২ ভ্রমও দ্রষ্টব্য ; বিশেষতঃ বিজাতীয় মহাশয়েরা যে দুই একখানি লিখিয়াছেন, তাহাতে বিজাতীয় প্রমাদ হইয়াছে। ঐ প্রমাদে বিরক্ত বঙ্গভাষানুরক্ত কতিপয় মহাশয় প্রথমতঃ সাহেবদিগের পাঠের নিমিত্তে ইংরাজিতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন, তাহা প্রণীত হইলে শিক্ষা-সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা ঐ পুস্তককে ইংরাজী পাঠক বঙ্গবালকেরও উপযোগি জানিয়া গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়সকলে পাঠ্য করেন। পরন্তু তৎ-পুস্তকস্থ সূত্রাদির ব্যাখ্যা ইংরাজিতে থাকাতে এবং ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গলার অধ্যাপকেরা তাহা বুঝাইবার অক্ষমতা প্রকাশ করাতে উক্ত সমাজপতি (অধুনা) মৃত মহামতি মহোদয় শুদ্ধ বাঙ্গলায় ব্যাকরণ রচনার্থ অনুরোধ করেন,—যদনুসারে এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইল। ইহাতে বাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত পদমাত্রের এবং বাঙ্গলা

---

* ইংরাজী ও পারসী পাঠকেরা তত্তদ্ভাষার শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহার করেন, পণ্ডিত মহাশয়েরা তদ্রূপ বাঙ্গলাকে অসাধুবাদে সংস্কৃত শব্দ বা পদপূর্ণ বাঙ্গলা বাক্যকে সাধু ভাষা কহেন।

ভাষায় ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য্য সংস্কৃত শব্দের ও পদের শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম অথচ বাঙ্গলায় চলিত অপর ভাষার শব্দসমূহ ব্যবহারের সঙ্কেত প্রাপ্য। আর২ বাঙ্গলা ব্যাকরণে যে সকল ভ্রম ও আবশ্যক বিষয়ের অভাব, বোধ করি ইহাতে সে অভাবের অভাব। সঙ্ক্ষেপতঃ, বর্ত্তমানাবস্থ বাঙ্গালিদের বিশেষ উপকারি হইবে এই বাঞ্ছায় এই পুস্তক প্রস্তুত করিলাম।

শ্যামাচরণের 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষে অতি উপাদেয় হইয়াছিল। ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমি ১২৬৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ইহার "তৃতীয় বার সংশোধিত ও মুদ্রিত" সংস্করণও দেখিয়াছি। তবুও বলিতে হইবে, এইরূপ উপাদেয় গ্রন্থের আশানুরূপ প্রচার হয় নাই। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"শ্যামাচরণ বাবু খাঁটি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল; কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণ বাবু মাথা তুলিতে পারিলেন না।···কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিনের জন্য হারাইল।"—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫১।

৩। **ব্যবস্থা-দর্পণ**, ১ম-২য় খণ্ড। ১২৬৬ সাল। পৃ. ১১৮০।

"বঙ্গদেশীয় মতানুমত দায় ও দত্তাপ্রদানিক প্রভৃতি ব্যবস্থার বিষয়ক প্রামাণিক প্রমাণ ও টীকাদিযুক্ত ব্যবস্থা সংগ্রহ বিচারালয়ে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থাচয় এবঞ্চ সদরে সুপ্রীমকোর্টে ও প্রিবিকৌন্‌সিলে নিষ্পন্ন নিষ্পত্তিপত্র সম্বলিত"। বাংলা-সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় রচিত হিন্দু দায়াধিকার ব্যবস্থাবিষয়ক এই গ্রন্থখানি শ্যামাচরণের অক্ষয় কীর্ত্তি।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি জন্ পি. নর্ম্যানের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Besides a Bengally Grammar and collection of rules on the Mahomedan Law of Inheritance he has published the *Vyavastha Darpana* a Digest of the Hindu Law as current in Bengal.

This is an exceedingly useful work. It is constantly referred to by judges and frequently cited in Courts: It has been adopted as a text book for the examination of pleaders of the higher grade Opinions of text-writers and decisions of the Courts, the correctness of which the Babu has seen reason to doubt, he has criticised, and in several instances, to which I could point, the Babu s views have been adopted by the High Court, and recognized as law.

৪। *The Muhammadan Law*: being a digest of the Law applicable especially to the Sunnis of India. Calcutta 1873, pp. 567, ***Tagore Law Lectures, 1873.***

৫। *The Mahammadan Law*: being a digest of the Sunni Code in part and of the Imamiyah Code. Calcutta 1875, ***Tagore Law Lectures, 1874.***

জীবনীতে (পৃ. ২৯) শ্যামাচরণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে; উহা—"মেকনাটন ও এল্‌বার্‌লিং সাহেব কৃত মহম্মদীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংগ্রহের উপরে তাঁহার টীকা টিপ্পনী ও স্বাভিপ্রায় সম্বলিত নূতন সংস্করণ 'সিরাজিয়া' নামক গ্রন্থ।" এই গ্রন্থ আমরা দেখি নাই, তবে শ্যামাচরণ-প্রদত্ত প্রথম ল-লেক্‌চরের ভূমিকায় তাঁহার প্রকাশিত অপর একখানি পুস্তকের উল্লেখ পাইয়াছি। সার্ উইলিয়ম জোন্‌স 'সিরাজিয়া'র পূর্ণ অনুবাদ ও 'সিরাজিয়া'র টীকা 'শরীফিয়া'র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়া অনুবাদ দুইটি পৃথক্‌রূপে প্রকাশ করেন। শ্যামাচরণ জোন্‌সের এই দুই অনুবাদ একত্রে মুদ্রিত করেন; ইহাতে মূলের প্রত্যেক অংশের অনুবাদের নীচে তৎসম্পর্কীয় টীকার

অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে জোন্সের পুস্তকদ্বয়ের পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

৬। *Vyavastha Chandrika*, a digest of Hindu Law as current in all the provinces of India, except Bengal Proper. Vol. I, 1878; Vol.II, 1880.

ইহার দুই খণ্ডই ইংরেজীতে লিখিত। প্রথম খণ্ডটি মুদ্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সংস্কৃত ও উর্দু ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা ইংরেজী সংস্করণের ১ম খণ্ডের Preface, p. li হইতে জানা যায়।

৭। **'পাঠ্যসার'**। ৯ই আগষ্ট ১৮৮১। পৃ. ২০।

৮। **'নীতি-দর্পন'**। ১১ই জুন ১৮৮২। পৃ. ৮০।

শ্যামাচরণের জীবনীকার এই দুইখানি পুস্তক-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"তাঁহার শেষ-জীবনে গবর্ণমেণ্ট মনোনীত বুক্ কমিটীর জনৈক মেম্বর ডাক্তার কানাইলাল দে রায় বাহাদুর মহাশয়ের অনুরোধে বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য দুইখানি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-ভাব ও নীতি-জ্ঞান-পূর্ণ ঈশ্বর-প্রেমাভিষিক্ত পদ্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।" (পৃ. ৩২)।

* * *

শ্যামাচরণের পাণ্ডিত্যের সাহায্য পাইয়া অনেকে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা স্মৃতি-অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি তাঁহার সাহায্যে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে "দ্রাবিড় দেশীয় শ্রীদেবানন্দ ভট্ট প্রণীত 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' দায়ভাগ প্রকরণ" প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়ে' "কোন কোন অংশ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেখিয়া" দিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র মিত্র

১৮১৪—১৮৭৪

রামচন্দ্র মিত্রের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির বাংলাভাষার শিক্ষাগুরু ছিলেন, ইহা আমাদের অবিদিত নহে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কলিকাতার হিন্দু-কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গবর্মেণ্ট হাউসে হিন্দু-কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাঁহাকে ইংরেজী কাব্য হইতে আবৃত্তি করিতে দেখি।*

কর্ম্ম জীবন

হিন্দু-কলেজে অধ্যাপনা

রামচন্দ্র যে-কলেজে শিক্ষালাভ করেন, সেই কলেজেরই শিক্ষক-রূপে তিনি প্রথমে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষকতা করিয়াই তিনি জীবন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট হইতে রামচন্দ্র মিত্র হিন্দু কলেজে কখন কোন্ পদে কার্য্য করেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সং), পৃ. ৩৪।

১ মার্চ	১৮৩০ ...	শিক্ষক,	জুনিয়র স্কুল—হিন্দু-কলেজ				
	১৮৩৬ ...	শিক্ষক,	„	„	„	৭৫৲
এপ্রিল	১৮৪২ ... ২য়	„	„	„	„	১২৫৲
এপ্রিল	১৮৪৪ ... ৪র্থ	„	সিনিয়র বিভাগ		„	
ডিসেম্বর	১৮৪৭ ... ৩য়	„ (অস্থায়ী)	„	„	„	
২১ জুলাই	১৮৪৮ ... বাংলা-সাহিত্যের শিক্ষক „		„		„	২০০৲

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হিন্দু-কলেজ উঠিয়া গিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু-স্কুল—এই দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। হিন্দু-স্কুল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধীন থাকে। রামচন্দ্র এই সময় ২০০৲ বেতনে হিন্দু-স্কুলের সিনিয়র বিভাগের Teacher of Tranalation ছিলেন। ইহার অল্প দিন পরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক হন।

কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুদক্ষ অধ্যাপক-রূপে রামচন্দ্রের সুনাম ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ক্লিণ্ট (L. Clint) তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন :—

> This class [the First year Bengali] is instructed by Baboo Ram Chunder Mitter, who has always shown the greatest alacrity in taking the class of any Professor or Assistant Professor who might be absent, and whose steady, efficient, and punctual discharge of his own duties deserves particular mention.*

রামচন্দ্রের শিক্ষা-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতুকাবহ গল্প সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাইপ্রবাস' পুস্তকে (পৃ. ৫৪-৫৬) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

---

* Report of the Director of Public Instruction for the year 1856-57 p. 181*n*.

স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় রামচন্দ্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ছয় মাসের ছুটি লইয়াছিলেন ; তাঁহার স্থলে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্থায়িভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ('ক্যালকাটা গেজেট,' ৬ মার্চ ১৮৬০ দ্রষ্টব্য)। ইহার পর রামচন্দ্র আর বেশী দিন অধ্যাপনা করেন নাই। ৩৩ বৎসর অধ্যাপনার পর, তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১০ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> "বিবিধ সংবাদ।—২০এ কার্ত্তিক বুধবার।...প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক বাবু রামচন্দ্র মিত্র পেন্সন লইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ৩৩ বৎসর তাঁহার কর্ম্ম করা হইয়াছে।...(২৫ কার্ত্তিক ১২৬৯)

বীটন-সোসাইটির সম্পাদক

বীটন নারী-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে এফ. জে. ময়েট (F. J. Mouat) সাহেব কয়েকজন ইউরোপীয় ও এদেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহায়তায় কলিকাতায় বীটন-সোসাইটি নামে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল :—"the consideration and discussion of questions connected with Literature and Science."

বীটন-সোসাইটির সদস্যদের মধ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামচন্দ্র মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিকলাল সেন, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল

হইতেই রামচন্দ্র বীটন-সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি এই পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বীটন-সোসাইটির ১৫ মার্চ ১৮৬০ তারিখের অধিবেশনে সভাপতি রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডফ্ রামচন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

...tbe President rose to express his deep sorrow and regret at the cause of the absence of their Honorary Secretary, Babu Ram Chandra Mittra. For some time past he had been suffering from various ailments which had beon superinduced by hard and unceasing labour. At length he was constrained to ask for and obtatn six months' leave of absenee from his professional office in the Presidency College. He (the President) could not allow the occasion to pass without expressing, however feebly and inadequately, his own sense of the Babu's great merits and important services to that Society. as its Honorary Secretary. Persons ignorant of its duties might reckon the office of Secretary a mere sinecure. He had now from his position as President, good reason to know the contrary. It was an office which made heavy demands on the time, attention and patienee of the Secretary ; and involved duties the right discharge of which, required special tact and aptitude. His friend, Babu Ramchandra, whom he had known for nearly thirty years, was possessed of the needful qualifications in a high degree. Distinuished by superior talent and scholarship, he endeared himself to all by his bland and amiable manners. Gentle and unaffected in his address, he was yet remarkable for his keen discernment of character, and unfailing stock of masculine good sense and good feeling. When differences of opinion arose, and explanations had to be given, he was the man fitted for the task. He proved himself preeminently a peacemaker. To the promotion of the best interests of the Society he was devoted in no ordinary degree. When others had forsaken, or had threatened to forsake it, he clung to it with more resolute tenacity. In expressing, therefore, their sympathy with him in

his affliction, he (the President) proposed that they should record their strong sense of the valuable, untiring, and indefatigable services he had rendered to the Society...The President then announced that pending the absence of Babu Ram Chandra, a friend and relative of his, * and a long tried and faithful member of the Society. Babu Koylas Chandra Bose had agreed to act as Secretary...†

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র মিত্র কলিকাতার এক জন জষ্টিস অব দি পীস‡ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো'§ নির্ব্বাচিত হন।

মৃত্যু

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে, ৬০ বৎসর বয়সে রামচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে চুঁচুড়ার 'সাধারণী' লিখিয়াছিলেন :—

"প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ইনি ১৮১৪ সালে জন্মপরিগ্রহ করেন এবং অদ্য অষ্টাহ হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অনেক সাহেব

* কৈলাসচন্দ্র বসু দেওয়ান ভবানীচরণ বসুর প্রপৌত্র এবং হরলাল বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৈলাসচন্দ্রের ভগিনীর সহিত রামচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল।

† The Proceedings of the Bethune Society, for the Sessions of 1859-60, 1860-61. Pp. *12-13*.

‡ *The Hindoo Patriot* for 18 Jany. 1864.

§ *Ibid.*, 11 April 1864.

শুভ ইহাকে ভাল বাসিত। ইনি পদ্মাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কালেজে শিক্ষকতা কার্য্যে অনেক দিন নিযুক্ত থাকিয়া, এক্ষণে পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো ছিলেন, এবং রাজধানীর একজন জষ্টিস অব দি পীস ছিলেন।”—‘সাধারণী’, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪।

২১ মার্চ ১৮৭৪ তারিখে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উপলক্ষে ভাইস-চ্যান্সেলার ই. সি. বেলী রামচন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Ram Chandra Mitra, too, has passed away ; he deserves a tribute of respect as a veteran champion of education, whose services were rendered at a time when there were few to fight, and when the struggle was hard to maintain, and because his personal high character lent force to his exertions.

রচনাবলী

রামচন্দ্রের লিখিত দুইখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

১। A Speech delivered at the opening of the Hindu College Pathshala by Ramchandra Vidyabagish. With an English Translation. January 1840.

এই পুস্তকের বাংলা অংশ—‘হিন্দু কালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা’ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের রচনা। তিনি ইংরেজী জানিতেন না; বক্তৃতাটির ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন—রামচন্দ্র মিত্র। এই

ইংরেজী অনুবাদের কিয়দংশ আমি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূজা-সংখ্যা *Hindusthan Standard* পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি।

২। **মনোরম্য পাঠ,** ১ম ভাগ। অক্টোবর ১৮৫৫। পৃ. ১১৪।

ইহা "গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ"-এর অন্তর্ভুক্ত। পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও ইহা যে রামচন্দ্রেরই রচিত, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।*

'মনোরম্য পাঠে'র "ভূমিকা"টি এইরূপ :—

"বর্ণাকুল্যার লিটরেচর্ সোসাইটির আদেশানুসারে "পর্লি এনেক্‌-ডোট্‌স" নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থের সারসংগ্রহপূর্ব্বক অনুবাদিত হইয়া এই মনোরম্য পাঠের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহাত্মাদিগের জীবনচরিত, পুরাবৃত্ত, শিল্প, সাহিত্য, পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিবিদ্যা:ত্মক ঐশিকনিয়ম প্রভাবিত নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ মনোহর পাঠ সকল নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থি বালকবৃন্দের সহজেই জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা; কেন না, তাহারা এই এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে অনায়াসে বিশ্ববিধানকর্ত্তা পরম বিধাতার এই সুকৌশল-সম্পন্ন বিশাল সংসারের অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবে।

অনেকে বিদ্যালয় মধ্যে অবাস্তবিক অদ্ভুত গল্প পাঠনাই মনোনীত করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বকাণ্ড সম্বন্ধীয় প্রকৃত বিষয়ের পাঠনাই তদপেক্ষা বিশেষ শুভদায়িনী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদিও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমুদায় ঐশিককাণ্ড বর্ণিত হইবার সম্ভাবনা নাই

---

*Catalogue of Bengali Books for Schools, Vernacular Medical Classes, Normal Schools, etc. (1875), pp. vi, 6.

বটে ; তথাপি এতদ্দ্বারা বিদ্যার্থি বালকবর্গের জ্ঞানলাভের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার সাধন হইলেই, সমুদায় শ্রম সকল বোধ করিয়া কৃতার্থ হইব। ...বাঙ্গলা ভাষার অনুরোধে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ বাহুল্য ও সংক্ষেপ করা গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূলভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। আর ইহাতে তুচ্ছ শব্দচাতুরী ও অনুপ্রাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করা যায় নাই। কলিকাতা অক্টোবর ১৮৫৫।

* * * *

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র বঙ্গাক্ষরে ইউরোপের মানচিত্র প্রকাশ করেন।*

আরও দুইখানি পুস্তকের উল্লেখ পাইতেছি, যাহা রামচন্দ্র মিত্রের রচিত হওয়া বিচিত্র নহে। পুস্তক দুইখানি,—

(১) **পাঠামৃত**। ইহা রামচন্দ্র মিত্রের রচিত বলিয়া উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় উল্লেখ আছে। কিন্তু পুস্তকখানি এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

(২) *An easy primer of the English language particularly adapted to assit Indian youth in learning the English tongue.* Compiled by Ramchundru Mittru (12 Shibnarain Das's Lane, Simla), 7th edn.

---

*"...a map of Europe in the Bengali character has been prepared by Babu Ram Chunder Mittre, the Bengali master of the Senior School department of the Hindu College. It is well executed on the scale of the Irish School Society's maps, and has been lithographed at the Government Press."—General Report on Public Instruction,...From 1st October, 1849, to 30th Sept. 1850, p. 25.

২২ ডিসেম্বর ১৮৬৯ তারিখে এই পুস্তকের ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় বলিয়া বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় উল্লেখ আছে।

সাময়িক-পত্র পরিচালন

রামচন্দ্র অনেকগুলি সাময়িক-পত্র কৃতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্রে' প্রদত্ত হইয়াছে; এখানে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইল।

'পশ্বাবলি'

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি 'পশ্বাবলী' নামে একখানি বাংলা মাসিক-পুস্তকের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। ইহা সঙ্কলন করেন—পাদরি লসন্ এবং বঙ্গানুবাদ করেন—ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স। ১৮২৭ (?) খ্রীষ্টাব্দে লসনের মৃত্যু হওয়ায় 'পশ্বাবলী' ছয় সংখ্যার বেশী প্রকাশিত হয় নাই।

রামচন্দ্র মিত্র দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলি' পরিচালন করেন। ইহা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা—'কুক্কুরের বৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রত্যেক সংখ্যায় আলোচ্য জন্তুর এক-একখানি চিত্র থাকিত। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির দশম কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> The *Natural History*...is now taken up by RAM CHUNDER MITR, who was formerly a scholar, but is now a teacher, in the Hindoo College; and who appears likely to carry it forward with vigour and success. He

has furnished the *History of the Dog*, enlivened with a great number of interesting anecdotes, each arranged under the species of the animal of which he is treating. ...The Tenth Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Fifteenth and Sixteenth Years, 1832-1833. Pp. 10-11.

রামচন্দ্র মিত্র 'পশ্বাবলি' সর্ব্বসমেত ১৬ সংখ্যা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন,* কিন্তু এগুলি যথাসময়ে বাহির হয় নাই।

'জ্ঞানান্বেষণ'

'জ্ঞানান্বেষণ' ইংরেজী-শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র ছিল। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮ জুন ১৮৩১ তারিখে। ইহা প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হইত। রামচন্দ্র কিছু দিন 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালন করিয়াছিলেন। ২৪ নবেম্বর ১৮৩৯ তারিখে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত রামগোপাল ঘোষের একখানি পত্রে প্রকাশ :—

I should mention to you before I conclude that at a meeting of a few select friends lately held in my house at

* Anglo Bengali...

Animal Biography, Vol. I in 8 numbers ; viz.

No. 1. The Dog ; 2. The Horse ; 3. The Ass ; 4. The Ox ; 5. The Buffalo ; 6. The Sheep ; 7. The Goat ; 8. The Camel ;—Vol. II. in 8 numbers ; viz.

No. 1. The Wolf ; 2. The Leopard ; 3. The Monkey ; 4. The Beaver ; 5. The Seal ; 6. The Bat ; 7. The Hare ; 8, The Rat ;...

—The Twenty-first Report...Account of Stock of the Calcutta School-Book Society Jany. 1st. 1860.

> the request of Babu Ram Chunder Mitter, and Horo Mohun Chatterjee the present conductors of the Gyananashun, to take into consideration different points connected with the management of that paper...

'জ্ঞানোদয়'

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রামচন্দ্র 'জ্ঞানোদয়' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যা হস্তগত হইবার পর, ১০ মার্চ ১৮৩২ তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> "শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয় নামক বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ঐ মহাশয়েরদের এ অতি প্রশংসনীয় কর্ম্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদৃষ্টে আমারদের অত্যন্তাহ্লাদ।"

'জ্ঞানোদয়" বালকদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রধানতঃ নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল-বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। 'জ্ঞানোদয়' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই; ইহার ১০ম সংখ্যার তারিখ—"মার্চ ১৮৩৩ শাল।"

'পক্ষির বিবরণ'

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির সাহায্যে "পক্ষির বিবরণ। Ornithology. No. I." বাহির করেন। ইহার মূল্য ছিল দশ পয়সা। ইহাতে সাধারণভাবে কতকগুলি পাখীর কথা বলা হইয়াছে।

'পক্ষির বিবরণে'র অন্যান্য খণ্ডও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রামচন্দ্রের ছিল ; তিনি প্রথম সংখ্যার ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন :—"ভারতবর্ষীয় পক্ষীর বৃত্তান্ত পরে লিখিব।" কিন্তু 'পক্ষির বিবরণে'র প্রথম সংখ্যা ছাড়া আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৭

নীলমণি বসাক
হরচন্দ্র ঘোষ

নীলমণি বসাক
হরচন্দ্র ঘোষ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৫০
দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫০
তৃতীয় সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫১

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

নীলমণি বসাক

১৮০৮ ?—১৮৬৪

বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের বাংলা গদ্য-সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া আমরা সাধারণতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের নাম করি। সে সময় আরও অনেক কৃতী লেখক বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হওয়া উচিত। ইঁহাদের মধ্যে নীলমণি বসাকের গদ্য এখনও পুরাতন হয় নাই। তাঁহার রচনা সরল, সুললিত ও সুমার্জ্জিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার "বাঙ্গালার সাহিত্য" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

> "পরিবর্ত্তনসময়ের আর একজন প্রধান লেখক নীলমণি বসাক; ইহার পুস্তকাবলী অদ্যাপি লোকে পাঠ করিয়া থাকে, ইনি সরল গদ্যের জন্মদাতা; যখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না, সেই সময় নীলমণি বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া খাঁটি বাঙ্গালায় কতদূর ভাব-প্রকাশক্ষমতা আছে, তাহা লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার নবনারী আজিও বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ।"—'বঙ্গদর্শন,' ফাল্গুন ১২৮৭, পৃ. ৪৯৮।

বাল্য ও ছাত্র-জীবন

অনুমান ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তন্তুবায়-কুলে নীলমণি বসাক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজচন্দ্র বসাক। সে যুগে কলিকাতার

শেঠ-বসাকেরা যথেষ্ট সম্পন্ন ছিলেন। নীলমণিকে কিন্তু বাল্যে ও কৈশোরে দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইতে হয়। তাঁহাদের বাড়ী ছিল—রামবাগান উমেশ দত্তের লেনে। সেই বাড়ী পিতার দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। পরে তিনি তাঁহাদের পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া যান এবং সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। রাজচন্দ্রের দুই পুত্র—নীলমণি ও কমলাকান্ত। কথিত আছে, বালক নীলমণি ডেবিড হেয়ারের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহা হইতে অনুমান হয়, নীলমণি পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। প্রধানতঃ হিন্দু-কলেজের ছাত্রবৃন্দ—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ কলিকাতায় যে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়, নীলমণি বসাক তাহার অন্যতম সভ্য ছিলেন।

চাকুরী-জীবন

হেয়ারের চেষ্টায় নীলমণি হুগলী কোর্টে অল্প বেতনের কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিনি নিজের কর্ম্মদক্ষতা এবং প্রতিভাবলে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়া গেজেটেড অফিসর হইয়াছিলেন। চাকুরী ব্যপদেশে তিনি বহু দিন যাবৎ রাজসাহীতে অবস্থান করেন। রাজসাহী হইতে তিনি বর্দ্ধমানে বদলি হন। বর্দ্ধমানে নীলমণি কমিশনরের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টেণ্ট ছিলেন। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন-লিখিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিতে পাই :—

"যৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত খোলা হয়,

তৎকালে একদিন পিতৃদেব আমাকে ও আমার মধ্যম সহোদরকে সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমান দেখিতে যান। তথায় যাইয়া তাঁহার পরমাত্মীয় বন্ধু নীলমণি বসাক মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন। নীলমণি বাবু তখন কালেক্টর সাহেবের হেডক্লার্ক ছিলেন। তাঁহার বাড়ীটী রাণীসায়রের ধারে ছিল। তিনি পিতৃদেবকে পাইয়া এতদূর আনন্দিত হন, যে, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সহরের সর্ব্বত্র দেখাইয়া বেড়াইলেন।"—হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন: '৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন-চরিত,' পৃ. ৪৭।

মৃত্যু

বর্দ্ধমানের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া, ৬ আগস্ট ১৮৬৪ তারিখে নীলমণি বসাক লোকান্তর গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আনুমানিক ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে পরবর্ত্তী ১৩ই আগস্ট (শনিবার) কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

We regret to have to record the death of Baboo Nilmoney Bysack, Assistant to the Commissioner of Burdwan, which melancholy event took place on the night of Saturday last....He published several works, among which the *Nobonaree* ranks as his best performance....It has been accepted as a standard work, in fact the best of its kind and will hand down the author's name to posterity. Baboo Nilmoney's translation of the Persian tales and the first volume of the Arabian Nights evince great graphic power. His History of India is the most elaborate and original of any that has yet appeared on the subject...

রচনাবলী

নীলমণি বসাক যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রকাশকাল ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ তাহাদের একটি তালিকা দিলাম :—

১। **পারস্য ইতিহাস।** (পদ্য) ইং ১৮৩৪।

এই গ্রন্থ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ৯ আগস্ট ১৮৩৪ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে প্রকাশ :—

"পারস্য ইতিহাস।—শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত নীলমণি বসাককর্ত্তৃক পারস্য ইতিহাস গ্রন্থ ইঙ্গরেজী হইতে বঙ্গ ভাষায় পদ্যছন্দে ভাষান্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া এই সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে।"

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহার "ভূমিকা" হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :

"মকলিস নামক পারস দেশীয় একজন অতিমান্য জ্ঞানি ফকীর দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হয় তিনি প্রথমতঃ সংস্কৃত বা হিন্দীভাষায় রচিত কতিপয় রহস্য কবিতার পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া এক পুস্তক করেন, পরে ঐ পুস্তক স্বকৃত জানাইবার নিমিত্ত "হাজার এক রোজ" নাম দিয়া উক্ত অনুবাদের রূপান্তর করত ইতিহাসের ন্যায় করিয়া লিখিলেন সে ইতিহাসের তাৎপর্য্য এই, যে এক রাজ-কন্যা পুরুষমাত্রকে বিশ্বাসঘাতক বোধে হেয়জ্ঞান করিয়া আপন উদ্বাহে নিতান্ত অসম্মতা হইয়াছিলেন, এ কারণ তাঁহার ঐ কুমতির উপশম হইয়া যাহাতে পুরুষের প্রতি বিশ্বাস জন্মে এতদর্থে প্রত্যেক প্রস্তাবে বিশ্বস্ত ও সুশীল পুরুষের সুশীলতা ও সুজনতার উত্তম উপমা প্রদর্শিত হইয়াছে যদিও তাবত্ ইতিহাসের অভিপ্রায়ই এই,

তথাপি বিজ্ঞ গ্রন্থকার মহাশয় নানা অলঙ্কারে তাহাকে এমত্ ভূষিত করিয়াছেন এবং ঘটনায় এমত্ পার্থক্য রাখিয়াছেন যে সকল গল্পই নূতন ও বিলক্ষণ মনোরঞ্জক বোধ হয়।…

এই গ্রন্থ ক্রমে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় ভাষান্তর হইয়া অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তত্তদ্দেশীয় রসজ্ঞ বিজ্ঞগণেরা ফলদায়ক ও মনোরঞ্জক রূপে গুরুতর সমাদর করিয়াছেন, অতএব আমরা স্বদেশীয় অর্থাৎ বঙ্গীয় সাধুভাষায় গদ্যরূপে ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করিলাম…।

বহু দিবস হইল এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ শ্রীযুত গৌরিশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক শোধিত হইয়াছিল এইক্ষণে শ্রীযুত হরিনারায়ণ গোস্বামি মহাশয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার বিবেচিত ও সংশোধিত হইল।"

২। আরব্য উপন্যাস।

প্রথম খণ্ড। ১২৫৬ সাল। পৃ. ১৬৬।

দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৫৭ সাল। পৃ. ১৭০।

তৃতীয় খণ্ড।* ১২৫৭ সাল।

গ্রন্থের "ভূমিকা" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যে কোন প্রকার পুস্তক হউক, সময় বিশেষে মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অবশ্য তদ্দ্বারা কোন সদুপদেশ ও আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তন্নিমিত্ত লিপিজ্ঞ সহৃদয় মানবগণের পক্ষে যদিও পুস্তক

* এই খণ্ডটি দুষ্প্রাপ্য। ইহা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিন খণ্ড 'আরব্য উপন্যাস' "পুনঃ সংশোধিত এবং তাহাতে আর আর কয়েক উৎকৃষ্ট গল্প সংযোজিত করিয়া" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মাত্রই উপাদেয় হয় তথাপি ইহা বিবেচনাসিদ্ধ বটে যে যে স্থলে অল্প-সংখ্যক ব্যক্তি পুস্তক পাঠে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন তথায় আদৌ মনোরম্য পুস্তকেরই বাহুল্য হওয়া উচিত। অধিকন্তু অধিক বয়স্ক জনগণ শিশুদের ন্যায় শাসন অথবা তাড়নাদি দ্বারা পুস্তক পাঠে বাধ্য হইতে পারেন না সুতরাং তাঁহাদিগকে পুস্তক পাঠের রসজ্ঞ করিতে হইলে চিত্তরঞ্জক গ্রন্থেরই বৃদ্ধি করা আবশ্যক বোধ হয়। পরন্তু এই বঙ্গভূমিতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাধুভাষায় কতিপয় প্রথম শিক্ষার পুস্তক ব্যতীত চিত্ততোষক সুললিত অধিক গ্রন্থ বিরচিত অথবা অনুবাদিত হয় নাই। অতএব আরেবিয়ান নাইট্স নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মনোহর উপন্যাস সকল বঙ্গীয় সুকোমল ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কিতানন্তর প্রকাশ করা গেল।"

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম খণ্ড 'আরব্য উপন্যাস' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"...ঐ মছলন্দের উপর হইতে একটা আলোক আসিতেছিল তাহা দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এবং ঐ আলোক কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য সিংহাসনের উপর উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে ময়ূরের ডিম্বের ন্যায় একখানা হীরা তথায় রহিয়াছে, তাহা অতি নির্ম্মল এবং এমত উজ্জ্বল যে দিবসে তাহার প্রতি দৃষ্টি করা যায় না। এই সকল দৃষ্ট করণানন্তর অন্য২ ঘরে প্রবেশ করিলাম তাহাতে যে সকল আশ্চর্য্য২ সামগ্রী দেখিলাম তাহাতে প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া জাহাজ ও ভগ্নীদিগকে ভুলিয়া থাকিলাম, ক্রমে যখন রাত্রি হইল তখন মনে পড়িল যে

জাহাজে যাইতে হইবেক কিন্তু বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিয়া না পাইয়া যে ঘরে সিংহাসন ছিল ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ঘরে আসিয়া পড়িলাম, তখন কি করি, বিবেচনা করিলাম অত্য এই খানে শয়ন করিয়া থাকি, কল্য জাহাজে যাইব। এই ভাবিয়া স্বর্ণসিংহাসনে শয়ন করিয়া থাকিলাম, কিন্তু কোন প্রকারে নিদ্রা হইল না, প্রায় অর্দ্ধ রাত্রির সময় বোধ হইল যেন কোন মনুষ্য কোরাণ পাঠ করিতেছে তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া একটা আলোক হস্তে করিয়া ঐ শব্দ লক্ষ্যে গমন করিলাম, পরে যে ঘরে কোরাণ পাঠ হইতেছিল তাহার দ্বারে আসিয়া আলোক অন্তরে রাখিয়া অর্দ্ধমুক্ত দ্বারা দিয়া দেখিলাম যে এক রূপবান্ যুবা পুরুষ একখানা গালিচার উপর বসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে, ইহা দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল কেন না যে স্থানে সকল মনুষ্য পাষাণ দেহ প্রাপ্ত সে স্থানে জীবৎ মনুষ্য থাকা অসম্ভব, সুতরাং মনে করিলাম ইহাতে কোন চমৎকার আছে। এই ভাবিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চ স্বরে পরমেশ্বরের এইরূপ স্তব করিলাম যে হে পরমেশ্বর তোমার কৃপাতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি এবং যে পর্য্যন্ত আমরা স্বদেশে পুনরাগমন না করি সে পর্য্যন্ত তুমি আমারদিগকে নিয়ত রক্ষা কর।" (পৃ. ১০৮)

৩। **নবনারী**। ইং ১৮৫২। পৃ. ২৯৮।

নবনারী। অর্থাৎ নয় নারীর জীবন চরিত শ্রীনীলমণি বসাক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। কলিকাতা। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৪।

এই গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার "ভূমিকা"য় লিখিয়াছেন :—

"ভিন্ন দেশীয় অনেকে মনে করিয়া থাকেন এতদ্দেশে বিদ্যাবতী

যা গুণবতী নারী ছিলেন না। এ কথা নিতান্ত অমূলক। পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে অনেক বিদ্যাবতী ও গুণশালিনী কামিনী ছিলেন; বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থে ইহা প্রকাশ আছে। এবং একালেও গুণবতী নারীর অভাব নাই। কিন্তু এতদ্দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা না থাকাতে তাদৃশ স্ত্রীদিগের গুণ ও যশঃ বিশেষরূপে সর্ব্বত্র বিদিত হইতে পারে নাই। এই ন্যূনতা পরিহার বাসনায়, এবং বালিকারা সদ্‌গুণ বিশিষ্টা স্ত্রীদিগের উত্তম উত্তম চরিত্র দর্শন করিলে পবিত্র পথ অবলম্বন করিবেক এই অভিপ্রায়ে, অশেষ প্রকার অনুসন্ধান ও নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রাচীন ও আধুনিক নয় নারীর চরিত্র লিখিত হইল।"

'নবনারী'তে এই নয়টি নারীচরিত্রের কথা আছে :—সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যা বাঈ, রাণী ভবানী।

"নবনারী প্রথম মুদ্রাঙ্কন কালে, পণ্ডিতবর শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নানাবিধ কর্ম্মে আবৃত থাকিয়াও অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনেক শ্রমে ও যত্নে এই পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।" 'নবনারী' বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতেই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহার সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়। "যেহেতু ভদ্রলোক মাত্রেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং হিন্দুকালেজ প্রভৃতি কলিকাতাস্থ ও অন্যান্য দেশস্থ অনেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই নবনারী অনেক নারী পাঠ করেন,…।"

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'নবনারী' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

"রাজা রামকান্তের লোকান্তর গমনের পর রাণী ভবানী সমুদয় ঐশ্বর্য্য আপন হস্তে পাইয়া দানাদি ও পুণ্য কর্ম্ম বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষায়

মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল কীর্ত্তির জন্ত তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে তখন পর্য্যন্তও তাহা করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তাঁহার এক কন্তা বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার গর্ভে যদি সন্তান উৎপত্তি হয় তবে তাহাকে তাবৎ ঐশ্বর্য্য ও ভূম্যাদির উত্তরাধিকারী করিবেন। এবং তাঁহার ইহাও বাঞ্ছা ছিল কন্তার বিবাহ দিয়া গঙ্গাবাসিনী হইবেন। এই অভিপ্রায়ে রঘুনাথ লাহিড়ি নামক খাজুরা-নিবাসী এক সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণকুমারকে কন্তা দান করিয়া তাঁহাকে তাবৎ বিষয়ের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগ্য ব্রাহ্মণকুমার বিবাহের অল্প দিবস পরে পরলোক গমন করিলেন। তাহাতে আপনি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে বঞ্চিত হইলেন এবং রাজনন্দিনীকেও চিরদুঃখিনী করিলেন। রাণী ভবানী জামাতার মরণে অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়াছিলেন এবং দান ধ্যানে সদা সুখে থাকিয়াও দুহিতার পতিহীনত্ব যন্ত্রণার জন্য সতত দুঃখিতা থাকিতেন।

কথিত আছে রাজকন্তা তারা অতি রূপবতী ছিলেন। তাঁহার রূপের গৌরব এমত ছিল যে মুরশিদাবাদের নবাব ও তৎপারিষদগণ তদভিলাষী হইয়া তাঁহাকে হরণার্থ অনেক সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মাতার অন্নে প্রতিপালিত যাবতীয় কৌপীনধারী মহান্তগণ তাহাতে কুপিত হইয়া এক হস্তে [illegible]ল ও এক হস্তে করবাল লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; সেই জন্য তাঁহাকে হরণ করিতে পারে নাই। তাহার পর অবধি রাণী ভাবনী তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতেন, স্থানান্তরে যাইতে দিতেন না। তৎকালে যবন রাজাদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের জন্য বিশিষ্ট লোকের কন্তা ও পুত্রবধূরা কখন্ গৃহের বাহির হইতে পারিতেন না।"

৪। **বত্রিশ সিংহাসন**। ইং ১৮৫৪। পৃ. ২০৭।

বত্রিশ সিংহাসন অর্থাৎ রাজা বিক্রমাদিত্যের কর্ম্মকাণ্ড ও চরিত্র। হিন্দী পুস্তক হইতে শ্রীনীলমণি বসাক কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস ও শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা বাহির মূর্জাপুর, নং ১৩, ভবনে মুদ্রাঙ্কিত। সন ১২৬১। ইং ১৮৫৪ সাল।

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপন"টি এইরূপ :—

"বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতে রচিত হয়, তৎপরে বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজি ভাষাতে ক্রমশঃ প্রকাশ হয়। বাঙ্গালা ভাষাতে যে বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক দেখা যায়, তাহা পদ্যে রচিত, এবং বিশিষ্ট সমাজে সমাদরণীয় নহে, তাহাও এক্ষণে প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। হিন্দী ভাষাতে যে পুস্তক আছে তাহা যদিও এতদ্দেশে প্রচলিত নাই, কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে গণনীয়, এবং তাহাতে রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ঐ হিন্দী পুস্তক হইতে সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া এই বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্য দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন। এতদ্দেশীয় লোক সকলকে তাঁহার সদ্‌গুণবৃত্তান্ত শ্রবণে সাতিশয় সমুৎসুক দেখা যায়। এই বত্রিশ সিংহাসন পাঠ করিলে, বোধ করি, তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের পক্ষে এই পুস্তক অনেক বিষয়ে উপকারজনক হইবেক। এই পুস্তক প্রচার দ্বারা যদি আমার এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণা ও সফলা হয়, তাহা হইলে এতৎসঙ্কলনের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এই পুস্তক, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক সংশোধিত হইল। সন ১২৬১ সাল ২৯ এ ভাদ্র।"

রচনার নিদর্শন :—

"উজ্জয়িনী নগরে ভোজ নামে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী অত্যন্ত পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে এমত রূপ লাবণ্য সম্পন্ন ও কান্তিপুঞ্জ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ণচন্দ্রও আপনাকে হীনকান্তি বিবেচনা করিয়া লজ্জিত হইতেন। ভোজরাজ অতিশয় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং এমত প্রতাপান্বিত ছিলেন যে তাঁহার রাজ্যে ব্যাঘ্র ও ছাগ এক ঘাটে জল পান করিত। তাঁহার অধিকারে যথার্থ সদ্বিচার ও ন্যায়াচার ছিল, তাহাতে কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিত না। এই নিমিত্তই রাজধানী এমত জনাকীর্ণ ছিল যে তিলার্দ্ধ মাত্র স্থান শূন্য ছিল না, তাবৎ নগর অতি অপূর্ব্ব অট্টালিকাতে সুশোভিত ছিল। পথ ঘাট সকল এমত সুন্দর ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল যে ঐ নগরকে পাশার ছক বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এবং সমস্ত রাজপথের প্রান্তে জলপ্রণালী থাকাতে প্রজাগণের জলকষ্ট মাত্র ছিল না। প্রজারা সকলে ঐ রাজধানীতে নানা প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিত, তাহাদের পণ্যবীথিকা সকল সকল সময়েই নানা জাতীয় দ্রব্যে সুশোভিত থাকিত এবং সকল প্রজারই গৃহ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল, কাহার কিছুমাত্র দুঃখ ও দুরবস্থা ছিল না, অতএব নগরের কোন স্থানে নৃত্য, কোন স্থানে সংগীত, কোন স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা, কোন স্থানে দেবার্চ্চনা দিবারাত্রই হইত। ভোজরাজের সভাতে বহুসংখ্যক মহা মহা পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। রাজা তাঁহাদের বিধানানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন।" (পৃ. ১-২)

৫। রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম, ১ম খণ্ড। ইং ১৮৫৫। পৃ. ১১৭।

রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম। অর্থাৎ রাজস্বসম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ড স্থাপন অবধি যে সকল নিয়ম হইয়াছে তাহার খোলাসা। শ্রীনীলমণি বসাক কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনুবাদিত। প্রথম খণ্ড। কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানি দ্বারা, বাহির মৃজাপুর, নং ১৩ ভবনে, মুদ্রিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৭। সন ১২৬২। ইং ১৮৫৫ সাল। এই পুস্তক কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে, প্রভাকর যন্ত্রে, এবং তত্ত্ববোধিনী সভায় ও গুপ্ত ব্রাদার্স ও রোজারিও কোম্পানির পুস্তকালয়ে, বিক্রয় হয়।

এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "ভূমিকা"তে বলা হইয়াছে :—

"বাঙ্গালা ভাষাতে রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম অর্থাৎ রেবিনিউ বোর্ডের সরকুলর অর্ডর, তর্জ্জমা না থাকাতে তৎসম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদনে অনেক ক্লেশ হইয়া থাকে। অনেকে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ঐ সকল সরকুলর অর্ডর বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিবেন, কিন্তু পুস্তক বাহুল্য দেখিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন নাই, কেহ বা প্রবৃত্ত হইয়াও শ্রম ও ব্যয় বাহুল্য প্রযুক্ত তাহাতে বিরত হইয়াছেন। ফলতঃ এই সকল সরকুলর অর্ডর অনুবাদ করা সামান্য শ্রমের কর্ম্ম ছিল না। কিন্তু বোর্ডের সম্প্রতিকার সেক্রেটরী শ্রীযুত গ্রোট্ সাহেব ঐ বিষয় বড় সহজ করিয়াছেন, অর্থাৎ বোর্ড স্থাপন অবধি একাল পর্য্যন্ত যত সরকুলর প্রকাশ হইয়াছে তাহা রদ বদল করিয়া, এক এক বিষয়ের সকল নিয়ম একত্রে শ্রেণীসংজ্ঞায় শ্রেণীমত প্রকাশ করিতেছেন। ইহা আমলা, জমীদার, উকীল ও মোক্তার লোকের পক্ষে বড় উপকারক হইয়াছে। অতএব এই সকল সরকুলরশ্রেণী বোর্ড হইতে যেমনং প্রকাশ হইবে তাহা বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিয়া ন্যূনাধিক একশত পৃষ্ঠার এক এক খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করা যাইবেক। সম্প্রতি প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইল।

এই পুস্তক অধিক উপকারী হয় এজন্ত, রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম সম্বন্ধীয় যেং আইন ও সদর দেওয়ানীর সর্কুলর বা আইনের অর্থ আছে তাহাও উদ্ধার করিয়া এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। ইতি সন ১২৬২ সাল। শ্রীনীলমণি বসাক।"

কিরূপ সুললিত গদ্যে তিনি অনুবাদ করিতে পারিতেন, নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে তাহা বুঝা যাইবে :—

"কিপ্রকার কাগজ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

২৪। কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত একই প্রকার এবং একই পরিমাণের কাগজ ব্যবহার করা উচিত। অতএব যাহাকে ছোট ফুলস্কেপ বলা যায় অন্য কাগজ অপেক্ষা সেই কাগজ এই কর্ম্মের উপযুক্ত। কেননা তাহা নাড়াচাড়ার পক্ষে সুবিধা, এবং পরিপাটি-রূপে ভাঁজ করিয়া রাখা যায়, আর ঐ সকল ভাঁজ করা কাগজের বাণ্ডিল বাঁধিলে কেবল যে একরকম হয় এমত নহে, তাহার নীচে ও উপরে সেই পরিমাণের পাতলা তক্তা দিয়া ফিতার দ্বারায় বান্ধিয়া রাখিতে পারা যায়।

২৫। এই ফুলস্কেপ কাগজে রুবকারী লিখিতে হইবে। যদি এই কাগজ কিম্বা ইহার তুল্য অথচ সুমূল্য কাগজ নিকটে পাওয়া যায়, ভাল, নতুবা শ্রীরামপুরের যন্ত্রে প্রস্তুত কাগজের জন্য ষ্টেসনরী আপিসে পত্র লিখিবেন। উক্ত স্থানে ফুলস্কেপ আড়ার যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা শক্ত এবং সকল কর্ম্মের উপযুক্ত, এবং তাহাতে পোকা ধরিতে পারে না। এবং যে স্থলে হরিতাল দেওয়া কাগজ জেলখানাতে প্রস্তুত হয় সেই স্থানে তাহাতে জবানবন্দি প্রভৃতি আর আর লেখা পড়া চলিবেক।

এই নিয়ম প্রস্তুতকালে গবর্ণমেন্টের ১৮৫৪ সালের ২৭ আপ্রেল

তারিখের হুকুম পাওয়া যায়, তাহাতে লেখে যে সকল কাগজপত্র চিরকাল থাকিবে তাহা উপযুক্ত মতে প্রস্তুতকরা কাগজ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কাগজে কখনই লেখা যাইবে না।" (পৃ. ৮৭)

৬। **পারস্য উপন্যাস।** ইং ১৮৫৬।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন :—

"এই সকল উপন্যাস 'পারস্য ইতিহাস' সংজ্ঞায় পূর্ব্বে পদ্যচ্ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং যদিও তাহাতে পাঠকগণের অনাদর দেখা যায় নাই, কিন্তু এই প্রকার উপন্যাস গদ্যেই ভাল হয়। বিশেষতঃ এই ক্ষণে পদ্যের পদ্ধতি উঠিয়া যাইতেছে এবং গদ্যের অধিক গৌরব দৃষ্ট হইতেছে। অতএব তাহা গদ্যে প্রকাশ করিলাম। ১লা আষাঢ়।···সন ১২৬৩।"

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ "পারস্য উপন্যাস" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পূর্ব্বকালে কাশ্মীর নগরে তওঙ্গরন্নবী নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম ফখরন্নাজ; তিনি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সমরবিশারদ ছিলেন। রাজকন্যার নাম ফরোখনাজ; তিনি এমত রূপবতী ছিলেন যে, তাঁহার রূপ-লাবণ্য-দর্শনমাত্র পুরুষের মন একবারে বিমোহিত হইত, তাহাতে কেহ যাবজ্জীবন ক্ষিপ্তপ্রায় হইত, কেহ বা স্মররোগে ক্রমশঃ জীর্ণকলেবর হইয়া যমপুরী দর্শন করিত।

এই রাজকন্যা মধ্যে মধ্যে মৃগয়ার্থ বনে গমন করিতেন; তৎকালে পীতচিহ্নে সুশোভিত শ্বেত অশ্বে আরূঢ়া হইয়া মুখাবরণ মুক্ত করিয়া রাখিতেন, এবং কৃষ্ণবর্ণা অশ্বারূঢ়া এক শত সহচরি তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া যাইত। এই সকল সঙ্গিনী নবীনবয়স্কা

ও পরম সুন্দরী এবং নানা বেশ ভূষায় ভূষিতা। যেমন নক্ষত্র-মণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রের শোভা হয়, সখীমণ্ডলের মধ্যে রাজদুহিতা সেইরূপ সুশোভিতা হইয়া যাইতেন। সকল লোকই তাঁহাকে দেখিতে ব্যগ্র হইত বিশেষতঃ তাঁহার রূপের এমত যশোবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, মৃগয়া-গমনকালে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পথিমধ্যে লোকারণ্য হইত। তাহারা তাঁহার লাবণ্য-দর্শনে নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়া যথোচিত মনের আনন্দ প্রকাশ করিত, এবং সকলে নিকটে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইত, তাহাতে অশ্বারোহী খড়্গধারী নপুংসক রক্ষকগণ জনতা-নিবারণ-ছলে কাহাকে অস্ত্রাঘাত ও কাহাকেও সংহার করিত। দর্শকগণ ইহাতেও ভীত না হইয়া সেইরূপ জনতা করিয়া থাকিত, এবং তাহাদের ব্যগ্রতা দেখিয়া এমত বোধ হইত যেন রাজকন্যার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করে ইহাই তাহাদের বাসনা।" (পৃ. ১-২)

'পারস্য উপন্যাস' সমালোচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬) লিখিয়াছিলেন :—

"পাতুরিয়াঘাটা নিবাসি বহুগুণসম্পন্ন শ্রীযুত বাবু নীলমণি বশাখ মহাশয়ের অনুবাদিত পারস্য উপন্যাস নামক পুস্তক বহু দিবস হইল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ঐ পুস্তক প্রথমতঃ তিনি কবিতাছন্দে অনুবাদ করেন, এইক্ষণে তাহা গদ্যে প্রকটন করিয়াছেন, ইদানিন্তন প্রকাশিত প্রায় তাবৎ পুস্তকেই এক এক বিষয়ে এক এক দোষ দৃষ্ট হয়, কোন পুস্তকই সর্ব্ব বিধায়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করা যায় না, কিন্তু বাবু নীলমণি বশাখ মহাশয় আরব্য উপাখ্যান, নবনারী, বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতি যে যে পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন তত্তাবতই অতি

সুমিষ্ট কোমল সুসাধু বঙ্গভাষায় লিখিত হওয়াতে পরম আদরণীয় হইয়াছে, বিশেষতঃ পারস্য উপন্যাস অতি সুমিষ্ট হইয়াছে, তাহা পাঠকালে চিত্ত আর্দ্র হইতে থাকে, অন্তঃকরণে সকল প্রকার রসের সঞ্চার হইয়া থাকে, এই পুস্তক আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক, তাহাতে আধুনিক কতিপয় লেখকদিগের ন্যায় স্বকপোলকল্পিত কোন উৎকট শব্দ লিখিত নাই, ইংরাজী হইতে অনুবাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনুবাদক মহাশয় ইংরাজী শব্দের অনুরূপ কোন শব্দই নির্ম্মাণ করেন নাই, যথার্থ বাঙ্গালা লেখার ভঙ্গিক্রমেই লিখিয়াছেন, সুতরাং তাহা সর্ব্ব সাধারণ জনগণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, আমরা পারস্য উপন্যাস পাঠে পরম পুলকিত হইয়াছি এবং এক একটি গল্প দুই তিন বার পাঠ করিয়াছি,·· ।"

৭। **ভারতবর্ষের ইতিহাস,** ১ম—৩য় ভাগ। ইং ১৮৫৭-৫৮।

প্রথম ভাগ। হিন্দু সাম্রাজ্যকাল। ইং ১৮৫৭। পৃ. ১৬২

দ্বিতীয় ভাগ। মুসলমানদিগের রাজ্য। ইং ১৮৫৭। পৃ. ১৫৬

তৃতীয় ভাগ। মোগল রাজাদিগের রাজ্যকাল। ইং ১৮৫৮। পৃ. ২৫৮

প্রথম ভাগের "বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

"এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে দুই এক খান পুস্তক দেখা যায় তাহা ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত নীরস যে কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তি বোধ হয় না। অধিকন্তু এই সকল পুস্তক

বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত নহে, এই জন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবর্ষের ভাল মন্দ কিছুই জানিতে পারে না, এবং ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে এ দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি মিথ্যা, এবং হিন্দুরা পূর্ব্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন। অপর বালকেরা অন্য দেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না।

আমি আশা করিয়াছিলাম এই সকল দোষ পরিহার জন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত লিখিবেন, তাহা হইলে এই দেশের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা সকলে প্রকৃতরূপ জানিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয়ে কাহার সন্দেহ বা দ্বেষ থাকিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহা এপর্য্যন্ত লিখিলেন না। অতএব আমি এই কর্ম্মে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ইহাতে আমার যেমন যেমন মানস ছিল তাহা সকল পূর্ণ হইল না, যেহেতু আমাদিগের পুরাবৃত্ত প্রায় নাই, যাহা আছে তাহা অসম্পূর্ণ ও অসত্য গল্প মিশ্রিত, অধিকন্তু তাহা কালসমন্বয়িক বা ধারাবাহিক নহে। এই সকল বিষয়ের বিরোধ সমন্বয় ও তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া লেখা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। অতএব পূর্ব্বকালের সকল হিন্দু রাজ্যের বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না, কেবল কয়েকটী প্রধান২ রাজ্যের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিলাম।…

মুসলমানদিগের অধিকার অবধি ভারতবর্ষের যে সকল বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তাহা অসম্পূর্ণ বা অসত্য গল্প মিশ্রিত নহে। এই বিবরণ বাহুল্য রূপে লিখিয়াছি। ইহা দ্বিতীয় ভাগে আরম্ভ হইবে।

এই সকল বিবরণ সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজী ও পারসী অনেক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।...

এই স্থলে আর একটী কথাও লেখা কর্ত্তব্য, প্রথম খণ্ডে ধর্ম্ম বিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহা কাদম্বরী-লেখক পণ্ডিতবর শ্রীযুত তারাশঙ্কর ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়া দিয়াছেন, এবং বিদ্যা বিষয়ক প্রস্তাব বর্দ্ধমান প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। শ্রীনীলমণি বসাক। ১ বৈশাখ।"

৮। **ইতিহাস-সার**। ইং ১৮৫৯। পৃ. ২৩৭+১।

ইতিহাস-সার। অর্থাৎ অতি প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত। বালকদিগের পাঠার্থ শ্রীনীলমণি বসাক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। কলিকাতা —বাহির মির্জাপুর, বিদ্যারত্ন যন্ত্র। বঙ্গাব্দ ১২৬৬। ইংরাজী ১৮৫৯।

এই পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন:—

"ইতিহাস মনুষ্যের চক্ষুঃস্বরূপ, ইহা পাঠ করিলে আমাদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। কোন্ দেশের মনুষ্যের কি চরিত্র, কি প্রকারে তাহারা রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও বলবৃদ্ধি করিয়াছে, বা কি দোষে পতনপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই সকল জানিলে চিত্তসংস্কার হয়। এই কারণ, সকল দেশে বালকদিগকে ইতিহাস পাঠ করান গিয়া থাকে।

এ দেশে এই প্রথা প্রায় ছিল না। ইদানীং স্থানে স্থানে বাঙ্গলা পাঠশালা হইয়া তাহাতে ইতিহাস পড়াইবার নিয়ম

হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই; বিশেষ, সকল দেশের বিবরণ জানা যায় এমন পুস্তক এ পর্য্যন্ত হয় নাই। অতএব, বালকেরা সকল দেশের বিবরণ অনায়াসে জানিতে পারে, এই বাসনা করিয়া আমি এই পুস্তকখানি লিখিলাম। ইহাতে সকল দেশের সংক্ষেপ বিবরণ আছে ইতি। ১৫ ভাদ্র।"

হরচন্দ্র ঘোষ

১৮১৭—১৮৮৪

উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে নাটক নাম দিয়া 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদ', 'হাস্যার্ণব,' 'কৌতুকসর্ব্বস্ব,' 'রত্নাবলী' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; এগুলিকে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের নীহারিকা-রূপ বলা যাইতে পারে।

পরবর্ত্তী অর্থাৎ প্রথম যুগের বইগুলি শুধু নামেই নাটক নয়, এগুলি অভিনয়োপযোগী নাটক হিসাবেই সংস্কৃত বা ইংরেজী রীতি অনুসরণে, অথবা উভয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস,' ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (শেক্‌সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে রচিত) প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হইলেও হরচন্দ্রের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুনে'র অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং হরচন্দ্রকে "বাংলা নাটকের অন্যতম জন্মদাতা" বলিলে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে হরচন্দ্রের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হলধর ঘোষ; ইহাদিগের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরে। হলধর হুগলীর কলেক্টরের হেড ক্লার্ক ছিলেন। হুগলী

ঘোলঘাটের বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তিনি হুগলী বাবুগঞ্জে বাড়ী করেন; এই বাড়ীতেই হরচন্দ্রের জন্ম হয়।

ছাত্র-জীবন

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; ঐ বৎসর ১লা আগস্ট হইতে কলেজে পাঠারম্ভ হয়। হাজী মহম্মদ মহসীনের অর্থে স্থাপিত বলিয়া ইহা মহম্মদ মহসীনের কলেজ নামেও পরিচিত ছিল। হরচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবেশ করেন। তৎকালীন প্রথানুসারে তিনি বাল্যে আর্বী-ফার্সী শিখিয়াছিলেন, বাংলা ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। শীঘ্রই তিনি ইংরেজী শিখিয়া কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড কলেজের ছাত্রগণকে মাতৃভাষার সেবায় উৎসাহিত করিবার জন্য মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করিতেন। বাংলা-শিক্ষায় হুগলী কলেজের ছাত্রেরা কলিকাতা হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। বেকনের Truth শীর্ষক সন্দর্ভের বঙ্গানুবাদে হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া হরচন্দ্র ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের নিকট হইতে একটি রূপার ঘড়ি পুরস্কার পাইয়াছিলেন :—

5. His Lordship was pleased to present to Hurrochunder Ghosh a Silver watch for the best Bengalee translation of Bacon's Essay on Truth.*

---

* Copy of a letter to the General Committee of Public Instruction dated 16-1-41 (forwarded to the Principal J. Esdaile on 26-2-41 by the Secretary) by members who visited Hooghly with the Governor General on Jan. 2. 1841.

হরচন্দ্রের রচনাটির পরীক্ষক ছিলেন—জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন :—

The youth has not, in some few instances, caught the exact meaning of the author, but the general character of the translation is fidelity; and some of the most difficult passages have been rendered with an accuracy and a just appreciation of the beauty of the original, which is surprising. The style of the Bengalee is remarkable for purity and classical excellence, the writer has a knowledge of his own language, which is rarely met with in young men whose time is devoted to English studies; and very great credit is due to the instructions which he has received in his own tongue. If all the alumni of our Colleges could write Bengalee with equal ease and chasteness, the reproach would be removed, that in their eagerness for the acquisition of a foreign language they had forgotten their own. (16 Decr. 1840.)—*General Report on Public Instruction......*for 1839-40, pp. 43-44.

পর-বৎসর হরচন্দ্র আর একটি প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লর্ড অক্ল্যাণ্ড-প্রদত্ত পুরস্কার—একটি সোনার ঘড়ি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় হিন্দুকলেজ ও হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

The Right Hon'ble the Earl of Auckland having offered for competition at the Hindoo and Hooghly Colleges a prize of a Gold Watch for the best translation into Bengali of Hume's Essay on the "Dignity and Meanness of Human Nature," there appeared by the Reports of the Examiners an extraordinary superiority in the winner Hurrochunder Ghose (a Student of the Hooghly College) in his composition, over those of all the others (which were very inferior indeed,) of the Hooghly College and of the Hindoo College Students.—*General Report of the Late General Committee of Public Instruction.* for 1840-41 & 1841-42, p. 72.

চাকুরী-জীবন

তখনকার দিনেও চাকুরী সংগ্রহ করা কম দুরূহ ছিল না; অনেকে চাকুরীর লোভে অকালে কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। তাহাদের কেহ শিক্ষকের, কেহ বা বে-সরকারী আপিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইত, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী—মুন্সেফ, দারোগা বা কেরাণীর পদ লাভ করিত। রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত যুবকদিগকে চাকুরী দিয়া উৎসাহিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন; আবকারী-বিভাগের কমিশ্যনর ডোনেলী সাহেব তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে হরচন্দ্র বোয়ালিয়ায় ২য় শ্রেণীর আবকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ লাভ করেন। তিনি পর-বৎসর ডিসেম্বর মাসে ১ম শ্রেণীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-রূপে মালদহে স্থানান্তরিত হন। মালদহে অবস্থানকালে তিনি যে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছিলেন, তাহা ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে জানা যাইবে :—

"সম্পাদক মহাশয়, মালদহের বর্ত্তমান আবকারি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এইক্ষণে অতি প্রশংসিতরূপে স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি ১৮৪৪ সালের নবেম্বর মাসে বোয়ালিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পরে ৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মালদহে আসিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়েন, এই স্থানে ইঁহার আগমনাবধি ক্রমশই আবকারির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বে বাইশ হাজার টাকার অধিক হইত না, হরচন্দ্র বাবু আসিয়া ১৮৪৬।৪৭ সালে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার

টাকা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এতদ্রূপ অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের এবম্ভূত অধিক লাভ করাতে কার্য্য কল্পে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে, ঢাকা প্রদেশের পূর্ব্বতন আবকারি কমিস্যনর মহানুভব মৃত ডোনেলি সাহেব এ বিষয়ে হরচন্দ্র বাবুর বিস্তর সুখ্যাতি লিখিয়াছেন, ফলতঃ তিনি যথার্থ রূপ প্রশংসা প্রাপণের যোগ্য পাত্র তাহাতে সন্দেহাভাব।...

এমত সুযোগ্য ব্যক্তির পদোন্নতি বিষয়ে রাজপুরুষেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না, যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য তাঁহারা অনায়াসেই অধিক বেতন প্রাপ্ত হয়েন, অথচ এ পর্য্যন্ত ইঁহার বেতন ২০০ টাকার অধিক হইল না,...। ১ ভাদ্র ১২৫৫।"

হরচন্দ্র মালদহে "প্রায় আট বৎসর কার্য্য করেন। এই স্থানে সন্তোষজনকভাবে কার্য্য করিবার পুরস্কার স্বরূপ তিনি রেভিনিউ সার্ভের ডেপুটি কলেক্টরের পদে উন্নীত হন এবং বহরমপুরে স্থানান্তরিত হন। এই স্থানে কিছু কাল কার্য্য করিবার পর তিনি ক্রমান্বয়ে রংপুর ও দিনাজপুরে বদলী হন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি থাকবস্ত বিভাগ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে যখন তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতির প্রভাবে তিনি এক ভীষণ দস্যুদলকে ধৃত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। দোকানীরা যে বাটখারা রাখিত তাহার ওজন ঠিক নহে বলিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া সেই অসাধু প্রথা রহিত করিয়া দেন। অতঃপর অন্যান্য জিলায় শাসনকার্য্য করিয়া তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত কেন্দ্রপাড়া মহকুমা হইতে পেন্সন লন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।" ('ভারতবর্ষ,' ফাল্গুন ১৩৪১, পৃ. ৩৮১-৮২)।

মৃত্যু

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি দেশহিতকর কার্য্যে মনঃসংযোগ করেন। তিনি কিছু দিন হুগলী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ২৪ নবেম্বর ১৮৮৪ তারিখে ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রচনাবলী

হরচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; এগুলির বেশীর ভাগই নাটক। তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। **ভানুমতী চিত্তবিলাস** নাটক। ইং ১৮৫৩। পৃ. ২১৮+ পরিশেষ ২।

ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক। হুগলী বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব ছাত্র ইদানীং মালদহের আবকারির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত।—কলিকাতা পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।—সন ১৮৫৩। শকাব্দা ১৭৭৫

ইহার দুইটি ভূমিকা আছে। একটি বাংলা; অপরটি ইংরেজী—২০ অক্টোবর ১৮৫২ তারিখযুক্ত। বাংলা ভূমিকাটি এইরূপ:—

"এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শক্রমে আমি "সেক্সপিয়র" নামক ইংলণ্ডীয় মহাকবির স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে "মরচেণ্ট-অফ-ভিনিস" ইত্যভিধেয় অপূর্ব্ব কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিতে

আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান্ মহাশয় উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের মর্ম্ম মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তি দান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধে তদনুসারে এই "ভানুমতী চিত্তবিলাস" নাটক গদ্য পদ্যে রচনা করিলাম। যদ্যপিও ইহাতে উল্লেখিত ইংরাজী কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্সপিয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি; তবে বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা সুদ্ধ দেশীয় মহাশয়দিগের অবকাশ কালে গ্রন্থ পাঠামোদের আনুকূল্য বিবেচনায় করা হইল। অতএব যদি এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ভদ্র সমাজের মনোনীত হয় তবে আমি প্রকৃষ্ট রূপে কৃত স্বীয় পরিশ্রম সফল বোধ করিব। কিমধিকং সুধীবরেষ্বিতি। হুগলী ভাদ্র। ১৭৭৪ শকাব্দা"

'ভানুমতী চিত্তবিলাস' হইতে গদ্য-পদ্য রচনার নিদর্শনস্বরূপ কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল :—

"দয়ার শুনহ গুণ লক্ষপতি রায়।
দয়ার গুণের কথা বর্ণন না যায়॥
অসীম দয়ার গুণ জগতে প্রচার।
গগন অম্বুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিস্তার॥
গগনাম্বু ক্ষিতি যেন স্নিগ্ধ মতি করে।
দয়াধর্ম্ম সেইরূপ শুভ করে নরে॥

দুই মতে শুভঙ্করী দয়ারে জানিবে।
দাতা গ্রহীতার সেই কল্যাণ করিবে॥
দয়াবান হয় সুখী দয়া প্রকাশিয়া।
গ্রহীতা কল্যাণ দেখে গ্রহণ করিয়া॥ (পৃ. ১৬১)

চিত্ত. লক্ষরায় তুমি এখনি যে ছুরিতে শাণ দিতেছ, ইহার কারণ কি?

লক্ষ. (তর্জ্জনপূর্ব্বক) ইহার কারণ যে বেটাদের শাণ নাই সেই বেটাদিগকে আরও অশাণ করিব এই জন্য ছুরিতে শাণ দিতেছি।

চিত্ত. লক্ষরায় ঐ ছুরিকা তোমার পাষাণময় হৃদয়ে কেন ঘর্ষণ কর না তাহাতে বিলক্ষণ শাণ হইবে, কেননা করুণাবাক্য প্রায় হৃদয় বিন্ধিতে সমর্থ হয় না ধাতুময় তীক্ষ্ণ অস্ত্রেই তোমার কি প্রয়োজন, তোমার লোভ দ্বেষ ও পৈশুন্যরূপ যে তিন অস্ত্র আছে তাহা এমত তীক্ষ্ণ যে ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতেও তীক্ষ্ণতর।

লক্ষ. যদি শূলে না যাও তবে তুমি শূলের অগ্রভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাক।

চিত্ত. এই নরাধম লক্ষপতি হিংস্রক পশ্বাদির ন্যায় অতি নিষ্ঠুর। ইহাকে দেখিয়া আমার এমত মনে হইতেছে যে কোন হিংস্রক ব্যাঘ্রের বধকালে তাহার কঠিন প্রাণ লক্ষের জঘন্য দেহে আবির্ভাব হইয়া থাকিবেক। যেহেতু এই নরাধমের দুরাশা রাক্ষসীরূপা অতি ভয়ঙ্করী শোণিতার্থিনী ক্ষুধার্ত্তা ও সর্ব্বগ্রাসিকা।

লক্ষ. তুই চিৎকার করিয়া কেবল আপনারই ক্ষতি করিতেছিস। আগে ভাবিয়া দেখ আমার ঋণ হইতে তোদের কিসে পরিত্রাণ হইবে। আমি বিচারার্থ দণ্ডায়মান আছি।"

'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাটকের "পরিশেষ" অংশে "ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ অথবা যাঁহারা ইংরাজী কোন নাটক গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের বিজ্ঞাপনার্থে কতিপয় উপদেশ" লিখিত হইয়াছে।

'ভানুমতী চিত্তবিলাস' কলেজের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হরচন্দ্রের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"...ইত্যগ্রে কিয়দংশ পদ্যে বিরচিত "ভানুমতী চিত্তবিলাস" ইত্যভিধেয় যে নাটক আমি প্রস্তুতপূর্ব্বক হুগলির কালেজের কৃপালু প্রধান অধ্যাপক সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায়* বিদ্যাদানার্থ কৌন্সেলে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা মহানুভব সভ্য মহাশয়েরা সুরচিত বোধ করিলেও অদ্যাপি কালেজাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই; অথবা বর্ণিত মহামহিমেরা তাহা তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, ইহা মদীয় দুর্জ্ঞেয়। বস্তুতঃ প্রাগুক্ত নাটক "সেক্‌সপিয়র" কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের (অর্থাৎ মরচ্যাণ্ট-অফ-বেনিসের) দেশীয় পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতদ্দেশস্থ যে সমস্ত মহাশয়েরা সেক্‌সপিয়র

---

* হরচন্দ্রের 'ভানুমতী চিত্তবিলাসে'র প্রতি কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার (Kerr) লেখেন :—

...a Dramatic Composition written in Bengali in imitation of Shakespeare's Merchant of Venice by Hurro Chunder Ghose...The author's Proficiency as a Bengalee scholar and the respectable appointment he at present holds are guarantees that this is not one of those hare-brained productions which sometimes emanate from young Hindoos. There is also a modesty in the plan of the work which recommends it highly.—K. Zachariah ; *Hist. of Hooghly College*, P. 52.

সাহেবকৃত স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে ঐ প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানা রসঘটিত, ও স্থানেং এতদ্রূপ সরস আদিরস রচিত যে নীতি জ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের তাহা পাঠের যোগ্য বোধ করিলে "ভারতচন্দ্রে" স্থান নির্বাপন করা নৈষ্ঠুর্য্য বোধ হয়।..."

২। **কৌরব বিয়োগ** নাটক। ইং ১৮৫৮। পৃ. ১৭৬+২।

কৌরব বিয়োগ নাটক। এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়াপর্য্যন্ত মহাভারতীয় অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশ গদ্যে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্যছন্দে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সন ১৮৫৮।

গ্রন্থে দুইটি ভূমিকা আছে; একটি বাংলা, অপরটি ইংরেজী। বাংলা ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—

"...ভারতবর্ষের অনবগতি নহে যে "মহাভারত" গ্রন্থ নীতিগর্ভ ও সন্দর্ভশুদ্ধির আশ্রম, এবং সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয়ের ও উপদেশ নিকরের নিকেতন। এ কারণ আমি ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়াপর্য্যন্ত অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সুমার্জ্জিত সাধুভাষায় বহুলাংশ গদ্য ছন্দে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্যপ্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিয়া "কৌরব বিয়োগ নাটক," এই আখ্যা দানে প্রকাশ করিলাম।...ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় বহুতর বিজ্ঞবরের অভিপ্রায় মতে আমি এই অভিলষিত অভিনব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "কাশীদাসের" কিয়দ্ভাগের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মলিন মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করিলাম। ...হুগলী। নবেম্বর ১৮৫৭।"

'কৌরববিয়োগ' পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহাও কলেজের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। ইহার আখ্যানের জন্য হরচন্দ্র "নীতিগর্ত্ত ও সন্দর্ভ শুদ্ধির আশ্রম" মহাভারতের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহার ভাষা অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃতবহুল। রচনার নিদর্শন :—

"ধৃত। যুধিষ্ঠির, বিলাপ সম্বরণ কর, তুমি কুলতিলক। আর ইষ্টদেবের ন্যায় তোমাকর্ত্তৃক সুসেবিত হইয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। যেহেতুক রাজ্যচ্যুত হইয়াও আমরা তোমার অতিশয় যত্নহেতু পূর্ব্বসুখ ও সম্পদভিভোগ করিতেছি। এই হেতু, হে পুত্র-বর, তুমি কদাপি অপ্রিয় নহ। রাজধর্ম্ম ও নীতি এই যে বার্দ্ধক্যে বনে গমন করত যথাশক্তি যোগ আচরণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমন, ও সদ্‌গতি অন্বেষণ করিবেক। আর মহৈশ্বর্য্যবান্ মহীশ্বরেরাও মহীমধ্যে এইরূপ আচরণ করিয়াছেন, হে যুধিষ্ঠির, শাস্ত্রবিৎ তোমার জ্ঞানের ইহা অগোচর নহে, সেইহেতু আমিও ইহা মনন করিয়াছি। আর পরমার্থ চর্চ্চায় এইরূপে প্রতিরোধ করা পরম পুণ্যাত্মা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যেহেতুক ধর্ম্মবলে তুমি সঙ্কট রূপ মহাসাগর পার হইয়া শত্রুনিকরে সংহার করত স্বরাজ্যের সমুদ্ধার করিয়াছ, এই-হেতু পৃথিবী মধ্যে সাধু ও সজ্জনেরা তোমার অনুক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে-ছেন। অতএব উদ্বেগ পরিহার করিয়া বাহুবলে অর্জ্জিত বসুমতী সবসু সম্ভোগ কর। আর অস্মদাদির পারত্রিক কুশলহেতু অনুকম্পা করিয়া আমারদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেও যে তোমার কল্যাণে আমরা ভাবি ভাবুকানুভব করিতে পারি।" (পৃ. ১৪৩-৪৪)

"বিদুর। হে রাজন্, শোক সম্বরণ কর। ঈশ্বর বস্তু মাত্রকেই নশ্বর করিয়াছেন। এই হেতু পশু পক্ষী কীট করী নাগ নরাদি

করিয়া যাবজ্জীবেরা নিয়তি মতে কালে নাশকে পায়, ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া জ্ঞানি লোকেরা প্রায় মুগ্ধ হয়েন না। আর শরীরিদের প্রাণ জলমধ্যস্থ চন্দ্রের ন্যায় চপল, ইহা নিশ্চয় জানিয়া অনুক্ষণ পুণ্যানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য।"

[পদ্য।]

১। "উঠ২ মহারাজ, সকল বিধির কায,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়তি যার, সেই দিন মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি॥

২। মহা২ বীরবর, নিত্য যায় যম ঘর,
মৃত্যু বশ সর্ব্ব চরাচর।
সব সংহরয়ে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর॥

৩। বাল্যকালে মরে কেহ, যৌবনে ত্যজয়ে দেহ,
কেহ মাত্র ধরণী পরশে।
অনিত্য এসব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ,
কেন মুগ্ধ হও মোহবশে॥

৪। জীর্ণাম্বর পরিহরি, যেন নব বাস পরি,
তেমতি কায়ের বিনিময়।
চঞ্চল জীবন অতি, অলক্ষ্য তাহার গতি,
জ্ঞানী কভু মুগ্ধ নাহি হয়॥

৫। আমার বচন ধর, সর্ব্ব শোক পরিহর,
ধর্ম্ম পথে স্থির রাখ মন।
চরমে উত্তমা গতি, হইবেক মহামতি,
অন্যথা না ভাব কদাচন॥" (পৃ. ৫১-৫২)

৩। চারুমুখ-চিত্তহরা নাটক। ইং ১৮৬৪। পৃ. ১৮৫।

চারুমুখ-চিত্তহরা নাটক। এতদ্দেশীয় সরল সাধুভাষায় গদ্য পদ্য প্রবন্ধে (হুগলির) শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক রচিত। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটের ৫৩ সংখ্যক ভবনস্থ কেনিংযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত। ১৮৬৪ সাল।

ইহার দুইটি ভূমিকা আছে; একটি, ইংরেজী—"1863" তারিখযুক্ত; অপরটি বাংলা। বাংলা ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "কিয়ৎকাল হইল ইংলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশিত "রোমীয়জুলিয়ট" নামক মনোহর নাট্যকাব্য এতদ্দেশীয় ভাষাপ্রবন্ধ পরিচ্ছদে প্রকাশ করিতে কোন বিদ্যানুরাগী বান্ধব আমাকে কহিয়াছিলেন।… তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, এই গ্রন্থ অতিশয় অলঙ্কৃত সুমার্জ্জিত সাধুভাষায় না লিখিয়া সামান্যতঃ কথিত কোমল সরলবাক্যে রচনা করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৌতুহল জন্য এতন্নাটিকা নেপথ্যের উপযোগিনী করা যায়। আমিও সেই কথাক্রমে সেই মতই রচনা করিয়াছি। আর অতুল সদ্ভাবাপন্ন মূল গ্রন্থে অপূর্ব্ব রস মাধুরী বহুরূপে বিভিন্ন দেশভেদে ও বিজাতীয় ভাষান্তরে যে পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারা যায় তদর্থেও ত্রুটি করা যায় নাই। ফলতঃ, এতদ্দ্বারা এমন জ্ঞান না হয় যে, ইয়ুরোপ খণ্ডের ইটালী প্রদেশ হইতে "রোমিও জুলিয়ট"কে আমি ভারতবর্ষে আনিয়া স্বদেশসিদ্ধ বসনালঙ্কারে তাঁহাদিগকে এমত সুবেশিত করিয়াছি যে, তাহাদের আর চেনা যাইতে পারিবে না। সে এক প্রকার অসাধ্য। ফলতঃ, বিগত প্রস্তাবকর্ত্তার এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে, ইটালী দেশের বরুণিয়া ও মেনতুয়া নগর হইতে রঙ্গ-ভূমি সর্ব্বসুদ্ধ নাড়িয়া ভারতবর্ষের কর্ণাট দেশে আনিয়া সেই সতী ও সতীপতি "রোমিও জুলিয়ট"কে অস্মদ্দেশীয় নব বসনে দর্শাইলে কেমন দেখায়, তাই দেখা যায়।"

হরচন্দ্রের অন্য নাটকগুলির তুলনায় 'চারুমুখ-চিত্তহরা'র ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রস্তাবনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

সূত্রধার।…প্রিয়ে! সে কথাটি কি?

নর্ত্তকী। তা আমি তোমাকে বল্‌বো না। তোমার পেটে কথা থাকে না। আমি যে মেয়ে-মানুষ, তবু কত কথা চেপে রাখি। তুমি পুরুষ হয়েও একটী কথা পেটে রাখ্‌তে পার না।

সূত্রধার। প্রিয়ে! তুমি এইবারখানি বল, আমি যেমন করে পারি পেটে রাখ্‌বো। আমার দিব্বি, যদি না বল। দেখ, আমি তোমা বই আর কারু নই।

নর্ত্তকী। তোমার সঙ্গে যখন যার ভাব হয়, তাকেই তো ঐ কথা বল যে, প্রিয়ে! আমি নিতান্ত তোমারি। তোমার বই আর কারু নই। কিন্তু তুমি যে কার, তা তোমার বিধাতাই জানেন। (পৃ. ২)

ইহাতে ১৪টি গান আছে। একটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

রাগিণী গারা-ভৈরবী—তাল আড়া।

অনিত্য সংসার মাঝে, নিত্য নিরাকার যেই।
মুক্তিপদ লাভ হবে, মনে মনে ভাব সেই॥
বিষয় বিষয়াবেশে,
বিষণ্ণ হইবে শেষে;
পঞ্চভূত আত্মা যেই, কবে আছে কবে নেই॥

৪। **বারুণী-বারণ** বা সুরার সঙ্গদোষ। ইং ১৮৬৪ (১৭৮৬ শক)। পৃ. ৬৮।

ইহাতে সুরাপানের অপকারিতা বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রধানতঃ প্যারীচরণ সরকারের চেষ্টায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের

১৫ই নবেম্বর কলিকাতায় 'বঙ্গীয় মাদকনিবারণী সমাজ' (The Bengal Temperance Society) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুরাপানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলে। 'বারুণী-বারণ' বোধ হয় এই আন্দোলনেরই ফল।

৫। **রজতগিরিনন্দিনী** নাটক। ইং ১৮৭৪। পৃ. ৮৯।

রজতগিরি-নন্দিনী নাটক। শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক বিরচিত এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮১ সাল।

গ্রন্থকারের "ভূমিকা"টি এইরূপ :—

"পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাট্যশালা না থাকায় সুরচিত নাটক গ্রন্থের সৌন্দর্য্য প্রায় অন্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাট্যে কেবল বিদ্বান্ লোকেরই অনুরাগ জন্মে। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের আমোদ হয় না। ইদানীং সে অভাব দূর হওয়াতে নাটক রচনার চর্চ্চা বৃদ্ধি হইয়াছে।

অতএব এই সুসঙ্গতি হেতু ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি। যদি এই অভিনয় নাটক গুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়, তবেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন আর কোন স্বার্থ নাই. হুগলী বঙ্গাব্দা ১২৮১। বৈশাখ।"

'রজতগিরিনন্দিনী'তে দুইটি গান আছে, তাহার একটি এইরূপ :—

চলিল সুধন্বা ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ লইয়া।
লম্ফে ঝম্পে মহী কম্পে শিব নাম কহিয়া॥
কুরুসৈন্য মাঝে যেন বৃহন্নলা হইয়া।
দ্বীপি-চর্ম্ম পরিধৃত পৃষ্ঠে তূণ লইয়া॥

হল স্থূল পশুকুল সর্ব্ব বন ব্যাপিয়া।
বেগে ধায় নাহি চায় যায় বন ত্যজিয়া॥ (পৃ. ৭)

এই নাটক প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন:—"ইহার পূর্ব্বেকার নাটকে গান নাই; বোধ হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির অনুকরণে এইখানিতে গান দেওয়া হইয়াছে।" এই উক্তি ঠিক নহে; আমরা দেখিয়াছি, হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'চারুমুখ-চিত্তহরা'য় ১৪টি গান আছে।

"নাটকটি একজন ইংরাজ গ্রন্থকারের Silver Hill নামক একটি ব্রহ্মদেশীয় উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও পরে উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে 'রজতগিরি' নামে একটি নাটক রচনা করেন। কিন্তু কোনও গ্রন্থই অভিনীত হইয়াছিল বা অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু এই গ্রন্থ অবলম্বনে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'কিন্নরী' নামক যে নাটক প্রণয়ন করেন, তাহা মিনার্ভা থিয়েটারে অসামান্য সাফল্যের সহিত অসংখ্য বার অভিনীত হইয়া দর্শকগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছে ও করিতেছে। অনেক সময়েই অগ্রণীরা যে ফললাভে বঞ্চিত হন, পরবর্ত্তীরা সেই ফল ভোগ করিতে পারেন।" ('ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪১, পৃ. ৫০৯)

৬। **সপত্নী সরো**। ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৪১।

সপত্নী সরো যথার্থ ঘটনামূলক উপাখ্যান। শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত।

"O beware, my lord, of jealousy;
It is the green-eyed monster, which doth mock
The meat it feeds on."

Shakespeare—Othello.

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কলিকাতা,—শোভাবাজার রাজা কালীকৃষ্ণের লেন ৩০ নং ভবনস্থ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্বৎ ১৯৩১।*

হরচন্দ্র উপন্যাস রচনা করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' ইহা সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

We have not a very high opinion of this novel, as there is not much action neither are the characters well sustained, though some of the descriptions are good and the reflections just......

৭। **রাজ তপস্বিনী,** ১ম খণ্ড। ইং ১৮৭৬। পৃ. ১৭৬।

এই কাব্যখানি মহাভারতের অম্বার উপাখ্যান অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

* * *

হরচন্দ্র ইংরেজী রচনাতেও পটু ছিলেন। রেঃ লালবিহারী দে সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' (মার্চ ১৮৮০) তাঁহার লিখিত Lessons from the Life of Sivaji নামে একটি সুলিখিত সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলী ইনষ্টিটিউশনে পাঠ করেন।

---

* এই উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে প্রকাশকাল "1875" দেওয়া আছে। ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৩য় সংখ্যা, ১৩৩৩ সন) এবং শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 'ভারতবর্ষে' (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৪১) হরচন্দ্র ও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই 'সপত্নী সরো' দেখেন নাই, তাঁহারা উভয়েই ইহার প্রকাশকাল "১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ" লিখিয়াছেন।

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫০
দ্বিতীয় সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫০
তৃতীয় সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫৩

মূল্য ছয় আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার

১৭৯৩ ?—১৮৪৫

পরিচয়

দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার সেকালের এক জন খ্যাতনামা কবি। তাঁহার পিতামহ রূপরাম (ওরফে গোপাল) মুখোপাধ্যায় আদি বাসস্থান হুগলী জেলার গরিটী গ্রাম হইতে আসিয়া হরিনাভিতে বসতি করেন। গোপালের পুত্র রামধন, রামধনের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, মাধবচন্দ্র ও হরচন্দ্র। এই রামচন্দ্রই আমাদের দ্বিজ রামচন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হরিনাভি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়।

রামচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। তাঁহাকে 'বিদ্যালঙ্কার', 'তর্কালঙ্কার' ও 'তর্কপঞ্চানন'—সাধারণতঃ এই তিন উপাধিতেই ভূষিত দেখিতে পাই। গান-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে 'কবিকেশরী' উপাধি দিয়াছিলেন,—

…উপাধি দিলেন শ্রেষ্ঠ
বুধগণে শ্রীকবিকেশরী।

রামচন্দ্রের শেষ জীবন রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আশ্রয়ে তাঁহার "সভাসদ্"-রূপে কাটিয়াছিল; কালীকৃষ্ণের আদেশেই রামচন্দ্র 'মাধবমালতী' ও 'হরপার্ব্বতীমঙ্গল' রচনা করেন।

রচনাবলী

রামচন্দ্র বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন ; এগুলির অধিকাংশই কাব্য। এই সকল গ্রন্থের প্রত্যেকটির একাধিক সংস্করণ—প্রধানতঃ বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

১। দুর্গামঙ্গলান্তর্গত **গৌরীবিলাস**। পৃ. ১৪০ + ১২৯ + ৩ (শুদ্ধিপত্র) + ৪ (স্বাক্ষরকারিদিগের নাম)।

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র-হীন এক খণ্ড রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। ইহাতে ৬ খানি চিত্র আছে ; তন্মধ্যে ২ খানি কাঠখোদাই, ৪ খানি ধাতু-খোদাই। গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে—গৌরীবিলাস, পৃ. সংখ্যা ১-১৪০ ; দ্বিতীয় ভাগে—কঙ্কালীর অভিশাপ, পৃ. সংখ্যা ১-১২৯। প্রথম ভাগের শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

এত বলি পার্ব্বতী হানিল অসি দুর্গাসুরে।
পড়িল দনুজপতি পুষ্পবৃষ্টি সুরপুরে॥
দুর্গাসুর সংহারিয়া হৈল মার দুর্গা নাম।
কি কব নামের গুণ নাহি তার অনুপাম॥
ব্রহ্মহত্যা আদি করি পঞ্চম মহাপাতকী।
দুর্গা নামে মুক্ত হয় অশেষ আর নারকী॥
দুর্গানাম মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ এইত শুনিলা।
অতঃপর ইতিহাস কহি একাম্বর লীলা॥
কঙ্কালী জন্মিল শাঁপে গৌড়ে ভূপতিকন্যা।
দ্বিজ রামচন্দ্র কবি কহে শুনহ সুধন্যা—(পৃ. ১৪০)

ইহার পর দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ। ইহার পৃষ্ঠাঙ্কও পুনরায় ১ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। আমরা সমগ্র গ্রন্থের নির্ঘণ্টটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

নির্ঘণ্ট পত্র

ভগবতীর একাম্বর যাত্রা ১, কেংকালীর অভিশাপ ৩, বেদবতীর জন্ম ৪, বেদবতীর বিবাহ ৭, সন্ন্যাসীর ঔষধগ্রহণ ১২, বাসর বর্ণনা ১৪, ব্রহ্মপুত্র নদের আগমন ২২, রাণীর মান ২৩, উভয় দাসীর কথা ২৯, বড় রাণীর কাছে রুমির কথা ৩২, ক্ষমার আগমন এবং হিংসা বর্ণনা ৩৩, বিষ্ণুশর্ম্মার সহিত ব্রাহ্মণীর কথা ৩৯, রাজার নিকটে গণকের আগমন ৪২, রাজার আক্ষেপ ৪৩, বেদবতীর বনবাস ৪৯, পঞ্চাশ অক্ষরে স্তব ৫৪, ভগবতীর অনুকম্পা ৫৭, বিদ্যাধরীর সহিত রাণীর কথা ৬১, বল্লালের জন্ম ৬৩, বল্লালের বিদ্যাভ্যাস ৬৫, রাণীর বিরহ ৬৮, রাজার যজ্ঞারম্ভ ৭৩, বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন ৭৫, কান্যকুব্জ দেশে ভাটের গমন ৭৬, পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন ৮০, যজ্ঞারম্ভ সভাবর্ণনা ৮২, বল্লালকর্তৃক পশুধারণ ৮৭, রাজার পরাভব ও পিতা পুত্রের যুদ্ধ ৯১, রাণীর রোদন ৯৯, রাজার চেতনা ১০২, রাণীর সহিত রাজার পরিচয় ১০৩, রাণীর আক্ষেপ উক্তি ১০৫, বারোমাস্যা কথন ১০৭, রাজার প্রতি ভগবতীর প্রত্যাদেশ ১০৯, ভগবতীর পূজা ১১০, রাণীর সহিত রাজার নিজদেশে গমন ১১১, বড়রাণীদিগের সহিত আলাপ ১১২, যজ্ঞ সমাপ্ত ১১৩, কৌলিন্যের নিরূপণ ১১৪, বারেন্দ্রের কুল ১১৫, কায়স্থের কুল ১১৬, রাণীর স্বর্গারোহণ ১১৭, লক্ষ্মণ সেনের জন্ম কায়স্থ ব্রাহ্মণের মিলিত সমাজ নিরূপণ ১২১।

আলোচ্য গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র পাওয়া না গেলেও, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম গ্রন্থমধ্যে বহু বার উল্লিখিত হইয়াছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) অভয়ার পাদপদ্মে মধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস ॥ (১ম ভাগ, পৃ. ৩২)

(খ) গরিটী সমাজধাম গোপাল মুখটি নাম
তার সুত দ্বিজ রামধন।

তাহার তনয় তিন   জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন

গৌরীগুণ করিল রচন ॥ (১ম ভাগ, পৃ. ১১৩)

(গ) শ্রীকবিকেশরী নাম   নিজ হরিনাভিধাম

শ্রীদুর্গামঙ্গল রসগানে ॥ (২য় ভাগ, পৃ. ২)

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষে রচনাকাল ১৭৪১ শক (= ইং ১৮১৯) এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :—

শশী ঋষি বেদ শশী শকনয় রায় ।

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ তারার ইচ্ছায়—

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইবার অব্যবহিত পরেই এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থের শেষে "স্বাক্ষরকারিদিগের নাম"-এর মধ্যে নীলমণি মল্লিক ও রামমোহন রায়ের নাম পাইতেছি ; ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নীলমণি মল্লিক পরলোক গমন করেন, এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন।

'গৌরীবিলাস' গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ; ইহাতে মাঝে মাঝে সুর, তাল, ধুয়া প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, "জয়ঘোষ নামে ইঁহাদের এক ধনাঢ্য শিষ্য ছিলেন, তাঁহার উৎসাহে রামচন্দ্র অনেক বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক রচনা করেন।...এই সকল কাব্য যাত্রারূপে গীত হইত এবং শিষ্য জয়ঘোষ সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।"* এই জয়নারায়ণ ঘোষের পিতা রামমোহনেরা অর্থেই 'গৌরীবিলাস' মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় রামচন্দ্র বলিতেছেন :—

পুস্তক প্রস্তুত করি ছিল অভিলাষ।

গায়ক দ্বারায় গীত করিব প্রকাশ ॥

* 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১ম সংখ্যা, ১৩০৫ সাল, পৃ. ১৪।

† 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ৩য় সংখ্যা, ১৩৪০ সাল, পৃ. ১১৫।

অর্থ বিনা সে সকল না হয় পূর্ণিত।
শ্রীরামমোহন ধনী করিলেন হিত॥
ছাপিলা পুস্তক করি নিজ অর্থব্যয়।
শ্রমসার্থকতা হয় গুণীগণে লয়॥

'গৌরীবিলাসে' কবি প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী ছাড়া আরও কতকগুলি নূতন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'গৌরীবিলাস' হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল; এগুলি হইতে তাঁহার রচনাশক্তির আভাস পাওয়া যাইবে :—

হংস যেন ত্যজে নীর ভোজন করয়ে ক্ষীর
গুণীর নিকট গুণ সাজে।
নতুবা বস্তু না পায় বাদুড়ে বাদাম খায়
ভেক যেন পদ্মবন মাঝে॥ (পৃ. ১২)

তোটক ছন্দ॥

জটাজালে ভালে গলে অস্থিমালা।
বোবো বোম বোবো বোম শিব শম্ভু ভোলা॥ (পৃ. ৩০)

পঞ্চাবলী ছন্দ॥

তোমার রূপে সুধার কূপে বন করেছে আল।
ভস্ম মাথায় সে বুড়াটায় সাজ্‌বে না তো ভাল॥
পদ্মমুখে গন্ধে সুখে ভ্রমর করে ভোগ।
সে ছার মুখ দেখ্‌লে দুখ পলাচ্ছে রোগশোগ॥
পাঁচটা মাথা জটায় গাঁথা তালের জটা যেন।
নবীন চাঁদে রাহুর ফাঁদে সাধে পড়িবে কেন॥
তোমার কেশ বিনোদ বেশ তাতে বকুল ফুল।
তাহার জটা বিষম কটা গঙ্গা তো কুল কুল॥

কপাল মাঝে সিঁদুর সাজে প্রভাতের রুপ।
তার কপালে আগুন জ্বলে ভ্যাতে মদন খুন॥ (পৃ. ৬৭)

একাবলী ছন্দ॥

সাজিল শঙ্কর বরের বেশ। ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন ভঙ্গা।
চারি দিগ আল রূপের শেষ॥ কুলু কুলু কুলু মস্তকে গঙ্গা॥
রজত অচল তনুর রুচি। ধক ধক ধক ললাটে বহ্নি।
বিভুতি ভূষণে শুভিছে শুচি॥ শশধর উর্দ্ধে উদয় অহ্নি॥
কটিতটে ধটী বাঘের ছাল। ... ...
কলেবরে কিবা কঙ্কাল মাল॥ চলিল শঙ্কর বৃষেরোপরি।
... ... রচিল সুন্দর কবি কেশরী॥ (পৃ. ৭৭)

ললিত প্রবন্ধ ছন্দ॥

পঞ্চ বদনেন সহ পঞ্চশরগামিনী।
অঙ্গে অর্দ্ধ সাঙ্গ শিব অর্দ্ধ অঙ্গধারিণী॥
পঞ্চানন সঞ্চারিল অর্দ্ধতনু সুন্দরী।
অর্দ্ধ রজতাঙ্গ আভা শুদ্ধ শোভা মাধুরী॥
অর্দ্ধ অতসীর সম অর্দ্ধ রত্নশোভিতং।
অর্দ্ধ তনু অস্থিমালা ভস্ম তথি ভূষিতং॥
অর্দ্ধ কটি ব্যাঘ্রাজীন উত্তরী গজাজীনং।
অর্দ্ধ শুভ্র বস্ত্রাবৃত সুনবীন লোলিতং॥
অর্দ্ধ অঙ্গে ক্ষীণমধ্য অর্দ্ধাঙ্গ পয়োধরং।
অর্দ্ধোদরে অর্দ্ধ যজ্ঞ সূত্রেব ফণীবরং॥
অর্দ্ধ মুখ হেম ইন্দু অর্দ্ধ নির্ম্মল: শশী।
অর্দ্ধ কিবা শ্মশ্রুশোভা অর্দ্ধ অরুণ রশ্মি॥
দক্ষ অক্ষি হৈমপানে ঢুলু ঢুলু ঢোলিতং।
ইন্দীবর নিন্দি বামে লোচন সুলোলিতং॥

সিন্দুরাক্ত বিন্দু ভালে অর্দ্ধ ইন্দু বর্দ্ধিতং।
চন্দনেন চর্চ্চিতাঙ্গ অর্দ্ধ ভস্মে মর্দ্দিতং ॥
অর্দ্ধ শিরে বদ্ধ বেণী গুঞ্জে ভ্রমরাশ্রেণী।
অর্দ্ধ জটাজুটঘটা গাঙ্গেয় তরঙ্গিণী ॥
দেখে অপরূপ রূপ দেববৃন্দ অম্বরে।
তৎপদারবিন্দে রামচন্দ্রচিত্ত সঞ্চরে ॥ (পৃ. ৮৫)

পিঙ্গল ছন্দ ॥

বাজিল রে রণডঙ্কা।
দগড় দগড় ডিমি বাজয়ে টিমি টিমি ঘোর ঘোষণ ঝঙ্কা ॥
তাথই থই থই নাচয়ে ধেই ধেই মারই মারই রঙ্কা।
সাজয়ে সব দল কুলু কুলু কল কল ঘনরোল মা কুরু শঙ্কা ॥
ঝুমু ঝুমু ঝাঁজর রুণু রুণু ঘাগর ঝনঝন নূপুর বাজে।
কত পরিপন্থি আমারী দন্তী নিশান ধন্তী বিরাজে ॥
তরয়ার চকমকী ঝকমক ধকধকী চর্ম্ম বর্ম্ম পরি বাজে।
মুষল মুদ্গর কামানে পুরি শর ধানুকী খরতর গাজে ॥
রণরবে রঞ্জন চঞ্চল ঝঞ্ঝা শন শন ঘন বাণ ডাকে।
মারই ধবধই কাটই তাড়ই মাভই মাভই হাঁকে ॥
গজে উরগ সম চলিল তুরঙ্গম থম থম দম দম দাপে।
সারি সারি ঢালি পাকি সঘনে সঘনে হাঁকি ধানুকী ধরি ধনু চাপে ॥
মদভরে গর্ব্বিত লোচন লোহিত চর্ব্বিত দন্তই দন্তে।
চলিল দলবল মেদিনী টল টল প্রলয় হয় বুঝি অন্তে ॥
কম্পিত ফণী ফণা কূর্ম্মের বেদনা অধীরা ধরণী হৈয়ে কম্পে।
কহে রামচন্দ্র কবি ধূলায় ঢাকিল রবি অচল চলিত হয় লম্ফে ॥

(পৃ. ১২৮-২৯)

২। **অক্রুর সংবাদ।**

ইহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং অব্যবহিত পরেই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এক খণ্ড 'অক্রুর সংবাদ' আছে; ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশ :—"শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত অক্রুর সংবাদ নামক গ্রন্থ॥ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী কর্তৃক অশেষ গম্ভ [পদ্য ?] রচিত অক্রুর সংবাদ মথুরালীলা।" পুস্তকের শেষে রচনাকাল—১৭৪৫ শক (ইং ১৮২৩) দেওয়া আছে :—

সাগরের পূর্ণশশী বাণ বেদ দশকে বসি
এই স্থানে গ্রন্থের বিশ্রাম॥

৩। **আনন্দলহরী।** ইং ১৮২৪। পৃ. ৬২।

> শ্রীশ্রীদুর্গা।—জয়তি—শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যনিজকৃতা আনন্দলহরী শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকৃত তদর্থ সাধু ভাষা সংগ্রহঃ কলিকাতায় কলুটোলায় সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল সন ১২৩১ সাল।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। ইহাতে রূপচাঁদ আচার্য্য-ক্ষোদিত একখানি ধাতু-ক্ষোদাই চিত্র আছে। পুস্তকের আরম্ভে গ্রন্থকার এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

হরিনাভিনিবাসী শ্রীরামচন্দ্র দ্বিজাত্মজঃ।
আনন্দলহরীভাষাং করোতি সুবোধায় চ॥ (পৃ. ।০)

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় রচনার তারিখ দেওয়া হইয়াছে :—

আনন্দলহরী স্তবমধু সরসিজ।
ভাষায় করিল ব্যাখ্যা রামচন্দ্র দ্বিজ॥

ইন্দু ইন্দুপিতা বেদ বাণ পরিমাণ।
এই শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত বিধা[illegible] ১০২ ॥
ইতি আনন্দলহরী সমাপ্তঃ সন ১২৩০ শাল ॥
তারিখ ২০ চৈত্র ॥

৪। **নলদময়ন্তী**। ইং ১৮২৭। পৃ. ৯২।

শ্রীশ্রীপরমেশ্বর শরণং। নলদময়ন্তী উপাক্ষণ। অর্থাৎ শ্রীযুক্ত নলরাজার কলি কত্রিক অক্ষক্রীড়া দ্বারা রাজ্যচ্যুত এবং কলিপরিত্যাগানন্তর পুনঃ-রাজ্যাভিশিক্ত। কলিকাতা। মহেন্দ্রলাল প্রেষে ছাপা হইল, নম্বর ২৭, শাঁখারিটোলা ১২৩৪।

'নলদময়ন্তী'ও দুর্গামঙ্গলান্তর্গত। পরবর্ত্তী একটি সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রে আছে :—"নলদময়ন্তী। শ্রীশ্রী৺ দুর্গামঙ্গলান্তর্গত নলদময়ন্তি উপাক্ষণ অর্থাৎ নৈশেধ কাব্য। তদ্ভাষা শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া হইয়া"।* কবি 'নলদময়ন্তী'র অনেক স্থলে 'নৈষধচরিতে'র ছায়া অবলম্বন করিয়াছেন।

'নলদময়ন্তী'র শেষে কবি 'কঙ্কালীর অভিশাপে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

নল দময়ন্তী কথা করিলে শ্রবণ।
কলির নাহিক ভয় পাপ বিমোচন ॥
অতঃপর বলি কঙ্কালীর অভিশাপ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র সংগীত আলাপ ॥

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 'নলদময়ন্তী'ও দুর্গামঙ্গলান্তর্গত। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র ন্যায় 'দুর্গামঙ্গল'ও স্বতন্ত্র কয়েক খণ্ডে বিভক্ত।

* 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা) পৃ. ১৬৪-৬৫ দ্রষ্টব্য।

'গৌরীবিলাস', 'কঙ্কালীর অভিশাপ' ও 'নলদময়ন্তী' লইয়া 'দুর্গামঙ্গল' সম্পূর্ণ হইয়াছে।

৫। **কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক**। ইং ১৮২৮। পৃ. ৭৮।

বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। মিউজিয়মের পুস্তক-তালিকায় ইহার এইরূপ বর্ণনা দেওয়া আছে :—

> **GOPINATHA CHAKRAVARTI কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক। শ্রীযুক্ত কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান। [*Koutukasarvasva nataka.* A Sanskrit play, with intervening portions appearing in a Bengali version in prose and verse by Ramschandra Tarkalankara.] pp. 78. ১২৩৫ [Caloutta? 1828.] 8.**

৬। **চন্দ্রবংশ**। ইং ১৮২৯।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে 'চন্দ্রবংশ' মুদ্রিত হয়।* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড 'চন্দ্রবংশ' আছে; তাহার পৃ. সংখ্যা ৪ + ১৪৪। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় রচনাকাল ১৭৫০ শক (=ইং ১৮২৮-২৯) এই ভাবে দেওয়া আছে :—

শুন ভাই পুণ্যবান ভারতের উপাখ্যান
রসিকজনের রসলভ্য।
মৈত্র বাণ শূন্য ভাকে সমাপন ঐ শকে
কহে রামচন্দ্র কবিসভ্য॥

কবি এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

শুন ভাই সর্ব্বজন চন্দ্র বংশ বিবরণ
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি সার।

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৯৭

নহুষের অবতংসে জন্ম যার চন্দ্রবংশে
যযাতি ভূপতি নাম যার ॥
কব কাব্য আন্তরস যাহাতে রসিক বশ
কাল গুণে আদর অধিক ।
ভক্তি মুক্তি রসপ্রতি অনেকে না লয় মতি
দেখিলাম প্রায় চারি দিক ॥
কিন্তু পূর্ব্ব কবি যারা প্রকাশ করেছে তারা
আস্ত রস সংস্কৃতে গুপ্ত ।
সাহিত্য নাটক যত প্রায় হইয়াছে হত
ইতে সংস্কৃত রস লুপ্ত ॥
ভাষায় কিঞ্চিৎ করা অনেকের মন হরা
গুণিজনে না ধরিবে দোষ ।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় যদ্যপি অগ্রাহ্য হয়
বিচক্ষণে পাইবে সন্তোষ ॥

৭। **শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক।** ইং ১৮২৯ (?)

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্ম্মবিপাক' পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়। পাদরি লঙের মতে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল—১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক শ্রীরামপুরে পুনর্ম্মুদ্রিত হয়; ইহার এক খণ্ড (পৃ. ৬১) রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। আখ্যাপত্রে প্রকাশ:—"শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক। অর্থাৎ শাতাতপ মুনিকর্তৃক সংগ্রহ মহাপাপ ও অতিপাপ ও সামান্য পাপকারি মনুষ্যদিগের জন্ম জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন যে সকল রোগ উদ্ভব হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ। তদ্ভাষার্থ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া…"

৮। মাধব মালতী।

ইহা ১৮৫২ শকে রচিত ও অব্যবহিত পরেই মুদ্রিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত (পৃ. ১২২) "মাধব মালতী নামক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারেণ বিরচিতং" এক খণ্ড আছে। গ্রন্থ-শেষে কবি 'মাধব মালতী'র রচনাকাল ১৭৫২ শক (ইং ১৮৩০-৩১) এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

চন্দ্র চন্দ্রযোনি চন্দ্রললাটবদন।
চন্দ্রহ্রাসবৃদ্ধি যাতে শক নিরূপণ॥

কবির শেষ-জীবন শোভাবাজার-রাজপরিবারের আশ্রয়ে কাটিয়াছিল। কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে তিনি এই কাব্যখানি রচনা করেন। কবি লিখিতেছেন :—

মহারাজা নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী।
তাহার বর্ণনা আমি কিরূপে বা করি॥
আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব।
সে সব বর্ণনা হয়ে নহে অসম্ভব॥
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম।
সেইমত তাহার তাবত দেখি কর্ম্ম॥
তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ।
সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবনবিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিবরাম পসপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোসাই ভট্টাচার্য্য নাম॥

এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদ।
আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥
মান্যের কি কব যার উজিরত্ব পদ।
হুকুম আছিল যার করিবারে বধ॥
বিলাতের বাদসাহ করিলে সম্মান।
গবর্ণরের ঘরে যিনি সদা চৌকী পান॥
অধিকার হাতে গড় গঙ্গামণ্ডলাদি।
হেন জন নাহি ছিল-হয় প্রতিবাদী॥
রূপের তুলনা নাই মানে গোষ্ঠীপতি।
মুখ্য বিনা কর্ম্ম নাই তাহার সন্ততি॥
তাঁর পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ।
কি কব তাঁহার গুণ ন শ্রুত ন দৃষ্ট॥
পিতাতুল্য মান্য নাম তাবত কর্ম্মেতে।
বিশেষ তাঁহার গুণ দয়ার ধর্ম্মেতে॥

দেবীবর বল্লালের যে বা ছিল ধাটি। নবীন প্রবীণ যিনি সর্ব্বগুণধাম ॥
কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটি ॥ আদ্যাশক্তি কম[illegible] কবিত্ব বিশেষ।
তার পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম। কবি রাম[illegible] প্রতি করিলা আদেশ ॥

৯। **আচার রত্নাকর গ্রন্থ।** ইং ১৮৩৪ (?)

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর সংখ্যা *Calcutta Christian Observer* পত্রে (পৃ. ৫৭৪-৭৫) এই পুস্তক হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অরুণোদয় হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত সময়ের কর্ত্তব্য সদাচার কথনই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু।*

১০। **হরপার্ব্বতীমঙ্গল।**

আমরা এই গ্রন্থের রচনা বা প্রকাশকাল জানিতে পারি নাই, তবে ইহা যে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রকাশিত, তাহা সুনিশ্চিত।†

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে'র এক খণ্ড পুস্তক (পৃ. ৩৩৯) বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদে আছে। ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশ:—"শ্রীহরপার্ব্বতী মঙ্গল মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে॥ তৎসভাসদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক রচিত॥ বিচার করিবে গুণ গুণি বিজ্ঞবর। খলের স্বভাব দোষ দেখিতে তৎপর॥ পদ্মবনে ত্যজি মধু মৃণাল ভুজঙ্গ। ভেক ভক্ষণের আশে তাহার আসঙ্গ॥"

---

* মুন্শী শ্রী আবদুল করিম 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৬৮) গ্রন্থে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এক খণ্ড 'আচার-রত্নাকরে'র সন্ধান দিয়াছেন।

† List of Bengalee Printed Books to the year 1839...*Haraparvati Mangal*, Praise of Hara and Parvati,...pages 364.—*Report of the General Committee of Public Instruction,...for the year 1838-39*, App. No. 5, p. 40.

'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে'র কবির "আত্মপরিচয়" অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

মুখটি বিখ্যাত কুলে, মেলবন্ধ যার মূলে,
শঙ্করের তনয় গোপাল।
ভরদ্বাজ মুনি অংশ, কানাই ঠাকুর বংশ,
আদান প্রদানে সম ভাল ॥
তিনি কুল ভঙ্গ নিজ, মাহিনগরেতে দ্বিজ
কামদেব সার্ব্বভৌমাখ্যান।
বিবাহ তনয়া তারি, তাহাতে সন্তান চারি,
রামধন তৃতীয় সন্তান ॥
তদঙ্গজ রামচন্দ্র, ইষ্ট চরণারবিন্দ,
একান্ত হৃদয়মাঝে ভাবি।
বিনোদরাম সুতাসুত, রচিল বিনয়যুত,
সংপ্রতি নিবাস হরিনাভি ॥

১১। কালীপুরাণ।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত এবং অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। ১২৫৫ সালে মুদ্রিত পুস্তকের এক খণ্ড (পৃ. ৪+২৭৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে। ইহার আখ্যাপত্রে আছে,—"মূল কালীপুরাণ। অর্থাৎ কামাখ্যা বর্ণন এবং ভগবতী পূজা ইত্যাদি বহুবিধ প্রকরণ আছে। বক্তা মহামুনি ঔর্ব্ব গোস্বামী॥ শ্রোতা সূর্য্যবংশোদ্ভব সগর রাজা॥ তদ্ভাষা শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃক বিরচিত হইয়া···।"

গ্রন্থশেষে ইহার রচনাকাল—১৭৫৬ শক (ইং ১৮৩৪-৩৫) এই ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে :—

রসবাণ সমুদ্র পশ্চাত সুধাকর।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ শক নৃপবর ॥

গ্রন্থারম্ভে কবি আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে শোভাবাজার-রাজবংশের পরিচয় দিয়া জানাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থও কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে রচিত। আমরা এই অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

নিবাস জাহ্নবীতীর হরিনাভী গ্রাম।
সমাজ কায়স্থ দ্বিজ কত কব নাম॥
মেলি বন্দ্য কুলেতে মুখুটি অবদাত।
অধুনা উপাধি তর্কালঙ্কার বিখ্যাত॥
পূর্ব্বে কয়খানি গ্রন্থ করেছি রচনা।
বহু রস বহু ছন্দে তাহার সূচনা॥
গৌরীর বিলাস নলদময়ন্তী কথা।
মাধব মালতী চন্দ্রবংশোদয় গাঁথা॥
কৌতুক সর্ব্বস্ব হরপার্ব্বতী মঙ্গল।
আনন্দলহরী ভাষা আচার সকল॥
কর্ম্ম বিবেকার্থ আর আছয়ে অনেক।
অক্রূর সম্বাদ ষষ্ঠী সিতলা কতেক॥
করেছি অমর ভাষা শব্দ অনুমান।
সংপ্রতি রচিব ভাষা কালীকা পুরাণ॥
বিক্রমআদিত্য তুল্য নবকৃষ্ণরাজ।
নবরত্ন সম যার পণ্ডিত সমাজ॥
তাহার তনয় রাজকৃষ্ণ বাহাদুর।
রূপে গুণে দয়া ধর্ম্মে তাবতে প্রচুর॥
তাহার তনয় অষ্ট সবে বিলক্ষণ।
শিবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ॥

কালীকৃষ্ণ নাম বর্ণনে বর্ণ হারে।
শাঁপে সুরশাপে অবতীর্ণ এ সংসারে॥
শান্ত ধীর দেবীকৃষ্ণ নামেতে তৃতীয়।
চতুর্থ অপূর্ব্বকৃষ্ণ সর্ব্বজনপ্রিয়॥
পঞ্চম মাধবকৃষ্ণ বিজ্ঞ গুণবান।
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ষষ্ঠ উপেন্দ্র সমান॥
সপ্তম নরেন্দ্রকৃষ্ণ মদন মূরতি।
যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ নাম অষ্টম সন্ততি॥
কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণসখ দেওয়ান বাটীর।
সসম্পর্ক ভাগিনেয় বিচক্ষণ ধীর॥
বৃহস্পতিতুল্য সভাপণ্ডিত শ্রীকান্ত।
মধ্যমের গুণ বলি ধীর দয়া শান্ত॥
সুশীল পণ্ডিত সুকুমার অনুপম।
ক্ষমা ধৈর্য্য দয়াশীল ধার্ম্মিক উত্তম॥
সভাসত রামচন্দ্র আজ্ঞা দিল তারে।
কালিকা পুরাণ ভাষা গীত রচিবারে॥
সেই বাক্য অনুসারে হইল রচিত।
সম্প্রতি ছাপায় গ্রন্থ হইবে মুদ্রিত॥
রচিব মানস আরো যদি আয়ু পাই।
নিবেদন মাগি কিছু সাধুজন ঠাঁই॥

উদ্ধৃত অংশে কবি স্বরচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'গৌরীবিলাস' হইতে 'অক্রূরসংবাদ' পর্য্যন্ত গ্রন্থের নাম ছাড়া ষষ্ঠী ও শীতলা সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনার আভাস পাওয়া যাইতেছে; বোধ হয়, ইহা ষষ্ঠীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল হইতে পারে। তদ্ভিন্ন 'অমরভাষা' বা অমরকোষের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আয়ুতে কুলাইলে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিতেও তাঁহার বাসনা ছিল দেখা যাইতেছে। কিন্তু 'কালীপুরাণে'র পরে তিনি অন্য কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই।

সম্পাদিত

কালিকামঙ্গল: প্রাণরাম চক্রবর্ত্তি-কৃত। ১২৪৩ সাল।

ইহা "১২৪৩ সালে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার শর্ম্মা কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া শিবাদহে মুদ্রিত।"—'এডুকেশন গেজেট', ৫ মাঘ ১২৭৯, পৃ. ৬২১ দ্রষ্টব্য।

মৃত্যু

আনুমানিক ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিকেশরী রামচন্দ্র পরলোক গমন করেন। শ্রীযুত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন:—

> রামচন্দ্র দুই বিবাহ করেন; তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। পুত্র আনন্দচন্দ্র অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান; কন্যা গোলোকমণিও বালবিধবা অবস্থায় বহু দিন বাঁচিয়া ছিলেন। এইরূপে তাঁহার বংশলোপ হয়। এখন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মাধবচন্দ্রের বংশধরেরাই হরিনাভিতে বাস করিতেছেন। ইং ১৮৪৫ সালের ১৬ই

জুন তারিখ দেওয়া একখানি দরখাস্ত দেখিলাম। রামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার প্রথমা পত্নী গৌরীমণি দেবী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (মাধবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দ্বারিকানাথ মিলিত হইয়া তাঁহার সম্পত্তির অধিকার পাইবার জন্য এই দরখাস্ত করেন; সুতরাং বুঝা যায়, ইং ১৮৪৫ (বাং ১২৫২) সালের কাছাকাছি সময়ে রামচন্দ্র মারা যান।—"রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র", 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৩য় সংখ্যা, ১৩৪০।

মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ১৩০৫ সালে একখানি পত্রে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন :—

প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ... ...প্রায় ৫৫ বৎসর হইল, রামচন্দ্রের কাল হইয়াছে।—'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১ম সংখ্যা, ১৩০৫, পৃ. ১৪।

কালীকৃষ্ণের এই উক্তি মোটামুটি ঠিক বলা যাইতে পারে।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ

?—১৮৬০

বংশ-পরিচয়

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের নিবাস—হুগলী জেলার অন্তর্গত মলয়পুরে। তাঁহার পিতার নাম রামমোহন। ২৪ পৌষ ১২৮৩ তারিখে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'সাধারণী' পত্রে (পৃ. ১৩০) ভাঙ্গামোড়ার নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

> …ঐ স্থানে [মলয়পুরে] গিয়া আমরা ভূতপূর্ব্ব মাদ্রাসা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের ললাটাঙ্কিত কবিতাটি পাঠ করিয়া সাধারণের বিদিতার্থে প্রকটিত করিতেছি :—
>
> নির্ম্মমে সাকল্যেরামভূদেবতনয়াত্মজঃ।
>
> রামমোহনসূনুঃ শ্রীমুক্তারামঃ শিবালয়ম্‌॥ ১২৫৬
>
> ১২৫৬ সালে সাকল্যরামের পৌত্র ও রামমোহনের পুত্র শ্রীমুক্তারাম শিবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ছাত্র-জীবন

মুক্তারাম কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের একজন সুযোগ্য ছাত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী। সংস্কৃত কলেজের প্রায় প্রত্যেক

শ্রেণীতেই—যেমন জ্যোতিষ, স্মৃতি—কৃতী ছাত্র হিসাবে মুক্তারাম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন বৎসর স্মৃতির ছাত্র ছিলেন এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দেই কলেজ ত্যাগ করেন।

চাকুরী-জীবন

সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মুক্তারাম শিক্ষকতা-কর্ম্মে ব্রতী হন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাঠে তাঁহার চাকুরী-জীবনের কথা কিছু কিছু জানা যায়।

হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন 'পাঠশালা'

বাংলার মাধ্যমে সাহিত্য এবং প্রাচ্য প্রতীচ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় 'পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'পাঠশালা'য় পাঠারম্ভ হয়। মুক্তারাম 'পাঠশালা'র পণ্ডিতের পদ লাভ করেন।* এই পদে তিনি এক বৎসর নিযুক্ত ছিলেন।

---

* General Report of the late General Committee of Public Instruction, for 1840-41 & 1841-42, p. 59 n.

এই রিপোর্টে আরও প্রকাশ :—"The Patshala was opened and came into operation at the close of 1839-40... It is situated a few yards from the [Hindoo] College, in the north westerly direction and across the College Street. It a lower roomed house of good ventilation." (Pp. 72-73.)

হিন্দুকলেজ

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি মুক্তারাম মাসিক ১৫৲ বেতনে হিন্দুকলেজের জুনিয়র-বিভাগের পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন।*

কলিকাতা মাদ্রাসা

দুই বৎসর হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর মুক্তারাম কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী-স্কুল-সংলগ্ন বাংলা-শ্রেণীর পণ্ডিতের পদে মাসিক ৪০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁহার নিয়োগকাল—২৬ জুন ১৮৪৩। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

> By the demise of Sreenauth Roy, the Bengalee Master, on the 15th June 1843, the office became vacant, and was filled up on the 26th† of the same month by the appointment of Mooktaram, a Pundit in the Junior Department of the Hindoo College.—General Report on Public Instruction,......for 1843-44, p. 45.

এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

সাহিত্য-সেবা

'পাঠশালা'য় শিক্ষকতাকালে মুক্তারাম হিন্দুকলেজের শিক্ষক ভুবনমোহন মিত্রের সহযোগিতায় 'পাঠশালা'র ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ বাংলায় একখানি ভূগোল প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে ইহার এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।—

---

* General Report on Public Instruction,...for 1840-42, p. 52.

† এই শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে হিন্দুকলেজের শিক্ষকবর্গের নামের তালিকায় মুক্তারামের নিয়োগকাল—২৯ জুন ১৮৪৩ দেওয়া আছে।

Geography, in 2 Parts, with 4 Supplements.	Compiled by Mooktaram Bhuttacharjee, a teacher of the Pautsalla, and Baboo Bhobunmohun Mittra, an Assistant Teacher of the Hindoo College.
There is an engraved Map of Hindoosthan.	The first part, containing Asia, is printed. The second, with Europe, Africa and America, is ready for Press. These 2 parts are for the Junior Department. The 4 Supplements, giving in detail the description of the four Quarters of the Globe, are for the Senior Departments.*

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এক খণ্ড 'শিশুসেবধি। ভূগোলসূত্র' আছে ; ইহাই মুক্তারাম-রচিত পুস্তক বলিয়া মনে হয়। পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৩ + ৪, আখ্যাপত্র এইরূপ :—

> শিশুসেবধি। ভূগোল সূত্র। হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষমহাশয়-দিগের অনুদেশে পাঠশালার ব্যবহারার্থে ভূগোল বৃত্তান্তের সংক্ষেপ সংগৃহীত। হিন্দুকালেজ প্রজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৭।

অতঃপর আমরা মুক্তারামকে সংবাদপত্র সেবায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। সেকালে যে-কয়খানি বাংলা সংবাদপত্র ছিল, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'† তাহাদের অন্যতম। ইহার তৃতীয় সম্পাদক অদ্বৈতচন্দ্র

* General Report of the late General Committee of Public Instruction, for 1840-41 & 1841-42, App. VI, pp. xxxvii—viii.

† ১০ জুন ১৮৩৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' মাসিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রথম সম্পাদক। কথিত আছে, কিছু দিন পত্রিকা

আঢ্যের আমলে (১৮৪১-১৮৭৩) বহু সুলেখক ও পণ্ডিত স্ব স্ব রচনাদি দ্বারা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতচন্দ্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

অদ্বৈতচন্দ্র-সম্পাদিত, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'ও মুক্তারাম নিয়মিতভাবে লিখিতেন। খুব সম্ভব, তিনিই কল্কিপুরাণ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যে অনুবাদ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বলাইচাঁদ সেন মুক্তারাম-কৃত কল্কিপুরাণের বঙ্গানুবাদ কবিতাকারে মুদ্রিত করেন।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের "সাহায্যে" সম্পাদিত হইয়া যে-সকল গ্রন্থ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি:—

১। **শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ** সটীকঃ। (বঙ্গাক্ষরে) মহামহোপাধ্যায় পরম ভাগবত শ্রীগোপাল ভট্ট সংগৃহীতঃ। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদকোদ্যোগতো বহুতর সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবরৈঃ সহ বিবিচ্য। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশেন শোধিতঃ। শকাব্দাঃ ১৭৬৭। পৃ. ৭১৭।

পরিচালনের পর তিনি ঢাকা কলেজে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সংবাদ সত্য হইতে পারে; কারণ, ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি, ২০ জানুয়ারি ১৮৩৮ তারিখে "হরচন্দ্র" ৩০৲ বেতনে ঢাকা স্কুলের (পরে, কলেজ) হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১২৪৫ সালের পৌষ (১৮৩৯, জানুয়ারি?) মাস হইতে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদক রূপে উদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম প্রকাশিত হয় ('বাংলা সাময়িক পত্র', পৃ. ৭৮)।

২। সেক্সপিয়র কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত **অপূর্ব্বোপাখ্যান** মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্ব কর্ত্তৃক রচিত। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য সুহৃদগণ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় সংকলিত। সন ১২৫৯ সাল। পৃ. ৫০০। (ইহাতে শেক্সপীয়রের একখানি এবং উপাখ্যানগুলি-সংক্রান্ত অনেকগুলি কাঠখোদাই চিত্র আছে।)

১৩১৮ সালে এই গ্রন্থ বসুমতী-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; ইহার আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকার-রূপে কেবলমাত্র "৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ"-এর নাম মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। **শব্দাম্বুধি।** অর্থাৎ বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর সংস্কৃত শব্দ সহকৃত-গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শকাব্দা ১৭৭৫। পৃ. ৬০৪।

৪। **আরবীয়োপাখ্যান।** আরব দেশীয় অদ্ভুত গল্প সমূহ শ্রীযুত পাদ্রি এড্‌বার্ড ফষ্টর সাহেবের সংগৃহীত ইংরেজী ভাষার পুস্তক হইতে। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত।

ইহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ; প্রত্যেক খণ্ডের প্রকাশকাল ও পত্র-সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রথম খণ্ড	...	১৭৭৫ শক	পৃ. সংখ্যা ২৯৪
দ্বিতীয় খণ্ড	...	১৭৭৬ „	„ ৩২৪

তৃতীয় খণ্ড	...	১৭৭৬ শক	পৃ. সংখ্যা ৩১৯
চতুর্থ খণ্ড	...	১৭৭৮ "	" ৩৩৮
পঞ্চম খণ্ড	...	১৭৭৯ "	" ৩৪০

এই গ্রন্থের ১-৪ খণ্ড কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে, এবং ৫ম খণ্ডটি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রাহার নিকট দেখিয়াছি।

৫। **বেণীসংহার।** মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সম্পাদিত। ১৯১২ সংবৎ। এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার এক খণ্ড আছে।

৬। **শ্রীমদ্ভাগবত।** মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। প্রথম স্কন্ধ। পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামিকৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

সমগ্র ভাগবত একাদশ বৎসর ধরিয়া দ্বাদশ স্কন্ধে প্রকাশিত হয়। প্রথম চারি স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ ১৭৭৭ শকেই সমাপ্ত হয়; শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়—৭ বৈশাখ ১৭৮৮ শকে। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ১০ম স্কন্ধের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অনুবাদে পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যকে সাহায্য করিয়াছিলেন; বাকি অংশের অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার সহ-সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

৭। **নূতন অভিধান।** জগন্নারায়ণ শর্ম্মকৃত। বিদ্যার্থি ও জ্ঞানার্থি জনগণের ব্যবহারার্থ শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক বহুতর শব্দ সংযোগ এবং সংশোধন পূর্ব্বক পুনর্নবীকৃত। শকাব্দাঃ ১৭৭৮। পৃ. ৩৫৬।

'সংবাদ অরুণোদয়'-সম্পাদক জগন্নারায়ণ শর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়) সঙ্কলিত 'নূতন অভিধান' সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে সর্ব্বপ্রথম

প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২০ ও শব্দ-সংখ্যা ১২০০০ ছিল।*

৮। **অমরার্থ দীধিতি।** অর্থাৎ কবিবর অমরসিংহকৃতাভিধানস্থ শব্দ সকলের নাম লিঙ্গ প্রকাশিকা। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক কোলব্রুকাদির সংস্কৃতাভিধান হইতে সংকলিত। সন ১২৬৩। পৃ. ১২৫ + ১৯০।

৯। **অন্নদামঙ্গল।** নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুমতি ক্রমে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক বিরচিত। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক অনেক স্থানের পুস্তকের সহিত ঐক্য এবং সংশোধন পূর্ব্বক মুদ্রিত।

এই পুস্তকের ইংরেজী আখ্যাপত্রে আছে—Revised by *Pundit Mooktaram Bidyabagis.*

আমরা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বহু কাঠখোদাই চিত্র-সম্বলিত দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক দেখিয়াছি। প্রথম সংস্করণের পুস্তক প্রকাশিত হয়—১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ১২ এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ :—

> ১২৫৮ সালের ঘটনা।——কার্ত্তিক।…সুকবি ভারতচন্দ্রের সমগ্র পুস্তক সংশোধন পূর্ব্বক এ যন্ত্রে প্রকাশ পায়।

১০। **হিতোপদেশ।** শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক সংশোধন পূর্ব্বক। ১২৬৭ সাল। পৃ. ৪৮৩।

ইহার "ভূমিকা"য় প্রকাশ :—"…বাঙ্গালা ভাষায় তাহার [সংস্কৃত হিতোপদেশের] যত যত অনুবাদ হইয়াছে তাহার মধ্যে এক খানিও

* 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার', ২য় বর্ষ, পৃ. ২৪০, ২৮৪ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বাপর সংলগ্ন বা অবিকল অর্থ কিম্বা উত্তম রূপ সংশোধিত দেখিতে পাওয়া যায় না। এ নিমিত্তে আমি কয়েক জন প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সাহায্যে সংস্কৃত হিতোপদেশ অনুবাদ করিয়া বিশিষ্ট পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করত: এই পুস্তকখানি প্রস্তুত করিলাম।”

মৃত্যু

১ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন বড় পণ্ডিত ও স্মার্ত্তকে হারাইয়াছে। কলিকাতা মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ কাপ্টেন লীস্ (W. N. Lees) বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুতে যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Pundit Mooktaram Vidyabagish, the late Head Pundit, Anglo-Persian Department of this Institution, died on the 1st April 1860....

Mooktaram Vidyabagish was a Pundit of rare acquirements. Possessing a good knowledge of Sanscrit as a language, and a general acquaintance with Hindu Literature and Philosophy, he would have maintained the position of a man of learning in any society of his countrymen. His speciality, however, was Law, and in this branch of knowledge there was no Pundit in Calcutta who held a higher place, or was more frequently consulted, than the deceased Pundit. His equality of temper and his kindness of disposition peculiarly fitted him for an instructor of youth, and, with his many other excellent qualities, endeared him to his pupils, as well as to all who knew him. His loss is deplored, but not more deeply than it deserves to be, for I regret to record that

Pundits of the merit of Mooktaram Vidyabagish are now not often to be met with.*

* General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1859-60. Appendix A. p. 170: Report of the Principal, Captain W. N. Lees, L. L. D.

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

১৮২২—১৯০৩

জন্ম ; বংশ-পরিচয়

চব্বিশ-পরগণার অন্তঃপাতি মদনমল্ল পরগণার মধ্যে রাজপুর গ্রামে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—রামধন বিদ্যাবাচস্পতি ; ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামধন "রাজপুরের চতুষ্পাঠীর অবস্থা মন্দ হওয়াতে কলিকাতায় আসিয়া ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী-গৃহের পশ্চাৎ ভাগে··· কর্ণওয়ালিস্ রাস্তার পশ্চিম প্রান্তে পুষ্করিণীর পাড়ের উপর এক টোলঘর বাঁধিয়া, কলিকাতার অধ্যাপক" হন।

বাল্য ও ছাত্রজীবন

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার "বাল্যজীবন" লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রকাশ :—

> আমাদের বাটীর অতিসন্নিকট উত্তরাংশে···তারাচাঁদ সরকারের বাটী ছিল। নিকটস্থ নূতন পুকুরের পশ্চিমাংশে বাসকারী মাণিক গুরু নামে এক ব্রাহ্মণ, ঐ সরকারের চণ্ডীমণ্ডপে ক্ষুদ্র বালকদিগের পাঠশালা করিয়াছিলেন ; আমার পঞ্চমবর্ষ বয়স্ উত্তীর্ণ হইলেই হাতে খড়ী হইয়া, ঐ মাণিক গুরুর নিকট তালপত্রে লিখন আরম্ভ করি।··· এক বৎসর কাল ঐ পাঠশালে আমার তালপত্রে লিখন ও সামান্য

সামান্য অঙ্ক শিক্ষা হয়। পরে যখন কলাপাতে লেখা আরম্ভ হয়, নানাপ্রকার নাম লিখিতে ও চিঠীপত্রাদি লিখিতে শিক্ষা হয়; তখন ঐ পাঠশালা ত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যেখানে ভবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (চণ্ডীচরণ ন্যায়ালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র) বৰ্দ্ধিষ্ণু হইয়া পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঐ স্থানে পূর্ব্বে নারায়ণ দের বাড়ী ছিল; তিনি নিজ চণ্ডীমণ্ডপে কিঞ্চিদধিকবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা করিয়াছিলেন। আমি ৬ বৎসর বয়স্ উত্তীর্ণ হইলেই ঐ পাঠশালে শিক্ষা আরম্ভ করি। তথায় সকলপ্রকার বাঙ্গলা অক্ষর লেখা ও পত্রাদি-লিখন-প্রণালী এবং শুভঙ্করের অঙ্ক সমুদায় এক বৎসর মধ্যে শিক্ষা করি। তৎকালে রাজপুরে আর অধিক বিদ্যা অভ্যাসের উপায় ছিল না। অতএব কলিকাতায় ১ খানি চৌলঘরে বাসকারী আমার পিতা আমাকে তথায় আনিলেন।

ঐ সময়ে (ইং ১৮২৪ সালে) কলিকাতা পটোলডাঙ্গানামক স্থানে গোলদিঘীর উত্তরাংশে, রাজকীয় বৃহৎ প্রাসাদে, কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় ছাত্রদিগের সংস্কৃত শিক্ষার্থ কালেজ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ দুই জাতি ভিন্ন অন্য জাতির (অর্থাৎ শূদ্রের) সংস্কৃত পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। অন্যজাতীয় বালকদিগের ইংরেজী শিক্ষার্থ তৎকালে ঐ সংস্কৃত কালেজের দুই পার্শ্বে বৃহৎ দুই একতালা বাটীতে হিন্দুদিগের অর্থ-সাহায্যে হিন্দুকালেজ নামে পাঠশালা স্থাপিত হয়। সংস্কৃত কালেজে নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনার্থ অনেকগুলি এদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হালিসহর—কুমারহট্ট-নিবাসী শিব-প্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। ব্যাকরণ-পাঠের ছাত্রসংখ্যা অধিক হওয়াতে আর দুই জন পণ্ডিতও নিযুক্ত হন। গঙ্গাধর ৪০৲ টাকা

বেতন পাইতেন এবং কলিকাতা সিমুলিয়া শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন।...

তর্কবাগীশ মহাশয় কালেজের অধ্যাপনাকর্ম্ম শেষ হইলে, বেলা ৪টার সময়ে বাটী আসিয়া, বস্ত্রাদি ত্যাগপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, আমার পিতার চতুষ্পাঠীর দাবায় বসিয়া, রাস্তার লোক দেখিতেন এবং নানা গল্প করিতেন। এমত সময়ে আমি ৮ বৎসর বয়সে পড়িয়াই কলিকাতায় আসিলাম। আমার আহারের জন্য পিতা অতিশয় বিব্রত হইলেন। আমাকে না খাওয়াইয়া কোথাও যাইতে পারিতেন না।

তর্কবাগীশ মহাশয় আমাকে দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সংস্কৃত কালেজে আমার পাঠ করিবার প্রস্তাব করিলেন। পিতৃঠাকুর বলিলেন "আমি কি করিয়া ১০টার মধ্যে খাওয়াইয়া দিব"। তাহাতে তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "গিরিশ ১০টার মধ্যে আমার বাড়ীতে খাইয়া কালেজে যাইবে"। পিতৃঠাকুর ঐ প্রস্তাবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও উপকৃত হইলেন। তদবধি আমি ২ বৎসর কাল তাঁহার বাটীতে সকালে খাইয়া পড়িতে যাইতাম; তার পর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রায় শেষ হইলে কালেজের নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিয়া মাসিক ৫৲ পাঁচটী টাকা বেতন পাইতে লাগিলাম।...

এইরূপ সংস্কৃত কালেজে প্রায় ১৩ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি সকল শাস্ত্রই কিছু কিছু শিখিলাম। বৎসর বৎসর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে ৮৲ টাকা করিয়া বেতন পাইতে লাগিলাম; তাহাতে পিতাঠাকুরেরও যৎকিঞ্চিৎ খরচের সাহায্য হইতে লাগিল। পাঠের শেষাবস্থায় ন্যায়-স্মৃতি-অধ্যয়নকালে ২।৩ বৎসর ১৫৲ টাকা করিয়া স্কলার্সিপ পাইতাম। শেষে যখন ২০৲ টাকা স্কলার্সিপ হইল, তখন কালেজের নিয়মানুসারে আমাকে

কালেজ ত্যাগ করিতে হইল, ২০৲ টাকা স্কলার্সিপ ভোগ করিতে পাইলাম না।—হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন : '৺গিরিশচন্দ্র-বিদ্যারত্নের জীবন-চরিত', পৃ. ৮-১১।

গিরিশচন্দ্র ১২ বৎসর ৫ মাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন; তন্মধ্যে এক বৎসর সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকারের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন। এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী ও সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষক জি. টি. মার্শাল তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Certified that the bearer, Girees Chunder Shurma, was a distinguished pupil of the Govt. Sanskrit College, in which he studied 12 years and which he has just been obliged to quit owing to the expiry of the time fixed for the college course. He stood *third* last year and *first* this year, on both which occasions I conducted the examinations. He was last year awarded a scholarship of 15 Rs. a month, and has frequently obtained Prizes. He has studied every branch of Sanskrit Literature and Science taught in the Institution with success and will no doubt in due time get a certificate to that effect. Amongst the Sanskrit Essays of this year, the subject of which was "Benevolence" his Essay ranked the first. He is a very intelligent and well-disposed young man.

College of Fort William
19 Jany. 1844 } G. T. MARSHALL

P. S. He has studied the English language one year since the institution of the English Department. He is accustomed to, and excels in Bengalee composition.

G. T. M.

১ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ হইতে যথারীতি প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতে মুদ্রিত হইয়াছে।

চাকুরী-জীবন

সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়া গিরিশচন্দ্রকে বাড়ী ছুটিতে হইয়াছিল; সেখানে তাঁহার পিতা তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দুই এক মাস দেশে বাস করিয়া পিতৃহীন নিঃসম্বল গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হইলেন। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার; তিনি গিরিশচন্দ্রকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, গিরিশ, ভাবিস্ না; যত দিন তোর কোন চাকরি না হয়, আমার বাসায় থাক।

গিরিশচন্দ্রকে বেশী দিন বসিয়া থাকিতে হয় নাই। তিনি ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে কিছুকাল কার্য্য করিবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (তৎকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ) চেষ্টায় গিরিশচন্দ্র ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে ব্যাকরণ-শ্রেণীর পঞ্চম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্রের চাকুরী-জীবন সংস্কৃত কলেজেই নিবদ্ধ ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন পদে ৩৭ বৎসর ১১ মাস ১৮ দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার চাকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দিতেছি।

পদ	বেতন	কার্য্যকাল
পুস্তকাধ্যক্ষ ও ব্যাকরণ-শ্রেণীর ৫ম অধ্যাপক	৩০৲	১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫—১১ নবেম্বর ১৮৫১
ব্যাকরণ-শ্রেণীর ৫ম অধ্যাপক	৪০৲	১২ নবেম্বর ১৮৫১—১৪ জুন ১৮৫৫
ব্যাকরণ শ্রেণীর ৩য় অধ্যাপক	৪৫৲	১৫ জুন ১৮৫৫—৩১ মার্চ ১৮৬০
ব্যাকরণ-শ্রেণীর ২য় অধ্যাপক	৫০৲	১ এপ্রিল ১৮৬০—১১ জুন ১৮৬৩
ঐ	৬০৲	১২ জুন ১৮৬৩—২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪
সংস্কৃত, অলঙ্কার ও ব্যাকরণের অধ্যাপক	৭৫৲	২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪—২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬
ঐ	৮০৲	১ মার্চ ১৮৬৬—৩০ জুন ১৮৭৩
সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক	১০০৲	১ জুলাই ১৮৭৩—১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
সংস্কৃত-সাহিত্য ও ব্যাকরণের অধ্যাপক	১৫০৲	২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪—৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২

৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে চাকুরী করিয়া গিরিশচন্দ্র পর-বৎসরের ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখ হইতে মাসিক ৭৫৲ পেন্‌শনে অবসর গ্রহণ করেন।

মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও কলিকাতায় বাসস্থান নির্ম্মাণ

গিরিশচন্দ্র কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় উদ্যমের ফলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে শেষে যথেষ্ট উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় 'বিদ্যারত্ন-যন্ত্র' স্থাপন করেন।* কিছু

---

* ইহার পূর্ব্বে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র আর এক ব্যক্তির সহযোগে পটলডাঙায় 'কলিকাতা সুচারু যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রের বিজ্ঞাপন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নীলমণি বসাকের 'রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম' পুস্তকের মলাটে এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে :—

দিন পরে বটতলায় আর একটি বিদ্যারত্ন-যন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র স্বীয় যন্ত্রের নাম রাখেন—গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্র।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পারসীর বাগানে ৫ কাঠা জমি ক্রয় করেন; এই পারসীর বাগান প্রথমে রোস্তমজী নামে এক জন পারসীর ছিল। জমি কিনিবার এক বৎসরের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীর উত্তরবর্ত্তী গলির নাম—গিরিশ-বিদ্যারত্ন লেন। তিনি রাজপুরের ভদ্রাসনেও পাকাবাটী নির্ম্মাণ করেন।

দানাদি পুণ্যকর্ম্ম

গিরিশচন্দ্র স্বগ্রামে একাধিক পুষ্করিণী খনন, কাশীতে "গিরিশেশ্বর" শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা (ইং ১৮৮৪), বরাহনগরে ভাগীরথী-তীরে শ্রীরাধা-মদনমোহন ও গৌরনিতাইয়ের মন্দির-সংস্কার, দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজের মূলধনে রাজপুর টাউনের অন্তর্গত গ্রামসমূহের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য দরিদ্রভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা (ইং ১৮৮৯) প্রভৃতি সৎকর্ম্মে অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ সমীপে নিবেদন এই।

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস, যিনি ইহানবোপ যন্ত্রের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি এক্ষণে উক্ত যন্ত্র পরিত্যাগ পুরঃসর শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সংযোগে, সাং কলিকাতা বাহির মৃজাপুর চাসাধোপা পাড়ায়, নং ১৩ ভবনে "কলিকাতা সুচারু যন্ত্র" স্থাপন করিলেন।...

কলিকাতা সুচারু যন্ত্র।
সন ১২৬২

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস, তথা
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

মৃত্যু

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

গ্রন্থাবলী

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতার যে 'জীবনচরিত' প্রকাশ করেন, তাহাতে "পিতৃদেবের" গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> সংস্কৃত কালেজের চাকরি করিবার সময় পিতৃদেব কতকগুলি সমস্যা পূরণ করিয়াছিলেন। ঐগুলি "সমস্যাকল্পলতা" নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।···
>
> পিতৃদেব কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কতকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, আর কতকগুলি গ্রন্থ টীকাসমেত প্রকাশ করিয়াছেন। ইং ১৮৫২ সালে মল্লিনাথ-কৃত সঞ্জীবনী-টীকাসমেত সমগ্র "রঘুবংশ" প্রকাশিত করেন···। পরে ইং ১৮৫৬ (সন ১২৬৩) সালে আশ্বিন মাসে সংস্কৃত দশকুমার-চরিতের বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। "বিধবা বিষম বিপদ্" নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটক—বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় বিধবা-বিবাহ-প্রচলনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই সময় [illegible] ইং ১৮৫৮*

* 'বিধবা বিষম বিপদ' নাটক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশ :—"···কয়েক দিবস হইল 'বিধবা বিষম বিপদ' নামে প্রকাশিত আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক দেখিয়াছি।" পরবর্ত্তী ২০এ সেপ্টেম্বরের পত্রে নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরির বিজ্ঞাপনে এই নাটকের নাম আছে; ইহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল /১০।

সালে) রচনা করেন। পরে ইং ১৮৬০ (১৭৮২ শাক) সালে বৈশাখ মাসে "শব্দসার" নামক একখানি ব্যুৎপত্তিযুক্ত সংস্কৃত-বাঙ্গলা অভিধান প্রকাশ করেন। "উৎকর্ষবিধান" নামে একখানি বালক-পাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক ইং ১৮৭০ (সন ১২৭৭) সালে শ্রাবণ মাসে প্রণয়ন করেন। ইং ১৮৭১ সালে জানুয়ারি মাসে "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ" সরল টীকা, পদান, শব্দ ও ধাতুসাধন এবং পাণিন্যাদি ব্যাকরণের সূত্রোল্লেখসমেত প্রকাশ করেন। প্রথমশিক্ষার্থী বালক-দিগের জন্য "মুগ্ধবোধসার" নামক একখানি ব্যাকরণও ইং ১৮৮০ সালে মে মাসে প্রকাশ করেন। "কাদম্বরী কথা" সরল-টীকা-সম্বলিত উত্তরভাগ ইং ১৮৮৩ সালে অগ্রহায়ণ মাসে ও পূর্ব্বভাগ ১৮৮৫ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশ করেন। উত্তরভাগটী বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য হওয়াতে উহা প্রথমেই প্রকাশ করেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম্, এ, পরীক্ষার্থ সংস্কৃত দশকুমার-চরিত হইতে একটী সংগ্রহ করিয়া ইং ১৮৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত করেন। উহা চারি বৎসর পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে।...

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, পিতৃদেবের চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছিল। পরে যখন তিনি চক্ষু পুনর্লাভ করেন, তখন স্বহস্তে ভগবদ্গীতাখানি লিখিয়াছিলেন, এবং "শ্রীকৃষ্ণাষ্টক" নামে ৮টী শ্লোকও রচনা করেন।

পেন্‌সন লইবার পর পিতৃদেব আরও ২খানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১ম—মনুসার, ২য়—কাশীখণ্ডসার। (পৃ. ৯৬-৯৭)

উপরের তালিকায় গিরিশচন্দ্রের একখানি পুস্তকের নাম বাদ পড়িয়াছে। উহা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ছাত্রশিক্ষা'। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

গিরিশচন্দ্র সাহিত্যরসিক ছিলেন। কোন লেখকই তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিয়া বিমুখ হইতেন না। নীলমণি বসাকের 'বত্রিশ সিংহাসন', লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়' প্রভৃতি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি সযত্নে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

লালমোহন বিদ্যানিধি

১৮৪৫—১৯১৬

আত্মপরিচয় ও বিবরণ

বিদ্যানিধি মহাশয় কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত "আত্মপরিচয় ও বিবরণ" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। এই "আত্মপরিচয়" নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের আত্মপরিচয় ও বিবরণ

জিলা নদিয়া বনগ্রাম সবডিবিজান মহেশপুর সমাজের ৺রমেশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র ও রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের পৌত্র, ৺রামরাম তর্কপঞ্চাননের প্রপৌত্র, নদিয়ার প্রধান রাজজ্ঞাতি ৺তারণচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র···

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য

জন্ম সন ১২৫১ সালের চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি। পঞ্চমবর্ষমধ্যে বিদ্যারম্ভ। সপ্তমবর্ষমধ্যে পাঠশালার বাঙ্গালা লেখাপড়া সমাপ্তি। একাদশ বর্ষে উপনয়ন ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সংপূর্ণরূপে আবৃত্তি। ১৩শ বর্ষমধ্যে মুগ্ধবোধ, অমরকোষ অভিধান, কবিকল্পদ্রুম ধাতুপাঠ ও ভট্টিকাব্য অধ্যয়ন। এই সমুদায়ের অধ্যয়ন মহেশপুরের, দিগম্বরপুর ও উলার চতুষ্পাঠিতে অধ্যয়ন হয়। তৎপরে মহেশপুরের মডেল স্কুলে প্রবেশ তথা হইতে ১৪ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৮৫৮ ইং সনে

সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৬৮ মধ্যে কাব্য, অলঙ্কার স্মৃতি, ন্যায়াদি অধ্যয়ন এবং তদ্বিষয়ে কৃতার্থতার নিদর্শনস্বরূপ কালেজ কমিটী হইতে বিদ্যানিধি এই উপাধি প্রাপ্তি। ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১৮৬২ ইং অব্দে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম অলঙ্কারগ্রন্থের রচনাকরণ। তাহাতে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাউলের সঙ্গে বিশেষ আনুগত্য এবং তৎকার্য্যেই বঙ্গভাষার কাব্যেতিহাসাদির সভায় বিশেষ সৌহার্দ্দ এবং রহস্যসন্দর্ভাদিতে লেখন। তাহাতে বিদ্বন্মণ্ডলীতে বিশেষরূপে পরিচিত। ১৮৬৮ শালের জানুয়ারিতে কটক কালেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠান। ১৮৭০ শালে দিনাজপুর জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের কার্য্যে নিয়োগ, ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ছোটনাগপুরের ডেপুটী ইন্‌স্পেকটারের পদে অধিবেশন। ১৮৭২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮৮ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জিলায়, নদিয়া, মুর্সিদাবাদ জিলায় কখন স্কুলসমূহের তত্ত্বাবধানকার্য্যে কখন বা ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকতায় থাকিয়া পুস্তকাদি লিখন। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে ভারতীয় আর্য্য জাতির আদিম অবস্থার বর্ণন ও তদ্বিষয়ে কৃতার্থতালাভে বিশেষ সুখ্যাতি প্রাপণ। তৎপরে সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থের লিখন ও প্রকাশকরণ।

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের কিছু দিন পরে এই আত্মপরিচয় লিখিত হয়। ‘সম্বন্ধ-নির্ণয়’ গ্রন্থের ৪র্থ পরিশিষ্ট—১ম খণ্ডে (৪র্থ সং, পৃ. ১৫৫-৬৮) তাঁহার পুত্র মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী* মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা হইতে বিদ্যানিধি মহাশয়ের শেষ জীবনের কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

* এই জীবনীর মতে—কি প্রমাণের বলে জানি না—বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্ম তারিখ ৩ চৈত্র ১৭০৪ শক (ইং ১৮৪৩)। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় স্বয়ং "আত্মচরিতে" যে তারিখ দিয়াছেন, তাহা হইতে "ইং ১৮৪৫" পাওয়া যায়।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে তিনি ১০০৲ বেতনে হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের হেড পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন।···তিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে ৩৪ বৎসর অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া, ১৯০১ সালের ১৪ই আগষ্ট হুগলী নর্ম্যাল স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করেন।···

তিনি ১৩২৩ সালের ১২ই আশ্বিন রাত্রি ৪৷০ ঘটিকার সময় (১৯১৬, ২৮শে* সেপ্টেম্বর) শান্তিপুরে জাহ্নবীতীরে ইহধাম ত্যাগ করেন।

গ্রন্থাবলী

বিদ্যানিধি মহাশয় যে-সকল পুস্তক রচনা বা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, প্রকাশকাল সমেত সেগুলির একটি তালিকা দিলাম।

১। **কাব্যনির্ণয়।** নবেম্বর ১৮৬২।

ইহা বাংলা ভাষার অলঙ্কারাদি বিষয়ে আজিও একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে। লেখক ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ বিখ্যাত কবিদিগের রচনা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বাংলার ছন্দ, দোষ গুণ, রীতি ও অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

২। **সম্বন্ধনির্ণয়।** [১৮ নবেম্বর ১৮৭৫] পৃ. ২৮০।

'সম্বন্ধনির্ণয়'—বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে গ্রন্থখানির প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

* ইংরেজী মতে "২৯এ" হইবে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত এই গ্রন্থখানি, ইউরোপে প্রচারিত হইলে, একটা কোলাহল বাঁধিয়া উঠিত; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতিউৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত; এবং অন্ততঃ কিছুকাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুরদৃষ্ট ক্রমে তিনি বাঙ্গালি, বাঙ্গালা দেশে বসিয়া, বাঙ্গালা ভাষায়, এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালি সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দূরে থাক্—কিছু সুসভ্য গালি গালাজ খান নাই, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য।

বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ; বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না।...অগ্রহায়ণ ১২৮২, পৃ. ৩৫২-৫৩।

বিদ্যানিধি মহাশয় 'সম্বন্ধনির্ণয়ে'র কয়েকটি ক্রোড়পত্র ও পরিশিষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেগুলি :—

(ক) সম্বন্ধনির্ণয়ের ১ম-২য় পরিশিষ্ট। শ্রাবণ ১৩০৭। পৃ. ৪২৪ + ৯৬।

(খ) সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র। ১৩১২ সাল। পৃ. ১৪২।

(গ) সম্বন্ধনির্ণয়ের তৃতীয় পরিশিষ্ট। বৈশাখ ১৩২১। পৃ. ২৮২।

৩। **ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।** ইং ১৮৯১, জুন। পৃ ২৯১।

লেখকের ভূমিকায় প্রকাশ, ইহার "কিয়দংশ আর্য্যদর্শন ও কিয়দংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।...কতকগুলি নূতন প্রস্তাব লিখনপূর্ব্বক প্রবন্ধের উপক্রমণিকা ভাগের সাঙ্গতা সম্পাদন করিলাম।"

৪। **মেঘদূতম্** (দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত সটীক সংস্করণ)। ইং ১৮৯৪। পৃ. ১০২।

৫। *The Meghaduta*. Trans. into English Verse with notes and illustrations, by H. H. Wilson. Edited by Lal Mohan Vidyanidhi. 1901. pp. 93.

বিদ্যানিধি মহাশয় কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি,—

(ক) **কবিকল্পদ্রুমঃ** (ধাতুপাঠ) পরিভাষা সমেত। সংবৎ ১৯২৩।

(খ) **পত্র-প্রবন্ধ** বা আদর্শ পত্র-লিখন-প্রণালী। [২৭ অক্টোবর ১৮৭৬]

(গ) **শিক্ষাসোপান,** ১ম ভাগ। সাহিত্য ও ব্যাকরণ। [২০ ডিসেম্বর ১৯০৩]। পৃ. ৮৭।

(ঘ) **চারু-প্রবন্ধ।** (গদ্য ও পদ্য) জুন ১৯১০।

এই সকল পুস্তক ছাড়া বিদ্যানিধি মহাশয় 'রহস্য-সন্দর্ভ', 'বঙ্গ-দর্শন', 'ভ্রমর', 'আর্য্যদর্শন', 'বান্ধব', 'নবপ্রভা', 'সাহিত্য-সংহিতা', 'প্রজাপতি', 'এডুকেশন গেজেট', 'বসুমতী', 'প্রতিভা' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা উচিত।

'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' সম্বন্ধে অভিমত

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—"অধিকাংশ পুস্তক আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি, উপকৃত ও প্রীত হইয়াছি। কয়েকখানি পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি, মালাকার শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ অনুসন্ধানের, পরিশ্রমের ও সমাহরণ-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেছি।"…"কয়েক বৎসর ব্রজেন্দ্রবাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক আছেন। তিনি দেশজ্ঞান প্রচারের নূতন পথ দেখাইলেন। তাঁহার সোনার দোয়াতকলম হউক।"—'প্রবাসী', চৈত্র ১৩৫০।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৮, ২৯

স্বর্ণকুমারী দেবী
মীর মশার্‌রফ হোসেন

স্বর্ণকুমারী দেবী
মীর মশার্‌রফ হোসেন

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

পঞ্চম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
৭.২—৭।৬।১৯৫৪

স্বর্ণকুমারী দেবী

১৮৫৫—১৯৩২

জন্ম : শৈশব-শিক্ষা

কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে আনুমানিক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা।*

সে কালে অন্তঃপুরিকাদের বিদ্যাশিক্ষার সেরূপ সুব্যবস্থা না থাকিলেও ঠাকুর-পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। শৈশবে ও বাল্যে যে আবেষ্টনীর মধ্যে স্বর্ণকুমারী প্রতিপালিতা হন, তাহা তিনি একটি প্রবন্ধে নিজেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> "কলিকাতার সাধারণ সম্ভ্রান্ত অন্তঃপুরের কথা জানি না, কিন্তু সে কালেও আমাদের অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। সে কাল অর্থে এ স্থলে আমি শুধু আমার শৈশব কাল গণ্য করিতেছি না—আমার পিতামাতার আমল হইতে আমার শৈশব পর্য্যন্ত এ সমস্ত কালখণ্ডটাই গণনায় আনিতেছি।...

---

* দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যা :—(১) দ্বিজেন্দ্রনাথ, (২) সত্যেন্দ্রনাথ, (৩) হেমেন্দ্রনাথ, (৪) বীরেন্দ্রনাথ, (৫) সৌদামিনী, (৬) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, (৭) সুকুমারী, (৮) পুণ্যেন্দ্রনাথ, (৯) শরৎকুমারী, (১০) স্বর্ণকুমারী, (১১) বর্ণকুমারী, (১২) সোমেন্দ্র, (১৩) রবীন্দ্রনাথ, (১৪) বুধেন্দ্র।

যখন আমার মাতৃদেবী [সারদাসুন্দরী] পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের স্ত্রীকন্যা পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভগিনী ভাগিনেয়ীগণ প্রভৃতি সকলেই এই এক বাড়ীতে তখন বাস করিতেন। এই বহু পরিবারের কেহই মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই জানিতেন।

আহার বিরাম পূজা অর্চ্চনার ন্যায় সে কালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতি দিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, অতএব বাঙ্গালা ভাল জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইঁহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল, কথকতা-ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেব দেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দর্শনলাভ ঘটে নাই,...

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাঠ্য ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা—মায়ের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির ত কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অনুবাদই হউক না কেন, তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের

"তত্ত্ববিদ্যা"র সমঝদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীনার দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সে দিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক—অন্তঃপুরে আসিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারীভরা পুতুল, খেলেনা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্ধুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।...

পিতৃদেবকে ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই সকলে জানেন। এবং যেহেতু আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার পৃথক্ বস্তু নহে, পরস্পরসংলিপ্ত, সেই হেতু ধর্ম্মসংস্কারের সহিত যে পরিমাণ সমাজসংস্কার অবশ্যম্ভাবী, সেই পরিমাণে গৌণভাবে তিনি সমাজ-সংস্কারক বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু গৌণভাবে নহে, ধর্ম্ম-সংস্কারের ন্যায় সমাজসংস্কারেও যে ইনি মুখ্যভাবে ব্রতী ছিলেন, ইঁহার দ্বারাই যে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন হইয়াছে, ইনিই যে বাল্যবিবাহের প্রথম সংস্কার করেন, এমন কি মহিলাদিগের সুসভ্য পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তন সংকল্পেও যে কত দূর মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বলিতে পারি।...

বেথুনস্কুল স্থাপিত হইবামাত্র সমাজনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া যে দুই একটি মহোদয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের শিশু কন্যাগণকে স্কুলে প্রেরণ করেন, পিতৃদেব তাঁহাদের মধ্যে একজন।

পিতৃদেব পাহাড়ে চলিয়া গেলে আমাদের অন্তঃপুরের শিক্ষা-সংস্কার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের উন্নতি আরম্ভ। তখন হইতে ধর্ম্মসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার একই সঙ্গে বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিলা বিসর্জ্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রতিদিন উপাসনার সময় সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয়

উপদেশে এবং ভিন্ন সময়ে নানারূপ সরল সহজ বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতায় তাঁহার পরিবারের, বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি সমভাবে সমাজ্জিত করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান উঠাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, সমস্ত ভারতব্যাপী বহুকালপ্রচলিত হীন স্ত্রী-আচার দুই একটি করিয়া নিজ অন্তঃপুর হইতে একেবারে উঠাইয়া দিলেন; আজিকালিকার মত বয়স্ক বিবাহ না হউক, বালিকাদিগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত করিলেন ও বিবাহের একটি নব পদ্ধতি গঠিত হইল। আমাদের মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হইতে এ পর্য্যন্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি অনুসারেই বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার শিশুকন্যাগণ শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তে উচ্চ উন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমাদের জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। অন্তঃপুরে মেম আসিতে লাগিলেন।

আমাদের বাড়ীর এই নবোন্নতিকালে কেশব বাবু পিতা মহাশয়ের শিষ্য হইলেন। অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরে বাহিরের নিঃসম্পর্কীয় লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় স্বাগত হইয়া প্রবেশলাভ করিলেন।...

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, এ সকলই মেজ দাদা মহাশয় [সত্যেন্দ্রনাথ] বিলাত যাইবার পূর্ব্বেকার কথা—১৮৫৯ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিত। প্রথমোক্ত সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়, এবং শেষোক্ত সময়ে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বৎসরান্তে, কিম্বা তাহারও পরে, ধর্ম্মের জন্য নহে—কেবল স্ত্রীশিক্ষার জন্যই, আর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন। মেমের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার মেজ দাদা মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিন জন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।" ("আমাদের গৃহে অন্তঃপুর-শিক্ষা ও তাহার সংস্কার" : 'প্রদীপ,' ভাদ্র ১৩০৬)

বিবাহ

১৭ নবেম্বর ১৮৬৭ তারিখে ১৩ বৎসর বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সহিত স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়। ১৭৮৯ শকের পৌষ-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

> **ব্রাহ্ম-বিবাহ।** গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্মবিধানানুসারে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর।* এই বিবাহ উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহুসংখ্য ভদ্র লোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিবাহের পর স্বর্ণকুমারী মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের নিকট বোম্বাইয়ে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে স্বামী আমাকে বোম্বাই রাখিয়া আসিলেন। তখনও আমি ইংরাজী জানি না বলিলেই হয়, অতি সামান্যই শিখিয়াছি। শিশুকন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া আমি এক বৎসর সেখানে ছিলাম।—'প্রদীপ,' ভাদ্র ১৩০৬, পৃ. [illegible]।

---

* ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় "নূতন সংবাদ"-বিভাগে প্রকাশিত এই বিবাহের বিবরণ পাঠে জানা যায়, "কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং সংস্কৃতও কিছু অধ্যয়ন করিয়াছেন।"

১২৯১ হইতে ১৩০১ সাল পর্য্যন্ত সাফল্যের সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়া স্বর্ণকুমারী দুই কন্যা—হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীর উপর 'ভারতী' পরিচালনের ভার অর্পণ করেন। ১৩০২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'ভারতী'তে এই বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> অবসর গ্রহণ।—এতদিন আমি আমার সাধ্যমতে ভারতীর সম্পাদন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে শরীর অসুস্থ হওয়াতে আমার কন্যাদ্বয়ের প্রতি ভারতীর ভার সমর্পণ করিয়া বর্ত্তমান বৎসর হইতে আমি অবসর গ্রহণ করিলাম। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

১৩১৫ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত স্বর্ণকুমারী পুনরায় 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে স্বামীর পরলোক গমনে তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই তিনি স্নেহভাজন আত্মীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে 'ভারতী' সঁপিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার বিদায়-বাণী উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ...যখন এই সম্পাদন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন ফলাফল লাভ ক্ষতি গণনা করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। কর্ম্মের আনন্দই কর্ম্মে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়াছিল। আজ সে উৎসাহ-উত্তেজনার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। আজ আমি বড়ই একাকী, বড় অসহায়; আজ শ্রান্তক্লান্ত দেহমন একান্তই নিবৃত্তিলোলুপ।
>
> কিন্তু প্রবৃত্তিতে আনন্দ আছে, নিবৃত্তিতে কি নাই? দানের তৃপ্তি কি গ্রহণের তৃপ্তি হইতে অল্প? পূজার মাহাত্ম্য কি বিসর্জ্জনেই ঘনীভূত নহে? বস্তুতঃ ত্যাগের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ বিরাজিত। ব্রত গ্রহণ করিয়া আমি যে উদ্‌যাপনে অবসর পাইলাম, ইহাই আমার কর্ম্মের প্রকৃত পুরস্কার।...'ভারতী,' বৈশাখ ১৩২২।

'ভারতী'র পৃষ্ঠায় স্বর্ণকুমারীর বহু রচনা—প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, নাটক-নাটিকা, কবিতা-গান মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সকল রচনার অধিকাংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস, গাথা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন।

গ্রন্থাবলী : স্বর্ণকুমারী দেবী সুদীর্ঘ কাল মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও বড় অল্প নহে। এগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :—

১। **দীপ-নির্ব্বাণ** (উপন্যাস)। ১২৮৩ সাল (১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ৩২১।

২। **বসন্ত উৎসব** (গীতিনাট্য)। ১৮০১ শক (৪ নবেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ৪০।

৩। **ছিন্নমুকুল** (উপন্যাস)। (৪ নবেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ২৩৮।

তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকে (ইং ১৯০০, পৌষ) "ইহার কোন কোন পরিচ্ছেদ একবারে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে।"

৪। **মালতী** (উপন্যাস)। ১২৮৬ সাল (২৫ মার্চ ১৮৮০)। পৃ. ৪৪।

ইহা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'মালতী ও গল্পগুচ্ছ' নামে পুনঃ প্রকাশিত হয় ; ইহাতে "মালতী" ছাড়া জীবন অভিনয়, পেনে প্রীতি, মিউটিনি ও অমরগুচ্ছ—এই গল্পগুলিও স্থান পাইয়াছে।

৫। **গাথা**। ১২৮৭ সাল (২০ ডিসেম্বর ১৮৮০)। পৃ. ৯৫।

সূচী :—শক্ত সম্প্রদান, সাধের ভাষান, খড়্গ-পরিণয়, অভাগিনী।

৬। **পৃথিবী** (বৈজ্ঞানিক পুস্তক)। আশ্বিন ১২৮৯ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮২)। পৃ. ১৮৪।

৭। **সখীসমিতি** (১২ আগষ্ট ১৮৮৬)। পৃ. ২৪।

৮। **মিবাররাজ** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক (১৭ জুন ১৮৮৭)। পৃ. ৮০।

৯। **হুগলীর ইমামবাড়ী** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। পৌষ ১২৯৪ (৮ জানুয়ারি ১৮৮৮)। পৃ. ২৫৬।

১০। **স্নেহলতা** (উপন্যাস) :

১ম খণ্ড। ১১ মাঘ ১২৯৬ (২৩ জানুয়ারি ১৮৯০)। পৃ. ২০৪+ ৭ পরিশিষ্ট।

২য় খণ্ড। ফাল্গুন ১২৯৯ (১৫ মার্চ ১৮৯৩)। পৃ. ১৮২।

১১। **বিদ্রোহ** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ১৫ শ্রাবণ ১২৯৭ (৯ আগষ্ট ১৮৯০)। পৃ. ২৮২।

১২। **বিবাহ উৎসব** (নাটক)। ? (১৩ মে ১৮৯২)। পৃ. ২৩।

১৩। **নবকাহিনী** (ছোট গল্প)। ? (১৭ আগষ্ট ১৮৯২)। পৃ. ১২৮।

সূচী :—কুমার ভীমসিংহ; ক্ষত্রিয় রমণী; ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি; সন্ন্যাসিনী; প্রতিশোধ; যমুনা; কেন ?; আমার জীবন; লজ্জাবতী; গহনা।

১৪। **ফুলের মালা** (উপন্যাস)। (১২ মার্চ ১৮৯৫)। পৃ. ১৫৯।

১৫। **কবিতা ও গান**। কার্ত্তিক ১৩০২ (১ ডিসেম্বর ১৮৯৫)। পৃ. ২৪০।

"কবিতাগুলির মধ্যে অল্পই ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং দুই চারটি আমার বাল্যরচনা। গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত, কেবল 'বসন্ত উৎসবে'র সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই; প্রসঙ্গহানি ব্যতিরেকে যে কয়েকটি উদ্ধার করা যায়, সেই কয়েকটি মাত্র ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে।"—বিজ্ঞাপন

১৬। **কাহাকে?** (উপন্যাস)। জুলাই ১৮৯৮। পৃ. ১২১।

১৮। **কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা**। ইং ১৯০১, জ্যৈষ্ঠ। পৃ. ৮১।

সূচী: কৌতুকনাট্য :—লজ্জাশীলা, বৈজ্ঞানিক বর, লোহার সিন্দুক, ষষ্ঠীর বাছা, চাক্ষুষ প্রমাণ, সৌন্দর্য্যানুরাগ, গানের সভা, ব্যাঘ্র সভা, স্বার্থ, তত্ত্বজ্ঞানী, নিজস্ব সম্পত্তি, বিরহ বেদনা, সূক্ষ্ম ডাক্তারি। বিবিধ কথা :—প্রেম, অভাব, নৈরাশ্য, কাজ, সিদ্ধি, মায়া।

১৮। **দেবকৌতুক** (কাব্যনাট্য)। ১৩১২ সাল (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬)। পৃ. ৯৬।

১৯। **কনে-বদল** (প্রহসন)। বৈশাখ ১৩১৩, ইং ১৯০৬। পৃ. ৫৮।

২০। **পাকচক্র** (প্রহসন)।? (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১১)। পৃ. ৭০+স্বরলিপি ১৮।

২১। **রাজকন্যা** (নাট্যোপন্যাস)। (১৭ এপ্রিল ১৯১৩)। পৃ. ৮২।

২২। **নিবেদিতা** (নাটক)। (৩ এপ্রিল ১৯১৭)। পৃ. ৬০।

২৩। **যুগান্ত কাব্যনাট্য**।? (২০ জানুয়ারি ১৯১৮)। পৃ. ৩৬।

২৪। **বিচিত্রা** (উপন্যাস)। ১ বৈশাখ ১৩২৭ (৭ মে ১৯২০)। পৃ. ১৫৭।

২৫। **স্বপ্নবাণী** (উপন্যাস)। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ (২৪ অক্টোবর ১৯২১)। পৃ. ১৭১।

২৬। **মিলন রাত্রি** (উপন্যাস)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ইং ১৯২৫। পৃ. ২৮৫।

২৭। **দিব্য-কমল** (নাটক)।? (১৪ এপ্রিল ১৯৩০)। পৃ. ১৬৩।

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী, ১ম—৬ষ্ঠ ভাগ। ইং ১৯১৬-১৭... (বসুমতী)

ইহাতে স্বর্ণকুমারীর প্রায় সকল পুস্তক এবং মাসিকপত্রে প্রকাশিত কতকগুলি কবিতা, গল্প ও গান স্থান পাইয়াছে।

পাঠ্য পুস্তক : স্বর্ণকুমারী 'গল্পস্বল্প' (মার্চ ১৮৮৯), 'সচিত্র বর্ণবোধ,' ১ম-২য় ভাগ (ইং ১৯০২), 'বাল্যবিনোদ' (ইং ১৯০২), 'আদর্শনীতি' (ইং ১৯০৪), 'প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ' (ইং ১৯১০), 'বাল-বোধ ব্যাকরণ' (ইং ১৯৩২) প্রভৃতি কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।

সম্পাদিত গ্রন্থ : 'হাসি ও অশ্রু' (কাব্য) : সরোজকুমারী দেবী। মাঘ ১৩০১ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ২৯৫।

স্বরলিপি-পুস্তক : স্বর্ণকুমারী-রচিত গানের দুইখানি স্বরলিপি-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরলিপিকার—শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী। অধিকাংশ গানের সুর সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন—গীতি-রচয়িত্রী স্বয়ং।

১। **গীতি-গুচ্ছ** (স্বরলিপি)। ১ম ভাগ। (১৮ জানুয়ারি ১৯২৩)। পৃ. ১২৪।

"এই গ্রন্থে জাতীয় সঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীতের সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য ভাবের গান যাহা আছে তাহাও যৌবন-সুলভ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেমসঙ্গীত নহে অতএব এই স্বরলিপি গ্রন্থ নিঃসঙ্কোচে বালক বালিকার হাতে দেওয়া যায়। এই গ্রন্থের অধিকাংশ গানই রচয়িত্রীর নব রচনা।"

২। **প্রেম-গীতি** (স্বরলিপি)। ২য় ভাগ। ? পৃ. ৭২।

ইংরেজী অনুবাদ

(১) *The Fatal Garland.* Eng. edn. by A. Christina Albers. Illustrated pp. 163. 1910

'ফুলের মালা'র ইংরেজী অনুবাদ। এই অনুবাদ প্রথমে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হয়।

(২) *An Unfinished Song.* By Mrs. Ghosal T. Werner Laurie. Ltd. London, Dec. 1913

'কাহাকে ?'র অনুবাদ।

(৩) *Short Stories.* (Ganesan, Madras)

স্বর্ণকুমারীর 'দিব্য-কমল' জর্মান্ ভাষায় Princess Kalyani নামে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য ভাষাতেও তাঁহার কোন কোন রচনা অনূদিত হইয়াছে।

নারী-কল্যাণ ও স্বদেশ-সেবা

অন্তঃপুরের বাহিরে যে বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানেও স্বর্ণকুমারী নিরলস কর্ম্মী ছিলেন। বাণী-মন্দিরে সেবিকার কার্য্য করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; নারী জাতির উন্নতির জন্য তিনি চিন্তা করিতেন,

নারীকল্যাণ-বিষয়ক কয়েকটি কাজের সহিত তাঁহার নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে।

'সখিসমিতি' ও 'মহিলা শিল্পমেলা': ১২৯৩ সালে 'সখি-সমিতি' নামে একটি মহিলা-সমিতি স্বর্ণকুমারী প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজেই ইহার সম্পাদিকার কার্য্য করিতেন। 'মহিলা শিল্পমেলা'ও তাঁহারই উদ্ভাবিত। এই প্রসঙ্গে ১২৯৫ সালের 'ভারতী ও বালক' হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য জানা যাইবে:—

> ...সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের পরস্পর সম্মিলন দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয়, ও তাঁহারা দেশহিতকর কার্য্যে যত্নবতী হয়েন, এই অভিপ্রায়ে প্রায় তিন বৎসর হইল—কলিকাতায় সখিসমিতি নামক একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।...দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সমিতিকে ১০২৫৲ টাকা দান করিয়া ইহার যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন।...অসহায় বঙ্গবিধবা ও অনাথা বঙ্গ-কন্যাগণকে সাহায্য করা এই সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য।
>
> আবশ্যক অনুসারে দুই উপায়ে এই সাহায্য দান হইবে। বিধবাই হউন বা কুমারীই হউন যিনি নিরাশ্রিত, যাঁহার কেহ নাই, বা যাঁহার অভিভাবকেরা নিতান্ত সঙ্গতিহীন, তাঁহাদের অভিভাবকদিগের সম্মতি-ক্রমে সখিসমিতি কোন কোন স্থলে তাঁহাদের ভার লইতে প্রস্তুত, কোন কোন স্থলে সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত।
>
> যে সকল অল্পবয়স্ক অনাথা-বিধবা বা কুমারীগণের ভার সখিসমিতি গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করা সখিসমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। শিক্ষিত হইয়া যখন এই বালিকাগণ অন্তঃপুরের শিক্ষা দান কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তখন সমিতি ইঁহাদিগকে বেতন দান করিবে। ইহা দ্বারা দুইটি কাজ একসঙ্গে সাধিত হইবে। অনাথা ও বিধবা বঙ্গকন্যাগণ হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত পরোপকার কার্য্যে জীবন দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে

জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, আর দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের একটি প্রকৃত পথ মুক্ত হইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধন অভিপ্রায়ে সমিতির হিতার্থীগণ কেহ কেহ মাসিক কেহ কেহ বা বাৎসরিক চাঁদা দিয়া থাকেন, কিন্তু সে চাঁদা হইতে এ কার্য্যের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে না। সেই জন্য সমিতির অর্থ বৃদ্ধির উদ্দেশে সমিতি হইতে সম্প্রতি মহিলা শিল্পমেলা নামে একটি মেলা হইয়া গিয়াছে। অর্থ বৃদ্ধি ভিন্ন মহিলাগণের শিল্পোন্নতি এবং পরস্পর সম্মিলন প্রভৃতি ইহার অন্য গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল।

গত ১৫ই পৌষ, কলিকাতায়, বেথুনস্কুল বাটীতে লেডী বেলী কর্তৃক বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এই মেলা খোলা হয়, মেলা খুলিবার পরই লেডী লাওস্‌ডাউন আগমন করেন। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি কলিকাতার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া মহিলাগণ এই মেলায় আগমন করিয়াছিলেন। মেলা তিন দিন খোলা ছিল এবং ১২টা হইতে ৩টা অবধি মেলার দোকান খোলা থাকিত। বিক্রেতা ক্রেতা ও দর্শক সকলেই এই মেলার মহিলা। মেলা উপলক্ষে বেথুনস্কুলের বাড়ীটি লতাপাতা ফুল প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। বাটীর মধ্যস্থলের খোলা উঠান চাঁদোয়া দ্বারা ঢাকিয়া উঠানের মধ্যভাগে একটি লতা পাতা রচিত কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুটীরের মধ্যে ফুলের দোকান। উঠানের চারি পার্শ্বে বারান্দায় ও ঘরে মহিলাদিগের ক্রয়োপযোগী নানারূপ দ্রব্যাদি সজ্জিত হইয়াছিল এবং এক এক জন মহিলার উপর বা দুই তিন জনের উপর দ্রব্যবিশেষ বিক্রয়ের ভার ছিল। কাহারও নিকট গহনা, কাহারও নিকট নানাপ্রকার রেশমী কাপড়, কাহারও নিকট ঢাকাই শান্তিপুরে সাড়ী, কাহারো নিকট খেলেনা, কাহারো নিকট মহিলাশিল্প ইত্যাদি।...এখানে অনেক প্রকার মহিলাশিল্প সংগ্রহ করা হইয়াছিল।...মহিলাশিল্প কি কি ছিল তাহার এইখানে একটু বর্ণনা করি।

প্রথমতঃ স্ত্রীলোকনির্ম্মিত মাছ কচ্ছপ লাউ কুমড়া প্রভৃতি কতকগুলি এমন সুন্দর শিল্প ছিল যে তাহা দেখিবামাত্র স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রম হয়।

একজন একখানি ক্ষীরের ফুলশয্যা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ক্ষীরনির্ম্মিত আসনে ক্ষীরনির্ম্মিত বর কন্যা, ক্ষীরনির্ম্মিত সখীগণ, ক্ষীরনির্ম্মিত থালায় ফুলশয্যার

নানা উপকরণ—ক্ষীরের কোন থালায় আম, কোন থালায় নেবু, কোন থালায় সন্দেশ ইত্যাদি।

একজন রমণী একখানি মাটির গ্রাম্য ছবি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকেই এখানি কৃষ্ণনগরের মনে করিয়াছিলেন। দুখানি খড়ের ঘর। প্রাঙ্গণে রমণী ধান শুকাইতেছেন। গোয়ালে গরুটা মুখ বাড়াইয়া আছে, অদূরে একজন মাথায় কাঠ লইয়া আসিতেছে। খাঁচায় একটা পাখী, দাওয়ায় একটা বেড়াল, পাশে দোলনায় ছেলে শুইয়া আছে।

একজন রমণী পুঁতির খাট, চতুর্দোলা, পালকী, কোচ, চৌকী, পাখা ইত্যাদি দিয়াছিলেন। একজন কানির ফলের ডালা, ফুলের বাগান, বাইনাচ, বাউল নাচ সব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রমণী-নির্ম্মিত বড়ির ও ধান চালের সুন্দর চিক বাজু বালা হার কণ্ঠী ইত্যাদি নানারূপ গহনা ও দড়ির শিকা, রেশম, পশম, জরী ও সুতার নানারূপ দ্রব্য—কাপড়, শাল, মোজা গলাবন্ধ, আসন, রুমাল, কাঁথা, চৌকী-ঢাকা, ফুল, ফল, পাখী, ইত্যাদি নানা প্রকার জিনিস ছিল। পিঁড়ার সূক্ষ্ম আলপানার কাজ, কার্পেটের ছবি, তেলের আঁকা সুন্দর ছবি প্রভৃতি মহিলা-রচিত শিল্পেরও অভাব ছিল না। শিল্পী মহিলাদিগের মধ্যে ৭ জন মহিলার শিল্প সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা প্রত্যেকেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু দানপ্রাপ্ত শিল্পের জন্যই সখিসমিতির পুরস্কার প্রদত্ত, সুতরাং ৫ জন মাত্র এই কারণে সখি-সমিতি হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নানা স্থান হইতে মহিলাশিল্প সংগ্রহ করা ব্যতীত আগরা, কাশ্মীর, বোম্বাই, মোরাদাবাদ, কাশী, জয়পুর, আগ্রা, গাজিপুর, বীরভূম, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে এবং কলিকাতার ইংরাজ বাঙ্গালী বড় বড় দোকানদারের নিকট হইতে নানারূপ প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি এখানে আনীত হইয়াছিল।

মেলার পর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মায়ার খেলা নামে একখানি গীতি-নাট্য বালিকাগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, দর্শক মহিলাগণ অনেকেই অভিনয় দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এইখানে একটি কথা, কেহ কেহ সখিসমিতিকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সমিতি বলিতে চাহেন। ইহার অনেক সখী ব্রাহ্ম ইহা অস্বীকার করি না; কিন্তু হিন্দু

সখীরও ইহাতে অভাব নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহার সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন যোগ নাই—দেশের সম্ভ্রান্ত মহিলা মাত্রেই ইহাতে যোগদান করিতে পারেন এবং করিয়াছেন।...

সকলেই অবগত আছেন—সখিসমিতি একটি বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনী নহে—একটি সামাজিক নিমন্ত্রণ সম্মিলনী। ইহার উদ্দেশ্যই মেলা মেশা, গল্প স্বল্প প্রভৃতি নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করা।

বাস্তবিক নির্দোষ আমোদ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের এত প্রবল যে উপযুক্ত উপায়ে যদি সেই আমোদ দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহা দ্বারা যেমন যথার্থ শিক্ষা হয় হাজার বক্তৃতাতেও তেমন হয় না। এবং যেখানে মনের উদ্দেশ্য থাকে গল্প করিয়া শিক্ষা করিব—এবং শিক্ষা দিব—সেখানে গল্পেই এই কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইতে পারে। সুতরাং কিরূপে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হইতে পারে, কিরূপে অনাথাদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে—এই সকল বিষয়ে পরামর্শ করা ব্যতীত সখিসমিতিতে গান, গল্পস্বল্প হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু অবিশুদ্ধ আমোদের ঘৃণাক্ষর এখানে নাই।

১২৯৮ সালের 'ভারতী ও বালকে' সখিসমিতির উদ্দেশ্য ও নূতন নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়াছে।* এই সংখ্যায় মুদ্রিত "সখিসমিতি ও শিল্প মেলার কর্ত্রীসভার সখিগণ"-এর তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ (Mrs. M. Ghose). শ্রীমতী বরদাসুন্দরী ঘোষ Mrs. L. Ghose. শ্রীমতী ললিতা রায় Mrs. P. L. Roy. শ্রীমতী মনোমোহিনী দত্ত Mrs. R. C. Dutt. শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্তা Mrs. B. L. Gupta. শ্রীমতী খাকমণি মল্লিক Mrs. O. C. Mullick. শ্রীমতী সরলা রায় Mrs. P. K. Ray. শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্তা Mrs. K. G. Gupta. শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী Mrs. P. Mukerji. শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী Mrs. S. P. Ganguli. শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস Mrs. G. N.

* এই প্রসঙ্গে ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত "সাত বৎসরে সখিসমিতি" প্রবন্ধ পঠিতব্য।

Dass, শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু Miss. C. M. Bose. শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী Mrs. N. N. Dutt, শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী Mrs. R. Tagore. শ্রীমতী বিধুমুখী রায় Mrs. R. N. Ray. শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী Mrs. Bagchi. শ্রীমতী সুরবালা দেবী Mrs. T. N. Mukharji. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী Mrs. J. Ghosal. সম্পাদিকা।

এই নারীকল্যাণ-কার্য্যে স্বর্ণকুমারীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা—হিরণ্ময়ী দেবী। সরলা দেবী লিখিয়াছেন :—

> থিয়সফির তখন খুব প্রচার, আমাদের বাড়ীতে মহিলা-থিয়সফিক্যাল সভা বসিত। নানা পরিবারের মেয়েদের আনাগোনা ও মাতৃদেবীর সহিত সখিত্ব স্থাপিত হইল। মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল অল্কট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, মহিলাদের উপদেশ দিতেন। মাদাম ব্লাভাটস্কির দলভঙ্গের পর থিয়সফির প্রতি শ্রদ্ধার যখন মান্দ্য পড়িয়া গেল 'সখিসমিতি' নাম দিয়া মাতৃদেবী একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করিলেন। থিয়সফিতে দীক্ষিত হওয়ার সূত্রে যাঁহাদের সহিত পরিচয় আরম্ভ হইয়াছিল তাঁহাদের লইয়াই ইহা প্রথম আরম্ভ হইল। নামকরণ রবীন্দ্রনাথ-কৃত। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিপন্ন বিধবা ও কুমারী মেয়েদের বৃত্তি দিয়া শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা, অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী পাঠান, শিল্পমেলায় মহিলাদের দ্বারা অভিনয় করান প্রভৃতির আয়োজনে সখিসমিতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। হিরণ্ময়ী দেবী এ সব কার্য্যে মাতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ('ভারতী,' ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ. ৩৭৪)

এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, ১৮৮২-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী 'লেডীস্ থিয়সফিক্যাল সোসাইটি'র সভানেত্রী ছিলেন।

হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রম, বালীগঞ্জ :—কালক্রমে সখিসমিতির আয়ু ফুরাইয়া আসিলে, উহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য হিরণ্ময়ী দেবী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রূপান্তরিত আকারে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলেন।* ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে (২৯ আষাঢ় ১৩৩২) হিরণ্ময়ী

* এই প্রসঙ্গে ১৩১৫ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হিরণ্ময়ী দেবীর "মহিলাশিল্পসমিতি" প্রবন্ধটি পঠিতব্য।

দেবীর মৃত্যু হইলে সরলা দেবী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কথা যাহা লেখেন, তাহাতে বিধবা-শিল্পাশ্রম সম্বন্ধে এই অংশটি আছে :—

> উপর্যুপরি অনেকগুলি সন্তানবিয়োগে হিরন্ময়ীর সন্তানবাৎসল্য-বুভুক্ষিত হৃদয় সখিসমিতির আশ্রিত কোন কোন অনাথ বা দুরবস্থাপন্ন বালিকাদের নিজের কাছে রাখিয়া পালনের জন্ত উন্মুখ হইল। বরাহনগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের সহিত এই উপলক্ষ্যে তাঁহার পরিচয় হয়। তাহার পর মাতৃপ্রতিষ্ঠিত ম্রিয়মাণ সখিসমিতি সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় নাম ও আকারের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া উহা বর্ত্তমান বিধবা-শিল্পাশ্রমে পর্য্যবসিত হইল। এই শিল্পাশ্রমের অনতিপূর্ব্বে তিনি অন্তঃপুরমহিলাদের শিক্ষার জন্ত একটি কলাভবন খুলিয়াছিলেন। মূল সখিসমিতি ও কলাভবনের সংমিশ্রণজাত এই বিধবা-শিল্পাশ্রম, হিরন্ময়ী দেবীর নিজস্ব কীর্ত্তি।...এখন একটি কমিটির সহায়তায় এই আশ্রমটি পরিচালিত হইতেছে—কমিটির প্রেসিডেন্ট পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।...তাঁর [হিরন্ময়ীর] দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হইতেই আসিয়াছিল, মাতার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্ত সখিসমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবাশ্রমের জন্ম। ('ভারতী,' ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ ৩৭৪-৭৫)

স্বর্ণকুমারী দেবী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বিধবা-শিল্পাশ্রমের সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালন করেন— সখী-শিল্প-সমিতি। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী এই সমিতিকে তাঁহার রচিত যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব দান করিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেস : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই জানকীনাথ আমরণ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বর্ণকুমারীও স্বামীর শিক্ষায় রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী "প্রতিনিধি"-রূপে যোগদান করিয়াছিলেন। আর কোন মহিলা প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই।

সাহিত্য-সেবার পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভানেত্রী :—১৩৩৬ সালের ১৯-২১এ মাঘ কলিকাতায় ১৯শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারায়, তৎপদে স্বর্ণকুমারী দেবী সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হন। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে মূল সভানেত্রীর পদলাভের সৌভাগ্য আর কোন মহিলার ঘটে নাই। তবে ২০-২১ চৈত্র ১৩৩২ তারিখে সিউড়িতে অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহার কন্যা সরলা দেবী সাহিত্য-শাখার সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক :—১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, শ্রেষ্ঠ লেখিকারূপে তাঁহাকে 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' দান করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার সমাদর করিয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীই সর্ব্বপ্রথম এই পদক লাভ করেন।

মৃত্যু

স্বর্ণকুমারীর সুদীর্ঘ জীবন বাণী-সাধনায় সমুজ্জ্বল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। ৩ জুলাই ১৯৩২ (১৯ আষাঢ় ১৩৩৯) তারিখে বালীগঞ্জের বাসভবনে তাঁহার জীবন-প্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

স্বর্ণকুমারী ও বাংলা-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রতিভার প্রখর দীপ্তিতে বাংলা দেশে যে-সকল স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্ক অদ্যাপি ম্লান হইয়া আছে, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব এখন অন্তরালে গিয়াছে। আমাদের মনে হয়, অতঃপর বিস্মৃত ও বিলুপ্তপ্রায় জ্যোতিষ্কেরা স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইবেন। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনীটি বাংলা দেশের বর্ত্তমান সাহিত্য-রসিক-সমাজে স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য-কীর্ত্তির কিছু পরিচয় বহন করিবে।

ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংযোগের পর বাংলা দেশের সাহিত্যে যে নবজাগরণ হয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর কণ্ঠেই দেশের নারী-সমাজের পক্ষে তাহার প্রথম কলগীতি ধ্বনিত হইয়া উঠে। প্রথম হইলেও তাহা অস্ফুট কলগানমাত্র নয়। গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কৌতুক-নাট্য, প্রহসন, কবিতা, প্রবন্ধ (সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক) —সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁহার দানের পরিমাণ বিপুল। উৎকর্ষের দিক্ দিয়াও তাহা যে গণনার অযোগ্য নয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহাদের কাছেই তাহা স্পষ্ট হইবে। এইগুলি অপঠিত আছে বলিয়াই স্বর্ণকুমারী সাহিত্যক্ষেত্রে তাদৃশ বিখ্যাত হন নাই—যদিচ সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী নামে অভিহিত করিয়া দেশের লোক এবং জগত্তারিণী-পদক দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল সম্মানের মূলে তাঁহার প্রতিভার প্রতি খাতির ততখানি নাই—যতখানি বঙ্গীয় নারীসমাজে তিনিই

প্রথম বলিয়া আছে। আমরা তাঁহার রচনার কালানুক্রমিক তালিকা মাত্র দিয়াছি, এগুলি সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই অনুভব করিবেন, স্বর্ণকুমারী সাহিত্য-শিল্পীও সামান্যা নহেন। 'ভারতী'র সম্পাদিকা হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠার কথা আজ আমরা ভুলিয়া গেলেও তিনি যে ঐ কার্য্য করিয়া বাংলা দেশের নারীদের অক্ষমতার অপযশ ঘুচাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বদেশ-প্রেমই স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-সাধনার উৎস। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দীপ-নির্ব্বাণে'র "উপহার"-পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

আর্য্য-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,
বহিবে নয়নে তব শোক-অশ্রুধার,
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি,
ঢেকেছে ভারত-ভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোণার দীপ, ভেঙ্গেছে কপাল!

এই স্বদেশ-প্রেম তাঁহার প্রায় সকল রচনাতেই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে নানা বিষয়ে দিদি স্বর্ণকুমারীকে অনুসরণ করিয়া চলিতেন। স্বর্ণকুমারীর কবিতা অতিশয় মধুর; তাঁহার গদ্যের ভাষাও চমৎকার। একটু দৃষ্টান্ত দিতেছি—

পুরী মরু-রাজ্য; আসমুদ্র কেবলই বালি বালি বালি,—আশে বালি, পাশে বালি, খাদ্যে বালি, বিছানায় বালি, রৌদ্রে বালি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে,—বৃষ্টিতে ইহার ক্ষয় নাই, আর্দ্রতার চিহ্নমাত্র নাই, ইহা অক্ষত অব্যয়! দিগন্তে সমুদ্ররাজ অনবরত তুর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বালু-তীর আক্রমণ করিতেছেন, আবার প্রতিহত হইয়া দূরে ফিরিয়া চলিয়াছেন, অবিশ্রান্ত এই সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু বালির এক কণা নাশ করিতে পারেন নাই।

ব্যঙ্গ ও কৌতুক রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার 'পাক-চক্র' প্রহসনের ঘটকীর গানটি উপভোগ্য; উহা এইরূপ :—

আমি কি যেমন তেমন ঘটকী, ও গিন্নি।
আমার পায়ে পড়ে আট পহরে ভারে ভারে সিন্নি!
রং বেরঙের, সুগুণ সুরূপ,
এক একটি বর আস্ত তুরূপ,—
আমার হাত ধরা,—
আর কনে সবি, হরেক বিবি—
এমন কেউ কখনো পান নি।
চাও যদি গো গুণের মেয়ে—
ভাঁর—না ফুরাবে অন্ন দিয়ে,—
আনব—স্বয়ং দ্রৌপদী—
কিম্বা পটল পারা চক্ষু চেরা—
চাও কি রূপের বহ্নি?
নয়—যদি চাও টাকার থলে,
তাহাও বল খুলে খেলে
ওগো—বিলাত যাবে—তোমার ছেলে,—
সবাই কবে ধন্যি।
বেশী কথা কি কব আর,
ভবে করি যাত্রী পার—
আমি কাণ্ডারী,
ছেলে মেয়ে, মা বাপেরা,
পার হতে চাও যারা যারা
আঁচল ধরে দাঁড়াও তারা,—
আমি—নহি ত সামান্যি।

তিনি খাঁটি বাংলা বুলির প্রয়োগকুশল শিল্পী ছিলেন। তাহার পরিচয় কৌতুক-নাট্যগুলিতে আছে। "লজ্জাশীলা" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

সিদ্ধেশ্বরী। কামিনী যে! এতক্ষণে কি আসতে হয়? বোনঝির গায়ে-হলুদ সব করবি কর্ম্মাবি, মা একেবারে বেলা পুইয়ে এলি!

নিধু। ও ভেবেছে বেলায় এসে হলুদের পালাটা এড়াবে, সেটি হচ্ছে না। সোনার রং কলিয়ে তুলবো লো ছাড়ব না।

কামিনী। মাইরি ভাই, তোদের পায়ে পড়ি বিকাল বেলাটা আর হলুদ দিস্ নে। নিজেরা ত রং ফুটিয়েছিস সেই ভাল! চমৎকার বাহার হয়েছে, আমায় মাপ কর।

কি বাহার করেছ রে প্রাণ কিবা হার পরেছ গলে,
দেখে তোমার মুখশশী মুনিজনার মন ভোলে।

সিধু। (সানন্দে নিজ অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে) কামিনি তোর কি মিষ্টি গলা ভাই! আমার সারাদিন শুনতে ইচ্ছা করে।

নিধু। বাহারটা তোরই যেন কিছু কম? অমন রঙ্গিন্ ফিতে কোথায় পেলি বল দেখি?

কামিনী। সে তোর ঠাকুরজামাইকে জিজ্ঞাসা করিস। হুটিয়ে না লাটিয়ে বলে কোন ইংরাজ দোকান আছে, আমার ছাই অত নাম মনে থাকে না, সেখান থেকে এই সব জুটিয়ে জাটিয়ে আনেন। যাহ'ক কার কথা তখন বলছিলি? বল্ না? লাজলজ্জার মাথা কে খেয়েছে?

নিধু। এই ঘোসেদের শশীর বৌএর কথা হচ্ছিল।

কামিনী। কেন তার কি হয়েছে কি?

সিধু। হবে আর কি! যতদূর হবার তা হয়েছে! একেবারে মেম সেজে গাউন পরে এসেছে। মা গো আমরা ত সাত জন্মে পারি নে! দেখে অবধি গা কস্‌কস্ করছে, তাই সে ঘর থেকে উঠে এসেছি। (ঘাড় বাঁকাইয়া অধরোষ্ঠ ভঙ্গী করিয়া ঘৃণা প্রকাশ)

নিধু। আর বল্লে কি হবে, কলিযুগ দেখছি উল্টে গেল!

কামিনী। সত্যি নাকি বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে শেষে বিবি সাজলে! ও মা কোথায় যাব মা?

সিধু। এমন তেমন বিবি! গায়ে জামা—

কামিনী। গায়ে জামা——তা—

সিধু। শুধু জামা! ভিতরে আবার বিদিকিচ্ছি মোটা ঘাগরা। সাড়ি সে শুধু নাম রক্ষে! দেখে অবধি লজ্জায় ঘেন্নায় একেবারে মরে যাচ্ছি।

কামিনী। এই যে বল্লি গাউন!

সিধু। গাউন না সে গাউনের বাবা! বিমন্বরণবাড়ীতে এসেছ নীলাম্বরী পর, নেট পর, পায়নাপল পর, তা না কি সংটাই সেজেছে, একবার দেখবি চল না। ('কৌতুক নাট্য,' পৃ. ১-৩)

স্বর্ণকুমারী দেবী স্বয়ং তাঁহার বাণীসাধনার কথা 'গীতি-গুচ্ছে'র একটি গানে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

ওগো কমল আসনা—রঙ্গিনী বীণাপাণি।
আমি কাহাকেও আর জানি না ভারতি
তোমারেই শুধু জানি!

ওগো মধুরছন্দা, হৃদয়ানন্দা,
না জানি প্রভাত না জানি সন্ধ্যা,
তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া, জীবন ধন্য মানি।

আমি জানি না ত তাহা ভাল কি মন্দ,
বাসহীন কিবা মধুরগন্ধ,
শুধু প্রীতিপূরিত পরমানন্দ লভি গো চরণে দানি!

আমি, না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি,
চাহি না মুক্তি চাহি না সিদ্ধি,
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ, তোমারি অমৃতবাণী।

তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনায় তাঁহার কামনা পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি ভারতীর প্রসাদ ও অমৃতবাণী লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের সকল

বিভাগ লইয়া আলোচনা করিতে গেলে নিঃসংশয়ে বলা যায়, বাংলা দেশের কোনও নারীর সাহিত্য-কীর্ত্তি এত বিরাট্ নয়; তিনি শুধু অগ্রণী নন, শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সাহিত্য পঠিত ও আলোচিত হইলে এই সত্য দিনে দিনেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

মীর মশার্‌রফ হোসেন

১৮৪৭—১৯১২

বাল্য-জীবন : বিবাহ : চাকুরী

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর (১২৫৪, ২৮ কার্ত্তিক) নদীয়া জেলার গৌরীতটস্থ লাহিনীপাড়া গ্রামে মীর মশার্‌রফ হোসেনের জন্ম হয়।* তাঁহার পিতার নাম মীর মুয়াজ্জম হোসেন। ইঁহাদের বংশমর্য্যাদা ও বংশ-পরিচয়ের উপাধি—সৈয়দ; কার্য্যের পারদর্শিতা অনুসারে রাজদত্ত উপাধি—মীর।

মশার্‌রফ শৈশবে জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় বাংলা শিক্ষা করেন। তাহার পর কিছু দিন কুষ্টিয়ার ইংরেজী-বাংলা স্কুলে এবং এক বৎসর পদম্‌দী নবাব-স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৮৬৪ সনের অক্টোবর মাসে তিনি পদম্‌দী-স্কুল হইতে বিদায় লইয়া পিতার নির্দ্দেশে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন; উমেশচন্দ্র দত্ত তখন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ। কিছু দিন পরে তিনি কৃষ্ণনগর হইতে সঙ্গীদের সহিত কলিকাতা বেড়াইতে আসেন এবং পিতৃবন্ধু নাদির হোসেনের (তৎকালে আলীপুরের আমীন) চেতলার বাসায় কয়েক দিন অবস্থান করেন। ইহার অল্প দিন পরেই নাদির হোসেনের

---

* ২৯ আশ্বিন ১৩১০ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত মশার্‌রফ হোসেনের পিতার জীবনী হইতে এই তারিখ গৃহীত হইয়াছে।

আগ্রহাতিশয্যে, মুয়াজ্জম হোসেন পুত্রকে বন্ধুর বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে অনুমতি দেন।

চেতলায় অবস্থানকালে নাদির হোসেনের প্রথমা কন্যা লতিফ-উন্‌-নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ গোপনে স্থির হয়। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে, তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বে, হোসেন সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা আজীজ-উন্‌-নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া যায় (১৯ মে ১৮৬৫)। ইহার আট বৎসর পরে তিনি বিবি কুলসুমকে বিবাহ করেন (মাঘ ১২৮০)।

মশার্‌রফ হোসেন জীবনের বেশীর ভাগ সময় ফরিদপুরের নবাব এস্টেটে ও ১২৯১ সাল হইতে দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজারের পদে কাজ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-সেবা

ছাত্রাবস্থা হইতেই মশার্‌রফ হোসেন বাংলা-সাহিত্যে আকৃষ্ট হন। তিনি আত্মকথায় লিখিয়া গিয়াছেন :—

> কলিকাতার সংবাদপ্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহিত পত্রে পত্রে দেখাশুনা যেরূপ হইতে পারে তাহা আছে। আমি অনেক সংবাদ তাঁহাদের কাগজে লিখিতাম। তাঁহারাও দয়া করে ছাপাইতেন। আমাকে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন—"আমাদের কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা," কেউ জানিত না যে আমি প্রভাকর পত্রিকায় কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা।—সাদাসিদা ভাবে লিখিতাম। ভুবনবাবু কাটিয়া

ছাঁটিয়া প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া দিতেন।* কোন কোন সংবাদ বাদও দিতেন। সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইতাম। কুমারখালিতে সে সময়ে গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা প্রকাশ হইত। কুমারখালি, আমার বাটী হইতে নিকটে। গ্রামবার্ত্তা সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্থায় স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থায় মান্ত করিতাম। সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামবার্ত্তায় সংবাদ লিখিতাম। প্রভাকরেও লিখিতাম। মস্তারপুরে [যশোহরে] বসিয়া বসিয়া থাকি, কোন কাজকর্ম্ম নাই।—সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নিয়মিতরূপে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। হরিনাথ বাবু কপতক্ষ নদীর অবস্থা লিখিতে পত্র লিখিলেন, এক এক দিন বহু দূর নৌকা করিয়া দেখিয়া আসিয়া লিখিতাম। তিনি কাটিয়া ছাঁটিয়া নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন। এদিকে হরিনাথবাবু আর কলিকাতার দিকে ভুবনবাবু আমার সামান্ত লিখা সংশোধন করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করা আরম্ভ করিলেন। ('আমার জীবনী,' পৃ. ৩৩৬-৩৭)

ইহা ১৮৬৫ সালের মে মাসে তাঁহার বিবাহের দুই-তিন মাস পূর্ব্বেকার কথা। এই সময় 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার আত্মকথায় প্রকাশ :—

প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম। মুসলমানের বিবাহপদ্ধতি—মনের কথা যাহা মনে উদয় হইল ; যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে, তাহার দোষ ধরিয়া যথাসাধ্য লিখিলাম। (পৃ. ৩৩৯)

মীর মশার্‌রফ হোসেন দীর্ঘ কাল বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়া

* "স্বয়ং ভুবনচন্দ্রের মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ" করিয়া, তাঁহারই জীবিতকালে যতীন্দ্রনাথ দত্ত তৎসম্পাদিত 'জন্মভূমি'তে (ভাদ্র ১৩১০) তাঁহার যে জীবনী প্রকাশ করেন, তাহাতে মশার্‌রফ হোসেনের রচনা সম্বন্ধে এই অংশটুকু আছে :—"কুষ্টিয়া-নিবাসী সৈয়দ মীর মশারফ হোসেন নামক এক মুসলমান যুবক দুইখানি বাংলা পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতে আনেন, তিনি তাহা উত্তমরূপে শোধন করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সজ্জিত করেন, একখানির নাম 'বসন্তকুমারী,' অপরখানির নাম 'বিষাদসিন্ধু'।"

গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য :—

মীর সাহেবের পূর্ব্বে মুসলমান-লিখিত বঙ্গসাহিত্যে কবিতা ছিল, পড়িবার মত গদ্য ছিল না। এখন অনেকে সুখপাঠ্য গদ্য গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, মুসলমান গদ্যলেখকবর্গের মধ্যে এখন পর্য্যন্তও মীর সাহেব সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বলিয়া পরিচিত। ইনি অদ্যাপি সাহিত্যসেবায় ব্যাপৃত আছেন। কুষ্টিয়ানিবাসী মীর মশারফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত অনুরক্ত। কাঙ্গাল হরিনাথ ইঁহার সাহিত্যগুরু ; প্রথমে 'গ্রামবার্ত্তা'র পরে 'প্রভাকরে' লিখিয়া লিখিয়া লেখা শিখিয়া, মীর সাহেব 'আজিজন্ নেহার' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন। মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে তাহাই সর্ব্বপ্রথম বলিয়া পরিচিত। তাহার পর বহু গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গীয় লেখকবর্গের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। কুষ্টিয়া একদা নীলবিগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার যথার্থ কাহিনী মীর সাহেব 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নামক এক বিচিত্র উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পল্লীনিবাসী মুসলমান লেখক কিরূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ কৌতূহলপূর্ণ। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে দেশে এত কাগজ ছিল না, এত গ্রন্থ ছিল না, এত মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, ছিল গুরু-মহাশয়ের পাঠশালা বা দুই একটি বঙ্গবিদ্যালয়, দুই চারিখানি কলেজ এবং দুই দশখানা ভাল পুস্তক। তৎকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশারফ হোসেন যে সাহিত্য-শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। ('প্রদীপ,' পৌষ ১৩০৮)

গ্রন্থাবলী : মীর মশার্‌রফ হোসেনের রচিত পুস্তকগুলির একটি তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **রত্নবতী** (উপন্যাস)। শ্রাবণ ১২৭৬ (২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯)। পৃ. ৬১।

"রত্নবতী প্রথম বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। একটি কৌতুকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার রচনা কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। ইহা কোন পুস্তক-বিশেষের অনুবাদ নহে। আজকাল অনেকানেক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার অনুবাদের পক্ষপাতী হইয়া সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন। আমি সে পথের পথিক না হইয়া যথাসাধ্য এই গল্পটি কল্পনা করিয়াছি। ভাষা-সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন যত দূর পারিয়াছি, সামঞ্জস্য রাখিতে ত্রুটি করি নাই। গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম।...শ্রীমীর মসাররফ হোসেন। কুষ্টিয়া,—লাহিনীপাড়া। ৩০এ শ্রাবণ,—১২৭৬।"—বিজ্ঞাপন।

২। **গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু** (কবিতা)। পৌষ ১২৭৯ (২০ জানুয়ারি ১৮৭৩)। পৃ. ১৮।

ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১২৮০) যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য; তিনি লেখেন :—

গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ন্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইঁহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা, হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যত দিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে, যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দ্দু ফারসীর চালনা করিবেন, তত দিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না, জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা। অতএব মীর মসাররফ হসেন সাহেবের বাঙ্গালাভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইবেন।

৩। **বসন্তকুমারী নাটক**। মাঘ ১২৭৯ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩)।
পৃ. ১২৭।

৪। **জমীদার দর্পণ** (নাটক)। চৈত্র ১২৭৯ (১ মে ১৮৭৩)।
পৃ. ৭২।

৫। **এর উপায় কি?** (প্রহসন)। ইং ১৮৭৫।
১৮৭৫, ২৫এ সেপ্টেম্বরের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য় বিজ্ঞাপিত।

৬। **বিষাদ-সিন্ধু !!!**

মহরম পর্ব্ব। ১২৯১ সাল (১ মে ১৮৮৫)। পৃ. ২০৪।
উদ্ধার পর্ব্ব। ১ শ্রাবণ ১২৯৪ (১৪ আগষ্ট ১৮৮৭)। পৃ. ১৯১।
এজিদ-বধ পর্ব্ব। ১২৯৭ সাল (১০ মার্চ ১৮৯১)। পৃ. ৪৩।

"চান্দ্র মাসের বৎসরের প্রথম মাসের নাম মহরম। হিজ্‌রী ৬১ সালের ৮ই মহরম তাঁরিখে মদিনাধিপতি হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালাভূমিতে উপস্থিত হন; এবং এজিদ-প্রেরিত সৈন্যহস্তে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন; সেই শোচনীয় ঘটনা মহরম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ ঘটনার মূল কি এবং কি কারণে সেই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বোধ হয় অনেকেই অনবগত আছেন। পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত হইল। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণের রচনা-কৌশল এবং শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। মাদৃশ লোকের পক্ষে তদ্বিষয়ের যথার্থ গৌরব-রক্ষার আকাঙ্ক্ষা বামনের বিধু ধরণের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় এক প্রকার দুরাকাঙ্ক্ষা বলিতে হইবে। তবে মহরমের মূল ঘটনাটি বঙ্গভাষাপ্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু'মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল।"—মুখবন্ধ

সমসাময়িক সাহিত্যে ইহা কিরূপ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, তাহার দুইটি নিদর্শন দিতেছি:—

"গ্রন্থকর্তা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং গতজীবন 'আজীজন্ নাহার' সম্বাদ পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাঁহার লেখনীর নূতন পরিচয় প্রদান বাহুল্য। প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তান্ত বিষাদসিন্ধুর গর্ভ পূর্ণ হইয়া বিষাদসিন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটী স্থান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে, পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না।...মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।" ('গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা', ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)

"ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গলা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট, নায়ক নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাঙ্গলা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" ('ভারতী,' ফাল্গুন ১২৯৩)

৭। **সঙ্গীত লহরী,** ১ম খণ্ড। ১২৯৪ সাল। পৃ. ৬৮।

৮। **গো-জীবন** (প্রবন্ধ)। ২৫ ফাল্গুন ১২৯৫ (৮ মার্চ ১৮৮৯)। পৃ. ৬৬।

"কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই যাহাতে গোজীবন রক্ষায় সচেষ্ট হন, এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানি লিখিত। গো বধের বিরুদ্ধে লেখক যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয়, লেখকের হৃদয় হইতে সে সকল কথা উত্থিত, তিনি কেবল মুখের কথা মাত্র বলিতেছেন না। পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষয়ে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন—যেরূপ অপক্ষপাতী ভাবে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে, আমাদের আশ্চর্য্যও জন্মিল। ভরসা করি, অন্য মুসলমানগণ তাঁহার অনুসরণ করিবেন।" ('ভারতী ও বালক,' চৈত্র ১২৯৫)

৯। **বেহুলা গীতাভিনয়**। ৭ আশ্বিন ১২৯৬ (২৩ জুন ১৮৮৯)। পৃ. ১৩৮।

"বেহুলা নখিন্দরের কথা নূতন নহে। বঙ্গের স্ত্রী মহলে বেহুলার কাহিনী —বড়ই আদরের। কথাটা যে একেবারেই উপকথা—এরূপ বোধ হয় না। ভাগলপুর অঞ্চলে চাম্পাই নগর, সাতালী পর্ব্বতের চিহ্ন—এবং ত্রিবেণীর নিকট নেতা ধোপানীর পাট (এই ক্ষণে পাথরে পরিণত) আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ঘটনা লইয়াই যশোহর অঞ্চলে প্রথম ভাসান যাত্রার সৃষ্টি হয়। ভাসানের ভাষা-দোষে, রচয়িতার অযথা বর্ণনায় এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতুতেই শিক্ষিত সমাজে ভাসান যাত্রার আদর নাই। কিন্তু শুক্তিতেই মুক্তা, স্বর্ণকারের নিক্ষিপ্ত অঙ্গারভস্মেই সুবর্ণকণা, সামান্য প্রস্তরেই কোহিনূর এবং দারইয়াই নূরের জন্ম। এই পরিসিদ্ধ বাক্যের অনুকরণে—দৃষ্টান্ত স্থলে বলিতে পারি, মনসার ভাসানই "বেহুলা গীতাভিনয়"।...১২৯৬—৭ই আশ্বিন। মীর মশাররফ হোসেন, শান্তিকুঞ্জ,—টাঙ্গাইল।"

১০। **উদাসীন পথিকের মনের কথা** (উপন্যাস)। (২৯ আগস্ট ১৮৯০)। পৃ. ১৯৮।

"গুপ্ত কথা, গুপ্ত লিপি, গুপ্ত কাণ্ড, গুপ্ত রহস্য, গুপ্ত প্রেম, ক্রমে সকলই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মনের কথা মনেই রহিয়াছে। মনের কথা অকপটে মুখে প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। বিশেষ সংসারীর পক্ষে নানা বিঘ্ন, নানা ভয়, এমন কি, জীবনে সংশয়। সংসারে আমার স্থায়ী বসতিস্থান নাই। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, বুদ্ধি নাই। আপন বলিতে কেহই নাই; সত্য কথা বলিতে দোষ কি?...এই অসার, অপরিচিত, অস্থায়ী "আমি," আমার ভাবনা চিন্তার কোনই কারণ নাই। সুতরাং মনের কথা অকপটে প্রকাশ করিতে বোধ হয় পারিব। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন, আর মা—জানেন। কারণ, শোনা কথাই পথিকের মনের কথা।...উদাসীন পথিক।"—মুখবন্ধ

১১। **গাজী মিয়াঁর বস্তানী,** প্রথম অংশ (উপন্যাস)। ১৫ আশ্বিন ১৩০৬, ইং ১৮৯৯। পৃ. ৪০০।

আখ্যা-পত্রে লেখকের নাম নাই; কেবল "সত্বাধিকারী উদাসীন পথিক" কথাগুলি মুদ্রিত আছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

"গাজী মিয়াঁর বস্তানী একখানি বিচিত্র সমাজচিত্র, সুশোভিত সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই, এমন রস দুর্লভ! কটু, তিক্ত, কষায়,—অম্ল, অম্লমধুর,—মধুর, অতিমধুর,—যাহা চাও, তাহাই প্রচুর। অথচ সকল রসের উপর দিয়া কাতর করুণরস উছলিয়া পড়িতেছে।

গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী হইলে শ্রুতিকটুদোষ পরিহার করিতে পারেন না; স্পষ্ট কথা সত্য হইতে পারে, সকল স্থলে সুমিষ্ট হয় না। সুতরাং গাজী মিয়াঁর কথা স্থানে স্থানে বড়ই কড়া হইয়াছে। তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে কশা ধারণ করিয়া যেখানে যাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন, সেখানেই যেন সপাসপ্ আঘাতধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কাতর ক্রন্দনের সঙ্গে রক্তধারা ছুটিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে! সে আঘাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় নাই? পাঠক! হয় ত তুমি আমি আর তাহারা কেহই বাদ যায় নাই!...

মফঃস্বলের কথা মফঃস্বলের ভাষায় লিখিতে গিয়া গাজী মিয়াঁ প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক প্রকারের পল্লী-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তন্মধ্যে মফঃস্বলবাসী ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকেরই ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন মনে হয়, বুঝি তোমাকে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে! কেবল পাত্রগণের নাম জয়ঢাক, ধিনতাধিনা, তেনাচোরা, দাগাদারী, তুড়ুক পাহাড় ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া যাহা কিছু রক্ষা! বস্তানীর পল্লী-চিত্র ইংরাজরাজ্যের লজ্জার বিষয়; পড়িতে পড়িতে মনে হয়, ইংরাজরাজ্যের বাহিরে বিলাতি বার্নিস, ভিতরে টিনের পাতা; দেখিতে খুব জমকাল। আইন আছে, আদালত আছে। আপীলের উপর আপীল আছে, কিন্তু বিচার নাই! ছোট লোকের সঙ্গে ছোট লোকের মোকদ্দমায় সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটে না; কিন্তু ছোট

বড় ধনী দরিদ্র কলহে লিপ্ত হইলে দরিদ্রের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। বিচার প্রণালীর দোষে বহু ব্যয় করিয়া মুক্তিলাভ করিতে দরিদ্রের প্রাণান্ত ঘটিয়া থাকে, কখন বা এত করিয়াও সুবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দোষ ইংরাজের নহে, দেশীয় কর্ম্মচারীর; গাজী মিয়াঁ সেই কথা বুঝাইবার জন্য নানা কথার অবতারণা করিয়াছেন।...রাজা প্রজা সকলের পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

গাজী মিয়াঁ কে? কে এই কল্পিত নামের অন্তরালে থাকিয়া এরূপ সুতীব্র সমালোচনায় রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খের কার্য্যকলাপের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন? পুস্তক পড়িয়া এই কথা মনে হইবামাত্র দেখিলাম, গাজী মিয়াঁর আত্মগোপনচেষ্টা সফল হয় নাই। পুস্তকের সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পরিস্ফুট। তিনি একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত অনুরক্ত মুসলমান সাহিত্য-সেবক। মুসলমান সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা অল্প, তন্মধ্যে "বিষাদ-সিন্ধুরচয়িতা" শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন ভাই সাহেব বাঙ্গালা গদ্য রচনার জন্য সুপরিচিত। যে লেখনী হইতে 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রসূত হইয়াছে, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'ও যে সেই লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এমন ভাষা, এমন ভাব, এমন কাহিনীবিন্যাস-কৌশল মুসলমান সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্তও কেবল 'বিষাদ-সিন্ধুর রচয়িতাতেই' লক্ষিত হইয়াছে।" ('প্রদীপ,' পৌষ ১৩০৮)

১২। **মৌলুদ শরীফ** (গদ্য-পদ্য)। ইং ১৯০৩।

১৩। **মুসলমানের বাংলা শিক্ষা:**

১ম ভাগ। (১ অক্টোবর ১৯০৩)।
২য় ভাগ। (১৫ মে ১৯০৮)। পৃ. ৫৩।

১৪। **বিবি খোদেজার বিবাহ** (কবিতা)। (২৫ মে ১৯০৫)।

১৫। **হজরত ওমরের ধর্ম্ম-জীবন লাভ** (কবিতা)। ১ শ্রাবণ ১৩১২ (১১ আগস্ট ১৯০৫)। পৃ. ৪২।

১৬। **হজরত বেলালের জীবনী**। (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৫)। পৃ. ৪২।

১৭। **হজরত আমীর হামজার ধর্ম্ম-জীবন লাভ** (কবিতা)। কার্ত্তিক ১৩১২ (১০ নবেম্বর ১৯০৫)। পৃ. ২২।

১৮। **মদিনার গৌরব** (কবিতা)। (১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬)। পৃ. ১২০।

১৯। **মোস্লেম-বীরত্ব** (কবিতা)। (২০ জুলাই ১৯০৭)। পৃ. ১৯৬।

২০। **এস্‌লামের জয়**। (৪ আগস্ট ১৯০৮)। পৃ. ৩০৭।

২১। **আমার জীবনী**। ইং ১৯০৯-১০।

এই আত্মজীবনী ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ড ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ এবং শেষ বা ১১শ-১২শ খণ্ড ২ মার্চ ১৯১০ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই ১২টি খণ্ড আবার একত্রে বাঁধাইয়া (পৃ. ৪১৫) প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহাতে লেখকের প্রথম বিবাহ পর্য্যন্ত জীবনের ঘটনা চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের শেষে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র শেষাংশ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল ; "আমার জীবনীর সহিত গাজী মিয়াঁর বস্তানীর শেষ অংশে বিশেষ সংস্রব আছে।"

২২। **বাজীমাৎ** (কবিতা)। ডিসেম্বর ১৯০৮। পৃ. ১৩১।

২৩। **হজরত ইউসোফ**।

'আমার জীবনী'র ১ম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩১৫) ইহা "যন্ত্রস্থ" বলিয়া বিজ্ঞাপন আছে।

২৪। **খোতবা**।

বাণীর বিহারক্ষেত্রে আমাদের জাতিভেদ, জ্ঞাতিভেদ কিছুই নাই…মায়ের যেমন জাতিবিচার নাই, আমরাও সেইরূপ আজি যেমন মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্য বিলাপ করিতেছি, মীর মোসারেফ্‌ হোসেনের জন্য সেইরূপ গভীর দুঃখে আত্মহারা হইয়াছি। আমার বড় বাসনা হইয়াছিল, মনোমোহন বা গিরিশচন্দ্রের অন্যতর একজনকে এই সম্মিলনের সভাপতি করা হয়;—আমি এমন কি, এইরূপ প্রস্তাবও করিয়াছিলাম। বুঝিয়াছি কাল আমার বিরোধী ছিল। মীর মোসারেফ্‌ হোসেনকে আমি কখনও দেখি নাই; তাঁহার 'বিষাদসিন্ধু' আমাকে বিচলিত করিয়াছিল। বড় আশা করিয়াছিলাম, এই সম্মিলনে তাঁহাকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিব। শেষ সময়ে শুনিলাম, তিনি এখন বিহেস্তবিহারী। যাঁহারা কখন মুর্শিদাবাদের মহরমের সময় মর্শিয়াগীতি শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, মহরমের আখ্যান-কাব্য 'বিষাদ-সিন্ধু' কিরূপ প্লাবনী করুণারসে টল টল করিতেছে। আর সেই সিন্ধুর ভাষা বাঙ্গালি হিন্দু লিখিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে। ('বসুধা,' ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৮, পৃ. ৩৮৬-৮৭)

মীর মশার্‌রফ হোসেন দীর্ঘকাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ তারিখে পরিষদ্‌-মন্দিরে তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মশার্‌রফ হোসেন ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা দেশে বাংলা-সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের দান সম্পর্কে যদি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা চলে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে স্থান, অন্য দিকে 'বিষাদ-সিন্ধু'-প্রণেতা মীর মশার্‌রফ হোসেনের স্থান ঠিক অনুরূপ। এ দেশের মুসলমান

সমাজে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যশিল্পী এবং এখন পর্য্যন্ত তিনিই প্রধান সাহিত্যশিল্পী হইয়া আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যেমন এককালে পঠিত হইয়াছিল, 'বিষাদ-সিন্ধু' তেমনই আজও পর্য্যন্ত জাতীয় মহাকাব্যরূপে বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয়; বাংলা-সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ্ হিসাবে সকল সমাজেই এই গদ্যকাব্যখানির সমান আদর। আর একটি কথা, আজ তাঁহার সম্পর্কে আমাদের স্মরণীয়—তিনি জীবনে এবং সাহিত্যে সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে ছিলেন, হিন্দু মুসলমান—বঙ্গমাতার এই দুই বিবদমান সন্তানের মিলন-সাধনের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা এমনই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে, সুদূর অতীতের কারবালা-প্রান্তরের ট্র্যাজেডিকে তিনি সমগ্র বাংলা ভাষাভাষীর ট্র্যাজেডি করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশের এই প্রতিভাবান্ সাহিত্যিককে আজ আমরা নামে মাত্র চিনি, তাঁহার জীবনীর এবং জীবনের সকল কীর্ত্তির পরিচয় তাঁহার স্ব-সমাজের লোকও রাখেন না। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা তাঁহার বিভিন্ন পুস্তক হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

'বিষাদ-সিন্ধু' : মাবিয়া পীড়িত। তাঁহার ব্যাধি সাংঘাতিক, বাঁচিবার আশা অতি কম; এজিদের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই, পিতার সেবাশুশ্রূষাতেও মন নাই; প্রস্ফুটিত গোলাপদলবিনিন্দিত জয়নাবের সুকোমল বদনমণ্ডলের আভা, সেই আয়তলোচনার নয়ন-ভঙ্গীর সুদৃশ্য দৃশ্য দিবারাত্রি তাঁহার অন্তরপটে আঁকা। ভ্রূযুগলের অগ্রভাগ, যাহা সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় অন্তর ভেদ করিয়া অন্তরে রহিয়াছে, দিবারাত্রি সেই বিষেই বিষম কাতর। সেই নাসিকার সরলভাবে সর্ব্বদাই আকুল। সেই ঈষৎলোহিত অধরোষ্ঠ পুনঃ পুনঃ দেখিবার আশা সততই বলবতী। আজ পর্য্যন্ত চিকুরগুচ্ছের লহরীশোভা ভুলিতে পারেন নাই। সামান্য অলঙ্কার, যাহা জয়নাবের কর্ণে দুলিতে দেখিয়াছিলেন, সেই দোলায় তাঁহার মস্তক

আজ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত জ্বলিতেছে। ললাটের উপরিস্থিত মাথার জালি যাহা অৰ্দ্ধচন্দ্রাকারে চিকুরের সহিত মিলিত হইয়া কিঞ্চিৎভাগ ললাটের শোভা বৰ্দ্ধন করিয়াছিল, তাঁহার মনপ্রাণ সেই জালে আট্কা পড়িয়া আজ পর্য্যন্তও ছট্‌ফট্ করিতেছে। সেই হাসিপূর্ণ মুখখানির হাঁসির আভা, যাহা জয়নাবের অজ্ঞাতে একবার দেখিয়াছিলেন, কত বার নিদ্রা গিয়াছেন, কত শত বার চক্ষের পলক ফেলিয়াছেন, তথাচ সেই মধুর হাসির আভাটুকু আজ পর্য্যন্তও চক্ষের নিকট হইতে সরিয়া যায় নাই। সমস্তই মনে জাগিতেছে।" (মহরম পৰ্ব্ব)

রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজবিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজ্যমধ্যে বিঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলে যথাসময়ে অবশ্যই নির্ব্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়া দিলে সে দুর্দ্দমনীয় তেজও একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া যায়। মহামারী জলপ্লাবন ইত্যাদি দৈব-দুর্বিপাকে রাজ্য ধ্বংসের উপক্রম শেষ হইলেও নিরাশসাগরে ভাসিতে হয় না—আশা থাকে। রাজার মজ্জা দোষে, কি উপযুক্ত মন্ত্রণা অভাবে রাজ্য-শাসনে অকৃত-কার্য্য হইলেও আশা থাকে। মূর্খ রাজার প্রিয়পাত্র হইবার আশয়ে মন্ত্রদাতাগণ অবিচার, অত্যাচার নিবারণ উপদেশ না দিয়া অহরহঃ তোষামোদের ডালি মাথায় করিয়া প্রতি আজ্ঞা অনুমোদন করাতেই যদি রাজা প্রজায় মনান্তর ঘটে, তাহাতেও আশা থাকে।—সে ক্ষেত্রেও আশা থাকে, কিন্তু স্বাধীনতা ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও আর সে রত্ন হস্তগত হয় না। স্বাধীন সূর্য্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা!

রাজা আর রাজ্য, এ দুইটী পৃথক্ কথা—পৃথক্ ভাব—পৃথক্ সম্বন্ধ। রাজা নিজ বুদ্ধিদোষে অপদস্থ হউন, সদ্‌যুক্তি সুমন্ত্রণায় অবহেলা করিয়া পরপদ... দলিত হউন স্বেচ্ছাচারিত্ব দোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি? কার্য্য অনুরূপ ফল। পাপানুযায়ী শাস্তি। স্বেচ্ছাচারী, সুমন্ত্রণাবিদ্বেষী, নীতিবৰ্জ্জিত, উচিতে বিরক্ত, এমন রাজার রাজ্যপাট যত সত্বরে ধ্বংস হয়, ততই মঙ্গল। ততই রাজ্যের শনিক্ষয়। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা। দাসত্ব রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। বিনা কারণে, প্রেমের কুহকে, পিরীতের দায়ে, প্রণয়বাসনায়, পরিণয় ইচ্ছায়, যদি এই রাজ্য যথার্থ ই পরকরতলস্থ হয়, পরপদভরে দলিত হয়, আমাদের স্বাধীনতা লোপ হয়, তবে সে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। সে মনঃকষ্টের আর ইতি হইবে না। রাজা প্রজারক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক এবং

করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা। দায়িত্ব প্রজারই অধিক। রাজ্য প্রজার। রক্ষার দায়িত্ব বাসিন্দা মাত্রেরই। যদি রাজ্যমধ্যে মানুষ থাকে, হৃদয়ে বল থাকে, স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান থাকে, পরাধীন শব্দের যথার্থ অর্থবোধ থাকে, জন্মভূমির মূল্যের পরিমাণবোধ থাকে, একতা বন্ধনে আস্থা থাকে, ধর্ম্মবিদ্বেষে মনে মনে পরস্পর বিরোধ না থাকে, জাতিভেদে হিংসা, ঈর্ষা, এবং ঘৃণার ছায়া না থাকে, অমূল্য সময়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে, আলস্যে অবহেলা এবং শৈথিল্যের বিরোধী যদি কেহ থাকে, আর চেষ্টা থাকে, বিদ্যার চর্চ্চা থাকে, এবং ঈশ্বরে ভক্তি থাকে. তবে যুগযুগান্তরে হউক, শতাব্দী পরে হউক, সহস্রাধিক বর্ষ গতে হউক, কোন কালে হউক, পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন-পরাধীন-গগনে স্বাধীনতা-সূর্য্যের পুনরুদয় আশা একবার করিলেও করা যাইতে পারে। (এজিদ্-বধ পর্ব্ব)

'সঙ্গীত লহরী': আর বাঁচি না প্রাণ সই রে, পোড়া শীতে মজাইল।
অভাগার ভাগ্যেতে বিধি, বুঝি এই লিখেছিল।
কাঁপে অঙ্গ থর থর,
বুঝি গায়ে এল জ্বর,
কারে বলি ধর ধর ভাগ্যে কেহ না জুটিল।
বুকে বুকে মুখে মুখে,
কত জনে আছে সুখে
(কেবল) কান্দি আমি মন দুঃখে, এবারকার শীত একা গেল।
বিধি যদি সদয় হয়ে,
দিতেন হতভাগার বিয়ে,
দেখতেন শীতে দুজনায়ে, মনে বড় খেদ রহিল।

* * *

রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
আমার আমার, সব ফক্কিকার, কেবল তোমার, নামটি রবে;
হবে সব লীলা সাঙ্গ, সোনার অঙ্গ, ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।
সংসারের মিছে বাজি, ভোজের বাজি, সব কারসাজি ফুরাইবে;
মরি এক পলকে, তিন ঝলকে, সকল আশা মিটে যাবে।
তোমার এই আত্মস্বজন, ভাই পরিজন, হায় হায় ক'রে কাঁদবে সবে;

তারা পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা, তুমি কথা না কহিবে ।
দেখ তোমার এই টাকাকড়ি, ঘর বাড়ী, ঘড়ি গাড়ী [illegible] রবে ;
আবার হাত থাকিতে, পা রহিতে, পরের কান্ধে যেতে হবে ।
চিরকাল ক'রে হেলা, গেল বেলা, এখন সন্ধ্যাবেলায় আর কি হবে ;
(এই) জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি, তিনি 'মশা'র ভরসা ভবে ।

* * *

চল মন ষ্টেশনে, টিকিট কিনে,
একবার তারে দেখে আসি ।
১। যার যেখানে ইচ্ছে মনে,
যাচ্ছে করে হাসি খুশী ।
তোমার কি ভাবনা, ঠিক বল না,
ভাবছ কি আর পথে বসি ॥
২। অরে ! বাজলে ঘড়ি, আসবে গাড়ী,
তাজ তুপড়ি বান্দো কসি ।
কর কি দৌড়ে চল, করে বল,
যাবে চলে বাজলে বাঁশী ॥
৩। তোমার কি নাই ঠিকানা, পথ চিন না,
জান না সে কোন দেশবাসী ।
ভাল কি সম্বলে, পথে চল,
বল তোমায় তাই জিজ্ঞাসি ।
৪। কত দিন উচট খেলে, দৌড়ে ম'লে,
ছটকে পলে, তিন চার রসি—
এতে আর কোথা যাবে,
কারে পাবে, ভাবে, মশা দিবানিশি ॥

* * *

ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল ।
ঘুমের ঘোরে থেকে তোমার সর্ব্বনাশ হইল ॥

(তোমার) টাকাকড়ি হীরা মতি যা যেথানে ছিল।
যে পেল সে লুটে পুটে আপন ঘর ভরিল রে॥
যাদের নামে কাঁপিয়াছে বাসুকি পাতালে।
এখন তাদের বুকে মারছে নাথি বামরের দলে রে॥
বিদ্যা বুদ্ধি সাহস বলে বলী ছিল যারা।
শেল কুকুরের মত মারা যাইতেছে তারা রে॥
যা দেখেছ আছে এখন তার ত কিছু নাই।
সুখের দফা শেষ করেছে বিড়ালচখ ভাই রে॥
রেল চলেছে কল চলেছে চলেছে আর কত।
সঙ্গে সঙ্গে কাটছে পিলে খেয়ে এড়ির গুঁত রে॥
সূর্য্য এখন চিত্র করে বিদ্যুতে দেয় আলো।
তেল সলিতার বিনে বাতি জ্বলিতেছে ভাল রে॥
ছয় মাসের পথের কথা এক পলকে আসে।
পেঁড়ের খবর নিচ্ছে লোকে আপন পিড়ের বসে রে॥
জলে খেলে কলের বোট কত বা জাহাজ।
গঙ্গার বুকে বাঁধ বাঁধিল কলি মহারাজ রে॥
দেখে শুনে ভুলছে লোকে হায় রে কারিগরি!
ঘরের খবর কেউ রাখে না এই ত বাহাদুরি রে॥
(ওরে) সাত সমুদ্র পারে গিয়া তোমার পুত্রগণ।
শিক্ষালাভ করিতেছে মনের মতন রে॥
আবার বলবীর্য্য দেখাইতে কোন কোন নারী।
বীর বেশেতে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে সারি সারি॥
মৃত্যুজীব জাগিতেছে গলাবাজীর বোলে।
ভারতসভা জাতিসভা হচ্ছে দলে দলে রে॥
নাই ভেদাভেদ কোন প্রভেদ হিন্দু মুসলমান।
ক্রমে ক্রমে হইতেছে এক দেহ এক প্রাণ রে॥

দিনে দিনে বাড়তেছে বি. এ, এম্. এর দল।
মেয়েরা সব শিক্ষালাভে হয়েছে পাগল রে।
জাগ জাগ ওরে ভারত ঘুমিও না আর।
তোমার ছেলে তোমার মেয়ে সকলই তোমার রে।

'গো-জীবন': ভারতের অনেক স্থানে গো বধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভা সমিতি বসিতেছে, বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরেজী, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দু মোসল্মান একত্রে এক প্রাণে এক যোগে গোবংশ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংরেজী পত্রিকায় আবার প্রতিবাদও চলিতেছে। এ সময় আর নীরব থাকা উচিত মনে করিলাম না।

আমি মোসল্মান—গো জাতির পরম শত্রু। আমি গোমাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পারি, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গোবৎসের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু স্বায়চক্ষে যাহা দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব? স্বাভাবিক ভাব কোন্ ভাববশে গোপন করিব? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জ্জনা করিবেন। মুন্সী সাহেব! ক্ষমা করিবেন। সুফি সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগৎ পরাধীন—কিন্তু মন স্বাধীন।...

আমাদের মধ্যে "হালাল" এবং "হারাম" দুইটি কথা আছে। হালাল গ্রহণীয়, হারাম পরিত্যাজ্য। এ কথাও স্বীকার্য্য যে—গোমাংস হালাল, খাইতে বাধা নাই। অশ্বমাংসও অন্য মতে (সাফি) হালাল। আমার মতে (হানিফি) হালালও বলিতে পারি না, স্পষ্ট হারামও বলিতে পারি না। মাঝামাঝি একটা নাম আছে (মক্‌রুহ) আবার ঐ সাফি মতে জলজন্তু মাত্রই হালাল। দৃষ্টান্তচ্ছলে এ কথা বলিতে পারি যে, রজকের পদ যতটুকু জলের মধ্যে বস্ত্র ধৌত সময় ডুবিয়া থাকে, সাফি মতের দায় দিয়া সে মনুষ্যপদটুকুও জলমধ্য হইতে কাটিয়া লইয়া ঝল্‌সা; পোড়া, সিদ্ধ, সুরুয়া, যাহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করিয়া উদরে ফেল, কোন চিন্তা নাই; কখনই পাপের খাতায় নাম উঠিবে না।—ইহাও শাস্ত্রের কথা। কিন্তু শাস্ত্রে এ কথা লিখা নাই যে, গোহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধঃ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে। বরং যাহা অখাদ্য,—যথা বরাহ—সে বিষয়

পবিত্র কোরাণশরিফে স্পষ্টভাবে বরাহ নাম উল্লেখে "খাইও না" (হারাম) লিখা আছে। খাইলে প্রধান নরক "জাহান্নাম" তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে, আর নিস্তার নাই। খাদ্য সম্বন্ধে বিধি আছে যে, খাওয়া যাইতে পারে, খাইতেই হইবে, গোমাংস না খাইলে মোসলমানি থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—এ কথা কোথাও লিখা নাই।

খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি,—খাই না। ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ্ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা,—গিলি না। গোসাপ উদরসাৎ করিতে পারি—বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটও যাই না। ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাদ্য, সে পাঁঠার দিকে তত ঘেঁষি না; যে ছাগীতে দুগ্ধ দেয়, তাহাকেই "আল্লাহ আক্‌বার" শুনাই। পাঁঠার সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই, তাহা বলিতে পারি না। রসনা পরিতৃপ্ত আশয়ে তাহার বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা রহিত করিয়া দিয়া দিব্বি মোটাসোটা চর্বিদার জিনিস বানাইয়া, কোরমা কালিয়া, কবাবে পেট পুরিয়া থাকি। উট এদেশে নাই, থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়া যাইত না। কারণ, শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়। মহিষ খাদ্য, তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে? কাজেই নিরীহ গো জাতির গলায় ছুরি বসাইতে আর এদিক্ ওদিক্ চাহি না। এত খাদ্য থাকিতেও কি গোমাংস না খাইলেই চলে না? ঘোড়া, মহিষ, বনগরু, মেষ, ছাগল, মৃগ, খরগোস, সকলি ত চলিতে পারে? এ সকল খাইলেও ত ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়? এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন? ইহার উত্তর কে দিবে?

গোদুগ্ধেই আমাদের জীবন। দশ মাস মায়ের উদরে বাস করিয়া জগতের মুখ দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে থাকি, সে সময়,—হায়! অমন কঠিন সময় কিসে আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়? মনে মনে একটা কথা উঠিতেছে—মায়ের ত দুগ্ধ আছে? আছে। কিন্তু গো-রস মায়ের উদরে না গেলে মায়ের স্তনে দুগ্ধ পাই কৈ? মায়ের স্তনে দুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই গো-রসে জীবন রক্ষা করিয়াছে। মিষ্টান্নে, পক্বান্নে সদ্যোজাত নবশিশুর প্রাণ রক্ষা হয় না, দুগ্ধই জীবের জীবন। জগতে দুগ্ধ ছাড়া এমন কোন একটি খাদ্য নির্দ্দিষ্ট নাই যে, শুধু সেই খাদ্যটি খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়।

গো-রসই বঙ্গের উপাদেয় খাদ্য। সুস্থ অসুস্থ শরীরে, এমন কি, প্রাণ সঞ্চার হইতে বিয়োগ পর্য্যন্ত দুগ্ধের প্রয়োজন। সেই দুগ্ধের মূল গোধনকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলে আর কি রক্ষা আছে!! ...

আর একটি কথা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক—সংসারকার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?

ধর্ম্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানিও বোধ হয়—হয় না। এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি ? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না। যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয়, সে ত্যাগে ক্ষতি কি ?

সংশোধন ও সংযোজন

দ্বিতীয় খণ্ড

চরিতমালা নং ২২—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :

পৃ. ৮২, পংক্তি ৫-এর পর এই অংশ বসিবে :—

এই গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনাগুলি স্থান পাইয়াছে। ইহাতে প্রকাশিত "বর্ষায় মানভঞ্জন" কবিতাটি (পৃ. ৬৪) ২১ জুলাই ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত হইয়াছিল। এগুলি ছাড়া গুপ্ত-কবির 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' প্রকাশিত আরও দুইটি প্রাথমিক রচনা ("শরদ্বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন" ও "বসন্ত বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন") আমি 'প্রবাসী'তে (মাঘ ১৩৫৩) পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

পৃ. ৮৪—ইহার শেষে এই অংশটি সংযোজন করিতে হইবে :—

পত্রাবলী : পরিষৎ-প্রকাশিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের ৮ খানি পত্র স্থান পাইয়াছে। ইহা ছাড়া ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্র ১৩৩১ সালের 'সচিত্র শিশিরে' মুদ্রিত হইয়াছে।

নাট্য-রূপ : কলিকাতা সাধারণ-রঙ্গালয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্য-রূপ প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। নাট্য-রূপের সবগুলি পুস্তকাকারে পাইবার উপায় নাই; কয়েকখানির কেবল গানগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। ('গিরিশ-গীতাবলী,' 'অমর-গ্রন্থাবলী', 'অতুল-গ্রন্থাবলী' দ্রষ্টব্য)। এ-যাবৎ এই কয়টি নাট্য-রূপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে :—

বিষবৃক্ষ	...	অমৃতলাল বসু	...	২৩ মার্চ	১৮৭৪
চন্দ্রশেখর	...	ঐ	...	১৫ সেপ্টেম্বর	১৮৭৫
রাজসিংহ	...	ঐ	...	১৮ মে	১৮৯৬
দেবী চৌধুরাণী	...	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	...	২ জুলাই	১৮৯২
দুর্গেশনন্দিনী	...	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	...	৩ মার্চ	১৮৭৩
কপালকুণ্ডলা	...	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	...	১৪ অক্টোবর	১৮৭৯

সীতারাম	...	গিরিশচন্দ্র ঘোষ*	...	২৭ অক্টোবর ১৯৩৯
ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল)	...	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	...	ইং ১৯৩৯ (?)
ইন্দিরা ও কমলাকান্ত	...	ঐ	...	৯ জুন ১৯৪০
সন্তান (আনন্দমঠ)	...	শ্রীবাণীকুমার	...	মে ১৯৪৫
সীতারাম	...	শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	...	মে ১৯৪৬

প্রথম নয়খানি বসুমতী-প্রবর্ত্তিত "নাট্য-সিরিজে" প্রকাশিত হইয়াছে; তারকা-চিহ্নিত দুইখানির আখ্যা-পত্রে ভুলক্রমে "অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত" মুদ্রিত হইয়াছে।

চরিতমালা নং ২৩—মধুসূদন দত্ত :

পৃ ২৯, ২১ পংক্তির শেষে তারকা-চিহ্ন বসাইয়া এই পাদটীকা সংযোজন করিতে হইবে :—

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত, গৌরদাস বসাককে লিখিত (২৪-১১-৮৯) রাজনারায়ণ বসুর একখানি পত্র এ-বিষয়ে আলোকপাত করে। রাজনারায়ণ লিখিতেছেন :—

"The Madras secret, I believe, is that Modhu eloped with the lady with whom he lived as wife but this myself and my son knew before I corresponded with you about Modhu's life. *You did not tell me anything about it.*"

এই সময়ে কুচবিহারে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে একজন উপযুক্ত লোকের জন্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। মধুসূদন এই পদপ্রার্থী হইয়া কুচবিহারাধিপতি নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

Calcutta Police, 27th January 1860.

My dear Raja Sahib,—I see an advertizement in the 'Englishman' in which your Highness wants a magistrate. Allow me to offer my services to you. Your Highness knows that I have been for several years connected with the Calcutta Police and understand criminal matters pretty well....Your Highness must know that I shall have to sacrifice my prospects here if I go up to your country, and the offer

must be tempting enough to induce me to do so. I shall undertake to give you such a Police-Establishment throughout your Principality in one year, that your Highness will win the praise of the British Government...('উৎসাহ' ৪র্থ বর্ষ, ১৩০৭-৮)

পৃ. ৯৬, পংক্তি ১৩-১৪ : "('বঙ্গীয় নাট্যশালার...দ্রষ্টব্য')" কথাগুলি বর্জন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই অংশ বসাইতে হইবে :—"বেঙ্গল থিয়েটার ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই এ-বিষয়ে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। বিজ্ঞাপন দুইটি এইরূপ —

The Bengal Theatre,—...Next Saturday, Maya Kanan, or the Enchanted Grove, the posthumous production of the late Michael Modusudan Dutta, will be produced. (The *Englishman* for 17 April, 1874.)

Bengal Theatre...This Evening Saturday. 25th April, 1874. For the Second time. Maya Kanana ; or The Enchanted Grove By the late Mr. Michael M. S. Datta...(The *Englishman* for 25th April, 1874.)